শ্রীশ্রী

কৃতান্ত মহাসত্র

• শ্রীশ্রী ব্রহ্ম সমহিতা • শ্রীশ্রী সর্বাত্মা মহালীলা • শ্রীশ্রী ব্রহ্মনির্দেশিকা



গ্রন্থাংশ সূচি

বিজ্ঞপ্তি

পাঠকগণ যদি আপনারা কেউ কনোকিছুকে সত্য বলে ইতিমধ্যে মেনে থাকেন, তাহলে প্রথমেই বলে দেওয়া হলো, এই গ্রন্থকে আপনারা পাঠ করে, নিজেদের বিভ্রান্ত করবেন না। কনো কিছুকে সত্য বলে মেনে নেবার ব্যাপারে বিস্তারে বলতে হলে, ভৌতবিজ্ঞান বা রসায়ন, বা যেকোনো সম্প্রদায়ের যেকোনো ধর্মগ্রন্থের সমস্ত অক্ষরকে সত্য জ্ঞান করে নিয়ে, যদি তাঁদের দেখানো বা ব্যখ্যা করা কথাকেই অন্তিম সত্য বলে মেনে থাকেন, তাহলে শ্রীশ্রী কৃতান্ত মহাসূত্রকে এই মুহূর্তে বন্ধ করে দিন, কারণ এই গ্রন্থ পাঠ করে আপনি বিভ্রান্ত হবেন।

হ্যাঁ, এই গ্রন্থ কেবল ধর্মগ্রন্থই নয়, এটি একটি মহাদিব্যগ্রন্থ, তবে তার অর্থ এই নয় যে এই গ্রন্থের মধ্যে কনো দিব্যশক্তি আছে যা আপনার গৃহে সঞ্চিত করে, কনো বিশেষ সুরক্ষা কবচ প্রদান করবে আপনাকে বা আপনার পরিবারকে। হ্যাঁ, এর প্রতিটি শব্দ দিব্য, প্রতিটি ব্যাখ্যা দিব্য, এবং প্রতিটি ভাব দিব্য ও প্রতিটি নির্দেশ দিব্য, কিন্তু এই গ্রন্থ কনো চমৎকারী গ্রন্থ নয় যে কেবলমাত্র এই গ্রন্থকে সঙ্গে রাখলেই আপনি উপকৃত হবেন, তাই তেমন আচার অনুষ্ঠান এঁকে নিয়ে করবেন না।

দিব্যআদেশেই লিপিবদ্ধ হলেও এই গ্রন্থ তাঁদের কনো উপকারে লাগবেনা, যারা কিছু না কিছুকে সত্য বলে ইতিমধ্যে ধারণা করে রেখে দিয়েছেন। তাই আপনি যদি তেমন ধারার ব্যক্তি হন, তবে আপনার অমূল্য সময় এই গ্রন্থের জন্য ব্যয় করে, তার অপচয় করবেন না।

এই গ্রন্থ সত্য অর্থে কেবলই সাধকদের জন্য, যারা সত্যে স্থাপিত হবার মার্গের সন্ধান করছেন। এই গ্রন্থ কেবল ও কেবলই তাঁদের অন্তরে ভক্তি, জ্ঞান ও আদর্শকে স্থাপন করতে সক্ষম, অন্য কারুর মধ্যে নয়। আপনি এই গ্রন্থকে যদি পাঠ না করেন এবং সঙ্গে না রাখেন, তবে কনো ভাবেই এই গ্রন্থের বা এই গ্রন্থের দিব্যতাকে অপমান করছেন না । তাই নিশ্চিন্ত এবং নির্বিঘ্ন হয়ে, আপনি এই গ্রন্থকে বর্জন করতে পারেন।

যদি আপনি সাধনার মার্গের সন্ধান করছেন, অথচ বিবিধ গ্রন্থ বা মতদ্বারা আবিষ্ট হয়ে, ভ্রমিত হয়ে যাচ্ছেন, এমন বোধ করেন, তবেই এই গ্রন্থ পাঠ করুন। তবে এমনও নয় যে এই গ্রন্থ পাঠ করার কালে, এর প্রতিটি শব্দকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেই হবে, নাহলে সেই অবিশ্বাসের জন্য আপনি কুফল লাভ করবেন। এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহজে কেউ করতে পারবেন না, তবে যিনি পারবেন, তিনি নিশ্চিত ভাবে মোক্ষের দ্বারে স্থিত হবেন। তবে আবারও বলি, আপনি যদি মোক্ষের দ্বারে স্থিত হতে আগ্রহী না হন, যদি সম্পূর্ণ সত্যকে অনুধাবন করতে আগ্রহী না হন, তবে এই গ্রন্থের থেকে আপনি দূরত্ব স্থাপন করুন, এতেই আপনার মঙ্গল।

শ্রীশ্রী ব্রহ্ম সংহিতা

প্রভু শ্রীদাস ব্রহ্মসনাতন হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার, এবং তাঁর একমাত্র কন্যা হলেন দেবী দিব্যশ্রী । দেবী দিব্যশ্রী একদিন ব্যকুল হয়ে বললেন, "পিতা, আপনি বলেন ব্রহ্মই ব্রহ্মময়ী হয়ে সম্মুখে আসেন, এবং আমাদের উদ্ধার করতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনিই আমাদের অন্তরে চেতনা হয়ে বিরাজ করেন, আর তিনিই হলেন প্রকৃতি। পিতা আমি জানতে চাই যে আমাদের এই সাহায্যের প্রয়োজন পরে গেল কেন? আমরা কে? প্রকৃতিই বা কে? আর প্রকৃতি আমাদের কি রূপে সাহায্য করেন?

আমি আপনার এই কথাকে ধারণা করার জন্য বেদের অধ্যায়ন করেছি, উপনিষদের অধ্যায়ন করেছি, কোরান ও বাইবেলের অধ্যয়ন করেছি, ত্রিপিটকের অধ্যয়ন করেছি, পুরাণাদির অধ্যায়ন করেছি। কিন্তু সমস্ত কিছুর অধ্যায়ন করে, আমার মাথায় সমস্ত কিছু জট পাকিয়ে গেছে। যেখানে বেদ আত্মার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারের গীত গাইছে, সেখানে উপনিষদ আত্মার বিশ্লেষণে রুচি রাখছে, আবার বুদ্ধমত চেতনার গুণগান গাইছে। যেখানে পুরাণ ও বেদ বলছে আত্মার অধীনেই স্থিত প্রকৃতি, সেখানে বুদ্ধমত ও বেদান্ত বলছে, প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব! ... আমি কোন ধারাতে বিশ্বাস রাখবো পিতা?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "কনো মতেই বিশ্বাস রাখার প্রয়োজন নেই পুত্রী। কে ঠিক আর কে বেঠিক, সেই তর্ক আমাদের সত্যের তো বাখান দেবেনা, তাই না! ... তাই কারুরই মতকে ধারণা না করে, কারুরই উপর পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন না করে, সত্যে মনন করো। তুমি স্বয়ং সত্যকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করে আছো। তাই কারুর থেকে কিছু জানার আবশ্যকতা কোথায়? নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করো পুত্রী, আর সেখান থেকে সমস্ত সত্যকে আস্বাদন করো। ...

হ্যাঁ পুত্রী, যদি বুদ্ধিদ্বারা, মস্তিষ্কদ্বারা সত্যের ধারণা করতে যাও, তবে কখনোই সত্যের আভাস পাবেনা, কারণ বুদ্ধি বা মস্তিষ্ক, এমনকি মনেরও সত্যকে ধারণা করার সামর্থ্য নেই। সেই সামর্থ্য একমাত্র তোমার হৃদয়ের কাছে আছে। তাই হৃদয় দ্বারা সত্যকে অনুধাবন করো, সম্যক সত্য তোমার সামনে স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করবে। তখন দেখবে, কে কতটা সঠিক বা কতটা বেঠিক, সেই নিয়ে আর দ্বন্ধ থাকবেনা। সমস্ত কিছু তোমার নিজেরই মানসনেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, আমি অন্য কনো গ্রন্থের অধ্যায়ন আর করতে চাইনা। আপনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম অবতার, স্বয়ং সত্য সনাতন, স্বয়ং সমাধিতে স্থিত হয়ে, সত্যের আলোকে স্নান করেছেন। সেখান থেকে নির্গত হয়ে আপনি বলেছেন, এক শূন্যই সত্য, বাকি সমস্ত কিছু হয় অনিত্য নয় মিথ্যা। সেই সমাধির থেকে মুক্ত হয়ে আপনিই বলেছেন, না তো কনোদিন কিছু ছিল, আর না কনো

কিছু সম্ভব। ... তাই পিতা, আমি আপনার মুখ থেকেই জানতে চাই, আর আমার মনে হয় আপনার থেকে অন্য কেউ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নেই, যিনি আমাকে সম্পূর্ণ সত্যের শ্রেষ্ঠসম্ভব ব্যখ্যা দিতে পারেন।

পিতা আপনার কন্যা হয়ে, আমি যদি সত্য সম্বন্ধে অনবগত থাকি, এঁর থেকে লজ্জার আর আমার কাছে কিচ্ছু হতে পারেনা ।... তাই পিতা আমাকে কৃপা করে ব্যখ্যা দিন, প্রকৃতি কি? আমরাই বা কে? আমাদের সাথে প্রকৃতির সম্বন্ধ বা সম্পর্ক কি? যদি কিছু নাই থাকে, যদি শূন্যই একমাত্র সত্য হয়, তবে এই আমাদেরই বা অস্তিত্ব সম্ভব হলো কি ভাবে, আর প্রকৃতিরই বা অস্তিত্ব কি ভাবে সম্ভব হলো! ... আপনি বলেন, প্রকৃতি আমাদের উদ্ধার করেন। কি ভাবে আমাদের উদ্ধার করেন তিনি? আমাকে কৃপা করে এই সম্পূর্ণ কিছু বলুন। আমি জিজ্ঞাসু, আমি শ্রদ্ধালু, আমি জ্ঞানপিপাসু, আমার ক্ষুধাকে, আমার পিপাসাকে তৃপ্ত করুন পিতা"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "পুত্রী, আমি তোমাকে একটি সাধারণ গল্প বলছি এই প্রসঙ্গে, শ্রবণ করো । এই সাধারণ কথা তোমাকে এই সম্পূর্ণ রহস্যের একটি সহজ ব্যখ্যা প্রদান করে দেবে, আর আমার বিশ্বাস তুমি সেই সহজ ব্যখ্যার থেকে নিজের ক্ষুধানিবৃত্তির পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। শোনো তবে, একটি সাধারণ মানুষ নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন, আর সেই পরিচয় ফিরে পাবার জন্য তিনি ব্যাকুল।

তাঁকে অনেকে স্মৃতি ফেরানোর প্রয়াস করেছেন, স্মৃতি ফেরানোর মত কথা বলে, কিন্তু কিচ্ছুতে কিচ্ছু হয়নি। যখন সমস্ত পূর্বস্মৃতি হারিয়েই ফেলেছেন সেই ব্যক্তি, তখন পুরাতন স্মৃতিদ্বারা তাঁর স্মৃতিকে ফেরানো কি সম্ভব? না সম্ভব নয়, আর তাই সেই ব্যক্তিটির সব চাইতে প্রিয়জন, তাঁর সাথে একটি নূতন সম্পর্কে যুক্ত হন। সেই প্রিয়জন নিজের স্মৃতি হারাননি, কিন্তু এমনই ভাবে তিনি সেই স্মৃতি হারিয়ে ফেলা ব্যক্তির সাথে মিলিত হন, যাতে সেই ব্যক্তির একটিবারও মনে না হয় যে পুরাতন স্মৃতি ফিরিয়ে দেবার জন্যই এই সখ্যতা স্থাপন করেছেন অন্যব্যক্তিটি, আর তাই স্মৃতিহারা যেই যেই কর্ম করতে আগ্রহী হন, সেই সেই কর্মেই যোগদান প্রদান করে পুনরায় স্মৃতিহারার কাছে প্রিয়জন হয়ে ওঠেন তিনি।

এমন করে এক নতুন এবং নীবির সম্পর্ক স্থাপন করলেন সেই প্রিয়জনটি; এবং যখন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন সেই প্রিয়জন, তখন তিনি অবলুপ্ত হবার অভিনয় করলেন, যাতে স্মৃতিহারা ব্যক্তি তাঁর অনুসন্ধান করেন। কি ভাবে অনুসন্ধান করবেন তিনি? প্রিয়জন সত্য অর্থে অবলুপ্ত হননি। কেবলই নিজেকে আচ্ছাদিত করে, অবলুপ্ত হবার অভিনয় করেছেন তিনি। তাই নেপথ্যে থেকে তাই তাই করালেন সেই প্রিয়জন, যা যা করে, সেই স্মৃতিহারা তাঁর পূর্ব সমস্ত স্মৃতিকে ফিরে পান।

অর্থাৎ পুত্রী, স্মৃতিহারা হয়ে যাবার পর, যখন সেই স্মৃতিহারা ব্যক্তিটি পূর্বপরিচয়ের সাথে আলাপ করতে চাইছিলেন না আর নতুন পরিচয়ের সন্ধান করছিলেন, তখন তাঁর প্রিয়জন তাঁর কাছে এক নতুনপরিচয় নিয়েই আসেন, এবং যা যা কর্ম করলে স্মৃতিহারা তৃপ্ত হয়ে পুনরায় তাঁকে প্রিয়জন রূপে গ্রহণ করবেন, তাই তাই করলেন। আর যখন তিনি পুনরায় প্রিয়জন হয়ে গেলেন, তখন তিনি

নিজেকে আচ্ছাদিত করে, স্মৃতিহারাকে বাধ্য করলেন, তাঁর সন্ধান করতে। আর সেই সন্ধান করতে করতে, স্মৃতিহারা নিজের স্মৃতি ফিরে পেয়ে যান।

পুত্রী, পরাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ীও আমাদের সঙ্গে ঠিক এমনটাই করেন। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ স্মৃতি হারিয়ে ফেলার পর, পুরাতন স্মৃতির ব্যাপারে চিন্তাও করতে চাইনা, এবং নতুন পরিচয় স্থাপনের প্রয়াস করি । সেই সময়ে আমাদের সর্বোত্তম প্রিয়জন, অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের সাথে যুক্ত হন। তিনি আমাদের সাথে নতুন এক সম্পর্কে যুক্ত হন, আর যুক্ত হয়ে, আমাদের সম্মুখে সেই সেই কর্ম করতে থাকেন যা যা করলে আমরা পুনরায় তাঁকে প্রিয়জন বলে স্বীকৃতি প্রদান করবো। আর তেমন করার ফলে, তিনি পুনরায় আমাদের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। আর যেইমুহূর্তে তিনি আমাদের প্রয়োজন হয়ে ওঠেন, তখনই তিনি নিজেকে আচ্ছাদিত করেন, যাতে আমরা তাঁর সন্ধান করতে বাধ্য হই। আর তাঁর সন্ধান করতে করতে, আমরা একসময়ে নিজেদের সত্যের সাথে পরিচিত হয়েই যাই। এই হলো আমাদের সাথে প্রকৃতির সম্পূর্ণ সম্পর্কের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা পুত্রী"।

দেবী দিব্যশ্রী সামান্য চুপ করে থেকে, নিজের অন্তরে চিন্তন করে বললেন, "এঁর অর্থ পিতা, কি হিন্দুশাস্ত্র, কি বৌদ্ধশাস্ত্র, কি ইসলামশাস্ত্র, সমস্ত শাস্ত্র আমাদেরকে এই স্মৃতি ফিরে আসার কথাটুকুই কেবল বলেছে! অর্থাৎ যখন প্রকৃতি আমাদের থেকে অবলুপ্ত হবার ভান করেন, আর আমরা কর্ম করতে শুরু করি, এবং আমাদের স্মৃতি ফিরে পাই, সেই কথাই বলেছে এখনোপর্যন্ত লেখা সমস্ত ধর্মগ্রন্থ! ... স্মৃতি হারিয়ে যাবার পূর্বে আমরা কেমন ছিলাম, তার কেবল উচ্চারণই করা হয়েছে মাত্র নিরাকার, নির্বিকার, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য ইত্যাদি বলে!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সম্পূর্ণ ভাবে সঠিক কথা বলেছ পুত্রী। ... প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ আমাদের কেবলই এই স্মৃতি ফিরে আসার সময়ে আমরা যা কর্ম করি, আমরা যা উপলব্ধি করি, সেটুকুই বলেছে; স্মৃতি হারানোর পূর্বে কি ছিলাম তার মাত্র আভাসটাই দেয় তাঁরা; কিন্তু প্রকৃতি কি ভাবে আমাদের স্মৃতি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন, সত্য বলতে সেই ব্যখ্যা কেবলমাত্র বুদ্ধমতধারা অবলম্বন করে প্রকৃতির অবতার মার্কণ্ড দিয়েছিলেন মার্কণ্ড মহাপুরাণে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিজেদের তত্ত্বকে স্থাপনার অভিলাষে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়নকে দিয়ে অন্য এক মার্কণ্ড পুরাণ লিখিয়ে, আসল গ্রন্থের বিনাশ করে দিয়েছিলেন। ... তাই পূর্বসত্য, আর প্রকৃতির ক্রিয়া জানার জন্য মানবসমাজের কাছে আর কনো গ্রন্থ অবশিষ্ট নেই"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, যদি আদেশ করেন, আর অনুমতি দেন, তবে আমি কি সেই গ্রন্থের রচনা করতে পারি। ... আপনার থেকে শ্রেয় সেই কথা কেউই বলতে সক্ষম নন। আমি আপনার কথাই শ্রবণ করবো, আর সেই কথাকেই লিপিবদ্ধ করবো, সমস্ত মানবসমাজের হিতের জন্য"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই লিখবে পুত্রী। জনকল্যাণের জন্য করা প্রতিটি কর্মকেই স্বাগত। আমি বলছি, তুমি পূর্বে শ্রবণ করো। শ্রবণ করার কালে লিখোনা, এতে না তো তোমার উপলব্ধি হবে, আর না তোমার লিখনের পাঠ করে কেউ কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। প্রতিদিবস সন্ধ্যায় যা আমি বলবো, তার রাত্রে ধ্যান করবে, এবং তাকেই প্রভাতে লিপিবদ্ধ করবে"।

দেবী দিব্যশ্রী, প্রভু ব্রহ্মসনাতন যেমন পদ্ধতিতে এবং যেমন উপায়ে বললেন, সেই ভাবেই সমস্তকিছুকে লিপিবদ্ধ করলেন, আর যা লিপিবদ্ধ করলেন, তার নাম দিলেন শ্রী শ্রী ব্রহ্ম সমহিতা, যা তিনি নিজের ও পিতার, অর্থাৎ প্রভু ব্রহ্মসনাতনের ভাষ্য অনুসারেই লিখলেন -

প্রকৃতিতত্ত্ব

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, পূর্বের স্মৃতি বলতে গেলে, সেই সময়ের কথা বলতে হয়, যেই সময়ে কিচ্ছু ছিল না, অর্থাৎ যেই সময়ে কেবলই সত্য বিরাজ করতো, বা শূন্য বিরাজ করতো। সেই অব্যাক্ত, অচিন্ত্য, অনন্ত, অসীম এবং নিরাকার শূন্য অবস্থাই সত্য, আর তাঁকেই পণ্ডিতবর্গ বলেন ব্রহ্ম। অর্থাৎ পুত্রী, সত্য এই যে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছুর কনো অস্তিত্বই নেই, আর কিচ্ছুর কনোসময়ে অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। তবে তুমি বলবে, আমি বা তুমি, বা আমরা সকলে, বা এই জগত কি তবে? ... পুত্রী, এই প্রশ্নের উত্তর হলো ভ্রম।

হ্যাঁ পুত্রী, সমস্তটিই ভ্রম, আর সেই ভ্রমেই এই জগত, এই তুমি, আমি, এবং সর্বস্ব কিছু বিরাজ করছে। সেই ভ্রমেরই দর্শককে বলা হয় পুরুষ বা আত্মা, এবং সেই ভ্রমকেই বিনাশ করার জন্য যিনি সম্মুখে উপস্থিত, তিনিই ভক্তের ভাষ্যে হলেন প্রকৃতি, যিনি অন্য কেউই নন, স্বয়ং পণ্ডিতের ব্রহ্ম এবং জ্ঞানীর শূন্য । অর্থাৎ পুত্রী, সত্য বলতে গেলে, আত্মা বা পুরুষও সেই ব্রহ্ম, প্রকৃতিও সেই ব্রহ্ম, আর সমস্ত ভ্রমকে অপসারিত করে দিলে, যা পরে থাকে তাও ব্রহ্ম। পুত্রী, যেই স্মৃতিহারা ব্যক্তির কথা বললাম, তিনিই হলেন পুরুষ, আর যিনি সেই স্মৃতিকে ফিরিয়ে দিতে সমস্ত লীলার অবতারণা করলেন সেই স্মৃতিহারা ব্যক্তির প্রিয়জন, তিনিই হলেন প্রকৃতি।

এবার শোনো তাহলে, স্মৃতি হারিয়ে যাবার পূর্বে পুরুষ কি ছিলেন; কেন বা কি ভাবে তিনি স্মৃতি হারালেন, স্মৃতি হারানোর পূর্বে প্রকৃতির সাথে তাঁর সম্বন্ধ কেমন ছিল, আর স্মৃতি হারানোর পরে প্রকৃতি কি ভাবে তাঁর সাথে নব্যসম্পর্ক স্থাপন করলেন, এবং সম্পর্ক স্থাপনের উপরান্তে কি কি হলো, বা কি কি করলেন প্রকৃতি।

পুত্রী, পরমশূন্য, পরমসত্য পরব্রহ্ম তিনি, যিনি না থেকেও আছেন, থেকেও নেই। এমন বলার কারণ এই যে যা কিছু নেই, তাই তিনি, আর যা কিছু আছে, তাই ভ্রম অর্থাৎ তাও বাস্তবে নেই, অর্থাৎ তাও তিনিই । সত্যসার এই যে না তো কিছুর অস্তিত্ব কনো কালে ছিল, আর না কনো কালে কনো কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব। একটি সময় ছিল যখন কনো ভ্রমও ছিলনা, তাই ব্রহ্মাণ্ডও ছিলনা। এখন সেই

ভ্রমটি আছে, যা বাস্তবে না থেকেও, কেবলই ভ্রম বলেই তা আছে, কারণ আমরা ভ্রমিত। আর যখন আমাদের এই ভ্রমের নাশ হবে, তখন আবারও সেই অবস্থাতেই আমরা উপস্থিত হবো যেখানে আমরাও নেই, আর অন্য কিচ্ছুও নেই।

অর্থাৎ পুত্রী, আমি অমুক, আমি তমুক, এই ভানই ভ্রম, কারণ আমার কনো অস্তিত্বই নেই; আমার অস্তিত্বই একটি ভ্রম। সত্য এই যে আমি তাই যা কনো কালেই নেই, কনো কালেই সম্ভব নয়। ব্রহ্মাণ্ডও সত্য অর্থে তাই যা কনো কালেই নেই, আর কনো কালেই সম্ভব নয়। যা আছে, তা কেবলই ভ্রম। তাই বললাম ব্রহ্ম তিনি, যিনি নেই। যা কিছু নেই তাই ব্রহ্ম, আর বাস্তব ও সত্য এই যে কনোকিছুর কনো কালেই কনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

পুত্রী, যদি কিছু থাকতো, তবে তা অবশ্যই ব্যাক্তও হতো, যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডও ব্যাক্ত, আর এই ব্রহ্মাণ্ডের নিরিখে ভগবানও ব্যক্ত। কিন্তু যা নেই, তা কিরূপে ব্যক্ত হবেন? তাই ব্রহ্ম হলেন অব্যাক্ত। যা আছে, তা অবশ্যই চিন্ত্য, কিন্তু যা নেই তা কি করে চিন্ত্য হবেন? তাই ব্রহ্ম অচিন্ত্য। তিনি তাই যা নেই, আর তিনিই একমাত্র সত্য; তাই তিনি শূন্য অর্থাৎ যা নেই; তাই তিনি অসীম অর্থাৎ যার সীমাই সম্ভব নয় কারণ তিনিই সত্য। এই হলো ব্রহ্মের ব্যখ্যা, যা কনোভাবেই ব্যাখ্যা নয়। ব্রহ্ম তিনিই যা নেই আর যাহাই সমস্ত কিছুর আদি সত্য, তাই তাঁর ব্যখ্যা সম্ভবই নয়।

ব্রহ্মকে একমাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব হয় সমাধি বা নির্বাণ অবস্থায়। আর সেই অবস্থা থেকে কেবল ও কেবল ঈশ্বরকটিই প্রত্যাবর্তন করতে পারেন, অন্য কেউ নন, আর তাও যে পারেন কি উপায়ে, তা বলছি তোমায় সমস্ত কথার শেষে। কিন্তু অন্য জীবকটিরা এই সমাধি বা নির্বাণ অবস্থায় স্থিত হবার পর কনোকালেই প্রত্যাবর্তন করেন না। কেন করেন না? পুত্রী, সাগরে পাঁচটি নদীর জল মিশে গেলে, যেমন কনো ভাবেই বলা যায়না যে কোন জলের কণাটি কোন নদীর, তেমনই মহাশূন্য পরব্রহ্মে লীন হবার পর আর কনো ভ্রমই অবশিষ্ট থাকেনা, কনো পরিচয়ই অবশিষ্ট থাকেনা। তাই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব।

এখানে তোমার প্রশ্ন নিশ্চয়ই এই যে, যখন কিচ্ছুই নেই, তখন ভ্রমেরই বা রচনা হলো কি করে? আর ভ্রমিতই বা হল কে? পুত্রী, নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো, শূন্যের কনো অণু কি করে সম্ভব! অণু তারই সম্ভব যার অস্তিত্ব সম্ভব; কিন্তু যার অস্তিত্বই নাস্তি, তার অণু কি করে সম্ভব বা অস্তি হতে পারে! তাই ব্রহ্মের কনো অণু বা কনো ভাগই সম্ভব নয়। আর পুত্রী, যা অসম্ভব, তার ভান করাই হলো ভ্রম। সেই ভ্রমেই আবদ্ধ হন কিছু ব্রহ্মাণু, কারণ বাস্তবে ব্রহ্মাণু সম্ভবই নয়।

সেই ব্রহ্মাণু, যারা বাস্তবে ছিলেন নিষ্ক্রিয়, অব্যক্ত, এবং অচিন্ত্য, তাঁরা ভ্রমের অর্থাৎ স্মৃতিক্ষয়ের পর হয়ে উঠলেন সক্রিয়, বিভ্রান্ত এবং চিন্তায় লীন। পূর্বেই যেমন বলেছিলাম পুত্রী, যখন আমাদের পূর্বের কথার মানুষটি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর প্রিয়জন কি করেন? তিনি তাঁর কাছে এক নতুন পরিচয়ে এসে, তাঁর সাথে এক নব্যসম্পর্কের স্থাপন করেন। ঠিক তেমনই ভাবে, নিষ্ক্রিয়, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্ম এই সমস্ত বিভ্রান্ত এবং স্মৃতিহারা অণু, যারা বাস্তবে অণু না হয়েও, কেবল কল্পনাতেই অণু, তাঁদের স্মৃতি

ফিরিয়ে স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে, নিষ্ক্রিয়তা, অব্যক্ততা, এবং অচিন্ত্যতা ত্যাগ করে, সক্রিয়, ব্যক্ত এবং চিন্তনীয় রূপ ধারণ করেন, আর সেই রূপের নাম হলো প্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী।

অর্থাৎ পুত্রী প্রকৃতি হলেন সেই ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্মাণুরাও সেই ব্রহ্মই। ভেদ এই যে, ব্রহ্মাণু, জাকে জ্ঞানী বলেন আত্মা এবং পণ্ডিত বলেন পুরুষ, তাঁরা নিজের স্বরূপের স্মৃতি হারিয়ে নূতন স্বরূপের সন্ধান করে ফিরছেন, আর প্রকৃতি নিজের স্বরূপের স্মৃতি না হারিয়েই ব্রহ্মাণুদেরকে স্মৃতিতে ফেরাতে, তাঁদের কাছেই এসে উপস্থিত।

প্রথমেই যে কাহানীর অবতরণ করেছিলাম, সেই কাহানীকে স্মরণ করো পুত্রী। কি বলেছিলাম সেখানে? সেখানে বলেছিলাম এই যে একজন নিজের পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন এবং নতুন পরিচয়ের সন্ধান করছেন। আর তাঁরই প্রিয়জন তাঁর স্মৃতিকে ফিরিয়ে দেবার প্রয়াসে নতুন সম্পর্কে তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে, তাঁর নিকট আত্মীয় হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা করছেন। কেন স্মৃতি হারানোর কথা বলেছিলাম, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো! ... ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা, ব্রহ্মের শূন্যতাকে ভুলে, অস্তিত্বের সন্ধানে, যার অণুই সম্ভব নয়, তাঁর অণু হয়ে সম্মুখে আসছেন ব্রহ্মাণু বা পুরুষেরা, যারা সংখ্যা সহস্র সহস্র লক্ষ ।

আর কে তাঁদের প্রিয়জন, তাও বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই! স্বয়ং ব্রহ্মের থেকে অধিক প্রিয়জন এই ব্রহ্মাণুদের আর কেই বা হতে পারে? এই ব্রহ্মাণুরা একে অপরের কাছেও ততটা আপনজন বা প্রিয়জন নন, যতটা ব্রহ্ম তাঁদের সকলের কাছে প্রিয়জন, কারণ তাঁরা সকলেই নিজের নিজের পৃথক পরিচয় লাভে উন্মত্ত। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁদের স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁদের হারিয়ে ফেলা স্মৃতি। কনো ব্যক্তির সর্বাধিক প্রিয় হলেন তাঁর প্রকৃত পরিচয়ের স্মৃতি। তাই ব্রহ্মই এই বিভ্রান্ত পুরুষদের সর্বাধিক প্রিয়জন, আর তিনিই নিজের নিষ্ক্রিয়তা আর অব্যক্ততা ত্যাগ করে, ব্যক্তরূপে, এবং সক্রিয়রূপে প্রকৃতি।

পুত্রী, যেমন করে বলেছিলাম তোমাকে সেই কাহিনীতে যে, পূর্বপরিচয় নিয়ে যখন স্মৃতিহারার সম্মুখে যাওয়া হয়, তখন স্মৃতিহারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে দেন। তাই স্মৃতিহারার কাছে নবপরিচয় নিয়ে উপস্থিত হতে হয় । ব্রহ্মের সেই নবপরিচয়ই হলেন প্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী। অর্থাৎ পুত্রী, বাস্তব এই যে না তো প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে কনো ভেদ আছে, আর না পুরুষ ও ব্রহ্মের মধ্যে। পুরুষরাও সেই ব্রহ্মই, সেই সত্যই, কিন্তু স্মৃতি হারিয়ে তাঁরা বিভ্রান্ত, আর তাই সেই সত্যতা ভুলে, তাঁরা নতুন পরিচয় প্রাপ্ত করতে অভিলাষ রাখেন আর সেই অভিলাষেই তাঁরা এক নয় একাধিক।

আর প্রকৃতিও স্বয়ং সেই ব্রহ্মই, যিনি এই বিভ্রান্ত পুরুষদের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ ব্রহ্মপরিচয় গুপ্ত রেখে, প্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী বেশে, সেই পুরুষদের ভ্রমের মধ্যেই অবস্থান করেন, ঠিক তেমন ভাবেই যেমন করে আমাদের কাহিনীতে প্রিয়জন স্মৃতিহারার ভ্রমের মধ্যেই নিজেকে স্থাপিত করেন নবপরিচয় গ্রহণ করে। এই হলো এই ভ্রমের আদিসত্য, বা আদি কাহিনী। যা সংক্ষেপে বললে এই দাঁড়ায় যে, যেই ব্রহ্মই সত্য, সেই সত্যস্মৃতিকে হারিয়ে ফেলেন কিছু সেই অণু, যারা বাস্তবে অণু নন, এবং তাঁরা

নিজেদের পুরুষ হিসাবে স্থাপিত করে নতুন পরিচয় লাভ করতে চান। আর তাঁদের প্রিয়জন স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁদেরই ভ্রমেই প্রবেশ করেন ব্রহ্মময়ী বেশে, এবং এই পুরুষদের সাথে নতুন করে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, তাঁদের স্মৃতি তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিতে।

এবার তোমার প্রশ্ন এই যে, এই স্মৃতি প্রকৃতি ফেরান কি ভাবে, তাই তো? আবারও কাহিনীর কথা স্মরণ করো পুত্রী। কাহিনীতে আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম এই যে সেই প্রিয়জন স্মৃতিহারার সাথে নবসখ্যতা স্থাপন করেন, এবং তাঁর কাছে স্থিত হয়ে সেই সেই কর্ম করেন, যেই যেই কর্ম করে স্মৃতিহারা নিজের নব্য পরিচয় লাভ করতে পারেন, আর এই ভাবে পুনর্বার স্মৃতিহারার কাছে তিনি প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। ঠিক তেমনই ক্রিয়া প্রকৃতি করেন পুরুষের সাথে"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু পিতা পুরুষ মানে, যারা ভ্রম বশত নিজেদের এই পৃথক পৃথক অণুরূপ অস্তিত্বকে সত্য মানছিলেন, তাঁরা তো নিজেদের নতুন পরিচয়ের সন্ধান করছিলেন। তা প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী তাঁদেরকে সেই কর্মে কি রূপে সাহায্য করলেন, তাঁদের প্রিয়জন হয়ে ওঠার জন্য!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "প্রতিটি পুরুষের ভ্রমজগতের মধ্যে প্রবেশ করলেন প্রথমে ব্রহ্মময়ী, এবং সকলের কাছে নিজের সেই তিনরূপকে স্থাপন করলেন, যেই তিনরূপ ব্যতীত পুরুষেরা নিজেদের নবপরিচয় লাভ করতে পারবেননা। আর সেই তিনরূপ হলো বিদ্যাস্বরূপ, শ্রীস্বরূপ, এবং শক্তিস্বরূপ।

যার কনো লিঙ্গ না থাকলেও, ভক্তিবেশে আমি যাকে তুমি জানো, মাতা সর্বাম্বা বলি, সেই ব্রহ্মময়ী প্রকৃতিই বিদ্যাবেশে এক নবপরিচয় স্থাপনের বিদ্যা, সুর, বর্ণ এবং অক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু সেই সমস্ত কিছু বিদ্যাদ্বারা কি করে পুরুষ কিছুর নির্মাণ করবেন এবং নিজের পরিচয় স্থাপন করবেন? কিছু নির্মাণের জন্য তো কিছু সামগ্রীও প্রয়োজন। সেই সামগ্রী প্রদানের জন্য প্রকৃতি দ্বিতীয় যেই স্বরূপ ধারণ করেন, তা হল শ্রী, যিনি ধান, ধন, জয়, বিজয়, সন্তান, উর্জ্জা, সমস্ত কিছু প্রদান করেন পুরুষকে।

এই সামগ্রী ও সামগ্রীকে ব্যবহার করার বিদ্যা নিয়েই বা পুরুষ কি করবেন? এগুলিকে ব্যবহার করার শক্তি তো আবশ্যক। সেই শক্তি প্রদানের জন্য প্রকৃতি পরবর্তী যেই রূপ ধারণ করলেন, তা হলো শক্তি। পুত্রী, পুরুষও প্রকৃতির এই তিনরূপকে ধারণ করার জন্য এবং নবনির্মাণ করার জন্য, ত্রিগুণে বিভক্ত হলেন, যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ ধারণ করলেন বিদ্যাকে, রজগুণ ধারণ করলেন শ্রীকে, এবং তমগুণ ধারণ করলেন শক্তিকে।

কিন্তু পুত্রী, পুরুষ প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে মুল্যঙ্কন করতে পারবেন কি করে? তাঁরা যে ভ্রমিত! তাই সত্ত্বগুণ প্রথমে ধারণ করলেন বিদ্যারছায়াকে অর্থাৎ ছায়াবিদ্যাকে, রজগুণ প্রথমে ধারণ করলেন ছায়াশ্রীকে, এবং তমগুণ প্রথমে ধারণ করলেন ছায়াশক্তিকে। কিছুই নয় পুত্রী, প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্মুখে থাকলেও, পুরুষ যে নিজের ভিন্ন অস্তিত্বের ভ্রমে অহং-এঁর চিন্তা করতে মত্ত। আর সেই অহংএর ফলে, প্রথমত তাঁরা ছায়ামূর্তিদেরই গ্রহণ করেন, এবং পরে যখন ছায়ামূর্তিদের সাথে মিলনের ফলে, বিকারদের জন্ম হওয়া

শুরু হয়, তখন তাঁরা প্রকৃতিকে প্রিয়জন মানতে শুরু করেন, এবং অহংকারকে ঈষৎ ধারণ করে, তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে, পঞ্চভূতের জন্ম দেন।

আকাশতত্ত্ব অর্থাৎ মন ও জলতত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি জন্ম নেয় সত্ত্বগুণ ও বিদ্যার থেকে; মৃত্তিকাতত্ত্ব অর্থাৎ শরীরের জন্ম হয় শ্রী ও রজগুণের থেকে; আর অগ্নিতত্ত্ব অর্থাৎ উর্জ্জা এবং পবন বা প্রাণবায়ুর জন্ম হয় শক্তি এবং তমগুণের থেকে। অন্যদিকে ছায়াবিদ্যা এবং সত্ত্বগুণের থেকে জন্ম হয় কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ বা দম্ভ এবং ঈর্ষার; ছায়াশ্রী এবং রজগুণের থেকে জন্ম হয় ভয়, দ্বেষ, শঙ্কা, হিংসা, লজ্জা, ঘৃণা, কুল ও শীলের; তথা ছায়াশক্তি এবং তমগুণের থেকে জন্ম হয় ইন্দ্রিয়াদির।

পুত্রী, এই ত্রিগুণ ও প্রকৃতির সন্তানরা ব্রহ্মাণ্ডের গঠনকর্মে সহায়ক হন, এবং ত্রিগুণ ও ছায়াপ্রকৃতির সন্তানরা ব্রহ্মাণ্ডকে বিকারে আবদ্ধ করে, ভ্রমের সঞ্চার করতে সদাব্যস্ত থাকেন। পুত্রী, একটি পুরুষ অজস্রবার ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ করেন, এবং লয় করেন, যেখানে নির্মাণ কর্মের শুরু হয় যখন মাতৃগর্ভে একটি সন্তান ভ্রূণ অবস্থায় স্থিত থাকেন, আর ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয় মৃত্যুর কালে।

স্মরণ রেখো পুত্রী, প্রতিবার এক জিবকটির জন্ম হয়, প্রতিবার এই ত্রিগুণের সাথে ত্রিপ্রকৃতিরূপের এবং ত্রিছায়াপ্রকৃতিরূপের মিলন হয়, এবং প্রতিবার এই সন্তানরাই জন্ম নেয়। কিন্তু হ্যাঁ, যতই ভ্রম ঘন হয়, ততই ছায়াপ্রকৃতির সন্তানরা শক্তিশালী হন, আর তাই পঞ্চভূতকে তাঁরা সহজেই পরাধীন করে রেখে দেন। আর যতই ভ্রম বিনষ্ট হতে থাকে, ততই প্রকৃতির সন্তানরা শক্তিশালী হন, আর ততই পঞ্চভূত বিকারশূন্য হয়ে বিরাজ করেন।

কিন্তু এই পঞ্চভূত অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জ্জা, এবং দেহ জন্ম নিলেই, তথা বিকারেরা জন্ম নিলেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়না। সাতটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার নির্মাণ করে পুরুষ, প্রকৃতির সংসর্গে থেকে, সূক্ষ্মকুণ্ডলিনী দেহভাবের নির্মাণ করে। পুত্রী, সমস্ত বিকারদেরকে এবং পঞ্চভূতকে রাখা হয় এই সমূহ ব্যবস্থার বাইরে, এবং যদি এঁরা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা ত্যাগ করে সাম্যতায় স্থাপিত হতে পারে, তবেই এঁদের জন্য কুণ্ডলিনীর দ্বার উন্মোচিত হয়।

তখন বিকাররা মূলাধারে স্থাপিত থাকেন অর্থাৎ প্রথম সূক্ষ্মশরীরে স্থাপিত থাকেন, এবং পঞ্চভূতেরা তখন মনিপুরে এবং তাঁদের থেকে স্থাপিত চতুর্বিংশতিতত্ত্বরা স্বাধিষ্ঠানে অর্থাৎ তৃতীয় এবং দ্বিতীয় সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করেন। পরবর্তী তিনটি সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত থাকেন বিদ্যা, শ্রী ও শক্তি, কিন্তু তাঁদের নিকট উপস্থিত হতে গেলে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শরীরে বিকার ও ভূতদের স্থাপিত করতে হয়।

আর পুত্রী যখন এই সমস্ত ব্যবস্থার নির্মাণ হয়ে যায় এক শিশুর দেহে, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত সাতটি সূক্ষ্ম শরীরের রচনা হয়ে যায়, তখন তাঁর স্থূলদেহ গঠিত হয়, এই সাত সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টির বেশে । তবে আবারও বলছি পুত্রী, এমন একটিবারের জন্যও ভেবোনা যে

বাস্তবে এই সমস্ত কিছু হয়। এই সমস্ত কিছুর শুরুই হয়, পুরুষের ভ্রমান্ডে, আর সেই ভ্রমান্ডের অতিতে এই সব কনো কিছুরই কনো অস্তিত্ব থাকেনা।

তবে প্রকৃতি এই সমস্ত ক্রিয়াতে পুরুষকে সঙ্গ দেন, যাতে তাঁর প্রিয়পাত্র হতে পারেন। আর একবার যখন এই সমস্ত স্থুল শরীরের ধারণা সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন প্রকৃতি নিজেকে এই চতুর্থ, পঞ্চম, এবং ষষ্ঠম সূক্ষ্মশরীরে, অর্থাৎ অনাহতে, বিশুদ্ধে এবং আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত করে নিয়ে, কুলকুণ্ডলিনী দ্বারা নিজেদের অবস্থানের স্থানকে আবদ্ধ করে রেখে, পুরুষকে ব্যকুল করে তোলেন, এবং পুরুষ সর্বক্ষণ প্রকৃতির সন্ধান করে ফেরেন।

পুত্রী, এই কর্ম প্রতিবার যখন ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয় তখনের, আর এই প্রতিবার ব্রহ্মাণ্ড রচনার শেষে, প্রকৃতি তিনটি সূক্ষ্মশরীরে নিজেদের স্থাপিত করে, কুলকুণ্ডলিনীদ্বারা আচ্ছাদিত সুষুম্না, অর্থাৎ সাতটি সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারকে আবদ্ধ করে রেখে দেন। তবে এমন ভেবো না পুত্রী যে, তাঁরা কেবলই আচ্ছাদিত হয়ে থাকেন, সমস্ত পুরুষের বিদ্যা আহরণে, সম্পদ উত্তোলনে, এবং শক্তি সঞ্চয় ও ব্যবহারে তাঁরা তখনও যোগদান করতে থাকেন, আর সেটি পুরুষের কাছে অধিক চিন্তার বিষয় হয়, কারণ তিনি প্রকৃতিকে দেখতে না পেলেও, প্রকৃতি যে আছেন, তার প্রমাণ তিনি পেতেই থাকেন।

পুত্রী, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে ক্রমে এমন স্তরে উপস্থিত হয়, যেখানে স্থিত হয়ে মনের অর্থাৎ আকাশতত্ত্বের, বুদ্ধির অর্থাৎ জলতত্ত্বের, প্রাণের, উর্জ্জার এবং দেহের আয়ু হয়ে যায়, এবং তাঁরা নাশের মুখে অবস্থান করেন। সেই সময়ে প্রকৃতি সেই ব্রহ্মাণ্ডের নাশ করে দেন, এবং পুনরায় পুরুষকে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করান প্রথম থেকে। অর্থাৎ পুনরায় পুরুষের সাথে প্রকৃতির ত্রিরূপের এবং প্রকৃতির ত্রিছায়ারূপের মিলন ও পুনরায় ভুত এবং বিকারদের জন্ম হয়, এবং পুনরায় প্রকৃতি অনাহতে, বিশুদ্ধে, এবং আজ্ঞাতে আবদ্ধ করে নেন নিজেদেরকে, এবং পুরুষকে তাঁর অনুসন্ধান করতে বাধ্য করান।

পুত্রী, যখন ভূত, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এবং বিকারদের মনিপুরে, স্বাধিষ্ঠানে এবং মুলাধারে স্থাপন করতে সক্ষম হয় পুরুষ, তখনই তাঁরা পুনরায় প্রকৃতির সাখ্যাত লাভ করে, আর তারপরে প্রকৃতির হাত ধরে সহস্রারে উন্নীত হয়ে, সমাধি লাভ করে নিজেদের স্বরূপে অর্থাৎ শূন্যে উপস্থিত হয়ে, ভ্রমের নাশ করেন পুরুষ। এই হলো সম্পূর্ণ প্রকৃতির ক্রিয়া"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, এতো অতি সংক্ষেপে বললেন আমাকে, বিভিন্ন ভূতেরা, বিভিন্ন বিকারেরা কি কি ভাবে ক্রিয়া করেন, আর পুরুষেরা কি ভাবে তাঁদেরকে সূক্ষ্মে স্থাপন করতে সক্ষম হন, সেই বিষয়ে বিস্তারে বলুন আমাকে পিতা"।

ভূতবিকারতত্ত্ব

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যবদনে বললেন, "বেশ পুত্রী, সেই কথা তোমাকে অতি স্পষ্ট ভাবেই বলছি, এবং এঁদের বিস্তারে ব্যাখ্যা দেব। ... আর পুরুষ কিছু করেন না পুত্রী, কেবলই চিন্তন করেন, এবং কাল যাপন করেন। কর্ম করেন প্রকৃতি। যেমন করে এক স্মৃতিহারা ব্যক্তি কর্ম করেন না, কর্ম করার চিন্তন করেন, আর তাঁর প্রিয়জন যিনি নবপরিচয় গ্রহণ করে তাঁর পুনরায় প্রিয়জন হয়ে রয়েছেন, তিনিই সেই চিন্তন অনুসারে কর্ম করেন, সেই স্মৃতিহারার প্রিয় হয়ে থাকার জন্য, তেমনই পুরুষ কেবলই চিন্তন করেন, এবং প্রকৃতি সেই অনুসারে কর্ম করতে থাকেন।

আর পুরুষ যেই চিন্তন করেন, ভূতদের এবং বিকারদের একত্রিত করে, সেই চিন্তনেরই কর্মফল হয়, কর্মের নয়। যেই পুরুষ নিজেই ভ্রমিত, সে কর্ম করবে কি উপায়ে? সে কনোদিনও, কনো কর্ম করেনি। কেবলই কর্মের চিন্তন করেছেন তিনি, আর সেই চিন্তনের ফল পেয়েছেন তিনি। আর পুত্রী, এই কর্ম করা থেকে কর্মের ফল লাভ করার অবধিকে কাল বা সময় বলা হয়। অর্থাৎ পুত্রী, যতক্ষণ পুরুষ ভ্রমিত, ততক্ষণই সে চিন্তন করতে থাকে নিজের নতুন পরিচয়ের ব্যাপারে, আর ততদিনই তিনি কর্মফল পেতে থাকেন, এবং কালের ব্যাপ্তি হতে থাকে, আর একেই বলে কর্মচক্র।

আর এই কর্মচক্রের বন্ধনকে পুরুষ তখনই খণ্ডন করতে পারেন, যখন তিনি ভ্রমের নাশ করে ফেলেন। তবে ভ্রমের নাশ করার কথা পরে, পূর্বে তোমাকে তোমার ইচ্ছা অনুসারে আমি মনের, বুদ্ধির, এবং অন্যান্য ভূতদের বিস্তারের কথা, এবং তাঁদের সাথে বিকারদের মিশ্রণের ও প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করি, তা শ্রবণ করো। এই বিস্তারের অনুসারেই পুরুষ নিজের উপর একাধিক ভ্রমের আস্তরণকে স্থাপন করে রেখে দেন, এবং ব্রহ্মাণ্ড নাশ হবার পূর্বে, সেই সমস্ত ভ্রমপর্দার স্মৃতিকে নিজের মধ্যে রেখে দেন, যাকে পরবর্তী ব্রহ্মাণ্ডে যতক্ষণ না স্থাপন করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সেই নবব্রহ্মাণ্ডের অগ্রগতি শুরু হয়না।

অর্থাৎ পুত্রী, মন-বুদ্ধি-প্রাণ-উর্জ্জা-দেহ এই পঞ্চভূত যেমন যেমন বিকারদের সাথে সংগ্রামে স্থাপিত হয়, তেমন তেমন ভ্রমের পর্দার নির্মাণ করে পুরুষ, এবং তেমন তেমন ভ্রমের অন্তরালে নিজেকে স্থাপিত রাখেন তিনি। তবে এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে, একটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হয়ে গেলে, পরবর্তী ব্রহ্মাণ্ডে পূর্বের ব্রহ্মাণ্ডের কনোরূপ প্রতিফলন পরবে না। বাস্তব এই যে, পূর্বের ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার ভ্রমপর্দা স্থাপিত ছিল, সেই সমস্ত পর্দাকে যতক্ষণ না পুনরস্থাপিত করা হবে, ততক্ষণ সেই নতুন ব্রহ্মাণ্ডের নবপথ অতিক্রম শুরুই হয়না। ...

তাই পুত্রী, যেই ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত হয়ে, অর্থাৎ যেই ভ্রমশরীরে স্থিত হয়ে কারুর কাছে ভ্রমনাশের চেতনা এসেছে, সেই দেহতেই সেই ভ্রমের নাশ করতে হয়; তা না হলে, তাঁর পরবর্তী ব্রহ্মাণ্ড তাঁকে পুনরায় এমন অবস্থায় স্থিত করে দেবে, যেখানে স্থিত হয়ে আবার ভ্রমনাশ করার জন্য বহুকাল লেগে যাবে। ...

এই তত্ত্বকে যদি বুঝতে চাও, তাহলে একটি ছোট্ট গল্প শুনে নাও। একটি ব্যক্তি মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে একটি বিশেষ মিষ্টান্ন খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রের সুবিধা অসুবিধার বিচার করে, তিনি সেই মিষ্টান্ন আহারের থেকে দূরে থাকেন, আর একদিন তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়, আর মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর স্মরণ আসে যে মিষ্টান্নটি তাঁর আহার করা হয়নি। তাই তিনি আবার দেহ নিয়ে এলেন, কেবল সেই মিষ্টান্নটি গ্রহণ করার জন্য। আর সেই দেহে তিনি হলেন এক গরিবের সন্তান, এবং যেই মিষ্টান্ন আহার করতে চেয়েছিলেন, সেই স্থানের থেকে বহুদূরে স্থিত। ... দীর্ঘ ৭০ বছর চলে যাবার পরে, তাঁর কাছে কেউ সেই মিষ্টান্নের কথা বলেন, কিন্তু তারপর আর সেই মিষ্টান্ন গ্রহণ করা হলো না। আর পুত্রী, সেই ব্যক্তি সেই মিষ্টান্ন যখন গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর আরো পাঁচটি জন্ম চলে গেছে, আর এই পাঁচটি বছরে তাঁর বহু আরো চিন্তা এসে যাবার জন্য, তাঁর সময় আরো অধিক চলমান হতে থাকে।

কি বুঝলে এঁর থেকে পুত্রী? যদি চেতনা আসে ভ্রমনাশের, তবে সেই জন্মেই, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তা সম্পন্ন করতে হয়, নাহলে তা যে কত জন্ম পিছিয়ে যাবে, তার কনো হিসাব নেই"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, আপনার এই সমস্ত কথা থেকে দুটি বিষয়ের সম্বন্ধে আমার দ্বন্ধ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রথম দ্বন্ধ এই যে, পুরুষ যখন কনো কর্মই করতে পারেনা, তবে কর্মফল কি করে তিনি ভোগ করেন? আর দ্বিতীয় দ্বন্ধ হলো কর্মচক্র নিয়ে। কর্মচক্রের ধারণা আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। কর্মচক্র কি? কর্ম করা আর কর্মের ফল ভোগ করা, এই যদি কর্মচক্র হয়, তবে তো এই কর্মচক্রের অবসান কখনোই হবেনা! আর যদি এই চক্রের সমাপ্তি না হয়, তবে পুরুষ নিজের স্বরূপ কি করে লাভ করবে?

অর্থাৎ আমার কথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের অর্থাৎ আমাদের আত্মার স্মৃতি ফেরানোর জন্য, তাঁর সাথে নতুন সম্পর্কে যুক্ত হলেন, এতটা তো বুঝলাম। সেই সম্পর্কে স্থিত হয়ে, আত্মা বা পুরুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি এবং সাতটি সূক্ষ্মদেহের রচনা করতে দিলেন পুরুষকে, এবং স্বয়ং সেই সাতটি সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে তিনিটি সূক্ষ্মশরীর অধিকার করে নিয়ে, পুরুষের থেকে লুক্কায়িত হয়ে গেলেন। কি ভাবে লুক্কায়িত হলেন? পুরুষ যেহেতু পঞ্চভূত ও বিকারদের পর্দাকে অধিগ্রহণ করে নিলেন, সেহেতু সূক্ষ্মদেহের দিকে তার নজর রইলো না, আর ফলে, প্রকৃতিকে সে আর খুঁজেও পেলো না, এটাও বুঝলাম।

এবার প্রকৃতির অনুসন্ধান করার জন্য, সে একাধিক কর্মের চিন্তা করতে থাকলো, আর সেই কর্মের চিন্তার পরিবর্তে প্রকৃতি তাঁর কর্মফল নিশ্চয় করলেন। এটা আমার কাছে বোধগম্য হলো না। পুরুষ চিন্তা করলেন, সেই চিন্তা অনুসারে প্রকৃতি কর্ম করলেন, আর কর্মফল ভোগ করলেন পুরুষ! ... আর দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চিন্তা-কর্ম-কর্মফলের চক্র চালাতে থাকলেন কেন প্রকৃতি? কি এই চক্রকে চলমান করার পশ্চাতে উদ্দেশ্যে?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন তৃপ্ত হয়ে বললেন, "পুত্রী, তোমার প্রশ্ন সর্বত ভাবে যথার্থ। আর তোমার প্রশ্ন এটি বলে দেয় যে, তোমাকে আমি যা বলছি, তাকে তুমি হৃদয় দ্বারা অনুভব করার প্রয়াস করছো, আর তা করছো বলেই তোমার মনে এই যথার্থ প্রশ্নগুলির উদয় হয়েছে। ... হ্যাঁ, তুমি সঠিক অনুধাবন করেছ, পুরুষ যেহেতু পর্দাদের অবতারণা করে সূক্ষ্ম, এবং স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করে তাতেই মাকড়সা যেমন নিজের জালে অবস্থান করে, তেমনই ভাবে পুরুষ অবস্থান করেন, সেহেতু প্রকৃতির সন্ধান তিনি কিছুতেই করতে পারেন না। আর সেই সন্ধান লাভ করার জন্যই তিনি ক্রমাগত চিন্তা করেন, আর সেই চিন্তা অনুসারে কর্ম করেন প্রকৃতি, আর সেই কর্মের কর্মফল লাভ করেন পুরুষ। ...

এবার তোমার প্রশ্ন হলো যে যখন কর্ম করছেন প্রকৃতি, তখন ফল কেন পুরুষ ভোগ করছেন, এই তো? পুত্রী, যেই জগতই একটি ভ্রম, সেই জগতে কি করে কর্ম করা যেতে পারে? অর্থাৎ পুত্রী, কনো কর্ম করা হয়না। কেবলই যিনি ভ্রমিত, অর্থাৎ পুরুষ, তিনি নিজের ভ্রমেরই বিস্তার করার চিন্তা করতে থাকেন। একটি সময় পর্যন্ত নিজের ভিন্নতার ভাবকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই পুরুষ কর্মচিন্তা করে চলেন, আর সেই কর্মচিন্তা প্রকৃতিকে মাধ্যম করেই করেন, তাই তাঁর ধারণা হয় যেন কর্মগুলি বাস্তবে হচ্ছে।

আর কর্মের সেই বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার ভান করে, ভ্রমের মধ্যেই ভাবেন পুরুষ যে তিনি মহান হচ্ছেন, বৃত্তবান হচ্ছেন, সম্মান লাভ করছেন, অপমানিত হচ্ছেন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন, নিজের কামনার বস্তু পাচ্ছেন, নিজের কামনার বস্তু হারাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পুত্রী, সেগুলি কি বাস্তবে হচ্ছে? না পুত্রী, বাস্তবে কিচ্ছুই হচ্ছে না, কারণ পুরুষ তো একটি ভ্রম-অণ্ডের মধ্যেয় স্থিত থেকেই , নিজের ভ্রমের মধ্যেই এই ভাঙাগড়ার খেলা খেলছেন, আর প্রকৃতি তাঁর সেই শিশুবৎ ক্রীড়াকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। বাস্তবে কেউ কিচ্ছু হচ্ছেন না, কেবলই কিছু হচ্ছেন, কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, সম্মান বাড়ছে, সম্মান চলে যাচ্ছে, ধন আসছে, ধন চলে যাচ্ছে, ক্ষমতা পাচ্ছেন, ক্ষমতা হারাচ্ছেন, এই ভাবনার মধ্যে তিনি আবদ্ধ আছেন, যা সর্বৈব ভাবেই মিথ্যা এবং কাল্পনিক।

পুত্রী, পুরুষ কেবলই কল্পনা করে চলেন যাতে প্রকৃতি সহায়তা করেন তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার জন্য। সেই কল্পনা অনুসারে প্রকৃতির সাহায্যে তিনি যাচনা করেন, আর সেই কল্পনা এবং যাচনার মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেন যোজনাদ্বারা, আর তাকেও প্রকৃতি সহায়তা করতে থাকেন। অর্থাৎ পুত্রী, পুরুষ কনো কর্মই করেন না, আর সত্য বলতে কনো কর্ম বাস্তবেও হয়না, না সেই কর্ম পুরুষ করেন, আর না সেই কর্ম প্রকৃতি করেন। এবার বলো পুত্রী, যদি কনো কর্মই না হয়, কেবলই কর্মের চিন্তা হতে থাকে, কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা হতে থাকে, তবে তার পরিণাম পুরুষের কাছে কিরূপে স্থাপিত হবে?"

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এক অনন্ত চক্রের রচনা হবে, চিন্তা এবং হতাশার চক্র... এত চিন্তার পরেও, আশাপ্রদ কর্মফল না পাবার জন্য পুনরায় চিন্তা করবে পুরুষ, আর পুনরায় কর্মফলের আশা করবে, আর পুনরায় হতাশাই আসবে"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সেটিই তো হয়ে চলে পুত্রী, সর্বক্ষণ। সর্বক্ষণ পুরুষ কিছুর না কিছুর কল্পনা করছেন, আর সেই কল্পনাকে ভিত্তি করে যাচনা করে চলেন, আর সেই যাচনাকে কেন্দ্র করে যোজনা করে চলেন। কিন্তু সেই কল্পনা, সেই যাচনা, বা সেই

যোজনা, কনোকিছুরই ফল লাভ করেন না তিনি। আর সেই না ফল পাওয়াই হলো কর্মফল। আর সেই কর্মফলের কারণে সমানে পুরুষ অধিক থেকে অধিক হতাশ হতে থাকেন, আর সেই হতাশা একসময়ে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করে নেয়, এবং এক অনন্ত চক্রে তাঁকে স্থাপিত করে দেয়, যার নাম কর্মচক্র।

পুত্রী, এই সমস্ত কিছুই এক কল্পনার অণ্ডে স্থিত হয়ে পুরুষ করতে থাকেন, আর এই কল্পনার পর যাচনা, যাচনার পর যোজনা করে, কর্মফলের আশা করে পুরুষ যে অবস্থান করে থাকে, সেই অধ্যায়কে বলা হয় কাল বা সময়। আর যেহেতু সেটি বাস্তবে কনো কাল নয়, কেবলই কল্পের কাল, তাই সনাতন বৌদ্ধধারা এই কালকে বলে কল্পকাল।... বুঝতে কি পারছো পুত্রী? বাস্তবে কনো কর্মই হচ্ছেনা, আর তাই কনো কর্মফলই লব্ধ হচ্ছে না। আর যেহেতু কর্মফল লব্ধ হচ্ছেনা, সেহেতু পুনরায় প্রয়াস করতে থাকে পুরুষ, কারণ পুরুষ যে কর্মফলের অভিলাষী। কিন্তু ভিন্নতার অভিমানে স্থাপিত পুরুষ কিছুতেই এটি বুঝতে চান না যে তিনি একটি কল্পপ্রার অণ্ডে স্থিত হয়ে কল্পনার কাল নির্মাণ করে চলেছেন, আর অন্য কিছুই করছেন না।

তাই পুত্রী, কর্মের ফল কে লাভ করেন? কর্মই যখন নেই, তখন কর্মের ফল কি করে জন্ম নিতে পারে? পুরুষ কর্মের ফলের আশা করেন মাত্র, আর সেই ফল তিনি কিছুতেই লাভ করেন না, আর আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না করাকেই পুরুষ বলে কর্মফল, আর যেহেতু সেই কর্মফল শূন্য, এবং শূন্য কর্মফল তাঁর কল্পনা, যাচনা এবং যোজনাকে নিরর্থক করে দেয়, তাই পুরুষ লাভ করেন অনন্ত দুঃখ। এটিই জগতের সত্য, এটিই কর্মের সত্য, এটিই কর্মফলের সত্য, আর এটিই কালের সত্য।

বাস্তবে কনো কালই নেই, কেবলই কল্পনার কাল এটি, পুরুষের কল্পনা করা থেকে সেই কল্পনার ফল লাভের আশা করার অধ্যায় হলো সেই কাল, তাই কল্পকাল। বাস্তবে কনো কর্মই নেই, তাই কনো কর্মফলও নেই। আর তাই কর্মফলের আশা করে পুনরায় কল্পনা করার প্রয়াস করেন অভিমানী পুরুষ, আর এই ভাবেই কর্মচক্রের স্থাপন, যা বাস্তবে কখনোই নেই। আর এটিই সত্য পুত্রী"।

দেব দিব্যশ্রী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "এঁর অর্থ, পুরুষ যেই কল্পনার বশে শূন্যতা ত্যাগ করে, নিজের শূন্য হবার স্মৃতি ত্যাগ করেছিলেন, সেই কল্পনার স্মৃতিকে ধারণ করেই তিনি অভিমান করেন, এবং নিজেকে নিজে এক ভ্রমজগতের নির্মাণ করে, তার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন!"

প্রিভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "হ্যাঁ পুত্রী, একেই সনাতন বুদ্ধধারা বলেন উর্ণনাভ, আর এই উর্ণনাভিকেই পিপলাদ ব্যাখ্যা করেছেন উপনিষদে, যেখানে মাকড়শা নিজের লালা দ্বারাই একটি কাল্পনিক জগত নির্মাণ করে, তাতে আবদ্ধ থাকেন। ঠিক একই ভাবে পুরুষ, যা স্বরূপে শূন্য, তিনি নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে, নিজের কল্পনার থেকে একটি জগত নির্মাণ করেন, আর মনে করতে থাকেন যে সেই জগতই তাঁর সত্যতা।

পুত্রী, এই কল্পজগতকে স্থাপনা করতে স্মৃতিহারা ব্রহ্ম-অণু বা পুরুষ বা ভিন্নতার সন্ধানে উন্মত্ত অহংকার সর্বদা উলমালা থাকেন, আর প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং পুরুষকে আশ্বাসন দিতে থাকেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে আছেন, আর সেই আশ্বাসনের উপর ভরসা করে, মনকে বিস্তারিত করেন পুরুষ, বুদ্ধিকে মনের বিস্তারের সাথে সহগামী করেন, এবং বিকারদের এই মনের পরিবর্তন এবং বুদ্ধির পরিবর্তন দ্বারা পরিচালিত করে, দেহকে প্রাণকে এবং উর্জ্জাকে প্রভাবিত করেন।

মন বা আকাশতত্ত্ব ২৭টি অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে পান, এমন পুরুষ মনে করেন যা বাস্তবে হয়না। আর এই ২৭ অবস্থাকে সনাতন বৌদ্ধমত বলে ২৭ নক্ষত্র। এই ২৭ মনবস্থা, যা পুরুষের কল্পনা মাত্র, তার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি অর্থাৎ জলতত্ত্ব বস্তুবিজ্ঞান নির্ণয় করে, যাকে বৌদ্ধমত বলে শুক্র; গুণবিজ্ঞান নির্ণয় করে, যাকে বলা হয় বৃহস্পতি, ঋণাত্মক বিচারের উপস্থাপনা করে, যাকে বলা হয় শনি; অভিমানের রচনা করে, যাকে বলে আদিত্য; কামনার সঞ্চার করে, যাকে বলা চন্দ্র; ভেদভাবের রচনা করে, যাকে বলে বুধ; উগ্রতার রচনা করে, যাকে বলে মঙ্গল; বিড়ম্বনার রচনা করে যাকে বলে কেতু, এবং বাঁধার ধারণা করে, যাকে বলে রাহু।

পুত্রী, কি ভাবে ঋণাত্মক গতিতে বুদ্ধি চলমান হয়, কি ভাবে অভিমান চালিত হয়, কি ভাবে সমস্ত কিছুর বিচার করে বুদ্ধি এবং সেই বিচার দেহ বা মৃত্তিকাতত্ত্ব, প্রাণ বা বায়ুতত্ত্ব এবং উর্জ্জা বা অগ্নিতত্ত্বকে প্রভাবিত করে, তা সম্বন্ধে সনাতন বৌদ্ধধারা বিস্তারে বলেছে, যা পরবর্তীতে ব্রাহ্মণরাও গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের কথন এমন দাবি করে, বিবিধ পুরাণ রচনা করেছেন। তাই সেই বিষয়ে বিস্তারে বললাম না। তার কারণ এই শুধু নয় যে তাদের বিস্তারে অন্যত্র স্থান থেকে জেনে নিতে পারবে, বরং এই জন্য বললাম না কারণ তারা সমস্তই পুরুষের কল্পনা, যার বাস্তবে কনো অস্তিত্বই নেই।

পুরুষ যখন নিজের কল্পনার জেরে, নিজের যাচনার জেরে, নিজের যোজনার জেরে, নিজেই জর্জরিত হয়ে যায়, বিরক্ত হয়ে ওঠে তাঁদের উপর, তখন সে নিজের পঞ্চভূতের মধ্যে বিকারদের প্রভাব, এবং বিকারদের উপর পঞ্চভূতের প্রভাবকেই দায়ী করার প্রয়াস করে, এবং বলার চেষ্টা করে যে, এই কল্পনা, এই যাচনা বা যোজনার উপর তাঁর কনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে পঞ্চভূত এবং বিকারসমূহ। আর সেই দোষারোপের প্রয়াসের কালেই পুরুষ এই তত্ত্বের অবতরণ করেন, এবং নিজেকে তথা নিজের অভিমানকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান।

পুত্রী, বিকারদের অবতারণা করে, আর সেই বিকারদেরকে পঞ্চভূত ধারণ করে যা কাল্পনিক পর্দার রচনা করার তা তো করেইছে পুরুষ। এই সমস্ত তত্ত্ব পুনরায় আরো একটি পর্দার নির্মাণ করে পূর্বের পর্দাগুলিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার আরো একটি প্রয়াস অভিমানী পুরুষের। তাই সেই কল্পনায় উন্মত্ত অহংকারী পুরুষের উন্মত্ততার আর নতুন করে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না এখানে।

তবে পুত্রী, একটি ভালো কথা এই যে, যখন পুরুষ এই প্রয়াস করতে শুরু করে, তা একটি শুভলক্ষণ কারণ সে তখন এটুকু সনাক্ত করতে পারেন যে, বাহ্য জগত সত্য নয়, বরং এটি উপলব্ধি করে যে অন্তরের জগতে যা কিছু ঘটছে, তারই বাহ্য প্রকাশ এই বাহ্য মিথ্যা জগত। ... অর্থাৎ বলতে পারাই যায় যে, এই প্রয়াস পুরুষের সত্যের উদ্দেশ্যে অতিসামান্য হলেও, উন্নতি।

কিন্তু তাও পুরুষ তখনও সেই অবস্থায় উপস্থিত হননা, যখন তিনি পূর্বস্মৃতিকে স্মরণ করতে প্রস্তুত। তাই প্রকৃতি তখনও তাঁর থেকে লুকিয়েই থাকেন। আর পুরুষ তাই কল্পনা করেই চলেন, যা তাঁকে পুনঃপুনঃ নবভ্রমে স্থাপিত করতে থাকে। পুত্রী, এই সমস্ত কিছু একটি দেহে হয়না জীবকটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ একটি ব্রহ্মাণ্ডতেই এই সমস্ত কিছু ঘটেনা, যেমন তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম।

তবে যেই ব্রহ্মাণ্ডে, লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রকৃতির সন্ধান করতে করতে পুরুষ এই সত্য উপলব্ধি করে ফেলতে পারেন যে অভ্যন্তরীণ জগতের জন্যই এই বাহ্য জগতের প্রকাশ, তা সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য জন্ম, আর সাধারণত এই ব্রহ্মাণ্ডে, অর্থাৎ এই জন্মে পুরুষ একটি সাধুর জীবনযাপন করেন এবং এই অভ্যন্তরীণ জগতের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হন, আর এই জগতের সন্ধান করতে যাবার কালে, পুরুষ প্রকৃতির সন্ধান না পেলেও, অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী মাতার সন্ধান না পেলেও, তাঁর তিনপ্রকাশ অর্থাৎ শক্তি, বিদ্যা ও শ্রীর সন্ধান পেয়ে যান। না তাঁদের কাছে উপস্থিত হতে পারেন না তিনি, তবে এটুকু উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁরা প্রকৃতিরই তিন প্রকাশ, আর তাঁরা সুষুম্নার মধ্যে স্থিত, যেখানে উপস্থিত হতে গেলে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূক্ষ্ম দেহে, ভূত এবং বিকারদের সাম্য অবস্থায় স্থিত করতে হবে।

তবে পুত্রী, শূন্যতার বোধ অভিমানী পুরুষের মধ্যে তখনও জন্মায় না। আর তাই কল্পকালের বোধ, বা কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা দ্বারাই সেই কল্পকাল এবং কল্পঅণ্ড প্রস্তুত করে তিনি বিরাজ করছেন, বা কর্মের ফল তিনি লাভ কনোদিনই করবেন না, আর তাই যতদিন কর্মের ফলের চিন্তা করবেন, ততদিনই হতাশার মধ্যে স্থাপিত থাকবেন, আর যতদিন অভিমান ত্যাগ না করবেন ততদিন আবার আবার করে কল্পনা করতে থাকবেন এবং কর্মচক্রকে সদাই চলমান রেখে দেবেন, এই বোধ তিনি করতে সক্ষম হননা। সেই বোধ করার জন্য, তাঁর প্রয়োজন হয় পঞ্চভাবের।

এখানে পুত্রী, তন্ত্র, যন্ত্র, মন্ত্র, অষ্টাঙ্গ যোগ, ইত্যাদি বহু উপায়ের কথা বলা হয় সাধুদের বা যোগীদের। কিন্তু যতক্ষণ না পঞ্চভাব পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ এই তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র বা অষ্টাঙ্গ যোগ, কনো কিছুই ধারণ করা সম্ভব হয়না। আর পঞ্চভাবকে যখন তিনি ধারণ করে নিতে পারেন, তখন এদের যেকোনো একটিকে ধারণ করেই, পরম সত্যে স্থাপিত হতে পারেন পুরুষ"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এমন কেন পিতা যে পঞ্চভাবই একমাত্র যা পুরুষকে উদ্ধার করতে সক্ষম? পঞ্চভাবের ফলে কি হয় পুরুষের সাথে? আর পঞ্চভাব জাগ্রতই বা কি করে হয় পুরুষের মধ্যে? আর সব থেকে প্রথম কথা এই পঞ্চভাব কি? তাদের ব্যাখ্যাই বা কি, আর তাদের প্রভাব বা বিজ্ঞানই বা কি?... তবে এই সমস্ত কিছুর উত্তর পাবার আগে, আমি আপনার কাছে এই কর্মচক্রের বিষয়ে

আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে আগ্রহী। আমি এখনও বুঝতে পারিনি যা, তা হল এই যে কর্ম যদি নাই হয়, আর কর্মফলও যদি না লব্ধ হয়, তবে আমরা ভৌতিক জগতে কনো একটি ব্যক্তিকে বৃত্তবান সকলে মিলে দেখি কেন?

অর্থাৎ আমার প্রশ্ন এই যে, আমি কর্ম করিনি, আর তাই কর্মফল লাভ করিনি। হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমি কর্মফলের আশা করে বসে ছিলাম, আর তা না পেয়ে আমি পুনরায় কর্মফলের আশা করে কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা করতে শুরু করি, এবং পুনরায় কর্মফল লাভ না করার জন্য হতাশ হই। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, একজন কর্মফল লাভ না করলে, বৃত্তবান হলেন কি করে? একজন কর্ম না করলে সন্তানলাভ করলেন কি করে? কর্ম কর্মফলের রহস্য কি? এই ভ্রমের বিস্তার হয় কি করে? আর এই বিস্তার এমন নয় যে কেবল আমাকেই প্রভাবিত করে! এই ভ্রমের বিস্তারে তো সকলেই প্রভাবিত। তাই আমার প্রশ্ন এই যে আমার ভ্রমের কারণে অন্যরা, অর্থাৎ অন্য অণুরা প্রভাবিত হন কি করে?

পিতা আমি অবশ্যই পঞ্চভাবের ব্যাপারে জানতে ইচ্ছুক, কিন্তু যতক্ষণ না কর্মচক্রকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করছি, আমার মনে হয়না যে আমার মধ্যে পঞ্চভাবের সম্বন্ধে জানার সামর্থ্য প্রস্তুত হয়েছে। আমার এমন বলার কারন এই যে পিতা, পঞ্চভাব তো আমাদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যাবে, আর যতক্ষণ আমরা সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত নই, ততক্ষণ আমরা সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অন্যের মুখ থেকে শ্রবণ করার পরেও, সেই দিকে যাত্রা করতে পারিনা । তাই পিতা আমি প্রথম জানতে চাই যে, আমরা ভ্রমিত হই কি করে, আর সেই ভ্রমের নাশ হওয়া শুরুই বা কি করে হয়? একবার তা উপলব্ধি করে নিলে, আমি অবশ্যই সেই ভ্রমনাশ সম্পন্ন কি করে হয়, তা জানতে আগ্রহী"।

প্রভু ব্রহ্ম সনাতন তৃপ্ত হয়ে বললেন, "অতি উত্তম পুত্রী। তোমার বিচার ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত উচ্চধারণার। সর্বৈব ভাবে সঠিক কথাই তুমি বলেছ। যতক্ষণ না কর্মচক্রকে জানা যাচ্ছে সঠিক ভাবে, এবং আমাদের ভ্রম আমাদের মধ্যে কি ভাবে বিরাজমান হয়, তা জানছি, ততক্ষণ আমরা পঞ্চভাবের বিষয়ে জানলেও, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবেনা। ... তাই আমি তোমাকে প্রথমে কর্মচক্রের ব্যাপারে বিস্তারে বলছি, শ্রবণ করো। আমার এই ব্যাখ্যায় আমি এও বলছি তোমাকে যে কি ভাবে কর্মচক্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভ্রমকে বিস্তারিত করে দিই, আর এও বলছি যে কোন অবস্থায় গিয়ে আমাদের ভ্রম ক্ষীণ হয়ে আসে, আর আমরা পঞ্চভাবকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতু হই"।

কর্মচক্র

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, কর্ম যে কিছুই কনো কালে হয়না; কেবলই পুরুষ নিজের কল্পনা, যাচনা এবং যোজনার মাধ্যমে কর্ম করে চলেছেন, এমন ভান করেন; এবং সেই কর্মের নিরিখে সে কর্মের ফল আশা করেন, এমনটা স্পষ্ট করে জেনেছো তুমি। এবার আমি তোমাকে সেই ভ্রম কি করে পুরুষ নিজের অন্তরে স্থাপন করেন, সেই ব্যাখ্যা প্রদান করছি, তা শ্রবণ করো।

পুত্রী, এই সমস্ত কিছুর ক্রিয়া সম্পন্ন হয় পঞ্চভূতদের এবং বিকারদের সংমিশ্রণে। বিকারদের কারণে, বুদ্ধি ও মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়, এবং এঁর ফলে এঁরা দেখেন যে এই আবেগের তাড়নায় তাঁরা দেহ অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্বকে অধিকার করে নিয়ে, নিজের ভ্রমের বিস্তার করে, নিজের অভিমানকে কালজয়ী করে তুলতে পারবেন। আর তাই এই আবেগদের ব্যবহার করেন তিনি উর্জ্জার উপর, অর্থাৎ অগ্নিতত্ত্বের উপর, এবং বায়ুতত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণকে ধরে রাখতে চান, কারণ বুদ্ধি ও মন উপলব্ধি করে যে এক প্রাণবায়ু যদি অক্ষত থাকেন, তবেই এই দেহ বা ব্রহ্মাণ্ড স্থির থাকবে, আর তখনই ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ দেহমন্দিরকে অক্ষত রেখে, ভিন্নতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

আর এমন ভাবনা নিয়ে, বুদ্ধি ও মন সমানে প্রয়াসশীল থাকে যাতে পুরুষের যাচনা অর্থাৎ ভ্রমে আবদ্ধ থেকে ভিন্নতা বা অহংকারকে উজ্জীবিত রাখাকে স্থায়ী করে রাখা যায়। এমনই উদ্দেশ্যে নিয়ে, বুদ্ধি ও মন সদা সজাগ থাকে যাতে পুরুষ অন্তরজগতে না স্থাপিত হয়ে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে স্থাপিত হন। পুত্রী, সেই বাইরে দৃষ্টিরাখার প্রয়াসের মধ্যেও প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করেন। কি ভাবে? কল্পনা, যাচনা ও যোজনা করার পর তাদের থেকে কর্মফলের আশা করে পুরুষ, আর সেই আশা করে অপেক্ষা করার অধ্যায়কে সময় বা কাল বলা হয়, তা তুমি ইতিমধ্যেই জেনেছো।

এই অপেক্ষার কালের মধ্যে প্রকৃতি সমানে ইন্দ্রিয়দের সম্মুখে তাই তাই স্থাপন করতে থাকেন, যার থেকে সত্যশিক্ষার ভান পেতে পারেন পুরুষ। কিন্তু বুদ্ধি ও মন এই ইন্দ্রিয়দের সম্মুখে যা আসে, তা অনায়স গ্রহণ করেনা। বরং যা কিছু আসে, তার মধ্যে পুরুষকে স্বার্থচিন্তা প্রদান করেন। আর সেই স্বার্থ চিন্তার ফলে, পুরুষ সেই বাহ্যপ্রকৃতিতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সম্মুখে যা আসে, তাদের মধ্যে তাই তাই গ্রহণ করেন, যাকে যাকে তিনি মনে করেন যে তাঁর ভিন্নতা বা অহংকার বৃদ্ধির সাধন হবে।

অর্থাৎ পুত্রী, যেই যেই ঘটনা ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে হয়, তাদের মধ্যে যেগুলিকে পুরুষ মনে করে যে সেগুলি তাঁর অহংকার বৃদ্ধির সাধন হতে পারে, তাই তাই গ্রহণ করেন পুরুষ তাঁর বুদ্ধি ও মনের সাহায্যে। কেমন এই ব্যাপারটি? এই ব্যাপারটি এমন যে পুরুষ কেবলই তাই গ্রহণ করেন যা তাঁর ভিন্নতাকে সম্মান প্রদান করছে বা আগামীদিনে করবে বলে তিনি বোধ করছেন। একই রকম ভাবে তাঁর ভিন্ন

অস্তিত্বকে যদি অপমানিত করা হয়, অর্থাৎ যদি ধারণা এমন হয় যে, সেই অপমান তাঁর ভিন্নতার অস্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেবে, তবেই তার দিকে নজর দেন, এবং সেই অপমানের প্রতিকার যাচনা করেন।

অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে এমন কিছু আসে যা তাঁর সম্মান, অপমানের সাথে যুক্ত নয়, বা তাঁর লাভক্ষতির সাথে যুক্ত নয়, তবে বুদ্ধি ও মনের সাহায্যে পুরুষ সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাকে উপেক্ষা করে চলে যান। কিন্তু পুত্রী, প্রকৃতি সেই সমস্ত কিছুকে পুরুষের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখেহ রাখেনই এই কারণে যাতে সেগুলি সময়ে সময়ে পুরুষকে সত্যতার বোধ করাতে পারে। আর সেই সমস্ত কিছুর উপেক্ষা করার কারণে, পুরুষের কাছে আমিত্ব বা আত্ম বা অহং ব্যতীত কিছুই বিচার করার জন্য অবশিষ্ট থাকেনা।

আর এঁর ফলে কি হয়, পুরুষ ক্রমাগত কেবলই অহংকারের চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকতে শুরু করেন, এবং একসময়ে এই অহংকারের বিকাশের মার্গ না খুঁজে পেয়ে অনন্ত হতাশার মধ্যে স্থাপিত হয়ে যান। আসলে পুত্রী, এমন নয় যে এই বাহ্য ঘটনাগুলি পুরুষকে দেখানো হয়। উপরন্তু সত্য এই যে বাহ্য সমস্ত কিছুই পুরুষই নির্মাণ করেন নিজের কল্পনার ফলে। অর্থাৎ তুমি একটি কল্পনা করলে, আর তার থেকে কিছু যাচনা করলে।

সেই যাচনার একটি প্রকাশ হবে, একটি পরিণাম হবে। সেই একটি পরিণামের মধ্যে সেটিও থাকবে যা তোমার যাচনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, আর সেটিও থাকবে যা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়। কিন্তু মন ও বুদ্ধি কেবল সেটিই গ্রহণ করতে বলেন পুরুষকে যা তাঁর যাচনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, এবং তা বর্জন করতে বলেন যা তাঁর যাচনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়। এই সেইগুলি, যেগুলি তাঁর যাচনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়, তাও পুরুষেরই কল্পনার ফল, কিন্তু সেগুলিকে গ্রহণ না করে উপেক্ষা করারই ভাবনা প্রদান করেন মন ও বুদ্ধি।

কেমন দেখো পুত্রী, তুমি জলপান করলে। কেন করলে? তোমার পিপাসাকে শান্ত করার জন্য। কি হলো সেই ক্ষেত্রে? তোমার পিপাসা শান্ত হলো, কিন্তু তোমার প্রস্রাব লাগলো না। কিন্তু অন্যদিকে তুমি আবারও জলপান করলে। কেন? তুমি এমন বিচার করলে যে তুমি বাইরে যাচ্ছ, আর সেখানে যাবার কালে তোমার জল পিপাসা লাগবে, আর তোমার কাছে জল থাকবে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, তোমার তৃপ্তি তেমন কিছু হলো না, উপরন্তু কিছুক্ষণ পরে, তোমার প্রস্রাব বেগ এসে গেলো। ... কেন হলো এমন?

প্রথম ক্ষেত্রে প্রস্রাব লাগলো না কারণ তুমি প্রকৃতির টানে জলপান করেছিলে। সমস্ত অনুভূতির উৎস প্রকৃতি কারণ প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের চেতনা। আর সেই অনুভবের জন্য তুমি অনুভব করলে যে তোমার পিপাসা লেগেছে, আর তুমি জলপান করলে । আর এঁর ফলে তোমার পিপাসা শান্ত হলো, এবং তোমার পুরুষ তৃপ্ত হলো। অন্যদিকে, দ্বিতীয়বার তুমি জলপান করলে, প্রকৃতির প্রেরণাতে নয়, বরং তোমার বুদ্ধি তোমাকে বলল যে, বাইরে নির্গত হলে জলপান করতে পারবে না, তাই পিপাসা পাবার আগেই তুমি জলপান করে নিলে।

এর ফল কি হলো? এর ফল এই হলো যে তোমার প্রস্রাব বেগ এসে গেল । ... বুঝতে পারলে পুত্রী, প্রকৃতির প্রভাবে কিছু করা, আর প্রকৃতির প্রভাব ব্যতীত কিছু করার ফলে কি হয়? প্রকৃতির প্রভাবে যখন তুমি কিছু করছো, তখন তুমি লাভ করবে তৃপ্তি, কারণ তাতে তোমার আশা পূর্ণ হয়, আর প্রকৃতির প্রভাব যেখানে নেই, সেখানে কিছু যাচনা বা কল্পনা করলে কি হয়? আশানুরূপ ফল লাভ হয়না, আর তাই উপস্থিত হয় হতাশা, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি আবেগ।

পুত্রী, এই হলো কর্মের বিজ্ঞান যার সার এই যে প্রকৃতি যেই কর্ম সম্মুখে উপস্থিত করেছে, তাই করতে হয়; প্রকৃতি যেই ঘটনা সম্মুখে উপস্থিত করেছে, তাকেই নিরপেক্ষ ভাবে গ্রহণ করতে হয়। আর মনবুদ্ধি যেই কর্মের চিন্তা করে, তার থেকে দূরে থাকতে হয়, কারণ তা করলে কখনোই আশাপ্রদ ফল লাভ হয়না, আর তার ফলে আবেগদের জন্ম হয়, এবং পুরুষ ভ্রমিত হতে থাকে। যেই ঘটনাকে তুমি তোমার স্বার্থ বা সম্মানের সাথে মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছনা, পুত্রী সেই ঘটনাই তোমাকে সত্যের সম্মুখে স্থাপন করে দেয়, কিন্তু যেই ঘটনাকে তুমি তোমার স্বার্থ এবং সম্মানের সাথে মিলিয়ে দেখতে সক্ষম, তা তোমার পুরুষকে নূতন ভ্রমের মধ্যে স্থাপন করে দেয় মাত্র, কারণ তোমার স্বার্থই তোমার ভ্রম।

এবার তুমি বলবে, যখন অস্তিত্বই মিথ্যা, যখন কর্মই মিথ্যা, যখন কল্পনা, যোজনা, যাচনাকেই ভ্রম বশত পুরুষ কর্ম বলছেন, আর তাদের ফলের আশা করে বসে আছেন, তখন ফলের প্রাপ্তি হচ্ছে কি করে? এই তো? ... পুত্রী, সত্যই বিচার করেছো তুমি। বাস্তবে এটির একটিও ঘটছে না, বরং সমস্ত কিছু আমাদের কল্পঅণ্ডের মধ্যেই ঘটছে, অর্থাৎ সবটাই কল্পনা মাত্র। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভাবে যেই ফল আসছে, তাও পুরুষের কল্পনা, আর বুদ্ধি বা মনের ক্রিয়ার ফলে যা উপস্থিত হচ্ছে, তাও পুরুষের কল্পনা।

সচেতন হয়ে শোনো পুত্রী, পুরুষ ভিন্নতার সন্ধানী, আর সেই সন্ধানেই সে নিজের স্মৃতি হারিয়েছে। তাই প্রকৃতির প্রতি আসক্ত হবার পূর্বে, সে নিজের ভিন্নতার প্রতি আসক্ত। আর সেই ভিন্নতার প্রতি আসক্ত হবার কারণে, সেই ভিন্নতাকে যেই ভূত এবং বিকারের মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়াস করেছেন পুরুষ, তাঁদের প্রতি আসক্ত সে। অন্যদিকে, তাঁর স্মৃতিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্রহ্ম যখন চেতনা বেশে প্রকৃতি হয়ে পুরুষের ঘনিষ্ঠ হলেন, তখন পুরুষ তাঁর প্রতিও আসক্ত হলেন। সেই আসক্তির কারণেই প্রকৃতি আত্মগোপন করলে, পুরুষ তাঁর সন্ধান করতে থাকলেন। তাই পুরুষ প্রকৃতির প্রতিও আসক্ত।

প্রকৃতির প্রতি আসক্তির থেকে, পুরুষ পিপাসার অনুভব করেন, ক্ষুধা অনুভব করেন, নিদ্রা অনুভব করেন, শান্তি, তৃপ্তি ইত্যাদি অনুভব করেন, আবার নিজের অহংকারের প্রতি আসক্তির কারণে, মন ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করে বিবিধ কল্পনা, যাচনা ও যোজনাও করেন। অর্থাৎ প্রকৃতি কিছুই করেন না, প্রকৃতি পুরুষের সামনে কিছু রাখেন এটি সত্য নয়। বরং সত্য এই যে প্রকৃতির প্রতি আসক্তির জন্য পুরুষ প্রকৃতিকে অনুভব করে তৃপ্তি, শান্তি, তুষ্টি, ইত্যাদি অনুভব করেন, আর এই প্রকৃতি কে? স্বয়ং ব্রহ্ম, অর্থাৎ পুরুষ যখন ব্রহ্মের ধারণা করেন বা সত্যের ধারণা করতে চান, সেই ধারনাই প্রকৃতি । আর যখন তিনি নিজের অহংকারের প্রতি আসক্তি প্রকাশ

করেন, তখন যোজনা করেন, যাচনা করেন, এবং কল্পনা করেন। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রেই বাস্তবে কিচ্ছুই হচ্ছেনা, সমস্তই হচ্ছে কল্পঅণ্ডের মধ্যেই, আর সমস্ত ক্ষেত্রেই কল্পকালেরই প্রসার হচ্ছে।

আর তাই, দুই প্রকার কর্মের প্রসার আমরা দেখতে পাই, একটি প্রাকৃতিক ভাবে আমাদের সম্মুখে আসে, আর দ্বিতীয়টি অপ্রাকৃতিক উপায়ে আমরা আমাদের সামনে উপস্থিত করার কামনা করি। যেটি প্রাকৃতিক ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেটি প্রকৃতির প্রতি আমাদের পুরুষের আসক্তির কারণে হয়, যাও বাস্তবে ঘটমান নয়; আবার যা অপ্রাকৃতিক ভাবে আমরা নিজেদের সম্মুখে উপস্থিত করতে চাই, তাও পুরুষের অহংকারের ফলে হয়, যাও বাস্তবে ঘটমান নয়।

যতক্ষণ আমরা অহংকারের প্রতি আসক্তির কারণে, অহংকারকে প্রকাশিত করার কারণে কল্পনা, যোজনা এবং যাচনা করি, ততক্ষণ আমরা হতাশাকেই বরণ করি, কারণ তার থেকে কনো কিছুই ফল উপস্থিত হয়না, কারণ আমাদের অহংকারই তো যথার্থ নয়, তা একটি ভ্রম মাত্র। আবার অন্য দিকে, যেহেতু প্রকৃতিই ব্রহ্ম আর ব্রহ্মই যথার্থ, তাই প্রকৃতির প্রতি আসক্তির ফলে আমরা যাকিছু অনুভব করি, তা বাস্তবিক না হলেও, তা আমাদেরকে শান্তি, তৃপ্তি, বা তুষ্টি প্রদান করে।

এই হলো ব্যক্তিগত কর্মচক্র, যার মধ্যে সকলেই সর্বদা আবদ্ধ রয়েছেন, আর তার থেকে মুক্তি তখনই সম্ভব যখন আমরা অহংকারের তোষামোদ করার জন্য কল্পনা, যোজনা এবং যাচনা করা বন্ধ করে দিয়ে, কেবলই প্রাকৃতিক উপায়ে যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে, তাকেই গ্রহণ করা শুরু করি। অর্থাৎ পুত্রী, যখন আমরা আমাদের বুদ্ধির ব্যবহার এবং মনের ব্যবহারই বন্ধ করে দিই, তখন আর বিকারেরা ক্রিয়াশীল হতে পারেনা, কারণ তাঁরা কেবল ভূতদের উপরই ক্রিয়া করতে পারেন। আর তার ফলে আমাদের মধ্যে কনো প্রকার আবেগের সঞ্চার হয়না, আর আবেগশূন্যতার ফলে আমরা হতাশার কবলেও পরিনা।

অন্যদিকে যখন আমরা এই কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা করা বন্ধ করে দিই, তখন আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে কেবলই প্রকৃতির প্রতি আসক্তি, আর তারফলে আমরা তৃপ্তি, তুষ্টি এবং শান্তির অনুভব করতে থাকি ক্রমাগত। আর এঁর ফলে কি হয়? আমরা ক্রমশ ভাবের দিকে তাড়িত হই। পুত্রী, যতক্ষণ বিকারের ক্রিয়া ততক্ষণই আবেগের ক্রিয়া বর্তমান থাকে । যাই আবেগের ক্রিয়া থেকে আমরা মুক্ত হই, তখনই শুরু হয় ভাবের ক্রিয়া, অর্থাৎ পঞ্চভাবের ক্রিয়া।

কখন আমরা আবেগের থেকে বিচ্ছিন্ন হই, এবং কখন আমাদের মধ্যে ভাবের বিস্তার হয়, তা বহু বিস্তারিত কথা। তাই সেই কথা আমি তোমাকে পরবর্তীতে বলছি। তার পূর্বে তোমার আরো একটি প্রশ্ন, অর্থাৎ কেন অন্যের করা কর্ম এবং অন্যের করা কর্মফলকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই ব্যাখ্যা প্রদান করছি, শ্রবণ করো।

পুত্রী, একটি ঘটনা বলি তোমাকে। একটি আচার্যের ২০টি ছাত্র ছিল। সেই ছাত্রদের মধ্যে যখনই প্রতিযোগিতা স্থাপন করেন আচার্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে, একটিই ছাত্র প্রথম হন সবক্ষেত্রে। এমনই একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, যিনি প্রথম হন, তিনি নিজের

যোগদানে তৃপ্ত হননা। আর অন্য একটি ছাত্র নিজের যোগদানে অত্যন্ত তৃপ্ত হন। প্রতিযোগিতার মীমাংসা যখন হয়, তখন প্রথম হওয়া ছাত্রটি প্রথমই হন, কিন্তু তিনি পূর্বেও নিজের যোগদানে খুশী ছিলেন না, আর যেমন ফল আশা করেছিলেন, সেই অনুরূপই ফল লাভ করেন।

অন্যদিকে যেই ছাত্রটি নিজের যোগদানে উল্লসিত ছিলেন, তিনি নিজের আশাপ্রদ ফলের থেকেও শ্রেয় ফল লাভ করেন। এরপর এই ছাত্রটি আরো অধিক প্রফুল্লিত হয়ে গেলেন, এবং আনন্দে সকল অন্য ছাত্রদের মিষ্টান্ন বিতরণ করলেন। বলতে পারো পুত্রী, সেই আচার্যের অন্য ছাত্ররা কোন ছাত্র প্রথম হয়েছে বলে মনে করবেন?"

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "প্রফুল্লতার ধারা দেখে, সকলে তো এই দ্বিতীয় ছাত্রটিকেই মনে করবেন যে তিনি শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেছেন। এমনই তো হওয়ার কথা"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "তাহলে কি বুঝলে পুত্রী? যিনি নিজের লাভ করা ফলে আপ্লুত, সকলে তাঁকেই মনে করেন যে শ্রেষ্ঠ। তাই তো? ... ঠিক একই ভাবে, এই ভৌতিক জগতেও, যিনি নিজের কল্পনা, যোজনা এবং যাচনার উপর অধিক বিশ্বাসী যে তিনি তাঁর কল্পনার অনুরূপে, যাচনার অনুরূপে, এবং যোজনার অনুরূপে ফল লাভ করবেন, তাঁকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করি।

পুত্রী, যেই রাজনীতিবিদ নিজের যোজনা নিয়ে নিজেই সংশয়তে থাকেন যে তিনি আশানুরূপ ফল পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন, তাঁকে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রদান করিনা। অন্যদিকে যদি কনো রাজনীতিবিদের নিজের কল্পনা, যোজনা এবং যাচনার উপর অধিক মাত্রায় আস্থা থাকে, তাঁকেই আমরা গ্রহণ করি শাসকরূপে। আর যিনি এই সমস্ত কল্পনা, যোজনা, বা যাচনা থেকে মুক্ত, তাঁকে আমরা সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখতেও পাইনা, কারণ ক্ষমতার প্রতি যাচনার জন্যই পুরুষ রাজনীতি করার চিন্তা করেন।

একই ভাবে, যিনি নিজের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন ভাবেই নিজের যাচনা, যোজনা এবং কল্পনার উপর আস্থা রাখেন, আমরা তাঁকেই বিশিষ্ট ব্যবসাদার মনে করে নিই। পুত্রী, যখন পুরুষই নেই, ব্যক্তিই নেই, বাহ্য জগতই মিথ্যা, তখন সেই মিথ্যা জগতে স্থাপিত ধন, বা সম্পত্তি, বা কীর্তি, বা ক্ষমতা কি করে সত্য হতে পারে? এমনকি পুত্রী, যা তুমি এখন লিখছো, আর আমি বলছি, তাও সত্য নয়। ... তুমি তোমার ভ্রান্তি দূর করতে ইচ্ছুক, তাই তোমাকে ভ্রান্তি দূর করার কথা জানছো, আর যিনি যিনি নিজের ভ্রান্তির থেকে মুক্ত হবার জন্য ইচ্ছুক হবেন, তিনি তিনি তোমার এই লেখা গ্রন্থ পাঠ করবেন।

কিন্তু না সেই কথা আমি তোমাকে বলছি, আর না সেই কথা তোমার পাঠকদের তুমি বলবে। সেই কথা তোমাকে তোমার অন্তরে স্থাপিত প্রকৃতিই অর্থাৎ চেতনাই বলছেন, আর সেই কথা তোমার পাঠকদেরও তাঁদেরই অন্তরে স্থাপিত চেতনাই বলার জন্য, তোমার লেখা গ্রন্থের সম্মুখে নিয়ে আসবেন। আর সত্য বলতে, প্রকৃতি স্বয়ংও তাঁদেরকে আনবেন না, বা তোমাকেও স্বয়ং আনেন নি এই কথা শ্রবণ করার জন্য। সত্য এই যে, তোমার অন্তরের পুরুষ যখন এই ভ্রমের নাশ করার জন্য ব্যকুল কারণ তিনি বুঝে গেছেন যে

তাঁর ভ্রমের নাশ না হলে, তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্য কিছুতেই পাবেন না, তখনই তোমার পুরুষ ব্যকুল হয়ে প্রকৃতির কাছে নিবেদন করেছেন সত্য ব্যখ্যা করার জন্য, আর তাই তোমার সম্মুখে এই সত্য উম্মোচিত হচ্ছে।

ঠিক তেমনই পুত্রী, যেই ধনকে দেখে তুমি বা তোমরা ভাবো কেউ বিত্তবান, সেই ধনের কনো অস্তিত্বই নেই, আর সেই ধনের অস্তিত্ব সম্ভবও নয়। তাঁর অন্তরে স্থিত পুরুষ যেহেতু তাঁর বিত্তবান হবার কল্পনাকে, যাচনাকে এবং যোজনাকে যথার্থ বলে জ্ঞান করে নিয়েছেন, সেই হেতু, তাঁর বিত্তবান হওয়াকে তিনি স্বয়ং, এবং তোমরা সকলে স্বীকার করে নিয়েছ। ... এবার তুমি বলবে পুত্রী যে, এমন তুমিও যদি কল্পনা করে নাও, তাহলে কি তুমিও বিত্তবান হয়ে যাবে?

এঁর উত্তর এককথায় হ্যাঁ, তবে এঁর মধ্যে বহু আরো কথা থেকে যায়, আর সেই কথা হলো যাচনা ও যোজনা। পুত্রী, তুমি নিজের বিত্তবান হবার যাচনাতে আস্থা রাখলে, আর নিজে বিত্তবান হয়ে গেলে কি কি করবে, তারও একটি কল্পনা করলে, তাহলেই কি তুমি নিজেকে বিত্তবান মানতে পারবে? নাকি অন্য পুরুষ বা আত্মারা তোমাকে বিত্তবান বলে মানতে পারবেন? ... না পুত্রী, এই দুইয়ের মধ্যে যোজনা বলে একটি ক্রিয়া থেকে যায়, তাই না!

এই যোজনার প্রয়োজন কি? পুত্রী, তুমি তোমার ভ্রমে একটি ভিন্ন ব্রহ্মাণু বা পুরুষ; আর তুমি নিজের এই ভিন্নতার ভ্রমকে সত্যরূপে স্থাপন করতে ব্যস্ত, আর সেই স্থাপনা তুমি নিজেকে বিদ্যান, বা সেবক, বা লেখক, বা ব্যবসায়ী, বা পরজীবী, বা রাজনীতিবিদ রূপে করতে আগ্রহী। অর্থাৎ কি? অর্থাৎ এই যে, অন্য যেই ভ্রমিত অণুরা রয়েছেন, সেই অণুদের কাছে, মানে সেই জীবদের কাছে তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনায় ব্যস্ত।

কিন্তু তা করবে কি উপায়ে? যখন তুমি তোমার যোজনাকে এমন ভাবে স্থাপন করবে, যা অন্যের লেখকের উদ্দেশ্যে কল্পনা, নেতার উদ্দেশ্যে কল্পনা, বনিক উদ্দেশ্যে কল্পনা, শ্রমিক হিসাবে কল্পনা, ইত্যাদি ইত্যাদি কল্পনার সাথে মিলে যাবে, তখনই তো তোমার যোজনাতে সম্মত হবেন তাঁরা!

অর্থাৎ ধরে নাও তুমি কনো শ্রমিক হতে চাও। সেই ক্ষেত্রে, যেই অণু বা জীবরা শ্রমিক সম্বন্ধে কল্পনা রাখেন, তাঁদের কল্পনার সাথে তোমার যোজনাকে মেলাতে পারবে, তখনই তো তোমার শ্রমিক হবার যোজনাকে সম্মতি প্রদান করবেন তাঁরা! শ্রমিককে তিনিই গ্রহণ করবেন, যিনি মালিক, বা মালিকপক্ষ, অর্থাৎ তোমার যোজনার মুল্যায়ন যারা করবেন, তাঁদের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু যদি তুমি রাজনেতা হতে আগ্রহী হও, তখন তোমার যোজনাকে স্বীকৃতি দেবার অণু বা জীব বা পুরুষের সংখ্যাও তো অধিক হবে। অনেক সংখ্যক পুরুষ মানে আত্ম যদি তোমার রাজনেতা হবার যোজনাকে সম্মতি দেন, তবেই তো তাঁরা তোমাকে রাজনেতা রূপে মানবেন!

অর্থাৎ তাঁদের পুরুষ একটি রাজনেতার কল্পনা করে রেখেছেন। যখন তোমার রাজনেতা হবার যোজনা তাঁদের কল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রাখবে, তখনই তো তাঁরা তোমাকে রাজনেতা রূপে মানবেন, তা না হলে কি রাজনেতা রূপে মানবেন তোমাকে? না মানবেন

না। এঁর থেকে কি বুঝলে তুমি পুত্রী? কর্ম করার সামর্থ্য তোমার কেন কারুরই নেই, কারণ কর্ম করার জন্য কর্তার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক, যা সম্ভবই নয়। তাই কর্ম করার প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু পুরুষ কাকে কর্ম বলেন? কল্পনা, যাচনা ও যোজনাকে।

আর সেই কল্পনা, এবং যাচনাকে যদি পুরুষ যোজনার রূপ প্রদান করে, অন্য পুরুষদের বা আত্মদের কল্পনা এবং যাচনার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেন, তাহলেই তিনি যেমন কল্পনা করেছেন, তেমন রূপেই স্বীকৃতি লাভ করবেন। যদি সেই কল্পনা হয় লেখক হবার, তবে তিনি অন্যের লেখকের কল্পনার সাথে নিজের যোজনাকে মেলাতে পারলে লেখক হবেন; যদি তিনি রাজনেতা হতে যাচনা রাখেন, অন্যের রাজনেতা নিয়ে যেই কল্পনা রয়েছে, তার সাথে নিজের যোজনাকে মেলাতে পারলেই তিনি রাজনেতা হবেন, ইত্যাদি।

অর্থাৎ বুঝতে পারলে, কেন কারুকে আমরা বিত্তবান বলি? কারণ তিনি নিজের যোজনাকে তোমাদের সকলের বিত্তবান সংক্রান্ত যেই কল্পনা, তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবে কনো কিছুর কনো অস্তিত্বই যেখানে নেই, সেখানে ধন, সম্পদ, খ্যাতি, এঁদের কি করে অস্তিত্ব থাকতে পারে? এঁদের কনো কিছুরই কনো অস্তিত্ব নেই, আর না তাদের কনো অস্তিত্ব সম্ভব। সমস্তই আমাদের কল্পের মধ্যে অস্তিত্বমান, আর সমস্ত কিছুর কল্পকালের অন্তেই লয়"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "যদি পিতা সমস্ত কিছুর কল্পকালেই লয় হয়ে যায়, তাহলে একটি ব্রহ্মাণ্ড নাশের পর যখন আমরা পুনরায় একটি অন্য ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করতে আগ্রহী হই, যেখানে প্রকৃতি পুনরায় আমাদের সহায়ক হয়ে যান, এবং পুনরায় সমস্ত প্রাথমিক গঠনের শেষে অবলুপ্ত হয়ে যান, তখন আমাদের মধ্যে পূর্ব সংস্কার কেন থেকে যায়?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, এটিই তো মাতা ব্রহ্মময়ীর আশীর্বাদ পুত্রী। তিনিই আমাদের আত্ম বা পুরুষের সাথে যুক্ত থেকে, একটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বীজকে উঠিয়ে রাখেন নিজের কাছে। আর যখন পরবর্তী ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হয়, তখন উনি ধীরে ধীরে সেই বীজকে পুনরায় আমাদের পুরুষের সত্ত্বায় স্থাপন করে দেন, যাকে সনাতন বুদ্ধ মতধারা বলে পূর্ব জন্মের সংস্কার। আর এই ভাবে প্রকৃতি আমাদের কিছুতেই পরে যেতে দেন না, তিনি আমাদেরকে সমস্ত সময়ে অগ্রগতিশীল রেখে দেন"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "আচ্ছা পিতা, পূর্বজন্মের কর্মফল বলে কি কিছু হয়? কর্ম তো হয়ই না, তাই কর্মফলও হয়না। তাহলে পূর্বজন্মের কর্মফল কি? অর্থাৎ যেই কর্ম আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে করিনি, বা বলা উচিত যেই কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বা এই জন্মে করিনি, তা কিরূপে আমাদের সম্মুখে আসে?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন উত্তরে বললেন, "ওই যে বললাম পুত্রী, মাতা ব্রহ্মময়ী বা প্রকৃতি আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে করে যাওয়া যেই যেই কল্পনা, যাচনা বা যোজনার নাশ হয়নি, সেই সমস্ত কিছুর বীজ নিজের কাছে রেখে দেন, এবং পরের ব্রহ্মাণ্ড গঠনের কালে সেই

বীজকে বপন করে দেন, সেই বীজেরই ফল এই সমস্ত। সেই বীজের কারণেই পূর্ব ব্রহ্মাণ্ড বা পূর্বজন্মের করা কল্পনা, যাচনা, এবং যোজনার থেকে জন্মানো ফলের আশা আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয়।

যেহেতু আমরা সেই কল্পনাকে, যাচনাকে, বা যোজনাকে স্মরণ রাখিনা, তাই সেই আশার কারণ আমাদেরও জানা থাকেনা, কিন্তু সেই আশাও কর্মফল শূন্যই হয়, আর তাই তার থেকে লব্ধ হতাশা আমাদের মধ্যে তখনও লব্ধ হয়। কিন্তু এমন ভেবোনা পুত্রী যে, এই বীজের কারণেই আমাদের দুঃখ, তাই সেই বীজসংগ্রহ করে রেখে দিয়ে কি প্রকৃতি আমাদের দণ্ড দিচ্ছেন? না পুত্রী, সেই বীজ আমাদের পূর্বের ব্রহ্মাণ্ডের সাথে পরবর্তী ব্রহ্মাণ্ডের, পূর্বজন্মের সাথে পরবর্তী জন্মের সংযোগ স্থাপন করে, আর এঁর ফলে আমাদের কাছে পূর্ব ব্রহ্মাণ্ডের থেকে অর্জন করা সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতি রূপে প্রত্যাবর্তন করে। আর তাই আমরা ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন করলেও, আমাদেরকে প্রথম থেকে সমস্ত কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শুরু করতে হয়না। তাই সেই বীজ প্রদান আমাদের জন্য একটি মহাবরদান"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এটা কেমন কথা পিতা? মাতা ব্রহ্মময়ী বা প্রকৃতি তো কেবলই আমাদের পূর্বজন্মের সেই কল্পনা, যাচনা ও যোজনারই স্মৃতি ফিরিয়ে দেন, যা সেই জন্মে বিনষ্ট হয়নি। তাহলে আমাদের কাছে সমস্ত স্মৃতি কি করে স্থাপিত থাকতে পারে? আমাদের কাছে তো কেবলই সেই কল্পনা, সেই যোজনা এবং সেই যাচনার স্মৃতি স্থাপিত থাকার কথা, তাই না?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, তুমি শিশুকালের অপরিপূর্ণ যোজনা, যাচনা বা কল্পনাকে ধারণ করে কৈশোরে পদার্পণ করেছ; কৈশোরের অপরিপূর্ণ স্মৃতি নিয়ে তারুণ্যে পদার্পণ করেছ; তারুণ্যের অপুরিপূর্ণ স্মৃতি নিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছ, তাই তো? তা আমাকে একটি কথা বলো, তুমি কি শৈশবের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছ? কৈশোরের? তারুণ্যের? ... ফেলনি তো! কেন? ... কারণ তোমার গ্রহণ করা দ্বিতীয় কল্পনা, যাচনা ও যোজনা, প্রথম কল্পনা, যাচনা ও যোজনার উপলব্ধিকে ধারণ করে রেখেই স্থাপিত। একই ভাবে তোমার তৃতীয় কল্পনা, যাচনা ও যোজনা, দ্বিতীয় কল্পনা, যাচনা ও যোজনার উপলব্ধিকে ধারণ করেই স্থিত।

তেমন ভাবেই পুত্রী, আমাদের একটি কল্পনা, যোজনা এবং যাচনা পূর্বের করা কল্পনা, যাচনা ও যোজনার থেকে লব্ধ উপলব্ধিকে ধারণ করেই স্থিত হয় । তাই আমাদের কাছে একটি কল্পনা, যাচনা ও যোজনার উপলব্ধির স্মৃতি যদি থাকে, তার অর্থ এই যে তার পূর্ববর্তী সমস্ত উপলব্ধিই আমাদের কাছে সঞ্চিত রইল, কারণ সেই উপলব্ধির উপর ভিত্তি স্থাপন করেই অন্য কল্পনা, যাচনা ও যোজনার রচনা হয়। ... তবে আমরা এই গুহ্য রহস্যকে উপলব্ধি করতে পারিনা আগে। তখনই এই রহস্যকে ভেদ করতে পারি, যখন আমাদের পঞ্চভাব জাগ্রত হয়, আর আমরা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হবার দিকে অগ্রসর হই"।

দেবী দিব্যশ্রী তৃপ্ত হয়ে বললেন, "কর্মচক্রের প্রাথমিক অবস্থাকে বেশ উপলব্ধি করতে পারছি পিতা। এবার আমাকে কর্মচক্রের দ্বিতীয় ও অন্তিম অর্ধের কথার বিবরণ দিন। কর্মচক্রের প্রথম অর্ধে আমরা আবেগের তাড়নায় স্থিত থাকি, কারণ আমরা সম্পূর্ণ

ভাবে বিকারের বশে নিজের ভূতদের রাখি। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে আমরা আমাদের ভূতদের বিকারের ছত্রছায়ার থেকে মুক্ত করি, আর তার ফলে আমাদের আবেগও বিনষ্ট হয়ে যায়, আর জন্ম নেয় ভাবের, অর্থাৎ পঞ্চভাবের।

কিন্তু পিতা, আমার এখানে প্রশ্ন এই যে, ভূতদের উপর থেকে বিকারের আবরণ যায় কি করে? অর্থাৎ ভূতরা কাম, মোহ, ক্রোধাদি রিপুর থেকে, ভয়, লজ্জা, ঘৃণাদি পাশের থেকে এবং ইন্দ্রিয়দের থেকে মুক্ত হয় কি করে? আর কি ভাবে মুক্ত হয়, সে তো একপ্রকার কথা, যেখানে কিছু অভ্যাস বা অনুশীলন নিশ্চয়ই থাকবে। তার পূর্বে আমার যা জানার, তা হলো কি এমন ঘটে পুরুষের মধ্যে, যার কারণে, তাঁর আবেগের থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা জাগে?

এই প্রশ্ন করার কারণ এই যে,একটি জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট আর তা এই যে, যা কিছু হয় তা পুরুষের যাচনার উপর ভিত্তি করেই হয়। তাই পুরুষ যদি আবেগের থেকে মুক্তির যাচনা না করে, তবে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আমার প্রশ্ন এই যে, পুরুষ কি কারণে এই আবেগদের থেকে মুক্তি চায়? আর কি ভাবে সেই আবেগের থেকে, এবং বিকারদের থেকে মুক্তি পায়?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন তৃপ্ত হৃদয়ে বললেন, "পুত্রী, তোমার প্রশ্নের গুনাগুণ সত্যই প্রশংসনীয়। যেই ধারা তোমার প্রশ্ন স্থাপিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে বলছে যে, তুমি কেবল আমার কথিত শব্দমালার শ্রবণই করছো না, বরং সেই শব্দমালাকে আত্মস্থও করছো। বেশ পুত্রী, তোমার প্রশ্নের আমি উত্তর প্রদান করছি, আর সেই উত্তর শ্রবণ করে তুমি উপলব্ধি করবে যে কেন পুরুষ আবেগ থেকে এবং বিকারের থেকে মুক্ত হবার যাচনা করেন, আর যখন তিনি সেই যাচনা করেন, তখন কি রূপে তিনি সেই আবেগ এবং বিকারদের থেকে মুক্ত হন"।

পঞ্চভাবজাগরণ

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, তুমি জানো যে পুরুষের দুই ক্ষেত্রে আসক্তি ক্রিয়া করে, প্রথমটি হলো তাঁর নিজের ভিন্নতা বা অহংকারের ক্ষেত্রে, এবং দ্বিতীয়টি হলো প্রকৃতির ক্ষেত্রে । আর এও জানো যে প্রকৃতির প্রতি আসক্তির জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে পিপাসা পায়, ক্ষুধা লাগে, নিদ্রা আসে, এবং তাদের পূর্ণতার ফলে, তৃপ্তি, শান্তি এবং তুষ্টি আসে। অন্যদিকে এও জানো যে, অহংকারের প্রতি আসক্তির কারণে পুরুষ নিজের অন্তরে ভূত এবং বিকারদের রচনা করেছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কল্পনা, যাচনা এবং যোজনার সঞ্চার করেন।

পুত্রী, বিকারদের দ্বারা তাড়িত হয় পঞ্চভূত, আর সেই থেকেই আবেগের সঞ্চার হয়। বিকার তিন প্রকার, তাও তুমি জানো, অর্থাৎ ৬ রিপু, ৮ পাশ, এবং ৬ ইন্দ্রিয়। ৬ রিপু হলো কাম মানে কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ অর্থাৎ আসক্তি, মদ অর্থাৎ দম্ভ এবং মাৎসর্য মানে

ঈর্ষা। ৮ পাশ হলো ভয়, লজ্জা, হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, শঙ্কা, কুল অর্থাৎ বংশ মর্যাদা ও শীল অর্থাৎ গোপন করার ইচ্ছা । আর ছয় ইন্দ্রিয় হলো দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, ভৌতিক অনুভব, এবং মনেন্দ্রিয় বা কল্পনা।

পুত্রী, বহু মূর্খকে বলতে শুনবে, কামকে জয় করার কথা, ক্রোধকে জয় করার কথা, লোভকে জয় করার কথা। মূর্খ কেন বললাম যারা এই সমস্ত কথা বলেন? কারণ স্পষ্ট, যেই অগ্নিসংযোগ হয়নি, সেই অগ্নিসংযোগকে নির্বাপিত কি করা যায়? যেই বিপর্যয় আসেনি, সেই বিপর্যয়কে কি কাটিয়ে ওঠা যায়! যেই ঘূর্ণাবাত, যেই প্লাবন আঘাত হানেনি, সেই ঘূর্ণাবাত, সেই প্লাবনকে কি নির্বাপিত করা যায়! কিন্তু এই মূর্খরা সেই কর্মই করতে বলেন।

কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা এঁরা মন-বুদ্ধির উপর অগ্নির সঞ্চার করে, কিন্তু যদি সেই অগ্নি সঞ্চারিত হয়, তবেই তো সেই অগ্নিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। লোভ, মোহ, ভয়, শঙ্কা, মন-বুদ্ধির উপর ঘূর্ণাবাতের সঞ্চার করে। যদি সেই ঘূর্ণাবাত আঘাত করে, তবেই তো তার থেকে সুরক্ষার প্রশ্ন আসে। ... কিন্তু এত বোধ তাঁদের থাকলে, তাঁরা আর মূর্খ কি করে হতেন! পুত্রী, এঁর থেকে কি নিরাময় সত্যই সম্ভব? অন্য কনো কি বিকল্প দেখতে পাচ্ছ?"

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "আমি একটি উপায় দেখতে পাচ্ছি পিতা। মনে যদি অগ্নুৎপাত হয় রিপু, পাশের দ্বারা, তবে রিপুপাশকে তো আটকানো সম্ভব নয়, তবে মনকে তো সুরক্ষিত করা সম্ভব। ... আমার কথার অর্থ এই যে, অগ্নুৎপাত হয়ে গেলে, তার নিরাময়, সে তো সাময়িক সুরক্ষার চিন্তা, কিন্তু যেই শুকনো পাতার জন্য অগ্নুৎপাত হয়, সেই শুকনো পাতাকেই যদি সরিয়ে রাখা হয়!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "যথার্থ পুত্রী, যথার্থ। জয়লাভ কামের উপর নয়, ক্রোধের উপর নয়, জয়লাভ মনের উপর, বুদ্ধির উপর, দেহের উপর, প্রাণের উপর এবং উর্জ্জার উপর করা সম্ভব, আর তা করাই কর্তব্য। মূর্খ শব্দের ব্যবহার করলাম বলো ক্ষমা প্রার্থনা করি পুত্রী, তোমার কাছেও আর জগন্মাতার কাছেও, কারণ সেই মূর্খরাও স্বরূপে সেই ব্রহ্মই, সেই মূর্খরাও পুরুষকে আশ্রয় করেই উপস্থিত, আর সেই মূর্খরাও প্রকৃতিকে আকর্ষণ করেই উপস্থিত।

তবে সত্য এই যে, সেই ব্যক্তিরা সনাতন বুদ্ধধারাতে পঞ্চভূত বলতে যে আমাদের মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জ্জা এবং দেহকে বলা হয়েছে, তাই উদ্ধার করেন নি। আর তা করেন নি বলে, ভেবে গেছেন এই বিশাল আকাশকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা, এই বিশাল সমুদ্রকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা, এই ব্যাপক মারুতকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা, এই বিশাল ও ব্যাপক ধরিত্রীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাঁরা! ... অর্থাৎ বুঝতে পারছো এই মূর্খব্রাহ্মণদের করুন দশা! ...

এঁরা সনাতন বুদ্ধধারার থেকে জনপ্রিয়তা ছিনিয়ে নিতে, বুদ্ধকথাকে নিজেদের মুখে বসিয়ে বলে তো দিয়েছেন যে বাহ্য জগত মিথ্যা, নাস্তি নাস্তি, কিন্তু এঁর গুঢ়অর্থ তাঁরা অনুধাবনই করেন নি। আর অনুধাবন করেননি বলেই, বাহ্য জগতের আকাশকেই আকাশতত্ত্ব ভেবেছেন, কিন্তু সেই উদ্ভ্রান্তরা মনই যে সেই আকাশতত্ত্ব, তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। অনুধাবন করতে ব্যর্থ বলেই, সেই অহংকারী

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সমুদ্রকেই জলতত্ত্ব ভেবে গেছেন, নিজেদের বুদ্ধির ধারাকে অনুধাবন করে তাকে জলতত্ত্ব বলেছেন সনাতন বুদ্ধমত, এই সত্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ।

অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি বলেই, মিথ্যা বাহ্যজগতকে কারুর কথার উপর তস্করি করতে গিয়ে নাস্তি নাস্তি বললেও, সেই বাহ্য জগতের পবনকেই, ধরিত্রীকেই, অগ্নিকেই পবনতত্ত্ব, মৃত্তিকাতত্ত্ব, বা অগ্নিতত্ত্ব ভেবে গেছেন আহম্মকের ন্যায়, কিন্তু নিজের অন্তরের প্রাণবায়ুর কথা, মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত দেহের কথা, এবং উর্জ্জাধারা যার দ্বারা তাঁরা পরিশ্রম করেন সেই অগ্নিধারার স্মরণ আসে নি তাঁদের।

কি করে আসবে পুত্রী, শব্দ নশ্বর, তার তস্করি করা যায়, ভাব যে ভাস্মর, ভাস্মরের কি আর তস্করি হয়? প্রয়াস করে সনাতন শব্দকে বুদ্ধের নাম থেকে, বুদ্ধের ধারা থেকে তস্করি করা সম্ভব, কিন্তু সনাতন মহাভাব! সে তো শব্দের ন্যায় মায়া নয়, সে তো ঈশ্বর! ঈশ্বরকে কি আর তস্করি করে লাভ করা যায়! ... হ্যাঁ পুত্রী, তুমি সত্যই ধারণা করেছ, জয়লাভ মনের উপর, বুদ্ধির উপর, প্রাণের উপর, উর্জ্জার উপর, এবং দেহের উপর করা যায়, বিকারদের উপর না তো জয়লাভ করা যায়, আর না জয়লাভ করার কনো প্রয়োজন আছে।

পুত্রী, লৌহের উপর অধিকার স্থাপন করতে হয়, লৌহের উপর যেই মরিচা স্থাপন হয়, তার উপর নয়। ঠিক তেমনই অধিকার স্থাপন মন, বুদ্ধি ইত্যাদি পঞ্চভূতের উপর করতে হয়, এঁদের উপর পরে থাকা মরিচা মানে, কাম, ক্রোধাদির উপর নয়। এই মরিচার উপর অধিকার স্থাপন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা করুন, যেমন তাঁরা করে এসেছেন বলে বিবিধ পুরাণ তথা বেদে দাবি করে এসেছেন। সাধক লৌহের উপর অধিকার স্থাপন করবেন, মরিচার উপর নয়। আর এই লৌহের উপর অধিকার স্থাপন করতে গেলে, যা প্রয়োজন তা হলো আবেগকে বিতাড়িত করা এবং ভাবকে গ্রহণ করা।

পুত্রী আবেগ হলো সেই মরিচা, যার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার অর্থ মুর্খামি ব্যতীত কিছুই নয়, তাই আবেগকে অধিকারে এনে, বশে এনে নিয়ন্ত্রিত করে ব্রাহ্মণ হতে যেও না। পঞ্চভূত হলো সেই লৌহ; তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত করে, ভাব গ্রহণ করে বুদ্ধ হয়ে ওঠা, সনাতন হয়ে ওঠা, অধিক শ্রেয়। তাই পুত্রী, আবেগকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ন্যায় নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস না করে, তাদের বিতাড়িত করো, কারণ আবেগকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত, ভাবের উৎপত্তি হতে পারেনা। যার মধ্যে আবেগ সঞ্চিত থাকে, তিনি যতই দাবী করুন যে, তিনি ভক্ত, বা তিনি প্রেমী, বা তিনি বিশ্বাসী ইত্যাদি, সমস্তই তাঁর মিথ্যাবচন এবং বাচালতা।

সামান্য অশুদ্ধি থাকলেও, প্রকৃতি সম্মুখে আসেন না পুরুষের, আর আবেগ হলো সেই অশুদ্ধি, সেই অপবিত্রতা। কেন বললাম এমন? খেয়াল করে দেখো পুত্রী, কি বলেছিলাম তোমাকে, পুরুষ দুইক্ষেত্রে আসক্ত, প্রথম নিজের অহংকারে যার থেকে আবেগের সঞ্চার হয় বিকার ও ভূতদের মিশ্রণে, আর দ্বিতীয় হলো প্রকৃতিতে যার প্রতি আনুগত্যের কারণে জন্ম নেয় ভাব । ... অর্থাৎ নিশ্চয়ই

বুঝতে পারছো, কেন আবেগের প্রতি মোহ না রেখে, তা ত্যাগ করা আবশ্যক? কারণ এই আবেগই মানবীয় অশুদ্ধি, এই আবেগই মানবীয় বিকার, এই আবেগই আমাদের সত্যের পথে যাত্রা করার প্রধান শত্রু।

হ্যাঁ পুত্রী, এই আবেগই আমাদের অহংকারের তোষামোদি করে। ব্রাহ্মণদের ন্যায়, দম্ভ বা মদকেই অহংকার ভেবো না। কনো প্রয়োজন নেই, এই মদকে অহংকার বলে ধারণা করে ব্রাহ্মণদের থেকে সাধু বা ঋষি উপাধি অর্জনের। সত্যের কাছে স্থাপিত হবার জন্য উপাধির কনো প্রয়োজন নেই পুত্রী, সত্যের কাছে স্থাপিত হবার জন্য উলঙ্গ হওয়া আবশ্যক, হ্যাঁ সমস্ত উপাধি, সমস্ত আমিত্বের নাশ করে উলঙ্গ হওয়া আবশ্যক প্রকৃতির সম্মুখে স্থিত হবার জন্য।

তাই বলছি, সাধু, ঋষি, এই সমস্ত উপাধির উপর মোহ ত্যাগ করো, এবং ব্রহ্মময়ীর প্রিয় সন্তান হয়ে বিরাজ করো। তাঁর প্রেম লাভ করার মত সৌভাগ্য অতি অল্প সংখ্যক মানুষেরই হয়, আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা তাঁর প্রেম লাভ করেন নি, কারণ তাঁরা আমিত্বের পূজারী। যা যা কিছু আমিত্বকে ভূষিত করে, অর্থাৎ খ্যাতি, নাম, যশ, প্রতিপত্তি, সম্পত্তি, মান, দেহসুখ, সেই সমস্তই কামনা করে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে গেছেন তাঁরা, এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ দাবি করার জন্য, ঋষি, মুনি, ইত্যাদি নামালংকার স্থাপন করে, আত্মবাখান করে গেছেন তাঁরা।

অন্যের দোষ বিচার করা অনর্থক, তাই সেই বিচার থেকে বিরত থাকো, আর সত্য সত্য যা করলে সত্যলাভ সম্ভব, তাকেই স্বীকার করো পুত্রী। সত্যলাভ তখনই সম্ভব যখন আমিত্ব ত্যাগ করতে পারবে। এই আমিত্বই অহংকার। আমি বিত্তবান এটিও আমিত্ব, আবার আমি দরিদ্র তাও আমিত্ব, অর্থাৎ দুইই অহংকার। 'আমি'র অস্তিত্বই যেই কালে ভ্রম, সেইকালে এই 'আমি' বিত্তবান হলো কি দরিদ্র, তা কি করে সত্য হতে পারে! ... যেইকালে 'আমি' শব্দটিই ব্রহ্মের সাথে, সত্যের সাথে মহাপ্রতারণা, সেইকালে এই 'আমি' সম্মান পেলাম, বা অপমান পেলাম, তা কি করে সত্য হতে পারে?

পুত্রী, বিচার করে দেখো, এই আবেগ সমূহ, এই সর্বৈব ভাবে মিথ্যা 'আমি'কে কেন্দ্র করেই অবস্থান করে। খেয়াল করো, কাকে আবেগ বলো? সুখকে আর দুঃখকে। সেই সুখ কে অনুভব করে? আমি। সেই দুঃখ কে অনুভব করে? আমি। ... এই মিথ্যা 'আমি'ই দেহসুখের অভিলাষী, এই মিথ্যা 'আমি'ই মনসুখের অভিলাষী, এই মিথ্যা 'আমি'ই দেহবেদনায় কাতর, এই মিথ্যা 'আমি'ই মনকষ্টে ভীত, এই মিথ্যা 'আমি'ই সম্মানের আশা করে, এই মিথ্যা 'আমি'ই অপমানে ক্রোধিত হয়।

অর্থাৎ এই যে, এই 'আমি'ই সমস্ত ভ্রমের প্রণেতা। এই 'আমি' ভাবের কারণেই যেই শূন্য ব্রহ্মের কনো ভেদ সম্ভব নয়, সেই ব্রহ্মের থেকে নিজেকে পৃথক ভ্রম করে আমরা আত্ম, বা পুরুষ। এই 'আমি'ই নিজের আমিত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বই সম্ভব নয়, যেই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আমরা নিদ্রার কালে ভুলেই থাকি, সেই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারের জন্য ব্রহ্মকে বাধ্য করেছি প্রকৃতি বেশে সম্মুখে আসতে আর আমাকে ত্রিগুণে বিভক্ত করতে। এই 'আমি'ই যেই ভূত নেই, সেই ভূতকে স্থাপনা করেছি, সেই ভূতদের ক্রিয়াশীল করার জন্য বিকারের অবতারণা করেছি। আর এই 'আমি' ই হলো অহংকার।

খেয়াল করে দেখো পুত্রী, আমরা যেই যেই পরিচয়ের চিন্তা করি সর্বক্ষণ, তা এই 'আমি'র কারণেই। আমি'র নাম, আমি'র কুল, আমি'র জাত, আমি'র সম্পদ, আমি'র যোগ্যতা, আমি'র সামর্থ্য, আমি'র মান, আমি'র জ্ঞান, আমি'র বিদ্যা, আমি'র বিশ্বাস, আমি'র ইচ্ছা, আমি'র বাসনা, সর্বত্র সর্বক্ষণ কেবল আমি আমি আর আমি। ... আর এই আমিকে বেষ্টন করেই সমস্ত ভুত, আর সমস্ত বিকার, আর তাঁদের মিশ্রণে সমস্ত আবেগ। ... আর ভাব! ভাব হলো এই আমির ক্ষয়। যতই এই আমি'র ক্ষয় হয়, ততই ভাবের উত্থান হয়, ততই ভাব ঊর্ধ্বগতি লাভ করে, আর নিম্নতম ভাব থেকে উচ্চতম ভাব, অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে সমর্পণে উন্নত হয়। তাই পুত্রী, এই আমিত্বকে ত্যাগ করার সংকল্পই হলো ভাবের পথে যাত্রার, এবং আবেগকে দমন করার পথে যাত্রার প্রথম চরণ"।

দেবী দিব্যশ্রী উন্মুগ্ধ হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির মধ্যে সামান্য প্রেমাশ্রু। ... আর শিষ্যত্বের বেশকে ধারণ করে রাখতে পারলেন না তিনি। শিষ্যের অন্তর থেকে শিষ্যের সংস্কার যেন মৃত্যু লাভ করলো আর তাই পরিত্যক্ত রইলো সন্তান। শিশু সন্তানের ন্যায়, তরুণী দিব্যশ্রী তাঁর পিতার কোমল দেহে নিজের তনুকে শিশুর ন্যায় স্থাপিত করে বললেন, "কিন্তু পিতা, এই আমির ত্যাগ করবো কি করে? সর্বক্ষণ তো সমস্ত চিন্তা এই আমিকে ঘিরেই করে চলেছি আমরা! ... আমার জীবন, আমার বচন, আমার পিতা, আমার ... আমার... আমার!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতনও আর প্রভু রইলেন না, একাধারে যেন তিনি পিতা ও মাতা, যেন সাখ্যাত মাতা ব্রহ্মময়ী তিনি। স্নেহের স্পর্শ প্রদান করে তিনি কন্যাকে বললেন, "পুত্রী, পূর্বেই বলেছিলাম মনে আছে, পুরুষ নিজের এই আমিত্ব বা অহংকারের প্রতি আসক্ত হয়ে, নিজের বুদ্ধি ও মনকে ব্যবহার করে আবেগের অবতারণা করেন। আবার এই পুরুষই প্রকৃতির প্রতি আসক্ত। তাই তাঁর ধারণা করেও, পুরুষ নিজের মধ্যে প্রাকৃতিক বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করেন, যেমন পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রা। ...

পুত্রী, প্রথম এই পঞ্চভূতের উপর স্বয়ংকেই অত্যাচার করতে হয়, আর তা করতে থাকলে একসময়ে আর কেবল ক্ষুধা, পিপাসা বা নিদ্রাতেই আমাদের প্রাকৃতিক ক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকেনা, উপরন্তু তখন সমস্ত ক্রিয়াই প্রাকৃতিক হয়ে ওঠে, কারণ যেই পঞ্চভূত আমাদের পুরুষের আমিত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করে, তাঁরাই নিজেদের অধিকার হারিয়ে ফেলে। ... আর তখনই ভাবের উৎপত্তি বা জন্ম হয়"।

দেবী দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "কিছুটা বুঝলাম পিতা। যেই মনবুদ্ধি আমাদেরকে আমিত্বের চিন্তার মধ্যে আটকে রাখে, তাদেরকেই কোণঠাসা করে দেবার চিন্তা। সেই চিন্তার ফলে, মনবুদ্ধি কোণঠাসা হয়ে যাবে, আর ফলে যেই আমিত্বের প্রসার করে তারা, সেই আমিত্বের প্রসার আর করতে পারবে না। পুরুষের অহংকারের প্রতি আসক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর যেমন আমাদের স্বভাব একটি বিকল্প হারালে, দ্বিতীয় বিকল্পকে আঁকড়ে ধরি আমরা, তেমনই ভাবে পুরুষ তখন প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরবেন, আর সমস্ত কিছু প্রাকৃতিক হয়ে উঠে ভাবের সঞ্চার হবে আবেগের বিনাশ করে। কিন্তু পিতা নিজে নিজের পঞ্চভূতকে অত্যাচার করা কি করে সম্ভব! একটি সীমা অতিক্রম করার পর তো এঁরা ভয়ের সঞ্চার করবে পুরুষের উপর, আর তাতে আমরা কি ভয় পাবো না! ... কি ভাবে এঁদের উপর অত্যাচার করতে হয়? কি ভাবে এঁদের উপর শাসন করতে হয়?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "তোমাকে কন্যা করে লাভ করে, আমি মাতা ব্রহ্মময়ীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পুত্রী। তুমি এই কঠিন বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে চলেছ!... সত্য বলতে আমি আশাও করিনি যে এই বিজ্ঞানকে কেউ কথিত শব্দের ভিত্তিতে উপলব্ধি করতে পারবেন। ... আমি ধন্য হলাম পুত্রী, ধন্যবাদ মাতার অসীম, অনন্ত কৃপার কারণে। ... আসলে পুত্রী, সত্যকে ধারণা করা যায়না, ব্যাখ্যাও করা যায়না, আর চিন্তাও করা যায়না। কারণ সত্য যে ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম যে অব্যাক্ত, অচিন্ত্য, ধারণার অতীত।

হ্যাঁ বুঝতে পারছি পুত্রী, যতই মাতার কৃপায় প্রয়োগ করা শব্দের বাণ তোমার হৃদয়ে আঘাত হানছে, ততই তোমার মন, বুদ্ধি, দেহ, আত্মা সকলেই বিচলিত হয়ে উঠছে, কিন্তু বিশ্বাস করো পুত্রী, যখন সমস্ত আমিত্ব ত্যাগ হয়ে যাবার পর নির্বাণ বা সমাধি লাভ হয়, তখন কেবলই মুক্ত হবার পরমানন্দ বিরাজ করে। এটা সঠিক যে সেই পরমানন্দকে শব্দের জালে অনুভব করা অসম্ভব। এটাও সঠিক যে, সেই পরমানন্দের অবস্থাকে শব্দের জালের মধ্যে স্থিত করে শ্রবণ করলে, যেই আত্ম, যেই পুরুষ সদা ভিন্নতার সাধ পেতে আগ্রহী, তাঁর অহংকার, তাঁর আমিত্ব চুরচুর হয়ে যায়, আর সে এক অজানা আশঙ্কায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু পুত্রী বাস্তবে যখন সেই অবস্থায় কেউ স্থিত হন, তখন কেবলই মুক্তির পরমানন্দ বিরাজ করে।

হ্যাঁ পুত্রী, সেই আনন্দ সত্যেরই মত অব্যাক্ত, ব্রহ্মেরই মত অচিন্ত্য, সনাতনের ন্যায়ই ধারণার অতীত। এতাবৎ কাল যেই মিথ্যা আমিত্বের চর্চায় রত ছিল পুরুষ, যেই আমিত্বকে এতকাল পুরস্কার মনে করতো পুরুষ, সেই আমিত্বকে প্রথমে বন্দিদশা বলে চিহ্নিত করতে গিয়ে পুরুষ আচম্বিত হয়ে যায়। দোটানা ভাবের মধ্যে স্থাপিত হন পুরুষ, আমিত্বের থেকে মুক্ত হওয়ার এক আকর্ষণ তাঁকে ধ্যানস্থ করে দেয়, কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলে, আমিত্বের নাশ হয়ে যাবে, সেই ভয়ে ভীত হয়ে, বারে বারে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়। আর এমন করতে করতে অবশেষে অসীম সাহস এবং সমর্পণ ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করে যখন পুরুষ একবার আমিত্বকে ত্যাগ করে দেন, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সমাধি হয়ে যায়।

সমাধি অর্থাৎ নদীর জলধারা সাগরে মিশে যাওয়া, যারপর আর কনো নদী নেই, সাগরের জলকে হাতে নিলেও, সেই নদীকে পৃথক করা যায়না। মুক্তি, সমস্ত আমিত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি, সেই আমিত্বের কারণে যেই জন্মমৃত্যুর দুর্দশাগ্রস্ত কয়েদি জীবন ছিল, তার থেকে সদা সদার জন্য মুক্তি; সমস্ত যোনির থেকে মুক্তি; কালের থেকে, ভ্রমের থেকে, মিথ্যার থেকে, অনিত্যের থেকে, সমস্ত কিছুর থেকে চিরতরে মুক্তি। পরম শূন্যতা তখন, আর শূন্যতার মহানন্দ তখন। ব্রহ্মস্বরূপ তখন। আর তখন কনো পুরুষ নেই, তাই কনো প্রকৃতিও নেই। থাকেন কেবলই ব্রহ্ম। নেই কনো ব্রহ্মাণ্ড, নেই কনো আপন বা পর, সকলেই তখন আপন, ঠিক যেমন ঈশ্বরের কাছে সকলেই আপন।

হ্যাঁ পুত্রী, ঈশ্বর তিনি নন, যিনি আমাদের এই কারণে গন্তব্য, কারণ তিনি আমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করবেন। ঈশ্বর তিনি, যিনি আমাদের লক্ষ্য, আমাদের পরমার্থ, আমাদের যথার্থ, আমাদের স্বরূপ, আমাদের সত্য, আমাদের প্রকৃত পরিচয়। আর আমরা তাঁকে লাভ করতে পারি, অবশ্যই পারি। আর পারবোনাই বা কেন? আমিও তো তিনিই, কেবলই ভ্রমের পর্দার কারণে আমি হলাম আমি,

আসলে যে এই আমি বলে কিছুর কনো কালেই কনো অস্তিত্ব ছিলনা । তিনিই ছিলেন, তিনিই আছেন, আর তিনিই থাকবেন, আর তিনি কে? তিনি পরম শূন্য।

যা কিছু নেই, তাই তিনি। তিনি তাই যা নেই, আর তিনি ছাড়া কিছুরই কনো কালে অস্তিত্বও নেই। দুই বাক্যকে মেলালে পুত্রী কি পরে থাকে... কিচ্ছু নেই, না কিছু ছিল, আর না কিছু থাকা সম্ভব। হ্যাঁ পুত্রী, কিছু থাকাই হলো সসীমতা, কিছু থাকাই হলো অন্তবোধ, কিছু থাকাই হলো ভ্রম, আর কিছু থাকাই হলো বেদনার কারণ। আর যখন কিচ্ছুই নেই, তখন কি পরে থাকে? বেদনাশূন্যতা, অন্তশূন্যতা, ভ্রমহীনতা, সীমাহীনতা, অর্থাৎ অসীম, প্রজ্ঞা, অনন্ত, আর পরমানন্দ। এই তো ব্রহ্মের শব্দদ্বারা যতটুকু ব্যখ্যা সম্ভব, সেই ব্যাখ্যা পুত্রী; এই তো সত্য। আর এই আমাদের লক্ষ্য।

দেখেছ পুত্রী ভাবের অপরিসীম সামর্থ্য। যিনি তাই যা নেই, যা সম্ভব নয়, ভাব এমনই যে তাঁর বিবরণ প্রদান করতে শুরু করলে, সেই বিবরণের কনো সমাপ্তিই হয়না। (হাস্যে) আসলে তিনি যে অসীম, তাই তাঁর বিবরণও যে অসীম; তিনি যে অনন্ত, তাই তাঁর বিবরণও অনন্ত। ... আর সেই অনন্তের ফাঁদে পরে, তোমার প্রশ্নের উত্তরটিই না দিয়ে, প্রগলের ন্যায় অব্যাক্তকে মূর্খের মত ব্যক্ত করে তোলার প্রয়াস করে চলেছি।

তা তোমার প্রশ্ন এই যে, ভূতদের অত্যাচার কি করা যায়? এই তো? পুত্রী, প্রথমেই বলি, এই কর্ম করেন আত্ম বা পুরুষ, আর তাঁর উপর কনো জোরই চলেনা। তাই আমাদেরকে একটি সাময়িক বিচার করে, এটি ধারণা করতে হয় যে, আমরা কর্ম করতে পারিনা, কারণ যে কর্ম করবে তার অস্তিত্বই নেই। তাই জোর করে কিচ্ছুই করা সম্ভব নয়, যা কিছু করতে হয়, তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে করতে হয়। আর বিজ্ঞান ব্যখ্যার জিনিস নয়, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধির বিষয়। এখানে উপলব্ধির বিষয় কি? উপলব্ধির বিষয় এই যে আমরা কেন ভূতদের উৎপীড়ন করবো। ...

এই বিচার একটি সূত্রের স্থাপন করে কিন্তু তা সম্পূর্ণতা লাভ না করার জন্য, আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি। তাই সে চাঞ্চল্যকে শান্ত করার জন্য একটি অভ্যাস করা আবশ্যক। না এই অভ্যাস সম্পূর্ণ ভাবে করা সম্ভব নয় ততক্ষণ, যতক্ষণ না পঞ্চভাবের সঞ্চার হয়। তাই সেই অভ্যাস আমরা সম্পন্ন অবশ্যই করতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ, ভূতদের যে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আশা আবশ্যক, তার চেতনা আমরা এই অভ্যাস থেকে লাভ করতে পারি, তাই এই অভ্যাস করা আবশ্যক। এই অভ্যাসের কনো নামকরণ করা নেই, কারণ বুদ্ধ সনাতন মত এই অভ্যাসের কথা বলেনি, আর নামকরণে আমি বিশ্বাস রাখিনা, কারণ নামকরণ প্রায়শই এক নতুন ভ্রমের সঞ্চার করে দেয়।

পুত্রী এই অভ্যাস হলো পর্যবেক্ষণের অভ্যাস, যেই পর্যবেক্ষণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করানো হয়, যাতে তাঁর মধ্যে লয়কর্তারূপের সঞ্চার হয়। পর্যবেক্ষণ ছাড়া আমরা করতেই বা কি পারি আর! ... কিসের পর্যবেক্ষণ করবে? মন ও বুদ্ধি যা কিছু ইন্দ্রিয়রা দেখে, শোনে, ঘ্রাণ নেয় ইত্যাদি, তাদের মধ্যে সর্বদা একটি ভেদভাব সঞ্চার করে রাখার প্রয়াস করে, আর সেই প্রয়াস হয় আমিত্বকে কেন্দ্রবিন্দু রূপে

স্থাপন করে। অর্থাৎ, যা কিছু ইন্দ্রিয়রা দেখে, শোনে বা ইত্যাদি করে, সেই সমস্ত কিছুকে বুদ্ধি ও মন অহং-এর নিরিখে বিভক্ত করে নেয়, আর যা কিছু অহং বা পুরুষকে চঞ্চল করতে পারে, সেই সমস্ত কিছুকেই তারা গ্রহণ করে।

অর্থাৎ পুত্রী, যদি এমন কিছু ঘটনা ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে ঘটে যা অহংকে সম্মানিত করে বা করার সম্ভাবনা রাখে, বা এমন কিছু ঘটনা ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে অর্থাৎ কল্পঅণ্ডে ঘটে যা অহংকে অসম্মান করে বা করতে আগ্রহ রাখে, বা এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা অহংকে কল্পধন প্রাপ্তির বা ক্ষয়ের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করায়, তাহলেই বুদ্ধি বা মন সেই ঘটনাকে গুরুত্ব প্রদান করে, অন্যথা নয়। এমন কি একটি সম্পূর্ণ ঘটনার মধ্যে যদি একটি সামান্য টুকরো ঘটনার মধ্যেই মনবুদ্ধি উপরোক্ত সম্ভাবনা দেখে, তবে কেবলমাত্র সেটিই গ্রহণ করে তারা।

অর্থাৎ ধরো একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বহু ঘটনা হয়, আর এর মধ্যে কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে যেখানে অহং সম্মানিত হয় বা অপমানিত হয়, তাহলে মনবুদ্ধি কেবল সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনারই স্মৃতিকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে, এবং অন্য সমস্ত ঘটনার স্মৃতিকে সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য যতটা স্মৃতিতে রাখতে হয়, ততটাই রাখে। পুত্রী, যখন একজন সাধক এই সমস্ত কিছুকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্পষ্ট ভাবে এই সত্যকে অবলোকন করে। এমনকি, তুমি যে এখন আমার মুখ থেকে এই কথা শুনছো, তুমিও নিশ্চয়ই বিচার করছো নিজের স্মৃতিকে কাঠগড়ায় তুলে, আর যেমন বললাম, তেমনটাই প্রত্যক্ষ করছো।

পুত্রী, এই প্রথম পর্যবেক্ষণের পরে আরো একটি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, আর তা হলো এই মনবুদ্ধিকে সচেতন ভাবে সাময়িক সময়ের জন্য আবদ্ধ রেখে, ঘটনার নিরীক্ষণ করতে হয়। সাধক যখন তেমন করেন, তখন তিনি স্পষ্ট ভাবে দেখেন যে, কনোরকম ভেদ না করে, সম্যক ঘটনাকেই তাঁর পুরুষ স্মৃতিতে রেখেছে, আর শুধু তাই নয়। কিছু সময় জ্ঞাপনের পরে, যখন কনো বিশেষ অবস্থার আনাগোনা হয়, তখন সেই পূর্বে দেখা সম্পূর্ণ স্মৃতির থেকেই লাভ করা শিক্ষা কাজে লেগে যায়, আর তা কাজে লেগে সেই সাধক সাফল্য লাভ করেন।

এমন পর্যবেক্ষণ করার পরে, সাধক উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত অর্থে পুরুষকে প্রেম মনবুদ্ধি নয়, প্রকৃতিই করেন, আর তাই প্রাকৃতিক ভাবে যা কিছু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আসে, তাদেরকে নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করলে, তবেই পুরুষ সময়ের ফেরে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই পর্যবেক্ষণ করার কালেই, সাধকের মধ্যে স্থিত পুরুষ নিজের সৃষ্টিকর্তা আবেশ ত্যাগ করে, ভূতদের রক্ষাকর্তার আবেশ ত্যাগ করে, প্রলয়কর্তার রূপ ধারণ করে, এবং সেই তাণ্ডবমূর্তি ধারণ করা পুরুষ সমস্ত ভূতদের দমন করে, প্রকৃতিকে আপন করে নিতে উদ্যত হয়।

পুত্রী, পুরুষের উপর জোর চলেনা। যদি তাঁর উপর জোরই চলতো, তবে প্রকৃতি তাঁকে কবেই স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করাতেন জোর খাটিয়ে। কিন্তু তাঁর উপর জোর চলেনা। কেন চলেনা? কারণ এই আত্ম যে স্বয়ং ব্রহ্ম, ভ্রমিত কিন্তু তাও তিনি ব্রহ্মই। সূর্য নিজের

পরিচয় হারিয়ে ফেললেও, তা সূর্যই থাকে। তেমনই ব্রহ্ম নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে পুরুষ বা আত্ম হলেও তিনি ব্রহ্মই থাকেন। আর যা শূন্য, যা ব্রহ্ম, তাঁর উপর জোর কি করে খাটানো সম্ভব!

এই জোর খাটানো সম্ভব নয় বলেই, প্রকৃতি পুরুষের সাথে মিশে, তাঁর ব্রহ্মাণ্ড বিস্তারের যাচনাকে প্রশ্রয় দেন। তাঁর উপর জোর খাটানো সম্ভব নয় বলেই, সেই ব্রহ্মাণ্ড, যা আদপে একটি ভ্রম ব্যতীতই কিছুই নয়, তারও রক্ষণ করে চলার যাচনা করেন পুরুষ, আর প্রকৃতি তা করে চলেন। কিন্তু পুরুষ কেবল প্রকৃতির উপর ভরসা না করে, নিজের ভ্রমকে প্রসারিত করে মনবুদ্ধির রচনা করেন সেই রক্ষণের কারণে। তাই পুত্রী, তাঁর উপর জোর খাটানো যায়না। কিন্তু তাঁর মধ্যে বোধ জাগানো যায় যে, যেই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দিয়েছেন তিনি, যেই ভুতদের জন্ম দিয়েছেন তিনি, তাদের রক্ষণ নয়, লয় আবশ্যক, কারণ তাঁদের জন্ম রক্ষণের কারণে হলেও, তাঁরা প্রকৃত রক্ষাকর্তা অর্থাৎ প্রকৃতির উপর আস্তরণ স্থাপন করে, রক্ষাকর্মকে ব্যহত করে।

আর যেই অভ্যাস তোমাকে বললাম, তা সাময়িক ভাবে করলে, পুরুষের মধ্যে এই বোধ জন্ম নেয় আর সেই বোধের কারণে, তিনি নিজের লয়কর্তা রূপকে সম্মুখে আনেন, এবং ভূতদের দমন প্রক্রিয়া শুরু করেন। আর তা শুরু করার কালে, পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির স্নেহপরশে জন্ম নেয় অন্তর্দৃষ্টি, যেই অন্তর্দৃষ্টির দ্বারাই নিজের অন্তরে চলমান প্রক্রিয়াসকলের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় পুরুষের পক্ষে। আর জন্ম নেয় বিচার, যার দ্বারাই স্বার্থচিন্তাযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি রেখে দর্শনের মধ্যে ভেদকে অবলোকন করতে পারেন পুরুষ।

আর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিচারের সাথে সাথে জন্ম নেয় বিবেক, যার বলে পুরুষ এই উপলব্ধি করতে পারেন যে প্রকৃতিই তাঁকে প্রকৃত অর্থে প্রেম করেন, এবং তাঁর ভালো চান। ভূতরা যে দাবি করে প্রেমের, তা নিতান্তই ভণ্ডামি। আর এই অনুভবের সাথে সাথে পুরুষের মধ্যে এক ভাব জন্ম নিতে আগ্রহী হয়, আর তা হল বিশ্বাসের। এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি তাঁকে অনন্ত প্রেম করেন, এই বিশ্বাস যে প্রকৃতিই কেবল তাঁর হিত চান, এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি তাঁর ভালো, তাঁর থেকেও ভালো করে জানেন, আর এই বিশ্বাস যে প্রকৃতি যা তাঁর সম্মুখে আনছেন, তাতেই তাঁর হিত, সেই হিত সেই মুহূর্তে বোধগম্য হয়না, কিন্তু প্রকৃতঅর্থে তাতেই তাঁর হিত অবস্থান করে।

কিন্তু সেই বিশ্বাস, যার মধ্যে কনো অবিশ্বাস নেই, তা জন্মেও জন্মাতে পারেনা, কারণ মনবুদ্ধি তো সাময়িক ভাবে বন্দি ছিল; তাঁদের বন্দিদশা কাটতেই নিজেদের অধিকার হননের ভয়ে তাঁরা অধিক সজাগ হয়ে পুরুষের উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করতে লেগে পরে। আর তাই সেই বিশ্বাস যার মধ্যে কনো অবিশ্বাস নেই, তার জন্ম যেন স্থগিত হয়ে যায়। স্থগিত হয়ে গেলে, আবার সেই বিশ্বাসে ফিরে যায়, যা বিশ্বাসের নামে ভণ্ডামি, আর তা পুরুষকে এবার ভয়ানক উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং অধিক অধিক ভাবে তাণ্ডবে উন্মত্ত করে দেয়"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "ভণ্ডামি কেন বললেন পিতা, সাধারণ ঈশ্বর বিশ্বাসকে?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "দুটি বন্ধু ছিলেন । দুইজন একটি বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাঁকোটি অত্যন্ত ভঙ্গুর, এবং যতটা পথ তাঁরা পেরিয়ে এসছেন, ততক্ষণ তাঁরা সাঁকো ভেঙে যাবার চিন্তা করছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম বন্ধু অন্তরে ভয় নিয়েই বললেন, "ভাই আমার কনো ভয় নেই, ঈশ্বর আমাকে ঠিক বাঁচাবেন, আমাকে তিনি কিছুতেই জলে পরতে দেবেন না"। ... দ্বিতীয় বন্ধু হেসে বললেন, "যদি ঈশ্বর আমাদেরকে জলে ফেলেন, তবে জলে পরে যাওয়াতেই আমাদের হিত"। ...

দুই বন্ধু এমন কথা বলতে বলতে যখন সাঁকোর মাঝামাঝি অবস্থায় পৌঁছালেন, তখন সাঁকোটি ভেঙে পরে গেল। প্রথম বন্ধুটি যেমন বলেছিলেন, তেমনই ভাবে তিনি জলে পরলেন না, সাঁকোর বাঁশে আটকে থাকলেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় বন্ধুটি জলে পরে গেলেন। এরই মধ্যে যখন প্রথম বন্ধুটি বাঁশ বেয়ে বেয়ে পারে যাবার চেষ্টা করছিলেন, তখন একটি বজ্রপাত হতে, সাঁকোর কাঠে আগুন লেগে গেল। ... সেই দেখে সেই প্রথম বন্ধুটি সাঁকো ধরে এগোনোর প্রয়াস ছেড়ে জলে পরে গেলেন, আর দ্বিতীয় বন্ধুটি তখন হাস্যমুখে প্রথম বন্ধুটিকে বললেন, "ভায়া বলেছিলাম না জলে পরাই যদি হিত হয়, তবে ঈশ্বর আমাকে জলেই ফেলে দেবেন"।

দ্বিতীয় বন্ধুটি বললেন, "সঠিক বলেছ ভাই, আমার বিশ্বাসেই ভ্রান্তি ছিল। ঈশ্বরকে যেন আমি নির্দেশ দিচ্ছিলাম আমার বিশ্বাসের মাধ্যমে। আমি যেন তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছিলাম যে আমাকে তিনি জলে ফেলবেন না। কিন্তু বিশ্বাস তোমারই স্থির ছিল ভাই । তুমিই বলেছিলে ঈশ্বর সেটিই করবেন যেটি তোমার জন্য হিত"।

বুঝলে পুত্রী, বিশ্বাস কাকে বলে? আমাকে পাস করিয়ে দাও, আমার অমুকের সাথে বিবাহ করিয়ে দাও, আমার অমুক চাকুরী করিয়ে দাও, এই বিশ্বাস সমূহের মধ্যে বিশ্বাস কম, ঈশ্বরকে নির্দেশনা দেওয়া অধিক থাকে; তেমনই আমার বিশ্বাস ঈশ্বর আমাকে পাস করিয়ে দেবেন, আমার বিশ্বাস ঈশ্বর আমাকে উনার সাথেই বিবাহ দেবেন, আমার বিশ্বাস ঈশ্বর আমাকে চাকরিতে বহাল রাখেবনই, এও হলো ঈশ্বরকে শর্ত দেওয়া। যেখানে শর্ত, যেখানে নির্দেশনা, সেখানে বিশ্বাস কোথায় পুত্রী?

বিশ্বাস মানে তাই, যেখানে কনো অবিশ্বাস নেই। অর্থাৎ কেমন? ঈশ্বর যেটাই করবেন, সেটাই সঠিক। আমি আমার ভালো কোথায় বুঝি! যা ঈশ্বর করবেন, সেটিই আমার জন্য শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর যখন আমাকে অপমানিত হতে দিয়েছেন, তখন আমার অপমান হওয়া আবশ্যক ছিল। ইসওরজখন আমাকে অসুস্থতা দিয়েছেন, তখন সেই অসুস্থতা আবশ্যক ছিল। ঈশ্বর যখন আমাকে আঘাত দিয়ে অবরোধ উৎপন্ন করেছেন আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে, তখন এই অবরোধ আবশ্যক ছিল। পুত্রী, একে বলে বিশ্বাস, যেখানে আমার বুদ্ধি যা বলে দিয়েছে, তাতে বিশ্বাস রাখছি আমি, অর্থাৎ অমুক চাকরি বহাল থাকবে, সম্মান হানি হবেনা, ধনলাভ হবেই হবে, এগুলি সম্মুখে থাকে, তখন তা ঈশ্বরবিশ্বাস কি করে হয়, সে তো নিজের অহংকারের উপর বিশ্বাস।

হ্যাঁ পুত্রী, এমন বিশ্বাস করার জন্য পুরুষ আগ্রহী হন এবার । সেই সাধকের অন্তরে স্থিত পুরুষ এই বিশ্বাস করতে চান, যখন তাঁর দুই প্রকার পর্যবেক্ষণই সমাপ্ত হয়, এবং তাঁর অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ও বিবেক জন্ম নিয়ে তাঁর তাণ্ডবমূর্তি স্থাপিত হতে শুরু করে । কিন্তু

মনবুদ্ধি সেই বিশ্বাস করা থেকে ভয়ানক পরিমাণ অবরোধ সৃষ্টি করে। আর সেই সময়ে যা আবশ্যক, তা হলো ভূতদের উপর অত্যাচার। আর সেই অত্যাচার করা খুব কঠিন হয়না তখন পুরুষের কাছে। কেন? কারণ প্রকৃতির উপর পুরুষের বিশ্বাস অর্পণ হয়ে গেছে একটিবার, আর বিচার বিবেক এবং অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হয়ে গেছে সেই নিরিখে, আর তাই পুরুষ নিজের লয়মূর্তিকে সেই বিশ্বাসের আধারে জাগ্রত করে নিয়েছেন।

অর্থাৎ বুঝতে পারলে পুত্রী, পুরুষের উপর জোর খাটানো সম্ভব নয়। তাই পুরুষকে দেখাতে হয় যে মনবুদ্ধি তথা সকল ভূতরাই আধিপত্য গ্রহণ করে স্বেচ্ছাচারী আর তাঁদের স্বেচ্ছাচারীতার কারণেই তিনি দুর্দশাগ্রস্ত। আর এও দেখাতে হয় যে প্রকৃতি তাঁকে অনন্ত প্রেম করেন, এবং সর্বক্ষণ তাঁর কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়াসশীল থাকেন। এই সাময়িক দৃশ্য দেখার পরে যখন এবার মনবুদ্ধি ও অন্যভূতেরা পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন, তখন ভয়নাক রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন পুরুষ, আর তা তিনি স্বয়ং করেন, কনো বাহ্যিক জোর ছাড়া।

অর্থাৎ পুরুষকে এই রুদ্রমূর্তি ধারণ করানোর জন্যই যেই সাময়িক অভ্যাস বললাম তোমাকে, তা করতে হয় সাধককে। আর একবার সেই অভ্যাসের থেকে প্রয়োজনীয় উপলব্ধি পুরুষ করে ফেললে, তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস জাগ্রত হয় প্রকৃতির প্রতি, আর সেই বিশ্বাসে আঘাত করতে ভূতরা সক্রিয় হলেই, সত্যযাত্রার জন্য আবশ্যক রুদ্রমূর্তি ধারণ করে নেন পুরুষ, স্বাভাবিক ভাবেই, যেটিই সাধকের কাম্য এবং সাধনার প্রয়োজন।

তাই এবার যেই অত্যাচার হয় ভূতদের উপর, তা বিচার ও বিবেককে দিয়েই পুরুষ করান আর অন্তর্দৃষ্টি সেই ক্রিয়ার সাক্ষী থাকেন । ... এবার তোমার প্রশ্নে আসি যে, অত্যাচার কিরূপে হবে। ... শোনো তবে, এক এক করে আমি সমস্ত ভূতের উপর কি ভাবে অত্যাচার করতে হয়, তা বলছি। পুত্রী, প্রথম অত্যাচার করতে হয় অগ্নির উপর । অগ্নিতত্ত্ব কি করে? অগ্নিতত্ত্ব উর্জ্জা প্রদান করে, আর সেই উর্জ্জার দ্বারা আমরা কি করি? পুত্রী, এতক্ষণ তুমি ব্রহ্মবিজ্ঞানকে জেনেছ, এবার কল্পঅণ্ডের বিজ্ঞানকেও জানো। ব্রহ্মবিজ্ঞানের কনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়না। যখন তা বুঝতে পেরেছ, তখন আশা করি কল্পঅণ্ডের বিজ্ঞানকে অতি সহজেই বুঝতে পারবে, কারণ তার প্রমাণ স্বয়ং তোমার জীবন।

পুত্রী, অগ্নি উর্জ্জার সঞ্চার করে, আর সেই উর্জ্জার বলে আমরা আহার করি, আমরা কল্পব্রহ্মাণ্ডে পরিশ্রম করি, আর সেই উর্জ্জা স্থির হয়ে গেলে আমরা নিদ্রা যাই। এবার দেখো পুত্রী, এই অগ্নির সাথে বা উর্জ্জার সাথে অন্য ভূতরা কেমন ভাবে জড়িত। যখন আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিনা, তখন আমাদের ক্ষুধা কম লাগে, আর তখন আমাদের মন আর বুদ্ধি কি করে? তারা ভেদভাব প্রবেশ করায় যে কি আহার করবো আর কি আহার করবোনা। তারা বলে নিরামিষ আহার করো, আমিষ খেয়ো না; তারা বলে এটা খাবো, ওটা খেতে ভালো লাগেনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার দেখো, অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে, দেহ অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্ব ক্লান্ত হয়ে যায়, আর সে ক্লান্ত হয়ে গেলে, মনবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। যতক্ষণ না সেই ক্লান্তি দূর হয়, ততক্ষণের জন্যই নিদ্রা যায় তনু, আর যখন উর্জ্জা পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে যায়, তখন স্বতঃই নিদ্রা ত্যাগ হয়ে যায়। কিন্তু যখন অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়না, তখন মন ও বুদ্ধি আলসেমো করে আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা গ্রহণ করে, আর সেই অতিরিক্ত নিদ্রা প্রাণকে নিঃশেষিত করতে শুরু করে দেয়। অর্থাৎ বুঝতে পারছো পুত্রী, কেন উর্জ্জার উপরেই প্রথম আঘাত হানতে হয়? কারণ এই উর্জ্জাকে যদি অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে মন ও বুদ্ধির কর্তৃত্বস্থাপন লঘু হয়ে যায়। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

আর এই উর্জ্জাকে অত্যাচার করবে কি ভাবে? অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে। একটি মুহূর্তের জন্য তাকে বিশ্রাম নিতে না দিয়ে। সমানে পরিশ্রম করিয়ে। যখন এমন ভাবে উর্জ্জার উপর অতিকায় পরিশ্রম হয়, তখন মন আর বুদ্ধি পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। না চাইতেও পুরুষ সঠিক সময়ে নিদ্রা যায়, এবং সঠিক সময়ে নিদ্রাত্যাগ করে। আহারের ভেদভাব চলে না তখন পুরুষের উপর, সম্মুখে যা লাভ করে, তাই গ্রহণ করে ক্ষুধার জ্বালায়, এমনকি জাতের নামে ভেদভাব করাও বন্ধ করে দেয় পুরুষ । যে-ই আহার প্রদান করে, তার হাতেই আহার, পানিয় জল, সমস্ত কিছু গ্রহণ করে।

অর্থাৎ পুত্রী, প্রথম উর্জ্জার উপর আঘাত হানতে হয়, আর সেই আঘাত হল অতিরিক্ত পরিশ্রম। নিশিতে নিদ্রা যাবার পূর্বের ক্ষণ পর্যন্ত একদণ্ডও বসতে দিতে নেই দেহকে, সমানে পরিশ্রম করিয়ে নিতে হয়। আর সেই পরিশ্রমের কারণে জন্ম নেয় প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসা এবং সঠিক সময়ে নিদ্রা, যা সমস্ত ভেদভাবের থেকে মনবুদ্ধিকে মুক্ত করে দেয়।

ভেদভাবের বেরাটপ পেরিয়ে গেলেও মন ও বুদ্ধির মধ্যে বহু সঙ্কোচ তখনও থেকে যায়। দেহের ব্যাধির প্রতি আকর্ষণ ও ভয়; প্রাণের ক্ষয়ের প্রতি আসক্তি ও ভয়; সম্পদহানির প্রতি চিন্তা এবং ভয়; সম্মানহানির প্রতি চিন্তা, আসক্তি ও ভয়। পুত্রী, এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে মন ও বুদ্ধিকে নির্গত করার একটিই উপায়, আর তা হলো সম্মুখে স্থিত ব্যাধিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কর্ম করে চলা, এবং প্রয়োজনে আহারভাবকে সহ্য করেও আহার না করা, তৃষ্ণাকে সহ্য করেও জলপান না করা, নিদ্রার ভানকে সহ্য করেও নিদ্রা না যাওয়া, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কর্ম করা, সম্পদলাভের সম্ভাবনাও যেখানে নেই সেই কর্মে যুক্ত হওয়া, সম্মানহানির সম্ভাবনা যেখানে সর্বাধিক, সেই কর্মে যুক্ত হওয়া।

এর অর্থ পুত্রী, এই যে প্রাণের সংশয়, ব্যাধির ভয়, সম্মানহানীর সংশয়, বা যেকোনো প্রকার সম্পদহানীর সংশয়, এগুলি হলো মন ও বুদ্ধির পুরুষকে শাসন করার প্রয়াস। এই সমস্ত কিছুকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুরুষকে দুর্বল করে তোলার প্রয়াস, যাতে পুরুষ আত্মচিন্তা করতে বাধ্য হয়, এবং কল্পনার অণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে বোধ করে। তাই পুত্রী, সেই সমস্ত কর্ম করে চলতে হয়, যা ব্যাধিকে সহজেই নিমন্ত্রণ দেয়, যা প্রাণকে ওষ্ঠাগত করে তোলে, যা সম্মানহানীর সম্ভাবনাকে প্রখর করে তোলে, বা যা সম্পদাহানীর সম্ভাবনাকে সহস্রগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এমন ক্রিয়ার ফল কি হবে? এমন ক্রিয়ার ফলে যা হবে তা হলো পুরুষ অবলোকন করবে যে মন ও বুদ্ধির কথিত কথা সমস্ত ভুল ও ভ্রান্ত। যেই কর্ম করলে এতকাল মনবুদ্ধি বলে আসছিল যে তাঁর ব্যাধি হবে, তা হয়না। যেই আহার করলে ব্যাধি হবে বলতো, তা আহার করেও ব্যাধি হয়না; স্বল্প নিদ্রা গেলে অসুস্থ হবে বলতো, তাও হয়না; আবার অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে অসুস্থ হবে বলতো, তাও হয়না।

একই ভাবে পুরুষ এও প্রত্যক্ষ করে যে সম্মানহানী হলেও তার কনো কিছু এসে যায়না, কনো ক্ষতি হয়না, আবার সম্পদহানী হলেও তাঁর কাছে যা ক্ষয় হয়, তা বা তার থেকে অধিকই এসে যায়। এই সমস্ত কিছু দেখার শেষে পুরুষ সহজেই এই মীমাংসায় আসতে পারেন যে, মন ও বুদ্ধি, তাঁকে ও বাকি ভূতদের এতকাল ভ্রমিত করে চলেছিল, অসত্য বলে চলেছিল। শুধু তাই নয়, পুরুষ এও উপলব্ধি করে যে, এই কঠোর অনুশীলনের ফলে, তাঁর অসুস্থ হওয়াই উচিত ছিল।

যেমন ধরো প্রতিদিন ২ই ঘণ্টা করে নিদ্রা, বা ২ই দিন পরে ৬য় ঘণ্টা নিদ্রা, বা তিন দিন পরে ৮ ঘণ্টা নিদ্রা। পুত্রী, এই উপমা শুনেই তোমার পুরুষের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হচ্ছে, কারণ মনবুদ্ধি তাঁকে এই বুঝিয়ে রেখেছে যে প্রতিদিন, সমস্ত দিনের তিন ভাগের একটি ভাগ তাঁকে নিদ্রিত হয়ে কাটাতে হবে, তবেই তিনি সুস্থ থাকবেন। কিন্তু পুত্রী, আমি স্বয়ং এই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে গেছি, আমি তো এখনো জীবিত, তাই না! ... আমার দেহ এখনো সুস্থ, তাই না! ... আর সেই অভ্যাসের পরে আমাকে আমার আরাধ্যা সমাধিও উপহার দিয়েছেন। তাহলে?

এর অর্থ এই যে, পুরুষ দেখেন মনবুদ্ধির কথা অনুসারে চললে, তাঁর তো অসুস্থ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে জীবিত ও সুস্থ রেখে দিয়েছে। আর এই ভাবে প্রকৃতির প্রতি সেই বিশ্বাসের জন্ম হয়, যার মধ্যে সামান্য প্রকার অবিশ্বাসও থাকেনা। ... পুত্রী, এই বিশ্বাস কখনোই একদিনে স্থাপিত হয়না। আর এই বিশ্বাস স্থাপিত হলে এক নতুন দরজা খুলে যায় পুরুষের জন্য । কি সেই দরজা? এবার তোমাকে সেই কথা বলবো পুত্রী।

পঞ্চভাববিস্তার

পুত্রী, যেই বিশ্বাসের কথা বললাম, যার মধ্যে কনো অবিশ্বাসের স্থানও থাকেনা, তা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে থাকে। ক্রমে ক্রমে, পুরুষের অহংকারের প্রতি বিশ্বাস, যাকে বলা হয় আত্মবিশ্বাস, তার নাশ হতে থাকে, কারণ তিনি পূর্বে যেই অনুশীলন বলেছিলাম, সেই অনুশীলন অনুসারে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন যে তাঁর ভূতেরা তাঁকে দিশা দেয়না, বরং বিভ্রান্ত করে প্রতারণা করেন।

পূর্বেই বলেছিলাম তোমাকে পুত্রী যে পুরুষ এক নিজের অহংকারের প্রতি এবং দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রতি আসক্ত। নিয়মিত ভূতদের দমন করার ক্রিয়ার থেকে পুরুষ এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, তাঁর অহংকারকে ভূতেরা যথার্থ মার্গ প্রদান করেনা, উপরন্তু প্রকৃতিই তাঁকে

সম্মার্গ প্রদান করে, যার কারণে তাঁর সমস্ত অহংকার অক্ষুণ্ণ থাকে। আর এর থেকে তাঁর ভূতদের প্রতি আসক্তি চলে যেতে থাকে, আর প্রকৃতির প্রতি আসক্তি দৃঢ় হতে থাকে।

আর সেই আসক্তি ক্রমাগত তাঁর প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে। প্রথমত তাঁর মধ্যে এমন বিশ্বাস ক্রিয়া করে যে, তাঁর অহংকার, অর্থাৎ তাঁর সম্মানসুখ, তাঁর দেহসুখ, তাঁর প্রাণসুখ ইত্যাদির যত্ন নেবেন প্রকৃতি। কিন্তু ক্রমে তিনি অবলোকন করেন যে, সেই সুখকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হলে, পরবর্তীতে তাঁর সুখ বিনষ্টই হয়ে যাচ্ছে। তাই বিশ্বাসকে সেই অবস্থার থেকে উন্নীত করতে, পুরুষ এবার অধিক বিশ্বাস করে প্রকৃতির উপর, এবং এমন ভাব স্থাপন করেন যে, প্রকৃতি তাঁর কল্যাণই করবেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রেও, পুরুষ নিজের কল্যাণের যথার্থতাকে সনাক্ত করতে অক্ষম হন। তিনি যাকে নিজের কল্যাণ মনে করেন, যেমন তাঁকে সম্মান কেউ না করলেও অপমান কেউ করবেন না, তাঁর দেহসুখের প্রয়াস কেউ না করলেও দেহসুখকে খণ্ডন কেউ করবেন না, বা তাঁকে ধনবৃদ্ধি করতে না দিলেও তাঁর ধনক্ষয় কেউ করবেনা, সেগুলিও ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। অর্থাৎ তাঁর ধনক্ষয় হয়, তাঁর অপমান হয়, তাঁর দেহসুখেরও হনন হয়।

এর কারণে পুরুষ সামান্য আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতি রুষ্টও হন, কিন্তু কিছু সময় জ্ঞাপন হবার পর তিনি দেখেন যে সেইদিন তাঁর অপমান হওয়ার ফলে, তিনি যেই স্থানে অপমানিত হন, সেই স্থান থেকে বিরত থাকেন, আর তাতে তাঁর শান্তি অক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে, বা বৃহত্তর বিপদ থেকে তিনি রক্ষা পান । একই ভাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর দেহসুখের হনন হবার পরে, তিনি যেইস্থানে তাঁর দেহসুখের হনন করা হয়েছে, তার থেকে বিরত থাকেন, আর এর ফলে তাঁর দেহবিকাশ অক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে। একইভাবে ধন, সমৃদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষ দেখেন যে, প্রকৃতি তাঁকে যেই অপমান বা ইত্যাদি ক্ষয়ের সম্মুখীন করেছিলেন, তার কারণে বাস্তবিক ভাবে তাঁর সমস্ত ক্ষয় রোধ হয়ে গেছে, বা বিস্তারিত ক্ষয়ের থেকে তিনি রক্ষা লাভ করেছেন ।

পুত্রী এমন সকলের ক্ষেত্রেই হয়, কিন্তু যিনি পূর্বের কথিত অনুশীলন করেন, তাঁর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ও বিবেকের সঞ্চার হওয়ায় তিনিই এই প্রকৃতির নেওয়া যত্নকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এ যেন, এক মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের বিস্তার, এ যেন এক পত্নী ও পতির সম্পর্কের বিস্তার। যেমন করে এক শিশু সন্তানের কাছে তাঁর মাতার শব্দ প্রথমে মনে হয় তাঁকে বিরোধিতা করার শব্দ, কিন্তু কিছুপরে তাঁর এই বোধ হয় যে মাতা যা বলেছিলেন, তা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধিতা হলেও সেই কথাই হিতকর; যেমন করে একই ভাবে এক স্বামীর মনে হয় যে তাঁর স্ত্রীর বচন তাঁর বিরোধ করার উদ্দেশ্যেই কথিত, কিন্তু সামান্য সময়ক্ষয়ের পর তাঁর মনে হয় যে তাঁর স্ত্রী তাঁর হিতের উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলেছিলেন; তেমনই পুরুষের প্রকৃতির ক্ষেত্রে বোধ হয়।

আর যখন সেই বোধকে অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ও বিবেক পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে স্থিত করে দেয়, তখন পুরুষের বিশ্বাস প্রকৃতির প্রতি সেই স্তরে উন্নীত হয়ে, যেই স্তরে উন্নীত হবার পরে, সামান্যও অবিশ্বাস আর অবশিষ্ট থাকেনা পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি । তখন পুরুষ এই বিশ্বাস অর্পণ করতে শুরু করেন প্রকৃতির প্রতি যে, প্রকৃতি যা কিছু করছেন, তা তাঁর হিতের জন্যই করছেন, সম্মান দিলেও

তা হিতের উদ্দেশ্যে করছেন, আর অসম্মান করলেও; ধন প্রদান করলেও তা হিত, ধন ক্ষয় করালেও তা হিত, সুখ দিলেও হিত, দুঃখ দিলেও হিত। কিভাবে?

যখন প্রকৃতির নির্দেশনা অনুসারে চলে সম্মান আসছে, পুরুষ উপলব্ধি করেন যে সেই স্থানে তাঁর কিছু ভূমিকা আছে করার মত, তাঁর কনো দায়িত্বপালন আছে; আবার যখন অসম্মান আসে, তখন পুরুষ উপলব্ধি করেন যে, সেই স্থান থেকে প্রকৃতি তাঁকে সরে থাকার শিক্ষা বা প্রেরণা প্রদান করছেন । একই ভাবে যেখানেই সুখলাভ সেখানেই দায়িত্বপালন, এবং যেখানেই দুঃখলাভ, সেখান থেকেই অপসারণ; যেখান থেকে ধনলাভ, সেখানে দায়িত্বপালন, আর যেখানে ধনক্ষয়, সেখান থেকে অপসারণ। আর এই ভাবে প্রকৃতির প্রতিটি দানকে জীবনের শিক্ষারূপে গ্রহণ করতে শুরু করেন পুরুষ।

আর যতই তা করতে থাকেন, ততই এই বিশ্বাস জন্ম নেয় পুরুষের মধ্যে যে, প্রকৃতি সর্বদা তাঁর হিতচিন্তাতেই স্থিতা। প্রত্যক্ষ ভাবে যা কিছু মনে হয় তাঁর অহিত, তাকে অহিত মেনে নেওয়াই হলো মূর্খতা, কারণ সেই অহিতও প্রকৃতির থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা; আর প্রত্যক্ষ ভাবে যাকিছু মনে হয় হিত, সেই হিতের থেকে সুখকে অন্বেষণ করাও মুর্খামি, কারণ প্রকৃতি সেই সুখ প্রদান করে তাঁকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

আর এই বিশ্বাস যখন নিজের সম্পূর্ণ উচ্চতায় যাত্রা করে, তখন সেই ভাবের সঞ্চার হয়ে যায় যেখানে, প্রকৃতির প্রতি এমন বিশ্বাস অর্পণ করেন পুরুষ, যাতে অবিশ্বাসের কনো স্থানই নেই। অর্থাৎ এই ভাবের উদয় যে, যা কিছু হয়ে চলেছে, তা প্রকৃতির দ্বারাই প্রস্তুত করা হচ্ছে, আর যা উচিত, যা ন্যায়, যা সঠিক, যা বৃহত্তর হিতের, তাই হয়ে চলেছে । তখন পুরুষের মধ্য থেকে সমস্ত ভেদভাব দূর হয়ে যায়। যা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, তাকেই তিনি তখন গ্রহণ করেন, তা আহার হলে আহার, নিদ্রার পরিমাণ হলেন নিদ্রার পরিমাণ, বিবাহের পাত্রপাত্রী হলে বিবাহের পাত্রপাত্রী, সুখ হলে সুখ, দুঃখ হলে দুঃখ, প্রাপ্তি হলে প্রাপ্তি, ক্ষয় হলে ক্ষয়।

তখন আর ক্ষয় হলে পুরুষ চিন্তিত হননা, কারণ তাঁর বিশ্বাস তাঁকে বলে এই ক্ষয় আবশ্যক, তাই প্রকৃতি সেই ক্ষয়কে সম্পাদিত হতে দিয়েছেন। তখন আর অপমানকে নিয়ে চিন্তিত হননা পুরুষ, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে এই অপমান আবশ্যক ছিল, তাই তা হতে পেরেছে। ... আর যখন বিশ্বাস এমন স্থানে উন্নিত হয়, তখন পুরুষের কাছে এক অজানা দরজা চিরতরের জন্য খুলে যায়, আর সেই দরজা হলো ইরার দরজা।

পুত্রী, পূর্বেই তোমাকে বলেছিলাম, কল্পঅণ্ডের সূক্ষ্মস্তরের সুষুম্নাকাণ্ডে সপ্তসূক্ষ্মশরীরের বন্ধন থাকে, যার মধ্যে বিকার, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এবং পঞ্চভূতকে যথাক্রমে প্রথমদেহে বা মূলাধারে, দ্বিতীয়দেহে বা স্বাধিষ্ঠানে এবং তৃতীয়দেহে বা মনিপুরে স্থাপিত করলে তবেই প্রকৃতির ত্রিদেবীরূপের কাছে উপস্থিত হওয়া যায়, যারা চতুর্থ অর্থাৎ অনাহতে, পঞ্চম অর্থাৎ বিশুদ্ধে, এবং ষষ্ঠম অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে আত্মগোপন করে থাকেন পুরুষকে সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করানোর জন্য। সেই সুষুম্নাকে দুটি সূক্ষ্মনাড়ি ভারসম্যে স্থিত করে রেখে দিলে, তবেই বিকারদের, চতুর্বিংশতি তত্ত্বদের এবং ভূতদের যথাস্থানে স্থাপনা করা সম্ভব হয়।

এঁদের মধ্যে প্রথম নাড়ি হলো পুরুষের প্রবাহধারা অর্থাৎ পিঙ্গলা, যা একটি ব্রহ্মাণ্ডে সর্বক্ষণ জাগ্রতই থাকে, আর তার জাগ্রত থাকার কারণে এই সুষুম্না কখনোই ভারসম্যে স্থিত থাকেনা আর তাই সূক্ষ্মের অনুভূতিও পুরুষ করতে পারেন না। ভারসম্যে থাকেন না কেন? ইরা পিঙ্গলা উভয়ে জাগ্রত হলে, তবেই তারা দুই দিক থেকে সুষুম্নাকে সাম্যতা প্রদান করেন, কিন্তু পিঙ্গলা একাকী জাগ্রত থাকার কারণে, সুষুম্না সেই সাম্যতা কিছুতেই লাভ করতে সক্ষম হয়না।

যেই বিশ্বাসের কথা বললাম, অর্থাৎ এমন বিশ্বাস যার মধ্যে কনো প্রকার অবিশ্বাস নেই, কনো প্রকার বেদনা নেই, কনো প্রকার সন্দেহ নেই, কনো প্রকার দাসত্ব বোধ নেই, বরং সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা থাকে যে যা কিছু হচ্ছে, তাই হিত; যা হয়নি তাই অহিত, তখনই এবং একমাত্র তখনই ইরা জাগ্রত হন, এবং সুষুম্না ভারসম্যতা লাভ করতে শুরু করে। আর দরজা খুলে যাবার কথা বললাম কেন? কারণ ইরা যেই মুহূর্তে জাগ্রত হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে কুণ্ডলিনীর দ্বার উন্মোচিত হবার অবস্থায় চলে আসে, আর তা হলেই বিকার, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আর ভূতরা নিজের নিজের স্থানে স্থাপিত হয়ে, পুরুষকে অনাহততে উপস্থিত হবার মার্গ প্রদান করতে থাকে।

আর পুত্রী, এরপর থেকেই শুরু হয় সাধনা। এখানে আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তোমায় পুত্রী, এমন একটিবারের জন্যও ভেবো না যে প্রকৃতি কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু করেন। প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় ভ্রমিত নন, তাই তিনি কর্তাভাবে ভাবাপন্ন থাকেন না। পুরুষই ভ্রমিত, আর তাই তাঁর মধ্যে কর্তাভাবের প্রকাশ সর্বক্ষণ থাকে। প্রথমে তিনি নিজেকে কর্তা জ্ঞান করতেন, এবং ভূত, বিকারদের নিয়ে কর্তা হবার প্রয়াস করতেন, আর পরে এঁদের উপর অবিশ্বাস জন্ম নিলে, প্রকৃতিকেই কর্তা জ্ঞান করেন।

বাস্তবে প্রকৃতি কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু করেন না, পুরুষই প্রকৃতির প্রতি আসক্তির কারণে, কর্তাভাব থেকে সরে আসেন, আর যেই মুহূর্তে সরে আসেন, সেই মুহূর্তে বিশ্বাসের জন্ম হয়। অর্থাৎ পুত্রী যতক্ষণ কর্তাভাব, ততক্ষণই আবেগদের আনাগোনা লেগে থাকে, আর যেই মুহূর্তে কর্তাভাবের নাশ হয়, সেই মুহূর্ত হতেই শুরু হয় ভাবের উন্নতি, আর যতই ভাবের উন্নতি হয়, ততই সাধনার সূত্রপাত হয়, আর সাধনার সূত্রপাতের অর্থই ইরার জাগরণ, কুণ্ডলিনী দ্বারের উন্মোচন, এবং বিকার, তত্ত্ব এবং ভূতদের মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে এবং মনিপুরে স্থাপন।

যেই মুহূর্তে তা হয়ে যায়, ভৌতিক জগতের ভেদভাব সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষীণ এবং লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। আহারের ভেদভাব, জাতের ভেদভাব, কুলের ভেদভাব, সম্প্রদায়ের ভেদভাব, লিঙ্গের ভেদভাব সামান্য থেকে সামান্য প্রকারেও প্রভাব সঞ্চার করা বন্ধ করে দেয় তখন, এমনকি সেই সংক্রান্ত বিচারও আর পুরুষের মধ্যে স্থান পায়না । কিন্তু তখনও জ্ঞানের ভেদভাব, সামর্থ্যের ভেদভাব এবং প্রতিভার ভেদভাব উপস্থিত থাকে সাধকের মধ্যে। তাই সাধক সেই সময়ে জাতির ভেদ, আহারের ভেদ, কুলের ভেদ, লিঙ্গের ভেদ না করলেও, অমুক জ্ঞানী, অমুক অজ্ঞানী, এই ভেদ রাখেন নিজের মধ্যে; তখনও পুরুষ অমুক প্রতিভাশালী, অমুক প্রতিভা হীন, এই ভেদভাবকে নিজের মধ্যে জীবিত রাখেন; তখনও পুরুষ নিজের মধ্যে অমুকের সামর্থ্য নেই, অমুকের সামর্থ্য আছে, এই ভেদ করতে থাকেন।

আর সেই ভেদের বিনাশ হয়, সাধনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, অর্থাৎ অনাহতে, বিশুদ্ধে এবং আজ্ঞাতে যাত্রা করার পরেই, আর সেখানে যাত্রা সম্ভব হয় ভাবের বিকাশের ফলেই । বিশ্বাসের বিকাশ হলে বৈরাগ্য স্থাপিত এবং ক্রমবিকশিত হয়, আর বৈরাগ্য পূর্ণবিকাশ লাভ করলে অনাহত জাগ্রত হয়; বৈরাগ্যের বিকাশ হলে ভক্তির স্থাপনা হয় এবং শুদ্ধিকরণ হয়, এবং ভক্তি শুদ্ধতার পরাকাষ্ঠায় স্থাপিত হলে বিশুদ্ধ জাগ্রত হয়; ভক্তি নিজের চরম সীমায় স্থাপিত হলে, প্রেমের সঞ্চার হয়, এবং এই প্রেম যখন নিজের অন্তিম সীমায় উন্নীত হয়, তখন আজ্ঞাচক্রের জাগরণ হয়, আর এও জেনে রেখো যে, কনো আচার, অনুষ্ঠান, অভ্যাস বা অধ্যাবশায় এই তিন চক্রকে জাগ্রত করার সামর্থ্য ধরে না।

পুত্রী, বৈরাগ্যের জাগরণ হলে অনাহততে প্রকৃতির বিদ্যারূপকে পুনরায় লাভ করেন পুরুষ এবং তাঁর জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ বিনষ্ট হতে শুরু করে; ভক্তির জাগরণ হলে বিশুদ্ধে প্রকৃতির শ্রীরূপকে পুনরায় লাভ করেন পুরুষ এবং তাঁর প্রতিভাবাণ -প্রতিভাহীন বৈষম্যতার নাশ হয়; এবং প্রেমের জাগরণ হলে আজ্ঞাচক্রে প্রকৃতির শক্তিরূপকে পুনরায় লাভ করেন পুরুষ এবং তাঁর সামর্থ্যবাণ এবং সামর্থ্যহীনের ভেদভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। আর পুত্রী, এই তিনের পূর্ণজাগরণের পরেই পুরুষ যাত্রা করেন জীবকটির অন্তিম সূক্ষ্মদেহের স্তরে অর্থাৎ সহস্রারে। তবে সেই যাত্রা এক মহাযাত্রা। সেই যাত্রাতে যাবার পূর্বে, এই তিন অবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুধাবন করে নেওয়া আবশ্যক"।

দেবী দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "পিতা, বৈরাগ্য কি? আর বৈরাগ্য জাগরণের ফলে কেন প্রকৃতির বিদ্যারূপ প্রকাশিত হন? আর সেই সাথে সাথে কেনই বা জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদভাব বিনষ্ট হয়? ভক্তির শুদ্ধতম অবস্থাই বা কি? আর তার জাগরণের ফলে কেন প্রকৃতির শ্রীরূপ পুনঃপ্রকাশিতা হন? আর তাঁর আবির্ভাবের ফলে কেনই বা প্রতিভাসম্পন্নতার ভেদ নষ্ট হয়ে যায়? প্রেমই বা কি? আর এর জাগরণের ফলে কেনই বা শক্তি প্রকাশিত হন পুনরায়? আর তাঁর প্রকাশের ফলে কেনই বা সামর্থ্যবানের ভেদভাব সমাপ্ত হয়ে যায়? এই কথা বিস্তারে বলুন আমাকে পিতা"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন তৃপ্ত হৃদয়ে বললেন, "পুত্রী, বিশ্বাস কখন চরম স্তরে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবিশ্বাসশূন্য অবস্থায় উন্নীত হয়, সেই সমস্ত কথা তোমাকে ব্যক্ত করলাম। যখন কনো প্রকার অবিশ্বাস বিশ্বাসে স্থিত থাকেনা, এবং প্রাকৃতিক ভাবে যা কিছু আসে, তা ক্ষয় হোক বা প্রাপ্তি, তাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করে নেয় পুরুষ, তখন ভূতগণ নিজেদের আধিপত্য হারিয়ে ফেলে পুরুষের উপর, কারণ পুরুষ তাঁদের প্রতি আর আসক্ত থাকেনা, আর তাঁদের সিদ্ধান্তের প্রতি বা বিচারের প্রতি বিশ্বাস অর্পণও করেন না। ভূতেরা যখন বিনম্র হয়ে আজ্ঞাবাহক হয়ে ওঠেন, নিজেদের স্বাভাবিক ঔধ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন বিকাররাও আর ভূতের সাথে সংযুক্ত থেকে কনো ফল পায়না, আর তাই তাঁরা সকলেই স্থিত হতে সচেষ্ট হয়।

আর সেই কারণে সমস্ত ভূত, সমস্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এবং সমস্ত বিকার যথাক্রমে মনিপুর, স্বাধিষ্ঠান এবং মূলাধারে স্থিত হয়ে যান, এবং পুরুষকে অনাহতে যাত্রা করার পথ প্রদান করে দেন। আর পুরুষের প্রকৃতির উপর বিশ্বাসও ক্রমে ক্রমে এমন এক স্তরে উন্নীত

হয়ে ওঠে, যেখানে স্থিত হয়ে তাঁর কাছে মান অপমান, সুখ দুঃখ সমস্ত কিছু সমান হয়ে উঠতে থাকে, আর তিনি আসক্তি বিরক্তি উভয়কেই আসক্তি বলে চিহ্নিত করে ফেলেন।

পুত্রী, এই সমস্ত কিছু অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়তেই হয়। তাই সাধককে কিছু যে করতে হয়, তা নয়। সাধককে কেবল প্রথমক্ষেত্রে ভূতদের শাসন করতে হয়, এবং প্রয়োজনে অত্যাচারও করতে হয়, যেমন বলেছিলাম। তারপর পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ভাবেই ভূতদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায় এবং প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাস। এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা চরম সীমায় উত্তীর্ণ হতে হতে এমন সীমায় উপস্থিত হয়, যেখানে আর কনো অবিশ্বাসই, কনো আশঙ্কাই, কনো অনীহাই বিশ্বাসের মধ্যে স্থান পায়না, অর্থাৎ পুরুষ তখন এমন একটিবারের জন্যও মনে করেন না যে প্রকৃতির বিধান, কি আর করা যেতে পারে, মেনে নিতে হবে।

পুত্রী, এই ভাব, অর্থাৎ মেনে নিতে হবে, এটি বিশ্বাস তো নয়ই, তা হলো চরম ভাবে অবিশ্বাস, কারণ এই অবিশ্বাসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি দ্বেষও যুক্ত থাকে, এবং তাঁর শাসনের প্রতি অনীহাও যুক্ত থাকে। তাই পুত্রী, এমন ভেবো না যে প্রকৃতির শাসনকে মানতে না ইচ্ছা করেও যদি মানা হয়, তা বিশ্বাস। তা বিশ্বাস তো নয়ই, উপরন্তু তা চরম ধারার অবিশ্বাস। বিশ্বাসের অর্থ আস্থা, প্রাকৃতিক ভাবে যা উপস্থিত হয়েছে সম্মুখে, তাতেই আমার হিত, তাতে আমার মূর্খতাপূর্ণ বিচার সায় দিক আর না দিক, সেটিই সঠিক।

বিশ্বাস মানে এই যে, আমার বিচার অত্যন্ত হীন এবং ক্ষীণ। সে কি নিজের ভালো বোঝে? নিজের ভালোই বঝেনা নে, সে কি করে বলতে পারে যে কোনটিতে তার হিত আর কিসে তার অহিত! ... বিশ্বাস মানে এই যে, কেন প্রকৃতি এমন করলেন, তা যদি আমার বোঝার সামর্থ্য থাকতো, তবে প্রকৃতি নিশ্চয়ই তা আমাকে বুঝিয়ে দিতেন । তা আমাকে বোঝালেও আমার বোঝার সামর্থ্য নেই, তাই বোঝালেন না। সময়ের সাথে সাথে আমার মধ্যে যদি সেই সামর্থ্যের উদয় হয়, তবে আমাকে প্রকৃতি নিশ্চয়ই এর অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু অর্থ বুঝতে পারিনি বলে, প্রকৃতির বিধান ভ্রান্ত, তা কিছুতেই হতে পারে না। তিনি আমার অত্যন্ত আপন, আর তাই তিনি এমন কিছু করেন না, যাতে আমার অহিত হয়। আমার মূর্খতা সেই হিতকে অনুধাবন করতে পারেনা বলেই তার বিরোধ করে, যখন মূর্খতা দূর হবে, তখন হিতও অনুধাবিত হয়ে যাবে।

এই হলো সেই অখণ্ড বিশ্বাস পুত্রী, যা ইরাকে জাগ্রত করে দেয়, কুণ্ডলিনীরূপ দ্বারকে উন্মোচিত করে দেয়, এবং ভূত, তত্ত্ব তথা বিকারদের যথাস্থানে অবস্থিত করে দেয়। আর একবার যখন এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়ে যায় পুরুষের মধ্যে, প্রাকৃতিক ভাবেই এই বিশ্বাসের থেকে একটি অন্য ভাবের জন্ম হয়, যার নাম বৈরাগ্য। আসক্তিকে তো পূর্বেই পুরুষ নিজের শত্রু বলে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন কারণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে নিজের মূর্খতার প্রতি আসক্তির কারণেই তিনি প্রকৃতির অনন্ত স্নেহকে লাভ করেও তা প্রত্যাখ্যান করছিলেন। কিন্তু এবার এই ভাবের কারণে পুরুষ, বিরক্তিকেও আসক্তি বলেই চিহ্নিত করেন।

তিনি আবিষ্কার করেন যে, যা কিছুর প্রতি তিনি আসক্ত, সেই সমস্ত কিছুর প্রতি সন্তুষ্টিজনক ফল না লাভ করলেই, তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। অন্তর্দৃষ্টি, বিচার ও বিবেক তাঁর কাছে এই সত্যতাকে স্পষ্ট করে দেয়, আর প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের কারণে তাই তিনি

বিরক্তিকেও এবার আসক্তি বলে চিহ্নিত করেন, এবং আসক্তি বিরক্তি দুইয়ের থেকেই মুক্ত হতে শুরু করেন। বিশ্বাসেরই পরিণত রূপ এটি পুত্রী। প্রকৃতির প্রতি পূর্ণবিশ্বাস পুরুষকে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকেই হিতকররূপে মানতে শেখায়, আর সেই শিক্ষার কারণেই আসক্তি ও বিরক্তি উভয়ই পুরুষের থেকে বিদায় গ্রহণ করে, বৈরাগ্যের সঞ্চার করে পুরুষের মধ্যে।

আর যখনই তা হয়, তখনই পুরুষ প্রত্যক্ষ করেন যে তাঁর মধ্যে সত্যের এক নতুন বিবরণের সঞ্চার হচ্ছে। তাঁর মানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে প্রকৃতিই সেই ঈশ্বরী, যিনি সমস্ত কিছুকে সুবন্দোবস্ত করে রেখে দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়ের সত্যতা, ভূতদের সত্যতা সমস্ত কিছুই যেন অনাহততে অঙ্কিত হয়ে আছে, এমনকি পুরুষ এও প্রত্যক্ষ করেন যে অনাহত থেকে স্বয়ং তাঁরও সঞ্চার হচ্ছে। ক্রমে সেই সমস্ত কিছু মেলালে, পুরুষ উপলব্ধি করেন যে সমস্ত কিছুর উৎস যেন এই অনাহতই, আর যখন সেই উপলব্ধি চরমে উন্নীত হয়, তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হয়ে যায়।

ইন্দ্রিয়রা অন্তর্মুখী হয়ে উঠলে, প্রথমে দেহের অন্তরের সমস্ত অঙ্গকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি প্রথমবারের মতন, আর ক্রমে এমনও অনুভব করেন যে, তিনি নিজের দেহাভ্যন্তরের সমস্ত কিছুকে নিজে নিজেই সঠিক করতেও পারছেন। বৈরাগ্য যখন সঠিক সঠিক ভাবে তাঁর আসক্তি ও বিরক্তি, দুইকেই প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তখন দেহের থেকে অন্তরে মনের ২৭টি বিচ্ছিন্ন অবস্থারও প্রত্যক্ষ করেন তিনি, এবং তাঁদেরকে নক্ষত্র রূপে আখ্যা দেন। শুধু তাই নয়, এই মনের ২৭টি অবস্থার উপরে বুদ্ধি তথা অন্যভূতরাও প্রভাব বিস্তার করেন, আর তার থেকে ৯য়টি অবস্থার সঞ্চার হয়, যারা একে অপরের সাথে বিবিধ পক্রিয়াতে মিশ্রিত হয়ে, সৃষ্টি করতো তাঁর সম্পূর্ণ চরিত্রকে।

এই মহাজ্ঞানকে লাভ করে, পুরুষ আপ্লুত হন, এবং যখন এই জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাদেরকে একত্রিত করে নাড়ি বিজ্ঞান বা জ্যোতিষের সাথে সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যেতে দেখেন। আর তখন তিনি একটি মীমাংসায় আসেন যে, জ্ঞান গ্রন্থ বা পুঁথি পড়ে লাভ করা যায়না। গ্রন্থ, পুথি বা বচন কেবলই জ্ঞানের প্রভা, আর তাকেই তিনি এতকাল মূর্খের মত জ্ঞান ভেবে এসেছেন। যেমন করে বাহ্য জগতে পৃথিবী কেবলই সূর্যের প্রভাকে লাভ করেন, আর সেই প্রভা অর্থাৎ রৌদ্রকেই সূর্য বলে ভেবে নিয়ে ভ্রমিত থাকে, পুরুষ উপলব্ধি করেন যে, তিনিও এতকাল এই জ্ঞানের প্রভা, অর্থাৎ পুঁথি, বিদ্যা, এবং বচনকেই জ্ঞান মেনে আসছিলেন, আর ভ্রম বশত ভেবে ফিরছিলেন যে, যিনি পুথি পাঠ করেছেন, তিনিই জ্ঞানী, অন্যরা অজ্ঞানী।

কিন্তু এবার তাঁর এই বোধ জন্ম নেয় যে, জ্ঞান তো সকলেরই অন্তরে অঙ্কিত। যিনিই অনাহত পর্যন্ত স্থাপিত হতে পারেন বিশ্বাস এবং বৈরাগ্যকে ধারণ করে, ইরাকে জাগ্রত করে, ভূত তত্ত্ব এবং বিকারদের যথাস্থানে স্থাপিত করে, তিনিই এই অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। আর এই উপলব্ধি তাঁর অন্তর থেকে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদকে সমাপ্ত করতে শুরু করে। তিনি তখন বলতে শুরু করেন, সকলে সকল কিছু জানেন, ভ্রমের বশে বাহ্যে সেই জ্ঞানের সন্ধান করছেন, পুথিতে, বচনে, বা গ্রন্থে, তাই স্বেচ্ছায় অজ্ঞানী হয়ে উপস্থাপন করছেন।

তিনি তখন বলতে শুরু করেন যে, যে যে যখন যখন অন্তর্মুখী হয়ে, বিশ্বাস এবং বৈরাগ্যকে সঠিক সঠিক ভাবে স্থাপিত করে ইরাকে জাগ্রত করবেন, তিনিই জ্ঞানের অধিকারী। সকলেই সেই জ্ঞানের অধিকারী, যিনি নিজের অধিকারকে প্রয়োগ করে, সেই জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, তিনিই জ্ঞানী, আর যিনি তা করেননি, তিনিই অজ্ঞানী, তা তিনি যতই গ্রন্থ পড়ুন, পুঁথি বা শাস্ত্র পড়ুন আর যতই মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ করুন । কিন্তু যারা অজ্ঞানী, তাঁরাও সেই জ্ঞান অর্জনের অধিকারী, আর সেই অধিকার লাভ করার জন্য কারুর দ্বারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারুর মন্তব্য শ্রবণ করার প্রয়োজন নেই, কারুর মতবাদকে ধারণ করার প্রয়োজন নেই, সেই জ্ঞান সবার অন্তরে সুরক্ষিত ভাবে অনাহততে রাখা আছে।

যখন এই সম্পূর্ণ বোধ তাঁর মধ্যে উদিত হয়, তখন তিনি অনাহত থেকেই অনাহত ওঁকার শ্রবণ করেন এবং প্রকৃতির শুভ্র আলোকে অবগাহন করে পূর্ণভাবে স্নান করেন এবং যেই পবিত্রতার আস্বাদন করেন তিনি, তার আস্বাদন করে তিনি প্রকৃতির বৈরাগ্যস্বরূপ অর্থাৎ বিদ্যাধারার পূর্ণ স্বাদ লাভ করেন, এবং তাঁর প্রকৃতির সন্ধান যে এতকালে সঠিক দিশায় যাত্রা করেছে, তা তিনি প্রত্যক্ষ করেন।

এই হলো পুত্রী বৈরাগ্য জাগরণের সম্পূর্ণ বিবরণ, আর এই দ্বিতীয় ভাব এবার উন্নীত হতে থাকে, এবং ভক্তিকে শুদ্ধতা প্রদান করে। আর যখন শুদ্ধতা জাগ্রত হয় ভক্তির, তখন পুরুষ উপলব্ধি করতে পারেন যে, যতক্ষণ তিনি বাহ্যজগতে আবদ্ধ ছিলেন এবং ভূতদের দ্বারা পরিচালিত হতেন, ততদিন যাকে তিনি ভক্তি বলতেন, তা ভক্তি নয়, তা কেবলই প্রকৃতির উপর ব্যবিচার ছিল। এই ভক্তিও বৈরাগ্যেরই পরিবর্তিত রূপ পুত্রী, পৃথক কনো ভাব নয়।

বৈরাগ্য যখন চরম সীমায় উন্নীত হয়ে, সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করে ফেলে, তখন পুরুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে যার যা কিছু প্রতিভা, তা তিনি প্রকৃতির থেকেই লাভ করেন, আর তা না জেনে তিনি বৃথা এমন ভেবে চলেন যে তিনি স্বয়ং সেই প্রতিভা অর্জন করেছেন। কেন এমন বোধ করেন পুরুষ? একটি সময় ছিল যখন পুরুষ বাহ্যজগতেই আবদ্ধ ছিলেন, ভূতদের দ্বারা পরিচালিত হতেন। তখন তিনি এই ধারণা রাখতেন যে আসক্তি ও বিরক্তির দ্বারাই তিনি নিজের সংস্কারকে গঠিত করেছেন, এবং সেই সংস্কারের মাধ্যমেই তিনি নিজের প্রতিভাকে প্রকাশিত করেছেন।

কিন্তু এই বৈরাগ্য অর্জন করার পরে, যখন তিনি সমস্ত আসক্তি ও বিরক্তির থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, তখন তিনি অবলোকন করলেন যে তিনি সেই সমস্ত প্রতিভার দ্বারা প্রতিভাশালী হয়ে উঠেছেন, যেই প্রতিভাদের তিনি কনোদিন পূর্বে সনাক্তও করেননি, এমনকি সেই প্রতিভাদের বিকশিত করার জন্য তিনি অন্য কনো পুরুষের থেকে প্রশিক্ষণও নেননি। প্রথমে তিনি সেই প্রতিভাদের প্রত্যক্ষ করে বিচলিত হয়ে ওঠেন।

কি ভাবে সেই সমস্ত প্রতিভা তাঁর মধ্যে স্থাপিত হলো, সেই বিচার করার প্রয়াস করেন, কিন্তু কনো কারণকেই তিনি সনাক্ত করতে পারেন না, তাদের জাগরণের জন্য। অবশেষে তিনি অবলোকন করেন যে, এই সমস্ত প্রতিভা তাঁর মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল, আর শুধু

তাঁর মধ্যেই নয়, প্রতিটি পুরুষের মধ্যেই সঞ্চিত ছিল, আর তারা প্রকাশিত হতে পারতো না, কেবল মাত্র আসক্তি ও বিরক্তির কারণে।

আসক্তি ও বিরক্তি সর্বক্ষণ তাঁকে একটি ভ্রমের মধ্যে স্থপিত রেখে দিতো, যার কারণে তিনি কখনোই এটি বুঝতে পারতেন না যে প্রতিভার উৎস স্বয়ং প্রকৃতি; পুরুষ কেবলই প্রকৃতিকে যেমন যেমন ধারণা করেন তেমন তেমন প্রতিভার প্রকাশকে অবলোকন করেন। যদি পুরুষ প্রকৃতিকে সম্যক ভাবে অনুভব করে নিতে পারেন, এমন কনো প্রতিভা নেই তখন যা তাঁর মধ্যে নেই; এমন কনো প্রতিভা নেই যা প্রকৃতির কাছে নেই, আর প্রকৃতির থেকেই সমস্ত প্রতিভা প্রতিফলিত হয় পুরুষের মধ্যে।

যতই পুরুষ সেই উপলব্ধি করতে শুরু করেন, ততই তাঁর মধ্যে এই ভাবের সঞ্চার হয় যে, এক প্রকৃতিই পূজনীয়া। তিনি উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃতির থেকে কিছু চাওয়ার অর্থ এই যে, প্রকৃতির থেকে বাকি প্রতিভাকে না চাওয়া। অর্থাৎ প্রকৃতির থেকে কিছু না চাওয়ার অর্থ, যখন যেই প্রতিভা আবশ্যক, প্রকৃতি সেই সমস্ত প্রতিভাই প্রদান করেন, কিন্তু যখন প্রকৃতির থেকে কনো বিশেষ প্রতিভাকে কামনা করা হয়, তার অর্থ অন্য সকল প্রতিভাকে দান করা থেকে প্রকৃতিকে প্রতিহত করা।

এই বোধ তাঁর অহংকারকে ক্ষীণ করে দেয়, আর যতই তা হয়, ততই প্রকৃতির থেকে সেই সমস্ত প্রতিভার ভান করতে থাকেন, যা তাঁর মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল আর তা তাঁর অজানা ছিল। আর যতই অহংকার ক্ষীণ হতে থাকে, ততই পুরুষ উপলব্ধি করতে থাকেন যে, কখন কি প্রতিভা আবশ্যক, তার ধারণা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকৃতি যেন মাতা, যেন এক পিতার হিত চাইতে থাকা কন্যা। যেমন এক পিতার দুলালী কন্যা পিতার যখন যা প্রয়োজন, তা পিতার উপলব্ধি করার আগেই তাঁর সামনে স্থাপিত করে দেন, তেমনই প্রকৃতি যেন সেই কন্যা যা সর্বক্ষণ তাঁর কি প্রয়োজন তার হিসাব রেখে চলেন, আর তা প্রদান করতে থাকেন।

পূর্বে তিনি ভক্তি তাকেই ভাবতেন, যেখানে কিছু চাইতে থাকা হয়, আর যা চাওয়া হয়, তার জন্য হট স্থাপন করতেন। কিন্তু এবার তাঁর কাছে ভক্তির পরিভাষাই পালটে যায়। তাঁর বোধ হয়, যিনি অযাচিত ভাবে সমস্ত কিছু দান করেন, যার সম্মুখে স্থিত হয়ে, কি প্রয়োজন আর কি অপ্রয়োজন তার বিচারও করতে হয়না, তিনি অনায়সেই তা দিতে থাকেন, তাঁর কাছে কিছু কামনা করা কেন? কিছু কামনা করা তাঁর কাছে যে মুর্খামি ব্যতীত কিছুই নয়।

তাঁর মধ্যে এবার প্রকৃতির প্রতি ধন্যবাদ উপস্থিত হয়, এবং মুহুর্মুহু প্রকৃতিকে সমস্ত দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ব্যকুল থাকেন। তিনি বেদনার সুরে অশ্রুপাত করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি মূর্খ ছিলাম যে তোমার থেকে কিছু বিশেষ কিছু চেয়ে, তোমার এই স্নেহকে, তোমার এই যত্ননেওয়ার ভাবকে অপমান করে এসেছি। ... আমার যাচনাই আমার কাল ছিল। আমার যাচনা পুড়ন করার জন্য যেই যোজনা আমি স্থির করতাম, তাই আমার মুর্খামি ছিলাম। আরে আমি তো নিজের হিত নিজেই বুঝিনা। কখন কোনটি আবশ্যক, সেই বোধই আমার মধ্যে ছিলনা। তাও আমি নিজেকে কর্তাজ্ঞানে, নিজের হিত খুব ভালো বুঝি, এমন অভিনয় করে, তোমার থেকে যাচনা করে গেছি মূর্খের মত''।

তিনি আরো বলেন, "আমাকে ক্ষমা করো হে প্রকৃতি। আমার মূর্খতাকে ক্ষমা করো। ... যিনি আমার থেকেও আমার হিতকে অধিক ভালো ভাবে জানেন, আর আমার হিতের জন্য যখন যা কিছু আমার জন্য আবশ্যক, তা সমানে দিয়ে যান, তাঁর কাছে কি যাচনা করবো? কেন যাচনা করবো? ... আমার সমস্ত যাচনাকে মূর্খের প্রলাপ জেনো হে প্রকৃতি! ... আমাকে ক্ষমা করো, এবার আর আমি তোমার থেকে কিচ্ছু যাচনা করিনা; এবার আমি তোমার থেকে তোমাকেই কেবল যাচনা করি। ... আর তাই বা করি কেন? তুমি তো আমারই ছিলে, আমারই আছো। ... সকল পুরুষের কাছে সম্পদ বলে কিছু যদি থাকে, তা একমাত্র তুমি।

আর তুমি এমনই সম্পদ, যা সমস্ত সম্পদ, সমস্ত বিদ্যা, সময়ে সময়ে এমন ভাবেই দিতে থাকো, যাতে তোমার থেকে কখনো কিছু যাচনা করতেই না হয়। ... আমাকে স্মরণে নাও হে প্রকৃতি, আমি শরণাগত; জানি আমি মূর্খ, জেনে গেছি আমি যে আমি একজন মূর্খশ্রেষ্ঠ; জেনে গেছি আমি যে সকল পুরুষই পূর্ণ মূর্খ, আর তাই তোমার থেকে যাচনা করতে থাকে। ... আর এই জানার পর, আর কিচ্ছু অভিপ্রায় নেই আমার। আমাকে কেবল তোমার শরণে নাও, আমি এবার কেবল তোমাকেই কামনা করছি। ... আর সমস্ত কিছুই আমার কাছে অহেতুক মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া। তাই তোমাকেই কামনা করছি"।

পুত্রী, এই হয়ে ওঠে পুরুষের তৃতীয় ভাব, আর এই ভাবের নাম ভক্তি। বুঝতেই পারছো পুত্রী, সমাজ কাদেরকে ভক্ত বলে, কাকে ভক্তি বলে, আর বাস্তবে ভক্তি কি, আর ভক্ত কে? সমাজ তাঁকেই ভক্ত বলে যিনি ঈশ্বরের থেকে কিছু যাচনা রেখে, তার উপর শর্তসাপেক্ষ বিশ্বাস রাখেন; অর্থাৎ এই বিশ্বাস রাখেন যে আমার যাচনা তুমি নিশ্চয়ই পুড়ন করবে। ... আর প্রকৃত ভক্ত তিনিই যিনি উপলব্ধি করে ফেলেছেন যে ঈশ্বরীর থেকে কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু চাইতে হয়না; সমস্ত চাওয়া মুর্খামি ব্যতীত কিছুই নয়। তাই একজন প্রকৃত ভক্ত কেবলই ঈশ্বরীকে চান, ঈশ্বরীর থেকে কিছু চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রকৃত ভক্ত তিনি, যিনি উপলব্ধি করে ফেলেছেন যে, সকলের সকল প্রতিভা ঈশ্বরীরই দান, কারুরই নিজস্ব কনো প্রতিভা থাকেনা। আর তাই তাঁর মধ্যে থেকে প্রতিভাবানের প্রতি ভেদভাবের দৃষ্টি চলে যায়, আর তিনি নিজের প্রতিভাকে ঈশ্বরের দানরূপে স্বীকার করে, প্রতিনিয়ত ঈশ্বরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, নিজের সমস্ত প্রতিভাকে ঈশ্বরীর চরণে স্থাপন করে, সেই প্রতিভাদ্বারা ঈশ্বরীর বিনোদ কামনা করে, সেই প্রতিভার ব্যবহার নিজের প্রশস্তিতে না করে, ঈশ্বরীর প্রতি স্নেহের দৃষ্টি রাখেন।

আর এই ভাবের পর, ভক্তিও উন্নত হয়ে যায়, আর প্রেমের সঞ্চার হয়। এই প্রেমের ভাবে, একজন প্রেমী অনুভব করেন যে, তাঁর অন্তরে যেই বিশ্বাস, যেই বৈরাগ্য, যেই ভক্তির সঞ্চার হয়েছে, তাও ঈশ্বরীরই দান। সকলের সকল প্রতিভা, বা বিদ্যা বা জ্ঞান কেবল নয়, সকলের অন্তরের সকল সামর্থ্যও ঈশ্বরীরই দান। তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁর অস্তিত্বই প্রকৃতির কারণে, তাঁর ভক্তি, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, সমস্তই প্রকৃতির কারণে।

আর সেই থেকে তাঁর ভাব উন্নীত হয়ে এমন স্তরে স্থাপিত হয়, যেখানে তিনি এই উপলব্ধি করেন যে তাঁর প্রকৃতির থেকে এই পৃথক অস্তিত্বই আর স্বীকার করতে ইচ্ছা করছে না। অনাহততে পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি স্নেহের ভাব জন্ম নেয়, এবং তাঁকে ভগিনী

মানতে ইচ্ছা হয়, স্নেহময়ী ভগিনী হয়ে ওঠেন প্রকৃতি তখন; সমস্ত প্রতিভা প্রদায়িনী প্রকৃতি কন্যাসমা হয়ে ওঠেন বিশুদ্ধে, আর আজ্ঞাতে প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে একাকার হবার ইচ্ছার জন্ম নেয়, আর নিজের এই দ্বৈতভাব, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি, এই ভাবকে নাশ করার ভাব প্রকাশিত হয়ে, এক হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

পুত্রী, যতক্ষণ দুই, ততক্ষণই মোহ; যখন এক, তখনই প্রেম। ... এতদিন প্রকৃতির প্রতি পুরুষের প্রেম নয় মোহ ক্রিয়া করছিল, তাই দ্বৈত ভাব ক্রিয়া করছিল আর প্রকৃতির ভ্রাতা হয়ে, বা পিতা হয়ে অবস্থানের ইচ্ছা থাকছিল। কিন্তু যেখানে প্রেম, সেখানে আর দুইএর অস্তিত্ব অসহ্য লাগে; তাই পুরুষ এবার একাকীত্ব হয়ে ওঠার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে, আর এই এক হয়ে যাবার ভান থেকে তিনি এই উপলব্ধি করেন যে তিনি সমস্ত সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। আর তাই তাঁর মধ্যে এই বোধ প্রত্যক্ষ হয় যে, সমস্ত সামর্থ্যের উৎসও প্রকৃতিই, আর এই ভাবে তাঁর থেকে সামর্থ্যবাণ এবং সামর্থ্যহিনের ভেদও বিনষ্ট হয়ে গিয়ে, প্রকৃতি শক্তিরূপে স্থিতা হন।

এই হলো সমস্ত চার ভাব, যা একটিই ভাবের প্রকারন্তর, আর তা হলো ঈশ্বরীয় ভাব। আর এই চারের পর, সমস্ত ভৌতিক, সূক্ষ্ম, তথা কারণ জগতের জ্ঞান অধিকার করে নেন পুরুষ। কিন্তু তাও তিনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পারেন না। আর তাই সেই একাত্ম হয়ে ওঠার ভাবের কারণে, ঈশ্বরীয় ভাব নিজের অন্তিম অর্থাৎ পঞ্চমভাবে উন্নীত হয়ে সমর্পণ রূপে প্রকাশিত হয়। এবার আমি তোমাকে এই সমর্পণ ভাবের কথা বলবো পুত্রী। এই ভাব হলো মহাভাব, যা এক সাধককে মোক্ষদ্বারে স্থিত করে দেয়, এবং মোক্ষও এনে দেয়। শোনো সেই কথা এবার মনোযোগ সহকারে"।

মহাভাব

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বলতে থাকলেন দেবী দিব্যশ্রীর উদ্দেশ্যে, "পুত্রী, প্রেম ভাবে ভাবাপন্ন হয়ে পুরুষ প্রকৃতির সাথে মিলন কামনা করলেও, প্রকৃতির কাছে এই আশা করতে থাকেন যে প্রকৃতি তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ সত্যের বহু নিকটে গিয়েও সামান্য অসত্যকে স্থাপন করে রেখে দিয়ে পুরুষ এই বোধ করেন যে তাঁর অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ করেন যে সকলের সকল জ্ঞান, সকল প্রতিভা এমনকি সকল সামর্থ্যও প্রকৃতির কারণে, তখন পুরুষ এবার ক্রমশ নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান হয়ে যান, এবং এই উপলব্ধি তাঁর মধ্যে স্থপিত হয়ে যায় যে তিনি সত্য হতে ভ্রমিত।

তাঁর বিচার ও বিবেকে এবার প্রকৃতির মধ্যে লীন হওয়া শুরু করে, এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সমানে বলতে থাকে যে, "দেখো, ভেবে দেখো, তুমি ভাবতে সমস্ত সামর্থ্য তোমার, তা মিথ্যা; তুমি ভাবতে সমস্ত প্রতিভা তোমার, তাও মিথ্যা, এমনকি এও মানতে যে সমস্ত জ্ঞান তোমার, এখন কি জানো? প্রকৃতিকে জানাই জ্ঞান, প্রকৃতিকে না জানাই অজ্ঞান। ... অর্থাৎ কনো কিছুই তোমার নয়। এবার ভাবো, কনো কিছুই যখন তোমার নয়, তখন তুমি কার? তুমি কি নিজের? নাকি তুমিও অন্য কারুর?"

পুরুষ তখন নিজের হারিয়ে যাওয়া অভিমানকে সংগঠিত করে বলেন, "আমি কার আবার? আমি আমার"। ... বিচার করে দেখ পুত্রী, পুরুষ নিজেকে কি বলেন? আত্ম, অর্থাৎ আমি।

বিচার ও বিবেক প্রকৃতিতে লীন হবার পূর্বে শেষ কিছু প্রশ্ন করে যান পুরুষকে। তাঁরা প্রশ্ন করেন, "বেশ তাহলে নিজের পরিচয় প্রদান করো"।

পুরুষ বলেন, "আমি কে আবার, আমি অমুকের পুত্র"।

বিবেক বললেন, "তোমার পিতৃপরিচয় জানতে চাইনি, জানতে চাইছি তুমি কে?"

পুরুষ বলেন, "আমি অমুক কুলের সন্তান"।

বিচার বলেন, "আত্মপরিচয় দাও পুরুষ, কুলপরিচয় চাইনি আমরা"।

পুরুষ বলেন, "আমি বৈদ্য বা রাজা, বা মন্ত্রী ইত্যাদি"।

বিবেক বললেন, "নিজের পরিচয় দিতে পারছোনা তুমি? নিজের পরিচয় দাও, নিজের পেশার পরিচয় কে চেয়েছে তোমার থেকে?"

পুরুষ এই ভাবে একের পর এক নিজের পরিচয় দেবার প্রয়াস করতে থাকেন, আর বিচার বিবেক সেই পরিচয়কে নস্যাৎ করে, অবশেষে প্রকৃতিতে লীন হয়ে যান। পুরুষ তখন সমস্ত সময়ে এই করে ফেরেন যে তিনি অমুক, তিনি তমুক, আর নিজেই নিজের উত্তরে অরাজি হয়ে অবশেষে প্রগলের ন্যায় হয়ে উঠে বলেন, "আমি কে? আমি কে, আমি নিজেও জানিনা! ... সমস্ত বিচারের শেষে আমি যে শূন্য পতিত হই। ... আমি যদি শূন্য হই, তবে প্রকৃতি কে? আমার আসল পরিচয় কি? কেউ আমাকে বলে দাও, আমার আসল পরিচয় কি? পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত, আমি আমার ভ্রমিত হয়ে থাকার পরিচয় ছাড়াতে ছাড়াতে শূন্যে স্থিতু হয়েছি। ... আমি কেউ নই, এমন বোধ হচ্ছে আমার!"

বিচার ও বিবেক প্রকৃতিতে লীন হয়ে গেছেন, আর তাই কেউ পুরুষের প্রশ্নের উত্তর দেন না। তাই পুরুষ উদ্ভ্রান্তের মত প্রশ্ন-উত্তর করতে থাকেন আবার, "আমি কেউ নই, প্রকৃতিই সত্য। ... প্রকৃতিই অস্তিত্ব। আমার অস্তিত্বই একটি ভ্রম, আমার কনো অস্তিত্বই নেই। আমার অস্তিত্ব কনো কালেই ছিলনা, কনো কালেই সম্ভব নয় আমার অস্তিত্ব। প্রকৃতির ক্রোড়েই আমি ছিলাম, অজস্র খোলের আস্তরণে আমি কারুর পুত্র ছিলাম, তো কারুর স্বামী; কারুর মনিব ছিলাম তো কারুর গুলাম। কিন্তু আমি শুধুই প্রকৃতির কারণেই ছিলাম, প্রকৃতি সত্য, তাই তাঁর ক্রোরে স্থিত থেকে আমি নিজেকেও সত্য বোধ করছিলাম। আসলে আমি মিথ্যা।

আমি মিথ্যা, আমি শূন্য, আমি কিচ্ছু নই, আমার অস্তিত্বই নেই, এই মিথ্যা অস্তিত্বের নাশ করে দাও হে প্রকৃতি, আমাকে তোমার মধ্যে লীন করে নাও, আমাকে তোমার মধ্যে ম্লান করে দাও। ... আমার অস্তিত্বকে সত্য করে দাও"।

পুত্রী এই প্রকাণ্ড বিলাপকে লক্ষ্য করো। আজ্ঞাচক্রে প্রেমভাবে এই পুরুষই নিজেকে ও প্রকৃতিকে, উভয়কেই সত্য মেনে, দুইজনের অস্তিত্বকে একত্রিত করে, একটি সত্যকে স্থাপনার কথা বলছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাব এবার প্রেমের থেকে সমর্পণে উন্নীত হয়েছে, তাই নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে ফেলেছেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, "কে বলেছে আমি প্রেম করি? কে বলেছে আমি বিশ্বাস করি? যার অস্তিত্বই নেই, সে কি করে প্রেম করবে? সে কি করে বিশ্বাস করবে? সে কি করে ভক্তি করবে? আমি কিচ্ছু করতে পারিনা। প্রেম তো প্রকৃতি করেছেন, বিশ্বাসও তিনি করেছেন । ... যার অস্তিত্বই নেই, তাঁকে প্রেম করেছেন উনি, তাঁর উপর বিশ্বাস করেছেন তিনি। যার কনো সামর্থ্যই নেই, সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত প্রতিভা তাঁর, সমস্ত জ্ঞান তাঁর, তিনি আমাকে নিজের থেকেও অধিক প্রেম করে গেছেন। প্রেম তো আমি করতে জানিই না; ভক্তি আমার সামর্থ্যের অতীত ভাব, আমার বিশ্বাস যেন অবিশ্বাসের সমান।

নিকৃষ্ট বিশ্বাস আমার। যখন উপলব্ধি হলো প্রকৃতিই সমস্ত কিছু করছে, তখন আমার বিশ্বাস জন্ম নিলো, তার আগে কোথায় ছিল আমার বিশ্বাস! ... আমি হীন, অতি হীন। ... হে প্রকৃতি, হে ব্রহ্মময়ী, আমার কি হবে? আমার এই অস্তিত্ব যে আমার কাছে অভিশাপ মনে হচ্ছে! যেই অস্তিত্বের এতকাল বড়াই করে ফিরতাম, যেই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কি না করিনি আমি, ভ্রমের পর ভ্রম করে গেছি! যেই দেহের অস্তিত্বই নেই, সেই দেহকে দীর্ঘায়ু করতে ছুটেছি; যেই মনের অস্তিত্বই মিথ্যা, তার ইচ্ছাপুড়ন করতে ছুটেছি; যেই বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা, তার যুক্তি শুনেছি। ...

হে মাতা, হে ব্রহ্মময়ী জননী, হে জনক, হে জননী, আমার মত হীনকে দণ্ড দাও। ... আমার নিজের অস্তিত্বই মিথ্যা । সেই মিথ্যার আবার অভিমান! ... এর দণ্ড কি হওয়া উচিত মা!"

পুত্রী, সমর্পণ ভাবে পুরুষের যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাঁর মুহুর্মুহু ধ্যান হয়, কিন্তু তাতেও তাঁর তৃপ্তি হয়না। ধ্যানের কালে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়, তাই পুরুষ নিজেকে হারিয়ে তৃপ্ত থাকেন। কিন্তু যেই ক্ষণে ধ্যান ভেঙে যায়, সেই মুহূর্তেই নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়, আর তা অসহনীয় পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে।

আর তখনই এক দিব্যস্বর তাঁর কাছে একসময়ে প্রকাশিত হয়, আর সেই স্বর বলেন, "মিথ্যা তোমার একার অস্তিত্ব নয়, মিথ্যা আমারও অস্তিত্ব। আমি প্রকৃতি । আমারই বা অস্তিত্ব কোথায়? সত্য কেবল শূন্য, যা তোমারও স্বরূপ, আর আমারও। ... আর শূন্যের অর্থ কি? শূন্যের অর্থ কিচ্ছুনা। অর্থাৎ তুমি যেমন কিচ্ছু নয়, আর সেটিই তোমার স্বরূপ; তেমনই আমিও কিচ্ছু নই, আর সেটিই আমার স্বরূপ।

হে পুরুষ, তুমি আর আমি ভিন্ন নই, তুমি আর আমি বিভক্তও নই। যাহা তুমি, তাহাই আমি। ... পুরুষ হয়ে ভ্রমে আচ্ছাদিত ছিলে তুমি, তাই তুমি আর আমি আলাদা এমন অনুভব করছিলে তুমি। যাকিছুকে ভ্রমের মধ্যে স্থাপিত দেখছিলে, তাকেই তুমি 'আমি' ও 'আমার' বলছিলে, আর যা কিছুকে ভ্রমের অন্তরে স্থাপিত রূপে দেখতে পাচ্ছিলে না, তাকেই তুমি প্রকৃতি মনে করছিলে। ... সমস্তটাই তোমার ভ্রম ছিল, বাস্তবে না তুমি আছো, আর না আমি আছি। ... অবাস্তব কেবলই বাস্তব বলে কিছু আছে তার বোধ । ভ্রম কেবলই সত্যের পৃথক অস্তিত্ব আছে এই বোধ। বাস্তব এই যে বাস্তব বলে কিচ্ছু নেই, সত্য এই যে সত্য বলে কিচ্ছু নেই। ...

শূন্যই সত্য, তুমিই সত্য, আর আমিই সত্য, আর ততক্ষণই আমরা সত্য, যতক্ষণ সত্য বলে কিছুর অস্তিত্ব হয়না, এই বোধ প্রত্যক্ষ থাকে। যখনই সত্য বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে এই বোধ জন্ম নেয়, সেইমুহূর্তে মিথ্যা বলেও কিছু আছে, এই বোধও জন্ম নেয়। আর এই দুই বোধ একত্রিত হয়ে প্রকাণ্ড ভ্রমের সঞ্চার করে। ... হে পুরুষ, সত্যের অস্তিত্বকে সন্ধান করতে গিয়ে মিথ্যাকে জন্ম দিয়েছিলে তুমি, আর সেই সত্যমিথ্যারূপ কল্পনার প্রভাবে এসে তুমি নিজের স্মৃতি হারিয়ে ফেল, আর তাই সত্য বলে কিচ্ছুর কনো অস্তিত্ব হয়না, তা ভুলে যাও।

কিন্তু তুমি যে নিজের স্মৃতি ভুলে গেছো, তাও ভুলে যাও, আর তাই সমানে সত্যের অস্তিত্বকে সন্ধান করতে থাকো, আর যতই তা করতে থাকো, ততই মিথ্যার রচনা করতে থাকো, কারণ সত্য বলে যে কনো কিছুর অস্তিত্ব হয়, সেই বোধই যে শ্রেষ্ঠ মিথ্যা। যত অধিক ভাবে তুমি সত্যের অস্তিত্বকে সন্ধান করতে থাকো, তত অধিকই তুমি মিথ্যার রচনা করো, আর তত অধিক ও ঘন হয়ে ওঠে তোমার ভ্রম, আর ভ্রমিত আত্মপরিচয়।

হে ব্রহ্ম, হে ভাস্মর, হে সনাতন, তুমিই সে যে একত্রে সত্য তথা মিথ্যা। তুমি সত্য কেন? কারণ তুমি একাকীই অস্তিত্ব। না তো তুমি ছাড়া কেউ কনো কালে ছিল, আর না কনো কালে কেউ থাকবেন। তুমিই প্রকৃতি, তুমিই পুরুষ, আর তুমিই সমস্ত পুরুষ। যেই যেই পুরুষ কণা বিদ্যমান, তাঁরা সকলেই তুমি হে ব্রহ্ম। যখন যখন তোমারই মত সত্যের সন্ধান করতে করতে এক অন্য পুরুষ এই স্থানে এসে উপস্থিত হবেন, তখন তখন তিনিও এই একই উপলব্ধি করবেন, যা তুমি এক্ষণে করছো, অর্থাৎ সত্যের পৃথক অস্তিত্ব যে সম্ভব সেটিই একমাত্র মিথ্যা, আর সেই মিথ্যার ভ্রমেই তিনি পুরুষ।

তিনিও তোমার মতই উপলব্ধি করবেন শূন্যকে, আর প্রত্যক্ষ করবেন যে শূন্যই সত্য, শূন্যই মিথ্যা। একমাত্র সম্ভব অস্তিত্ব, তাই শূন্যই সত্য। আবার শূন্য মানে তাই যার অস্তিত্বই সম্ভব নয়, তাই শূন্যই মিথ্যা। সত্যই মিথ্যা, মিথ্যাই সত্য হে ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই মিথ্যা। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কনো সত্য অস্তিত্বে না তো ছিল, না আছে, আর না থাকা সম্ভব। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় মিথ্যা না তো অস্তিত্বে ছিল, না আছে আর না থাকবে। ... শূন্যই একমাত্র সত্য, আর শূন্য স্বয়ং যেহেতু মিথ্যা অর্থাৎ অনস্তিত্ব, তাই তা সত্য হয়েও মিথ্যা"।

সেই দিব্যকণ্ঠ শ্রবণে, পুরুষ সমানে নিজের পুরুষত্বকে হারাতে থাকেন, নিজের প্রকৃতিতত্ত্বকে হারাতে থাকেন আর বলতে থাকেন, "কি বলে ডাকি তোমায়? মা না পিতা? স্বামী না স্ত্রী? কন্যা না পুত্র? ভ্রাতা না ভগিনী? সমস্ত কিছুই তুমি। সমস্ত লিঙ্গই তুমি। সমস্ত জীবই তুমি, সমস্ত পুরুষই তুমি। প্রকৃতি স্বয়ংও তুমিই । তুমিই একমাত্র অস্তি; তুমিই একমাত্র নাস্তি। ... তুমি স্বয়ং শূন্য। আর শূন্যই একমাত্র অস্তি। তাই শূন্যই একামাত্র সত্য, আবার শূন্যই একমাত্র মিথ্যা। ... সত্যই মিথ্যা, মিথ্যাই সত্য। আর ভ্রম নেই, আর বিস্মৃতি নেই। বুদ্ধ সঠিকই বলেছিলেন, বুদ্ধসনাতনেরা সঠিকই বলেছিলেন উপনিষদে, পিঁয়াজের সমস্ত খোল ছাড়িয়ে নিলে যা পরে থাকে, তাই তুমি, তাই সত্য; প্রতিটি খোল মিথ্যা। ...

হে লিঙ্গহীন, হে আকারবিহীন, হে সর্বব্যাখ্যার অতীত, হে সর্ব চিন্তার অতীত, হে সর্ব সীমার অতীত, হে সর্ব অন্তের অতীত, আর কি? আমার ভ্রমের নাশ হয়েছে, শূন্যই সত্য, আর শূন্য স্বয়ং মিথ্যা। ... তাই আমার এই পৃথক অস্তিত্ব শূন্যকে, সত্যকে, ব্রহ্মকে নিত্য অপমান করে চলেছে। এই অপমানকারীর চিরতরে লয় করে দাও। আমার সমস্ত সত্যসন্ধানের প্রয়াসকে ইতি করে দাও। চিরতরে আমাকে লীন করে দাও সত্যে, শূন্যে, ব্রহ্মে, যাহাই সত্য, যাহা সর্বৈব ভাবে মিথ্যা হয়েও একমাত্র সত্য। জন্ম মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, পুরুষ মিথ্যা, স্ত্রী মিথ্যা, কুল মিথ্যা, জাত মিথ্যা, সংগঠন মিথ্যা, সম্প্রদায় মিথ্যা, শব্দ মিথ্যা, সুর মিথ্যা, সম্পদা মিথ্যা, শক্তি মিথ্যা, এমন কি চেতনাও মিথ্যা, সমস্ত কিছু মিথ্যা, কারণ মিথ্যাই সত্য, শূন্যই সত্য"।

পুত্রী, জীবকটির এখানেই ইতি। সমাধিপ্রাপ্ত হন তিনি, আর ব্রহ্মে বা শূন্যে নিজের সমস্ত প্রকৃতি ও পুরুষকে লয় করে লীন হয়ে যান। জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে সার্বিক ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়ে যান। সমস্ত যোনির থেকে মুক্ত হয়ে, চিরতরে বিলীন হয়ে যান। মিলন হয় তাঁর, মহাসত্যের সাথে মিলন। পরম সত্যের মধ্যে তিনি একাকার হয়ে গিয়ে যাবতীয় বন্ধনের নাশ করে দেন । না পুত্রী, আর ক্রমে ক্রমে নয়, এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছুর নাশ করে দেন।

যদি কনো সামান্য ভেদবুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে, তবে মাত্র সাতটি পার্থিব দিনের জন্য ফেরেন, আর যদি তাও না থাকে, তবে চিরতরে লীন হয়ে, জন্মচক্রকে, কর্মচক্রকে, জীবনচক্রকে, সৃষ্টিচক্রকে সমাপ্ত করে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। এই হলো অন্তিম ভাব, সমর্পণের বিবরণ, পরিণতি, এবং সমাপন। এরপর আর কিচ্ছু অবশিষ্ট থাকেনা, কিচ্ছু মানে কিচ্ছু অবশিষ্ট থাকেনা। একমাত্র ঈশ্বরকটিই পুনরায় প্রকৃতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন সমাধি অবস্থা থেকে, আর সেই সমাধি অবস্থার এই সমস্ত বিজ্ঞানকে ফিরে এসে তাঁর অল্পসংখ্যক শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করে মহাসমাধি গ্রহণ করেন।

জীবকটির ক্ষেত্রে এই সেই অবস্থা, যাকে যোগ বলেছে সমাধি, বুদ্ধ বলেছেন নির্বাণ, এবং মার্কণ্ড বলেছেন মোক্ষ । আর এই পঞ্চভাবই সেই অন্তিম অবস্থায় পৌঁছাবার একমাত্র প্রাকৃতিক উপায়, অর্থাৎ যেখানে অনুশীলন কেবল একটিবার করতে হয়, আর সেই অনুশীলনের প্রবাহধারাকে সমানে প্রত্যক্ষ করতে হয়"।

দেবী দিব্যশ্রী বিহ্বল হয়ে বললেন, "পিতা, আপনি এই কথা বললেন, বা উপনিষদ, বেদান্তও এই মহাসত্যকে ব্যখ্যা করার প্রয়াস করেছেন বোধিসনাতন ধারাকে অবলোকন করে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এই কথাকে একজন কেবলই পুঁথি পাঠ করে এসে বলে নিজেকে সমাজের সামনে জ্ঞানী স্থাপন করতে পারেন! ... আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, কে স্থাপন করলেন বা কে স্থাপিত হলেন, তাতে কিই বা এসে যায়! সত্যলাভ তো আর সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি করতে পারেন না!... কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে পিতা, সমাজ কাকে সত্য অর্থে কথক মানবেন? অর্থাৎ কার মুখ থেকে এই মহাবিজ্ঞান শুনলে, সমাজ বিশ্বাস করতে পারেন, আর সেই বিশ্বাসে কনো ভ্রান্তি হবেনা!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সমর্পণের তত্ত্ব একমাত্র অবতার ব্যতীত কেউই ব্যক্ত করতে পারেন না, কারণ সমাধি বা নির্বাণ থেকে কেবলই অবতার প্রত্যাবর্তন করেন, অন্যরা নন। ... তবে হ্যাঁ, প্রেমের কথা, ভক্তির সত্যতা, বিশ্বাসের যথার্থতার বিষয়ে মার্গদর্শন প্রদান করতে একমাত্র তিনিই পারেন যার ইরা জাগ্রত হয়েছে । ... আমি তোমাকে সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার উপায় বলছি, যার ইরা জাগ্রত হয়েছে। পুত্রী, এক পুরুষের যদি ইরা জাগ্রত হয়ে থাকে, তাঁকে সনাক্ত করা খুবই সহজ, যদিও স্ত্রী যার ইরা জাগ্রত হয়েছে, তাঁকে সনাক্ত করা একটু কঠিন।

ইরা জাগ্রত হলে, তনু অত্যন্ত কোমল হয়ে যায়, এবং যেই পুরুষদের ইরা জাগ্রত হয়েছে, তাঁর তনু নারীসুলভ হয়ে যায়। বাহু, বক্ষস্থল, এবং কটিদেশে, সেই কোমলতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ হয়। আর তারই সাথে যেই পুরুষের মধ্যে ইরার জারণ হয়েছে, তাঁর লোমাবলি বৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে যায় কারণ ইরা জাগরণের সময়ে যেই পরিমাণ তাপ দেহে উৎপন্ন হয়, সেই তাপের ফলে রোমকূপ সমূহ জ্বলে যায়, আর তাই সেই পুরুষের মধ্যে দেখবে, হস্ততে লোমাবলী সমান ভাবে ব্যপ্ত থাকলেও, তারা পুরুষসুলভ হয়না, বরং সুন্দর ঘাসের আবরণের ন্যায় হয়।

সমান ভাবে লোমাবলী পাতলা ঘাসের আচ্ছাদনের মত উদরিস্থলে থাকলেও, বক্ষস্থলে সেই লোমাবলী যেন বৃদ্ধি লাভ করতে পারেনা, যেন তারা থেকেও একটি সামান্য উচ্চতায় ওঠার পর, তাদের বৃদ্ধি যেন চিরতরে রোধ হয়ে গেছে, এমন দেখায়। আর পৃষ্ঠদেশ, যেখানে সুষুম্নার তাপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, সেখানে লোমাবলির প্রতিটিকূপ যেন জ্বলে গেছে, আর উন্মুক্ত মৃত্তিকা ঘাসশূন্য জমি মনে হয় তা।

অর্থাৎ দেহের নারীসুলভ কোমলতা, এবং লোমাবলীর যেমন ব্যাখ্যা দিলাম, তেমন হয়ে থাকলে, সেই পুরুষের মধ্যে ইরার জাগরণ হয়ে গেছে। ইরা জাগরণের পুরুষদের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এইদুই ছাড়া আর যা থাকে তা হল দেহগন্ধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। না তো সুবাস আর না দুর্গন্ধ, কিছুই যেন দেহে নিবাস করতে পারেনা । এছাড়া যা হয়, তা হলো ঈশ্বরকথা। প্রেমের কথা, ভক্তির কথা, আদর্শকথা, স্বার্থহীনতার কথা, বিষয়হীনতার কথা, ভেদভাবহীনতার কথা এক ইরা জাগ্রত ব্যক্তি এই সকল কথা ব্যতীত অন্য কথা

বলতেই পারেন না। অর্থাৎ তাঁর চরিত্র, তাঁর ভাবনা, তাঁর আদর্শ, এমনই হয়ে যায় যে, স্থূল এবং ভৌতিক জগত কেবলই বিজ্ঞানের দ্বার হয়ে ওঠে, এবং মনস্তত্ত্ব এবং পঞ্চভূতকে অধীনে রাখা, এই তাঁর ব্রত হয়ে যায়।

পুত্রী, এই দুই ভাব নারীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায় । দেহের কোমলতা, দেহগন্ধহীনতা এবং লোমাবলীর হ্রাসও নারীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই লক্ষণীয়, কিন্তু নারীদের মধ্যে দেহের কোমলতা এবং লোমাবলীর হ্রাস স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, কারণ তাঁরা সৃষ্টির গহ্বর, তাই এই দুই দেহগুণ দ্বারা নারীদের মধ্যে ইরা জাগরণকে চিহ্নিত করা যায়না। কিন্তু ইরা জাগ্রত হবার লক্ষণ এই যে, সেই ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত ভেদভাবের নাশ হয়ে গেছে। যতই ইরা উন্নত হয়, ততই তাঁর মধ্যে থেকে ভেদভাব অধিক অধিক ভাবে নাশ হয়ে যায়।

তাই যার বচনের মধ্যে, নারীপুরুষের মানসিকতা সংক্রান্ত ভেদভাব, জাতিগত ভাবে ভেদভাব, বা কনো প্রকার জন্মগত ভাবে ভেদভাব স্থান পায়না, আবার যিনি বলেন প্রকৃতির কাছে যেতে পারার জন্যই আমার এই জ্ঞান, যিনিই প্রকৃতির নিকটে যাবেন, তিনিই জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম, কারুরই একচ্ছত্র অধিকার নেই তাঁর উপর, তিনি সকলের জননী, তাই সকলের অধিকার আছে সমস্ত জ্ঞানের উপর, সমস্ত প্রতিভার উপর, আর সমস্ত সামর্থ্যের উপর, জেনে রেখো, তাঁর ইরা জাগ্রত হয়েছে।

পুত্রী, সত্য এই যে সত্য বলে কিচ্ছু হয়না, অর্থাৎ সত্য এই যে কিচ্ছু বলতে কিচ্ছুর অস্তিত্ব না তো ছিল, না আছে আর না থাকা সম্ভব। তাই যেই ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বকেই নস্যাৎ করতে পারেন নি, তিনি সত্যের থেকে বহুদূরে স্থিত। অর্থাৎ স্পষ্ট ভাবে বলতে হলে, যেই ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব যত অধিকভাবে নস্যাৎ করতে পেরেছেন, তিনি ততই সত্যনিকটে স্থিত। তবে পুত্রী, এমন ভেবো না যে, এটি কেবলই মুখে বলার বিষয়।

কেউ মুখনিঃসৃত শব্দদ্বারা বললেন, "আমি নেই", এতেই হয়ে যায়না। এই একটি বচন বলে যদি নিজের সমস্ত মিথ্যাকে ঢেকে দেওয়া যায়, তবে এই একটি শব্দ খরচ তো বহু বহু ধূর্তও করবেন, তাই না! ... তাই কেবল মুখের শব্দ নয়, তাঁর আচরণেই এই নাস্তিবাদ স্পষ্ট থাকে। তিনি নিজের বচনে দৃঢ় থাকেন না, তিনি বলেন, "তখন বলিয়েছেন অমুক কথা, তাই বলেছি, এখন বলাচ্ছেন এমন তাই বলছি"। এতে তাঁর সম্মানহানী হবে, তা অন্যেরা সম্মানহানী কখন করবেন, তার অপেক্ষা তিনি করবেন না, তিনি নিজেই বলে উঠবেন, "কেরকম উজবুক আমি দেখেছো, বচনের কনো দামই নেই। ... আমাকে বিশ্বাস করা কি যায়! ... না, আমি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করিনা, তোমরা কি করবে, প্রকৃতিকে বিশ্বাস করো, তিনিই একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র"।

অর্থাৎ পুত্রী, তিনি সরাসরি নিজের অপমান নিজে করেন, আবার কেউ যদি সরাসরি এসে বলেন, "আপনাকে বিশ্বাস করাই যায়না", তিনি তখন হাস্যমুখে বলবেন, "আর কাকে বিশ্বাস করবে তাহলে? প্রকৃতির সাখ্যাত করেছ? যতক্ষণ করোনি, ততক্ষণ আমাকেই বিশ্বাস করতে হবে, নাহলে জলে পরে যাবে। ... একবার প্রকৃতির সাখ্যাত পেয়েগেলে, আর আমাকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু তাঁর সাখ্যাত পাবার আগে যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, তবে ভুলে যাও তাঁর সাখ্যাত পাবার স্বপ্নকে। ... তাঁর প্রকাশকে যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি তাঁর মুখদর্শনও করেন না"।

বুঝতে পারলে পুত্রী, এক সমর্পিত প্রাণের পরিচয়কে? যখন কেউ তাঁকে ভগবান মানতে এগিয়ে আসে, তিনি বলেন, "এই নশ্বর কি করে ঈশ্বর হতে পারে? হ্যাঁ, এই নশ্বর খোলের ভিতরে ঈশ্বর আছেন ঠিকই, কিন্তু ভাই, সে তো তোমার নশ্বর দেহের ভিতরেও আছেন। তুমি আমার মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস করছো কেন? নিজের ভিতরেই সন্ধান করো না। যদি করতে পারো দেখবে, আমি আর তুমি কেউ আলাদা নই। তাঁকে জেনে বসে রয়েছি বলে আর তুমি তাঁকে জানোনি বলে আলাদা মনে হচ্ছে। একবার তাঁকে নিজের ভিতরে প্রত্যক্ষ করে নিলেই, আমি তুমি একাকার"।

আবার যিনি তাঁকে উপেক্ষা করতে চাইবেন, আর বলবেন, "যখন তাঁর জন্যই তুমি, তাঁকে পেলে তুমি আমি এক, তখন তোমাকে কেন মানবো, তাঁকেই মানবো", তখন তিনি আবার হাস্যমুখে বলেন, "দেখো চেষ্টা করে... গতি নাই, গতি নাই... গতি থাকলে কি আর তিনি তোমাকে আমার সামনে আনতেন! ... খুঁজতে তোমাকে নিজের মধ্যেই হবে, তবে গন্তব্যে যাচ্ছ না গন্তব্য হারাচ্ছ, তা বোঝার জন্যই তো আমাকে সামনে রেখেছন তোমার। ... আমি হলাম তোমার জন্য মানচিত্র, আমাকে দেখে দেখে তোমাকে গন্তব্যে পৌছাতে হবে। মানচিত্র ফেলে দেবে, তো পথ হারিয়ে ফেলবে"।

অর্থাৎ পুত্রী, ইরাজাগ্রত এবং সত্যজ্ঞাত ব্যক্তিকে ঈশ্বর মানলে, তিনি তাঁর বিদ্রোহ করেন; যদি তাঁকে ঈশ্বরের দূত মেনে তাঁর থেকে কিছু না কিছু কামনা রাখো, যেমন ভূত ভবিষ্যৎ জানার কামনা, যেমন রোগভোগ ঠিক করার কামনা, যেমন জীবনকে সুরক্ষিত করে দেবার কামনা, যেমন সহস্র কামনাকে পূর্ণ করার কামনা, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তোমাকে বলবেন, "ঈশ্বরকে সয়তান বানানোর চেষ্টা করছিস হতচ্ছাড়া? সয়তান চমৎকার করে, ঈশ্বর নয়। সেই ঈশ্বরের দূত হয়ে চমৎকার করবো? সয়তানের দূত মনে করেছিস আমাকে তুই?" গালমন্দও করেন তিনি এই কথার সাথে।

আবার যখন তাঁকে উপেক্ষা করেন কেউ, তখন তিনি কেবলই হাস্যমুখে বলেন, তিনি হলেন মানচিত্র, মানচিত্র দেখে চললে পথ পাবে, নয়তো রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াবে। ... আর এতো বলে, চুপ করে যান। আবার সেই উপেক্ষা করা ব্যক্তি সামনে এলে, আবারও একই কথা বলেন, কারণ তিনি জানেন যে সেই সম্মুখে আসা ব্যক্তির দ্বারা কিছু সম্ভব তখনই যখন তিনি মানচিত্রকে অনুসরণ করবেন, আর তিনি মানচিত্রকে অনুসরণ করতে পারছেন না, কারণ তাঁর অহমিকা তাঁকে কেবলই নিজের কামনাতে জর্জরিত করে রেখেছে।

অর্থাৎ এক সত্যজ্ঞাত ব্যক্তিকে চিনতে গেলে যেমন শারীরিক গঠন দেখে চিনতে পারো, তেমনই তাঁর ঈশ্বরীয় ভাবকে দেখে চিনতে পারো পুত্রী। যিনি তাঁকে ঈশ্বর ভাববেন, তাঁকেও তিনি দূরে স্থাপন করেন, আর যিনি তাঁকে অহেতুক ভাবেন, তাঁকেও তিনি দূরে স্থাপন

করেন; কেবল যিনি তাঁকে মানচিত্র মনে করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে, সেই সমস্ত কিছুকে নিজের অন্তরে অভ্যাস করার প্রয়াস করেন, তাঁকেই তিনি সঙ্গে রাখেন, যেমন পুত্রী তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

আর এছাড়া আরো কিছু সতর্কতা বানী তোমাকে প্রদান করি, এই সত্যজ্ঞাতদের ব্যাপারে। প্রথম, এমন ভেবো না যে তুমি আমার কন্যা বলে সত্যজ্ঞাত হয়ে গেছ। সত্যকে সকলেই জানতে পারেন, আর যিনি জেনেছেন তিনিই সত্যজ্ঞাত, সত্যজ্ঞাতের সন্তান বা সত্যজ্ঞাতের অনুগামী বলে কেউ সত্যজ্ঞাত হয়ে যান না। অর্থাৎ কনো মহাপুরুষের শরণার্থী বলে, তিনি পূজনীয় ততক্ষণ নন, যতক্ষণ তিনি সত্যজ্ঞাত হচ্ছেন না। অর্থাৎ একমাত্র সত্যজ্ঞাতই অনুসরনিয়, না তাঁর সেই অনুগামীরা অনুসরনিয়, যারা সত্যজ্ঞান লাভ করেন নি, তা তাঁরা যতই তিলককাঞ্চন বা পোশাকআসাক ধারণ করুন না কেন, আর না তাঁর কনো সন্তানসন্ততি অনুসরনিয়, যদি তিনি সত্যজ্ঞান অর্জন না করে থাকেন।

পুত্রী, সাধারণ কথা সকলের শ্রবণ করা উচিত, আর সাধারণ কথা শ্রবণের জন্য, বক্তার বিচার করা অবাঞ্ছনীয়, কারণ সকল বক্তাই ঈশ্বরেরই প্রকাশ, যারা স্বরূপে সেই ব্রহ্মই। আবার কারুর কথাই শ্রবণযোগ্য নয়, কারণ ব্রহ্ম তিনিই, যিনি শূন্য অর্থাৎ অসত্য হয়েও একমাত্র সত্য। আর সত্যবাণী তাঁরই শ্রবণ করা উচিত যিনি স্বয়ং সত্যজ্ঞানে ভূষিত, আর তাঁকে কি ভাবে চিহ্নিত করবে, তা তোমাকে বললাম এতক্ষণ। তাঁর বেশভূষা সাদামাটা হয়, কিন্তু কনো ধারা মেনে হয়না, কারণ তাঁর কাছে সত্য প্রকাশ্য, আর তাই কনো ধারাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আবার সমস্ত ধারাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য।

তাই পুত্রী, বারংবার সতর্ক করে রাখলাম, সত্যজ্ঞান যার থেকেই গ্রহণ করবে, তিনি কোন ধারায় ভূষিত, কোন বিশেষ পোশাক ধারণ করেছেন, বা কোন জাতির বাহক, বা কোন লিঙ্গের, বা কোন মহাপুরুষের সন্তানসন্ততি, তা দেখবে না । যদি এই সমস্ত কিছু দেখে কারুকে সত্যজ্ঞাতারূপে যদি বিচার করো, তুমি অন্ধকূপে আত্মঘাতী হচ্ছ, এমন জেনে রেখো। ...

সত্যজ্ঞ হবার অধিকার আর সামর্থ্য সকলের আছে, সকল পেশার ব্যক্তির আছে, সকল জাতের ব্যক্তির আছে, সকল লিঙ্গের ব্যক্তির আছে, সকল বয়সের ব্যক্তির আছে, এবং সকল ধারার ব্যক্তির আছে, আর যিনি সত্যজ্ঞ হন, তাঁর চালচলন, বেশভূষা, কথাবার্তা, সমস্ত কিছু অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে যায়, আর তিনি এদের একটির উপরেও দৃষ্টিপাত করেন না। তাই পুত্রী, এই সকল আবরণকে দেখে সত্যজ্ঞ বলে কারুকে যদি বিচার করো, তবে তুমি নিজের হাতে নিজের অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছ"।

দেবী দিব্যশ্রী উত্তরে বললেন, "এর অর্থ পিতা, সত্যজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্য কনো আধারে নয়, কেবল ও কেবলমাত্র যোগ্যতার আধারেই চিহ্নিত করতে হয়। যিনি যাবতীয় প্রকার ভেদভাবের ঊর্ধ্বে উঠে, নিজেকে নিজের সমস্ত মন, বুদ্ধি, তনু, সামর্থ্য, প্রাণ সহ আত্মার বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন; যিনি স্বয়ং সমস্ত ভেদভাবের ঊর্ধ্বে স্থিত, আর নিজেকে সত্যজ্ঞ বলে প্রমাণ দিতেও অনীহাগ্রস্ত, অথচ যার মুখে কেবলই নিরাকারের কথা, কেবলই নিষ্ক্রিয়তার কথা, কেবলই সমর্পণের কথা, কেবলই প্রেমের কথা, কেবলই নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার কথা, সত্যজ্ঞ তিনিই কেবল। ...

কিন্তু পিতা, আমার আরো একটি প্রশ্ন এখনো অনুত্তরই রয়ে গেল। আমি জানতে চাই যে পিতা, কাকে সত্যজ্ঞান প্রদান করা উচিত আর কাকে নয়? অর্থাৎ কে মোক্ষলাভের অধিকারী আর কে মোক্ষলাভের অধিকারী নন? আচ্ছা মোক্ষ ও মুক্তি কি আলাদা কিছু?"

মোক্ষমুক্তি

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যবদনে, তাঁর দিব্যস্বরে বললেন, "পুত্রী, শব্দে কিই বা এসে যায়, শব্দ স্বয়ং একটি কল্পনা, আর কল্পনা কি করে সত্য হওয়া যায়, বা সত্যকে কি করে কল্পনা করা যায়! ... মোক্ষ এই শব্দটি ব্রাহ্মণরা সনাতন বুদ্ধধারার থেকে গ্রহণ করে এনেছেন, এবং মুক্তি ব্রাহ্মণদের স্বয়ংকার ব্যবহৃত শব্দ। শব্দদুটির প্রাথমিক ব্যবহার ভিন্ন ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ব্রাহ্মণই নিজেদের মহাজ্ঞানী প্রমাণ করার জন্য মুক্তিকে মোক্ষ নামে স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, আবার অনেক মহাপুরুষই শব্দকে অনিত্য জেনে, তাদের প্রতি অনাস্থা দেখিয়ে, মোক্ষকেই মুক্তি নামে চিহ্নিত করেছেন। আর এই দুই প্রান্তিক শব্দব্যবহারের জন্য মোক্ষ এবং মুক্তি এই দুই শব্দ মানুষকে প্রায়শই বিভ্রান্ত করে দেয়।

পুত্রী, মোক্ষ শব্দের ব্যবহার বুদ্ধ করেছিলেন জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াকে ইঙ্গিত করতে, যেখানে নিজের যাবতীয় অস্তিত্বকে পিয়াজের খোলা ছাড়ানোর মত করে ত্যাগ করার কথা বৌদ্ধমতধারা অবলম্বনকারী উপনিষদ বলেছে। আর মুক্তি শব্দের প্রয়োগ ব্রাহ্মণরা বা বৈদিকরা বলেছেন, দুর্দশার থেকে মুক্ত হবার জন্য। অর্থাৎ পুত্রী, মুক্তি একটি সাময়িক বন্ধনভেদ, কারণ দুর্দশা তাই যাকে আমরা ইতিমধ্যে দুর্দশা বলে চিহ্নিত করে ফেলেছি। সেই দুর্দশার থেকে আমরা মুক্ত হয়ে গেলেই যে দুর্দশার থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেলাম, তা কখনোই নয়, কারণ সেই মুক্তির পর আমরা যেই অবস্থায় এসে উপস্থিত হবো, আমরা তার মধ্যেও আগামীকাল দুর্দশাকে চিহ্নিত করে নেব।

আসলে পুত্রী, দুর্দশাকে মন্ত্র, তন্ত্র, বা যন্ত্র দূর করতে পারেনা, কারণ দুর্দশার উৎস হলো আত্ম'র অর্থাৎ আমার ভ্রম। তাই যতক্ষণ আত্মার বা আমার ভ্রম নাশ হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এই 'আমি' এই উপলব্ধি করতে পারেন না যে সত্যের অস্তিত্ব আলাদা করে সম্ভব, এটিই হলো অসত্য; সত্য তাই যা নেই, যা কিছু আছে তাই অসত্য, এই বোধ যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, ততক্ষণ আত্ম দুর্দশামুক্ত হয়না। অর্থাৎ যদি ঘুরিয়ে দেখো, তবে মুক্তিই মোক্ষ, যদিও ব্রাহ্মণরা অর্থাৎ বৈদিকরা সাময়িক দুর্দশামুক্তিকেই মুক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন।

পুত্রী, মানবসমাজে ব্যবহৃত দর্শনধারার মধ্যে সর্বোত্তম মিথ্যা দর্শনই এই যে, দেহের মৃত্যুতে জীবনের নাশ হয়। বাস্তব এই যে জীবনের শুরু হয়েছিল সেই ক্ষণে, যেই ক্ষণে আমরা ভ্রমিত হয়েছিলাম এবং ব্রহ্মের থেকে নিজেদের ভিন্ন বোধ করে আত্মের জন্ম দিয়েছিলাম। আর জীবনের সমাপ্তি তখনই সম্ভব, যখন এই ভ্রম চিরতরে দূর হয়ে, আমাদের আত্ম ব্রহ্মে বা শূন্যে চিরতরে লীন হয়ে

যায়। এই লীন হওয়াকেই বলা হয় মোক্ষ। অর্থাৎ পুত্রী, মোক্ষই হলো জীবনের বাস্তবিক অন্ত। মৃত্যু কেবলই এই জীবন নামক গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠার সমাপন; জীবন নামক দুর্দশাগ্রস্ততার একটি অধ্যায়ের সমাপন হয়ে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনাকে ইঙ্গিত করে মৃত্যু, জীবনের অন্তকে নয়, দুর্দশার অন্তকে নয়।

উপরন্তু বলতে পারো, এই জীবনের উদ্দেশ্যই হলো এই দুর্দশার থেকে মুক্তির উপায়ের সন্ধান, আর মৃত্যু সেই উপায়ের সন্ধানের একাকটি পর্বের মধ্যেকার অনুচ্ছেদ। দেহ বা ব্রহ্মাণ্ড ধারণের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দুর্দশার কারণ সন্ধান করি কারণ আমরা সেই দুর্দশার থেকে মুক্তি কামনা করি। যখন আমাদের এই দুর্দশার কারণ সন্ধান এমন একটি অবস্থায় পৌঁছে যায়, যেখান থেকে আর সত্য অর্থে দুর্দশার কারণ সন্ধান সম্ভবপর নয়, তখন আমাদের কাছে নেমে আসে মৃত্যু বা ব্রহ্মাণ্ডের সাময়িক বিনাশ।

পুত্রী, এই দুর্দশারও বহু অনুচ্ছেদ থাকে। আর এর একাকটি অনুচ্ছেদ থেকে মুক্তি যেকেউ অন্যকারুকে করতেই পারেন, যেমন এক বিত্তবান এক দরিদ্রকে দারিদ্রতার দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারেন, একজন বীর্যবান একজন নিঃসন্তানকে সন্তান প্রদান করে দুর্দশা মুক্ত করতে পারেন, ইত্যাদি। কিন্তু সেই সমস্ত দুর্দশামুক্তিই সাময়িক, সম্যক দুর্দশামুক্তি বা মোক্ষ কেউ কারুকে প্রদান করতে পারেন না। প্রতিটি আত্মকে স্বয়ং অনুভূত করতে হয় যে, তাঁর প্রকৃত দুর্দশা তাঁর আত্ম হয়ে অবস্থানের কারণে, ব্রহ্মের থেকে শূন্যের থেকে, সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরাজ করার কারণে। আর তা অনুভব করে, সেই বিচ্ছিন্নতা থেকে স্বয়ংকেই মুক্ত করতে হয়, আর সেই স্বয়ংমুক্তির নামই বুদ্ধধারা অনুসারে মোক্ষ।

তাই মোক্ষ কেউ কারুকে প্রদান করতে পারেন না, কনো ঈশ্বরকটি বা অবতারও পারেন না। ঈশ্বরকটি বা অবতার অন্তিমতম ব্যখ্যা প্রদান করতে পারেন সেই অব্যাক্তের যার থেকে সমস্ত আত্ম বিচ্ছিন্ন, যার মধ্যেই সমস্ত আত্মকে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করতে হয়, যেমন তুমি সেইরূপই এক ব্যখ্যাকে শ্রবণ করছো এক্ষণে । কিন্তু তুমি কি সেই কথা শ্রবণ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হচ্ছ? না পুত্রী, হচ্ছ না । কেন হচ্ছ না?

কারণ তুমি কেবলই সেই ব্যখ্যা শুনছো । যখন সেই ব্যখ্যাকে প্রত্যক্ষ করবে, যখন তা প্রত্যক্ষ করে ব্যখ্যার অতীত অবস্থায় উন্নীত হয়ে গিয়ে, অব্যাক্ত হয়ে উঠবে, তখনই তোমার মোক্ষ নিশ্চিত হবে, তার পূর্বে নয়। অর্থাৎ যেমন এক সত্যজ্ঞান আহরণকারী সাধক তোমার মার্গ দর্শন করতে পারেন, তেমনই এক ঈশ্বরকটি অবতার তোমার শ্রেষ্ঠ মার্গদর্শন করতে পারেন, কিন্তু না তো সাধু, আর না অবতার তোমাকে মোক্ষ প্রদান করতে পারেন। মোক্ষ হলো স্বয়ংকে স্বয়ং মুক্ত করার পদ্ধতি, আর সেই পদ্ধতি হলো পঞ্চভাব। তুমি নিজেকেই নিজে সত্যের থেকে, শূন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনিত্য অস্তিত্বে আবদ্ধ করেছ। তাই স্বয়ংকেই সেই বিচ্ছিন্নতা মুছে ফেলে, শূন্যে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করতে হয়।

সাধুগন তোমাকে সেই পথে যাত্রার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অবতার সাধুদের সেই পথের সন্ধান প্রদান করেন, যাতে সাধুগন আপামরকে সেই পথের সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু মোক্ষযাত্রা সকলকে স্বয়ংই করতে হয়, কারণ সত্য পরিচয়কে সকলে স্বয়ং

ত্যাগ করে এসেছেন, আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে, কারুর হস্তক্ষেপে তিনি সত্যবিচ্ছিন্ন হননি, হয়েছেন স্বেচ্ছায়, তাই স্বেচ্ছাতেই স্বয়ংকে লীন করতে হয় সত্যে।

আর রইলো কথা, তোমার প্রথম প্রশ্নের, অর্থাৎ কাকে এই শিক্ষা প্রদান করা উচিত, পুত্রী, প্রথম সেই শিক্ষা প্রদানের চিন্তা করাই সঠিক নয়। প্রথম নিজেকে সেই সত্য উপলব্ধি করতে হয়। জীবকটির সমাধি হলেই, তাঁর আত্মা বা আত্মভাব নষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায় শূন্যে, তাই তাঁর পক্ষে আর শিক্ষা প্রদানই সম্ভব হয়না। তবে সমাধি হবার পরে যেই পূর্ণতা লীন হওয়া সম্ভব হয়, সেই লীন হবার ভান জীব করতে পারেন ধ্যানের কালে। ধ্যানে আত্ম বিলীন হয়না ব্রহ্মে, কিন্তু আত্ম প্রকৃতিতে লীন হয়ে যান, এবং নিজের অস্তিত্ব সেখানে লয় করে দেন। যতক্ষণ না আত্মর অস্তিত্ব প্রকৃতিতে লয় হচ্ছে, এবং তুমি প্রকৃতিময় হয়ে উঠছো, ততক্ষণ শিক্ষাদানের অর্থ এই যে, তুমি নিজেও ভ্রান্তিতে নিজেকে বিসর্জন দিচ্ছ, এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করছেন, তাঁদেরকেও তুমি সেই ভ্রান্তিতেই বিসর্জন দেওয়াচ্ছ।

হ্যাঁ পুত্রী, তুমি যেটা বলতে চাইছো, আমি তা বুঝতে পারছি। তুমি বলতে চাইছো, অনেক ব্যক্তিই তিলকপোশাক ধারণ করে ভণ্ড হয়েও এই শিক্ষাদান করছেন এবং শিক্ষাদানকে পেশা করে নিয়ে ধনবান হচ্ছেন, এবং তাঁদের কথাও অনেকে শুনছেন, এবং তাঁরাও সেই ভণ্ডের ন্যায়ই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। পুত্রী, ভ্রমের এই জগতে, ভ্রমেরই বিস্তার হবে, আর ভ্রমেরই বিস্তারের প্রয়াস করা হবে, এটিই তো স্বাভাবিক, তাই পুত্রী এঁদেরকে পাপী বা দোষী, এই সমস্ত আখ্যা দিয়ে, নিজের অমূল্য সময়কে বিনষ্ট করো না।

সত্যে মন দাও, অসত্যে নয়। কারা অসত্যের বিস্তার করছে, তাদের বিরোধিতার অর্থ হলো সেই অসত্যকে মান্যতা প্রদান, যা সর্বত ভাবে জীবনের অপচয়। তাই সত্যে মনোনিয়োগ করো, আর সত্যের উপলব্ধি করে, সত্যের ধারার উন্মেলন করো। এটিই যথার্থ কর্ম। যারা যারা সত্যে মনোনিয়োগ করার চেষ্টা করেছেন, সেই সকল অবতার, যেমন বুদ্ধ, মার্কণ্ড, শঙ্কর, নিমাই, গদাধরে চোখ দাও; যেই সকল জীবকটি সত্যে মনোনিয়োগ করার চেষ্টা করেছেন যেমন বাল্মীকি, অশোক, কবির, মিরা, প্রসাদ, মোহনদাস, নরেন্দ্র দত্ত, তাদের উপর মনোনিয়োগ করো। এতেই তোমার মঙ্গল, আর এতেই সকলের মঙ্গল। সকলে স্বতন্ত্র, কারণ সকলেই সেই ব্রহ্ম। আর তাই সকলেই স্বয়ংএর সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

যিনি চাইবেন, তিনিই ভ্রমে আচ্ছাদিত থাকবেন, আর যিনি চাইবেন তিনি ভ্রম থেকে মুক্ত হবেন। তাই কেউ ভ্রমে আচ্ছন্ন থেকে, কারুকে ভ্রমে আচ্ছান্ন থাকার শিক্ষা দিচ্ছেন, এবং যাকে সেই শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি সেই শিক্ষা গ্রহণ করছেন, পুত্রী, যেমন ভ্রম থেকে মুক্ত হবার স্বতন্ত্রতা তোমার আছে, তেমন তাঁদেরও তো স্বতন্ত্রতা আছে, ভ্রমে আবদ্ধ হবার। যেমন কামনাবাসনার থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করার স্বাধীনতা তোমার আছে, তেমন কামনাবাসনায় বদ্ধ থাকার স্বাধীনতাও তাঁদের আছে । তবে তাঁদের এই স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপের বিচার আসছে কেন?

সেই বিচার কার অপমান? তাঁদের ভ্রমের, নাকি তাঁদের অন্তরে থাকা ব্রহ্মের ও প্রকৃতির? পুত্রী, তাঁদের অন্তরের ব্রহ্মপ্রকৃতি নিশ্চয় করে রেখেছেন যে তাঁরা ভ্রমিত থাকবেন, তাই যেখানে যেখানে ভ্রমের বিস্তার হবে, তাঁরা সেখানেই যাবেন। এটি তাঁদের স্বাধীনতা, এবং এটি তাঁদের অধিকারও। তোমার বা আমার, বা স্বয়ং প্রকৃতির এতে কনো আপত্তি জানানোর অধিকার নেই। তোমার অন্তরে যেই সত্য স্থাপিত, তিনি একাই কি ব্রহ্ম? তাঁদের অন্তরে যেই সত্য স্থাপিত, তা কি ব্রহ্ম নন? তবে নিজের ব্রহ্মের সম্মানবৃদ্ধির চেষ্টায় তাঁদের ব্রহ্মের অনাদর কেন করছো, কেন করবে, কোন অধিকারে করবে?

তাই পুত্রী, যারা ভ্রমিত হতে ইচ্ছুক, তাঁরা ভ্রমের পথে যাবার জন্য অবশ্যই স্বতন্ত্র, এবং তাঁদেরকে জোর করে ভ্রমমুক্ত করার প্রয়াস অহেতুক কেবল নয়, অন্যায় ও অধর্মও। হ্যাঁ, তবে তুমি কার উপর সেই অধিকার প্রয়োগ করবে? যিনি তোমার কাছে নিজের থেকে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর উপরেই। তাও কতটা অধিকার স্থাপন করবে, বা কতক্ষণ অধিকার স্থাপন করবে? যতক্ষণ না তিনি নিজের অন্তরে নিরাকার, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্মের সন্ধান না করছেন, ততক্ষণই।

যেই মুহূর্তে তিনি নিজের অন্তরে নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্মের সন্ধান করতে শুরু করে দেবেন, সেই মুহূর্তে নিজের অধিকারকে খর্ব করা অত্যন্ত আবশ্যক পুত্রী। পুত্রী, একটি তরুকে বনস্পতি করার জন্য, তার চারিপাশে বেড়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক যেমন, তেমনই সেই তরু যখন বনস্পতি হয়ে ডালপালা বিস্তার করতে আগ্রহী, তখন সেই বেড়া সরিয়ে নেওয়াও অতি আবশ্যক, কারণ তা না হলে সেই বনস্পতির বৃদ্ধিকেই খর্ব করে দেওয়া হয়।

সত্য শিক্ষার অধিকারী সকলেই; তাই যিনি সত্যশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তোমার কাছে আসছেন, তুমি যদি সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করে থাকো ধ্যানের মাধ্যমে, তবে অবশ্যই তাঁকে সত্যশিক্ষা প্রদান করবে, কিন্তু তার পূর্বে নয়, এবং তিনি ছাড়া অন্য কারুকে নয়। অর্থাৎ প্রথম তোমাকে সত্যশিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত হতে হবে। কেবলই আমার কথা শ্রবণ করে নিয়েছ বলে তুমি সত্যশিক্ষা দেবার অধিকারিণী হয়ে গেলে না। পুত্রী, আমাকে দেখো, আমাকেও প্রথম সত্যশিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে, ধ্যান-সমাধির পরেও বহুবর্ষ লেগে যায় আমার প্রকৃতির, আমাকে সত্যশিক্ষায় ভূষিত করে তোলার জন্য।

তবেই আমি তোমাকে সত্যশিক্ষা প্রদান করতে পারছি। তেমনই তোমার অন্তরে এই সমস্ত কিছু, যা কিছু আমি এক্ষণে তোমাকে বললাম, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। যখন তা সম্ভব হবে, তখনই তুমি সত্যশিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে। যদি এমন না করো, আর যদি সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করার পূর্বেই বাণিজ্যিক চিন্তা নিয়ে সত্যশিক্ষা প্রদান করতে শুরু করে দাও, অন্যকেউ ভ্রমিত হোক বা না হোক, তুমি স্বয়ং এমনই ভাবে নিজের ভ্রমের আচ্ছাদনকে মজবুত করে নিচ্ছ যে, সহস্র ব্রহ্মাণ্ড গঠনের শেষেও সেই আচ্ছাদনের নাশ হবে না। তাই অন্তত স্বার্থচিন্তা করে হলেও, সেই অপকর্ম করো না।

আর শিক্ষা প্রদান করবে কাকে? সকলে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকারী, তাই সম্মুখে যিনি এসেছেন, তিনি অধিকারী কি অধিকারী নন, সেই বিচার করবে না, তবে সম্মুখে যিনি আসেন নি, তাঁর অধিকার থাকলেও, তাকে সেই শিক্ষা প্রদান করবে না, কারণ প্রকৃতি স্বয়ং তাঁকে তোমার সাথে সংযুক্ত করেন নি"।

দেবী দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "সম্মুখে যিনিই উপস্থিত হয়ে আমার থেকে সত্যজ্ঞানের আশা করেন, যদি আমি সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করে থাকি, তবে আমি তাঁকে সত্যের বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা করবো?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "হ্যাঁ পুত্রী, করবে। তবে সেখানে অবশ্যই নিজের বিচার , বিবেক ও অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত রাখবে। স্মরণ রাখবে যে তুমি কর্তা নও, আর কর্ম করতেও পারো না । তাই যা শব্দ তুমি ব্যবহার করছো, তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার কখনোই প্রয়াস করবেনা। সেই শব্দে তোমার শ্রোতারা অনেক সময়েই আহত হবেন, আর তাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা ভ্রমকে আশ্রয় করেই উপস্থাপন করছেন। তবে কখনো যদি দেখো যে তোমার কনো শ্রোতা নিজের ভ্রমকে অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন বলে, তোমার অন্তর থেকে প্রকৃতিনিঃসৃত কথার অপমান করছেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁকে তোমার শ্রোতার তালিকা থেকে বহিষ্কার করবে, বিনা আসক্তি বা বিরক্তিতে।

অর্থাৎ পুত্রী, তোমার প্রতিটি শ্রোতাই ভ্রমে আচ্ছন্ন, তাই না চেয়েও তাঁরা তোমার থেকে শ্রবণ করা কথাকে অস্বীকার করে ফেলবেন। তবে তাঁরা অস্বীকার করে ফেলে, লজ্জিতও হবেন, আর তা সঠিক করে নেবার প্রয়াস করবেন। এমন সমস্ত শ্রোতাকে সর্বদা সাহায়তা করবে, এবং প্রয়োজনে তাঁদেরকে ভৌতিক জীবনে স্থাপিত করেও, তাঁদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু যদি দেখো এমন কনো শ্রোতা রয়েছেন তোমার শ্রোতাতালিকাতে, যারা নিজেকে শূন্য করার প্রয়াসও করছেননা, বরং নিজের ভ্রমতত্ত্বকে আঁকরে ধরে রয়েছেন, এবং তাদেরকে কিছুতেই ত্যাগ করবেন না, এমন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, তাঁকে তৎক্ষণাৎ শ্রোতার তালিকা থেকে বহিষ্কার করবে, কারণ তাঁর প্রকৃতি তখনও তাঁকে ভ্রমমুক্তির অবস্থায় স্থাপিত করেন নি।

পুত্রী, এমন কর্ম করার কালে, সেই ব্যক্তির প্রতি কনো বিরক্তিও রাখবে না, আর দ্বেষও রাখবে না। শুধু এটুকু জানবে যে তাঁর ভ্রমমুক্ত হবার সময় আসেনি, তাই তিনি কিছুতেই নিজের সংস্কারদের থেকে মুক্ত হতে পারছেন না, বা মুক্ত হতে চাইছেন না। ... পুত্রী, সত্যজ্ঞান আহরণ করার জন্য আবশ্যক যা, তা হলো কেবলই শূন্যতা। পূর্বসংস্কার, পূর্ব ভ্রান্তজ্ঞান আমাদের মন ও বুদ্ধিকে আমাদের মনিব করে রেখে দেয়, আর আত্ম বা পুরুষ স্বয়ং সেই মন ও বুদ্ধির দাস হয়ে থেকে যায়।

যার মন ও বুদ্ধির দাস হয়ে আত্ম নিবাস করছেন, তিনি সত্যজ্ঞান আহরণ করার উপযোগী অবস্থায় উন্নত হননি, তাই তাঁকে সত্যজ্ঞান প্রদান করার অর্থ এই যে তাঁর অগ্রগতিকে তুমি বন্ধনে আবদ্ধ করছো। তাই তাঁকে সত্যজ্ঞান প্রদান না করে, তাঁকে ভ্রমের জগতে ফিরে যেতে দাও, আর ফিরে গিয়ে তাঁকে সেই অবস্থায় উন্নীত হতে দাও যেই অবস্থায় স্থিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তাঁর মন ও বুদ্ধি তাঁকে দাশ করে রেখে দিয়েছেন।

অর্থাৎ পুত্রী, শ্রোতার ক্ষেত্রে প্রথম যা প্রদান করা আবশ্যক, তা হলো মন ও বুদ্ধির থেকে তাঁকে মুক্ত হয়ে ওঠার প্রেরণা । সেই আবশ্যকতা যখন আত্ম অনুভব করতে সক্ষম হবেন, তখন তিনি তার উপায়ের সন্ধান করবেন তোমার কাছে। তখন তাঁকে সেই উপায় বলে দাও, যেই উপায়ের অনুসরণ করে তিনি মন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকেমুক্ত হতে সক্ষম হবেন। সেই পদ্ধতি আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তাই পুনরায় সেই কথা বললাম না আর।

যদি কেউ এই মন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট হন, তবে তাঁকে সহায়তা করো সেই ক্ষেত্রে। আর যদি তিনি সচেষ্ট না হন, তবে পুনঃপুন প্রয়াস কর যাতে তিনি সেই কর্মে সচেতন হন, আর তাঁকে এও বুঝিয়ে দাও যে তুমি তাঁকে সত্যবিবরণ প্রদান করতে আগ্রহী, কিন্তু যেহেতু তিনি মন ও বুদ্ধির দাস, তাই তুমি চেয়েও তাঁকে সত্যবিবরণ প্রদান করতে পারছোনা । যদি তোমার এই ইঙ্গিতকে তিনি বুঝেও মন ও বুদ্ধির দাস হয়েই থাকতে আগ্রহী হন, তবে তাঁকে শ্রোতার তালিকা থেকে বহিষ্কার করো, এবং তাঁকে ভ্রমের জগতে নির্বাসনে স্থপিত করো।

যদি সেই নির্বাসনের পরও তিনি বুদ্ধি ও মনের থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট না হন, তবে তাঁর প্রতি কনো আসক্তি বা বিরক্তি না রেখে, তাঁকে চিরতরে ভ্রমের জগতে স্থাপিত করে দাও, কারণ তাঁর এখনো ভ্রমজগতকে ভ্রম বলে জানা বহু দেরী; কারণ ভ্রম জগতে লব্ধ মান সম্মান অপমান তাঁর কাছে তখন অত্যন্ত মূল্যবান; কারণ তাঁর কাছে ভ্রম জগতে লব্ধ ধনাদি অত্যন্ত মূল্যবান; কারণ তাঁর কাছে আত্মমর্যাদা অত্যন্ত মূল্যবান। আর যদি তিনি সেই নির্বাসনের পর পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে চান, তবে তাঁকে পুনরায় মন ও বুদ্ধির থেকে মুক্তির মার্গ প্রদান করো।

যদি তিনি এবারে প্রয়াসশীল হন সেই মুক্তির জন্য, তবে তাঁকে সহায়তা করো। সহায়তা করার জন্য যদি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ করে, তাঁর ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে দিতে হয়, তাও দাও, কিন্তু নীরবে দেবে, অর্থাৎ তাঁকে এই সাহায়তা তুমি করছো, তা বলবে না। আর যখন সেই সমস্ত কিছুর পরে, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়ে যাবেন মন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থেকে, আর দেখবে যে তিনি শরীরের সুস্থতা, প্রাণের আয়ু, বা সামর্থ্য প্রতিভার চিন্তা করা ত্যাগ করেছেন, তবেই তাঁকে সত্যজ্ঞান প্রদান করবে। এই হলো প্রক্রিয়া"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, কখন শিক্ষা প্রদান করার যোগ্য হবো আমি, বা কখন কোন শ্রোতাকে আমি সত্যজ্ঞান প্রদান করবো, সেই সমস্ত কিছু আমার কাছে এখন দিনের আলোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু এবার আমি জানতে চাই যে, কি ভাবে সেই শিক্ষা আমি প্রদান করবো তাঁকে? ... কেবলই কি সত্যজ্ঞানের স্থাপন করবো? সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন যাতে, তার জন্য কি কনো ভাবে প্রয়াসশীল থাকতে পারি আমি? যদি পারি, তবে কি করে সেই প্রয়াস করতে পারি আমি? আমাকে সেই কথা বলুন পিতা, আমার নিজেকে সত্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত করে, আমার সম্মুখে আমার প্রকৃতি যাদেরকে আনবেন, তাঁদেরকেও সেই সত্যের মার্গ দেখাবার ইচ্ছা হচ্ছে, ইচ্ছা হচ্ছে অনেক পুরুষের সাহায্য করতে, ইচ্ছা হচ্ছে অনেকের দুর্দশাকে চিরতরে সমাপ্ত করে দিতে। কি করে আমি তা করতে পারি?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন তৃপ্তির হাস্য হেসে বললেন, "পুত্রী, মানুষ তাই করতে পারে, যেই কর্মের প্রতি তাঁদের নেশা উৎপন্ন হয়; নেশা অর্থাৎ কনো এক অভ্যাসের প্রতি তীব্র আকর্ষণ । যতক্ষণ না মানুষের কনো কর্মের প্রতি নেশা উৎপন্ন হয়, ততক্ষণ না তো মানুষের সেই কর্মের প্রতি নিষ্ঠা জন্ম নেয়, না একাগ্রতা স্থাপিত হয়, আর না সেই কর্মের পথে তিনি সঠিক ভাবে অগ্রসর হতে পারেন। পুত্রী, অনেকে বলেন, কঠিন অধ্যাবসায়ের কনো বিকল্প নেই। সঠিক বলেন তাঁরা, সত্যই কঠিন অধ্যাবসায়ের কনো বিকল্পই হয়না, আর আরো সত্য বললে, যে যতই প্রতিভাবাণ হন না কেন, অধ্যাবসায় ছাড়া সে কিছুতেই অগ্রগতি লাভ করতে পারেন না।

কিন্তু এই যে কঠিন অধ্যাবসায়, নেশা যদি স্থাপিত না হয়, তবে সেই অধ্যাবসায় করাই সম্ভব হয়না। অর্থাৎ জোর করে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করলে, কর্ম সম্পাদিত হয়না, বরং সেই প্রাণটিই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রাণপণে প্রচেষ্টা করতে অবশ্যই হয়, কিন্তু সেটা নেশার জন্য, তবেই তাতে প্রাণ বসে যায়, প্রাণ চলে যায়না।

পুত্রী, তুমি অনেককে তামাকের নেশা করতে দেখেছো, অন্য মাদকেরও নেশা করতে দেখেছো। ভালো করে অবলোকন করেছ তাঁদেরকে? যদি করে থাকো, তাহলে দেখবে তাঁরা অত্যন্ত একাগ্রচিত্ত নিজেদের নেশার বস্তুর প্রতি। সেটির কারণ মাদক নয়, সেটির কারণ নেশা। নেশা কেবল মাদকেই হয়না, সাখ্যাত ভগবতীর পরমাবতার, ঠাকুর গদাধর চাটুজ্জে বলে গেছিলেন সব থেকে ভয়ানক নেশা হলো কামিনীকাঞ্চনের নেশা।

হ্যাঁ পুত্রী, কামিনী অর্থাৎ দেহকাম, এবং কাঞ্চন অর্থাৎ ধনসম্পদ, এই দুইয়ের নেশাতে সম্পূর্ণ মানবজগত এক্ষণে নেশাগ্রস্ত, এবং তাই দেখো পুত্রী, সেই নেশার জন্য যখনই দেহকাম পূর্ণ হবার প্রসঙ্গ ওঠে মানুষের সামনে, তখনই সমস্ত অন্যবিষয় থেকে মন উঠে, সেই দেহকাম বিষয়ের উপরই তাঁদের মনোনিয়োগ হয়ে যায়। একই ভাবে যেই বিষয়ের উপরই চর্চা হোক না কেন, যখনই ধনসম্পদের প্রাপ্তি বা ক্ষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই সমস্ত বিষয় থেকে মানুষের মন উঠে এসে, সেই ধনসম্পদ বা কাঞ্চনে আবদ্ধ হয়ে যায়।

মাদকের নেশা ভালো কি খারাপ, কামিনীকাঞ্চনের নেশা ভালো কি খারাপ, সেই বিশ্লেষণ করতে আমরা এখানে স্থিত নই, তাই সেই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমরা নাক গলাবো না, কিন্তু যেই কারণে এই সমস্ত দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করলাম, তা হলো নেশার গুনাগুণ। পুত্রী, কারুর কাছে কনো ক্রীড়া হলো নেশা, তো কারুর কাছে খ্যাতির জন্য হাঁকপাঁক করাই হলো নেশা, কারুর কাছে কনো কলাশিল্প যদি নেশা হয়, তো কারুর কাছে বিদ্যা গ্রহণ করা এবং বিদ্যার ভাণ্ডার নিজের কাছে স্থাপন করাই নেশা ।

ঠিক তেমনই, অধিক মানুষের ক্ষেত্রেই মাদক এবং কামিনীকাঞ্চনই হলো তাঁদের নেশা। কিন্তু কথা এই যে, নেশা যার যেখানে, তাঁর একাগ্রতাও ঠিক সেইখানেই। নেশার গুণই হলো একাগ্রতা বৃদ্ধি করা, নেশার সদ্গুনই হলো নিষ্ঠা নির্মাণ করা। ... আর এই নেশা কি করে নির্মিত হয়? নেশা হলো তাই যাতে সমস্ত পঞ্চভূত একত্রে মেতে ওঠে, আর তাতে স্বয়ং পুরুষ বা আত্মও নিমজ্জিত হয়ে যায়, বা বলতে পারো মজলিশে মেতে থাকেন।

আর যেহেতু সমস্ত ভূত, এবং স্বয়ং পুরুষ তাতে মেতে থাকেন, তাই নেশার বিষয় উত্থাপিত হলেই, একাগ্রতা এসে যায়, নেশার চিন্তা করলেই নিষ্ঠা এসে যায়। আর নেশার আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, যার যাতে নেশা, তার কনো ভূত কখনোই সেই বিষয়ের প্রতি তৃপ্ত হয়না। অর্থাৎ, যিনি মাদকের নেশা করেন, তিনি সর্বক্ষণ মাদকে ডুবে থাকলেও, তাঁর কনো বিরক্তি নেই, আর কনো সময়েই মনে হয়না যে আর মাদকের প্রয়োজন নেই, তৃপ্ত হয়ে গেছি আমি।

ঠিক একই ভাব যিনি কামিনীর নেশা করেন, তাঁরও কামিনীর প্রতি তৃপ্তি জন্মায় না, অনন্ত কামসুখ ভোগ করলেও, তাঁর তৃপ্তি হয়না। আবার যিনি কাঞ্চনের অর্থাৎ ধনসম্পত্তির নেশা করেন, তাঁর অনন্ত ধনঐশ্বর্য থাকলেও, তাঁর তৃপ্তি হয়না, আর সহস্র ধনেও তাঁর বিরক্তি জন্মায় না। তাই পুত্রী, যার নেশা হলো সত্যজ্ঞান অর্জন করা, সত্য অর্থে, তিনিই সত্যজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। যদি সত্যজ্ঞান অর্জন করাই তাঁর নেশা হয়, তবে সত্যজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন হলেই, তাঁর একাগ্রতা জন্ম নেয়; তাঁর সম্মুখে সত্যজ্ঞান বিষয় উত্থাপিত হলেই, নিষ্ঠা প্রকাশ পায়; কখনোই তিনি সত্যজ্ঞান অর্জনে বিরক্ত হননা, আর কখনোই তিনি সত্যজ্ঞান অর্জনে তৃপ্ত হননা, আর সর্বক্ষণ তৃপ্ত হবার ব্যকুলতা থাকে।

কেন বললাম পুত্রী, এই তৃপ্ত না হওয়ার কথা? পুত্রী, সত্য কি, তা ব্যক্ত তো করা যায়না, কিন্তু তার অন্তিম সম্ভব ব্যখ্যা তোমাকে ইতিমধ্যেই প্রদান করেছি, আর তার থেকে তুমি এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, উপনিষদ যেমন বলেছে, অর্থাৎ পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত করেই সত্য উদ্ঘাটন করতে হয়, অর্থাৎ একটি খোলা ছাড়িয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলে সত্যলাভ অসম্ভব। তাই প্রয়োজন নেশার, কারণ একমাত্র নেশা করলে, তবেই একটি খোসা ছাড়িয়ে তৃপ্ত হবেন না সেই পুরুষ। একের পর এক খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে যতক্ষণ না পূর্ণ সত্য অর্থাৎ শূন্যে স্থাপিত হবেন, ততক্ষণ তিনি তৃপ্ত হবেন না।

অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যতক্ষণ না তৃপ্তি-অতৃপ্তির অতীত অবস্থায় স্থিত হচ্ছেন পুরুষ, ততক্ষণ তাঁর সত্যলাভ সম্ভবই নয়, আর সেই একাগ্রতা, সেই নিষ্ঠা, সেই বিরক্তিহীনতা একমাত্র নেশার মধ্যে স্থিত হয়েই লাভ করা সম্ভব। তাই যিনি সত্যলাভ করতে চাইছেন, তাঁকে সত্যলাভের নেশা করতে হয়, তা সেই ব্যক্তি তুমি স্বয়ং হও, বা তোমার শিষ্য হন। পুত্রী, প্রতিবার একটি করে ভ্রমের খোলা আমাদের থেকে অপসারিত হয়, প্রতিবার আমরা কিছুক্ষণের জন্য তৃপ্ত অবশ্যই হই, কিন্তু যদি নেশা করি সত্যলাভের, তবে সেই তৃপ্তি আমাদের মধ্যে অধিকক্ষণ বিরাজ করবে না, আমরা পুনরায় আরো একটি খোলা ছাড়াবার প্রয়াস করতে উদ্যত হবো, আর তবেই সত্যলাভ সম্ভব।

ইন্দ্রিয়ের খোল ছাড়ানোর পর, আমরা এক এক করে সমস্ত ভূতের খোল থেকে নিজেদের মুক্ত করবো, আর শেষে পুরুষের খোল থেকে মুক্ত করে, অন্তে প্রকৃতির খোল থেকেও নিজেদের মুক্ত করবো। তবেই আমরা এমন অবস্থায় উপস্থিত হবো যা শূন্য, যা একমাত্র সত্য কিন্তু স্বয়ং অসত্য, আর তখনই আমরা তৃপ্তি-অতৃপ্তি উভয়ের থেকেই মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবো। তাই পুত্রী, স্বয়ংও

সত্যলাভের নেশা করো, আর যদি তোমার কাছে প্রকৃতি কারুকে অনুগামী করে রেখে দেন, তবে তাঁকেও নেশাগ্রস্ত করার প্রয়াস করো; যদি সক্ষম হও, তবেই তাঁর সত্যলাভ সম্ভব, নচেৎ অসম্ভব"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু পিতা এই নেশা স্থাপন করবো কি করে? মাদকের নেশা তো একাধিকবার মাদক গ্রহণ করলেই হয়ে যায়, আর তাই সেই নেশাকে ধারণ করা সর্বাধিক সহজ। কামিনীকাঞ্চনের নেশা স্থাপন করা আরো অধিক সহজ, কারণ একটিবার তার প্রতি আকৃষ্ট হলেই, তা নেশা হয়ে স্থাপিত হয়ে যায় আমাদের মধ্যে। কিন্তু এই সত্যলাভের নেশা কি করে করা বা করানো যায়?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যবদনে উত্তর দিলেন, "পুত্রী, মানুষ বিচিত্র অনুভূতির নেশা করেন। মাদক সেবনের ক্ষেত্রে তেমনই বিচিত্র অনুভূতি হয় বলেই, এতো সহজে কেবল মানুষ নয়, সকল জীব তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তেমনই বিচিত্র অনুভূতির সাখ্যাত করতে হয়, যাতে আমরা আকর্ষণ অনুভব করি, আর সেই বিচিত্র অনুভবের প্রথম চরণ হলো মনঃসংযোগ যেখানে ইন্দ্রিয়দের অতিতে স্থাপিত হওয়া যায়, এবং দ্বিতীয় হলো ধ্যান যেখানে ভূতদের অতিতে স্থাপিত হওয়া যায়, এবং তৃতীয় হলো মহাভাব যেখানে আত্ম বা পুরুষের অতিতে স্থাপিত হওয়া যায়।

পুত্রী, ইন্দ্রিয়দের অতিতে যদি যেতে হয়, তবে নিয়ম এই যে যেকোনো একটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে, বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হয়। একত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমরা স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রিয় করতে পারিনা, কারণ তাতে আমাদের ভূতরা এতটাই বিচলিত হয়ে যায় যে, আমাদেরকে একাগ্রতা অর্জন করতে দেয়না। তাই যেকোনো একটি ইন্দ্রিয়কে অতিসজাগ রেখে, অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়দের নিষ্ক্রিয় করে দিতে হয়।

এমন করার সময়ে, যেই ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখবে, তাকে একটিই কর্মে নিযুক্ত রাখবে, অর্থাৎ যদি দৃষ্টিকে সজাগ রাখো, তবে একটিই বিন্দুতে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে, যদি শ্রবণশক্তিকে সজাগ রাখো, তবে যেকোনো একটু ধ্বনকেই শুনতে থাকবে, যদি স্বাদকে সাধো, তবে একটিই স্বাদকে গ্রহণ করতে থাকবে, যদি ত্বকের অনুভবকে সাধো, তবে ত্বকের একটি স্থানেই পীড়া প্রদান করে, তাকে অনুভব করতে থাকবে, বা যদি ঘ্রাণকে সাধো, তাহলে যেকোনো একটি ধারার ঘ্রাণকেই গ্রহণ করতে থাকবে।

পুত্রী, যখন এমন অভ্যাস করবে, তখন বাকি ইন্দ্রিয়রা ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, আর একই ক্রিয়া করতে থাকার জন্য, যেই ইন্দ্রিয় সেই ক্রিয়া করছিলো, তার কাছেই সেই ক্রিয়া করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, আর যাই তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, তাই সেও সেই ক্রিয়া থেকে বিরত হয়ে যাবে। আর যখনই সে বিরত হবে, তখনই তুমি পঞ্চইন্দ্রিয়ের অতীত হয়ে যাবে, আর তখন ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে যাবে, তখন যা কিছু ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তির কারণে অনুভব করছিলে, তা সমস্তই হারিয়ে যাবে, আর যা কিছুকে ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তির কারণে অনুভব করতে পারছিলেনা, অর্থাৎ পঞ্চভূত, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সুষুম্না, এবং পিঙ্গলা, তাদের অনুভব করতে পারবে।

পুত্রী, যেই অনুশীলনের কথা বললাম, সেই অনুশীলনে তুমি সাফল্যের দিকে এগোচ্ছ, তা তখনই বুঝতে পারবে যখন পিঙ্গলার মধ্যে দিয়ে উষ্মবায়ু উপরে বা নিচে যাতায়াত করার ক্রীড়া হতে থাকবে। তবে পুত্রী, যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়দের সাধা সম্ভব হয়ে যাবে, তখন কুম্ভক হয়ে যাবে, অর্থাৎ তুমি তোমার দেহের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, অর্থাৎ তখন আর উষ্মবায়ুকে অনুভব করতে পারবে না। যিনি এই অবস্থায় স্থাপিত হতে পারেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। এবার কথা হলো কুম্ভক বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছ কেন তুমি?

পুত্রী, আমাদের পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্তই দেহের সাথে যুক্ত, আর এই সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রেই আমাদেরকে পঞ্চমভূত অর্থাৎ মৃত্তিকাতত্ত্ব বা দেহের বোধ করায়। তাই যখনই ইন্দ্বিয়াতীত হয়ে উঠবে, তখনই দেহের বোধ চলে যায়, আর তখনই কুম্ভকের অনুভব হবে। আর এই বিচিত্র অনুভব হওয়া মাত্রই একটি নেশার সঞ্চার হতে থাকে। তবে যদি তোমার শিষ্যের মধ্যে এমন লক্ষণকে দেখতে শুরু করো, তাঁকে অবশ্যই একটি কথা বলে দেবে, তুমি সত্যলাভের উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে যাত্রা করছো, তবে পথচলা এই সবে শুরু, এখনো বিস্তর পথ বাকি।

পুত্রী, এর থেকে অধিক কিছু বলবে না তাঁকে। কেন? কারণ এই যে, যখন এই কুম্ভককে অনুভব করবেন তিনি, তখন ক্রমাগত প্রয়াস করতে থাকবেন তিনি এর, ক্রমাগত অভ্যাস করতে থাকবেন এর; তাঁর কুম্ভক হবে; তিনি তৃপ্তও হবেন। কিন্তু তোমার কথা যে এই পথচলা শুরু, তা তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করবে, আর সে সমানে এই কুম্ভকের প্রতি তৃপ্তিকে হারিয়ে ফেলবেন, আর সমানে সম্মুখে যাত্রার পথ খুঁজবেন। কিন্তু তা খুঁজে পাবেন না তিনি।

যখন একান্ত চেষ্টা করেও আগে যাবার পথ খুঁজে পাবেনা সে, তখন সে তোমার শরণাপন্ন হবে, আর তখন তোমার কর্তব্য হলো প্রকৃতির সাথে তাঁকে পরিচয় করানো। প্রকৃতিই যে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রকৃতির নির্দেশে যদি তিনি চলতে পারেন, তবেই তিনি সত্যলাভ করবেন, এই কথাকে তার অন্তরে স্থাপন করে তাঁকে পুনরায় পঞ্চভাবের ক্রিয়া করতে দাও। সে প্রয়াস করবে প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য, কিন্তু ব্যর্থ হবে। কেন? কারণ তাঁর ভূতরা তাঁর পথকে আটকাবে, যা তুমি ইতিমধ্যেই জানো। তাই সে আবারও তোমার শরণাগত হবে।

আর এবার তুমি মনবুদ্ধিকে অত্যাচার করে, তাঁদের থেকে তাঁকে মুক্ত হবার মার্গ দেখাও। ... পুত্রী, তুমি বলবে, এই সমস্ত কিছু একত্রে বললেই তো হয়! কিন্তু না পুত্রী, যেমন যেমন একটি মানুষের জিজ্ঞাসা জন্মায়, তেমন তেমনই উত্তর প্রদান করতে হয়, তবেই সেই উত্তর তাঁর স্মরণ থাকে। যদি কারুর মধ্যে কনো প্রশ্ন জন্মানোর পূর্বেই সেই প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে সেই প্রশ্নটিই তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় না, আর তাই তাঁর মধ্যে সেই প্রশ্নের উত্তর লাভ করার ব্যকুলতাও জন্ম নেয়না। আর যদি তা জন্ম না নেয়, তবে সেই উত্তরও তাঁর নেশাকে প্রসারিত করেনা।

তাই অপেক্ষা করবে তোমার শিষ্যের মনে প্রশ্নের উদয় হবার। আর একবার তা উদিত হলে, তবেই সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে । যেমন ধর এইক্ষেত্রে, তুমি যখন প্রকৃতির সত্য জানাবে, তখন তোমার মধ্যে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার ইচ্ছা বিস্তার হবে, তবে সেই ইচ্ছা ব্যকুলতায় পরিণত তখনই হবে যখন তুমি হাজারো প্রয়াস করে প্রকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে না। আর সেই ব্যকুলতার উত্তরে যখন তুমি মনবুদ্ধিকে অত্যাচার করার কথা বলবে, তখন সেই অতিমানবিক কর্ম তাঁর কাছে সহজ হয়ে যাবে। কেন? কারণ তাঁর প্রকৃতির সাখ্যাত পাবার ব্যকুলতাই তাঁর এই কাজকে সহজ করে দেবে।

এরপরটা তুমি তো জানোই পুত্রী! ... যেমন যেমন মনবুদ্ধি অপসারিত হবে তাঁর পুরুষের উপর থেকে, তেমন তেমন তাঁর মধ্যে বিশ্বাসের জন্ম হবে, আর তেমন তেমন ইরার জাগরণ হবে তাঁর মধ্যে। আর একবার ইরার জাগরণ হয়ে গেলে, তোমার আর কনো ভূমিকাই থাকেনা, কারণ ইরা অর্থাৎ প্রকৃতিই তখন তাঁর দায়িত্বভার নিয়ে নেবেন, এবং তাঁকে ভূতদের অতীতে নিয়ে গিয়ে ধ্যান করিয়ে দেবেন এবং তাঁর পুরুষকে প্রকৃতির সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করবেন, এবং ক্রমশ সেই প্রেম পরিপক্ক হলে, প্রকৃতিই আত্মসমর্পণ করে, তাঁর পরুষকেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবেন, এবং মহামিলনে আবদ্ধ হয়ে, সমাধি প্রদান করে, তাঁর মোক্ষকে সুনিশ্চিত করবেন"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "যতভাবে অব্যাক্তকে ব্যক্ত করা সম্ভব, সেই সমস্ত কিছু আপনি আমাকে বলেছেন। কিন্তু এরপরেও আমার মধ্যে কিছু প্রশ্ন আসছে, তবে সেই প্রশ্নেরও আগে আমার মধ্যে একটি ইচ্ছা জন্মাচ্ছে। ... পিতা, আপনি পরাপ্রকৃতিকে মাতা সর্বাম্বা অর্থাৎ সর্বকিছুর অম্বা বা জননী নাম দিয়ে, তাঁর আরাধনা করেন, এবং নিজেকে তাঁর কাছে সর্বক্ষণ সমর্পিত রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে বহু লীলা করেছেন। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে, সেই লীলা সম্বন্ধে জানতে। আমাকে সেই লীলার কথা বলুন কৃপা করে"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "বেশ পুত্রী, প্রথম তোমার ইচ্ছাকে আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো মাতা সর্বাম্বার মিহালীলার বিবরণ প্রদান করে। সত্য বলতে আমার নিজের আরাধ্যের বিষয়ে শুনতে চেয়ে তুমি আমাকেই ধন্য করেছ। শোনো তবে সেই কথা"।

শ্রীশ্রী সর্বাম্বা মহালীলা

দেবী দিব্যশ্রীর ইচ্ছার মান রাখতে সচেষ্ট হয়ে পূর্ণব্রহ্ম অবতার শ্রীদাশ ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, তোমার ইচ্ছামত মাতার বেশ কিছু লীলার কথা শ্রবণ করাচ্ছি তোমায়, যেই লীলার মাধ্যমে তিনি আমাকে আমার স্বরূপে স্থিত করিয়ে, আমাকে শিক্ষিত করেছেন আমার স্বরূপকে স্বীকার করার ব্যাপারে। মাতা আমারই চেতনারূপে প্রকাশিতা, আর আমার আত্মাকে তিনি পতিরূপে গ্রহণ করে, দুই সন্তান বিচার ও বিবেকের জননী। তিনি তাঁদেরকে পঞ্চভূতের শিক্ষা দেবার জন্য, ত্রিবিকারের শিক্ষা দেবার জন্য, এবং মায়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনটি লীলা করেছিলেন। আর সেই লীলার উপরান্তে, আমার আত্মার মধ্যে বিচার ও বিবেক লীন হয়ে গিয়ে, নিজেদের অস্তিত্বের নাশ করেন এবং আমার আত্মা তাঁদের গ্রহণ করে পুরুষত্বের অহংকার ত্যাগ করে, প্রকৃতিময় হয়ে শ্যামা হয়ে ওঠেন।

কিন্তু শ্যামা হয়ে উঠলেও, তাঁর মধ্যে দুটি ভাবের অবস্থান ছিল, একটি বিকারেরে ভাব, এবং একটি সখ্যতার ভাব। এই দুই ভাবের নাশ না হলে, আমার আত্মা যে পুরুষত্বত্যাগ করে মাতার মধ্যে লীন হতে পারছিলেননা! তাই মাতার সেই মহালীলার কথাও শ্রবণ করো। আর এঁর উপরান্তে, যখন আমার আত্মা মাতার মধ্যে লীন হয়ে ব্রহ্মত্বলাভ করে সমাধি বা নির্বাণ লাভ করেন, তখন মাতা আমার সমস্ত ভ্রান্তভাবের বিনাশ করেন, নয়টি রূপ ধারণ করে। সেই সমস্ত নবরূপের কথাও শ্রবণ করো"

চিৎলীলা

প্রভু ব্রহ্মসনাতনের শ্রীমুখ থেকে অমৃত কথা শ্রবণের ইচ্ছা নিয়ে দেবী দিব্যশ্রী অপেক্ষা করলে, প্রভু ব্রহ্মসনাতন তাঁর অন্তরে প্রকাশিতা পরাচেতনা, যার নামকরণ তিনিই করেছিলেন মাতা সর্বাম্বা রূপে, তিনি তাঁরই বিচার ও বিবেককে কি ভাবে শিক্ষিত করে তাঁরই আত্মার মধ্যে লীন করে, তাঁর আত্মার পুরুষত্বের অহং নাশ করে, তাঁকে শ্যামা করে দিয়েছিলেন, সেই কথাই অলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন -

ভূতভবিষ্যৎ অধ্যায়

পুত্রী, মাতা সর্বাম্বার দুই পুত্র, বিচার ও বিবেকের মধ্যে তাঁদের মাতাকে জানার ব্যকুলতা জন্মালে, মাতা সর্বাম্বা তাঁদেরকে ভ্রমণে নির্গত হতে বললেন। ভ্রমণে নির্গত হয়ে, তাঁরা এক ধুধু প্রান্তরে, একটি ছোট পরিবারকে দেখতে পান। সেই পরিবার খুব যে ছোট ছিল, তেমনটা নয়। ... সেই পরিবারে একটি স্বামী ও একটি স্ত্রী থাকতেন তাঁদের একটি কিশোরী কন্যাকে নিয়ে। আর সেই স্বামীটির তিনটি ভ্রাতা থাকতেন। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ছয় সদস্যের পরিবার ছিল তা । ... কুটিরটিও বেশ বড় ছিল, যদিও বিশাল উন্মুক্ত স্থানে সেই কুটিরটিই একটিমাত্র গৃহ, তাই দূর থেকে দেখে কুটিরটিকে ছোট মনে হচ্ছিল।

বিবেক ও বিচার সেখানে উপস্থিত হয়ে, নিজদের পরিচয় রূপে, মাতা সর্বাম্বার সন্তান বললে, সকলে গদ গদ হয়ে যান, এবং সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন দুইভ্রাতাকে। ... কিন্তু সেই ছোট কিশোরী কন্যাটি প্রণাম না করে, ছুটে কুটিরের বাইরে চলে যান। ... বিবেক ও বিচারের সেই কন্যার আচরণ খারাপ লাগেনা। ছোট মেয়ে, তাই ছোটদের মতই স্বভাব, এমন বোধ করেন। ... যদিও, সেই কুটিরের গৃহিণী, দেবী ইরা, সেই কন্যাটিকে বহুবার 'ভদ্রা', 'ভদ্রা', যা সেই কন্যার নাম, সেই নাম ধরে ডাকলেন, তবুও সেই কন্যা এলেন না।

যাই হোক, সেই কুটিরের সকলেই অত্যন্ত ভদ্র এবং অতিথিসেবাপরায়ণ। কুটিরস্বামী, বাসব অত্যন্ত আনন্দের সাথে বললেন, "অতিথি সদাই দেবসম, কিন্তু আমাদের অতিথি দেবসম নন, সাখ্যাত দেবতা। ... আপনারা যতদিন থাকতে চান, ততদিন থাকুন। ... এখানে আপনাদের কনো অসুবিধা হবেনা । ... আপনাদের এখানে আগমনের হেতু আমরা প্রশ্ন করবো না নাথ, কারণ আমাদের কাছে আপনাদের আগমন যে আমাদের উপর করুণার বর্ষণ ব্যতীত কিছুই নয়"।

বিচার বললেন, "তো আপনারা এই ফাঁকা স্থানে একাকী থাকেন। ... আপনাদের জীবিকা কি ভাবে চলে?" ... বাসব বললেন, "প্রভু, আমরা ছোট মানুষ, আমাদের তো জীবন আর জীবিকা আলাদা বলে কিচ্ছু হয়না, আমাদের জীবনই জীবিকা। আমাদের কন্যার যদিও এতে ভারি আপত্তি। তাঁর কথা হলো আমাদের জীবিকার থেকে জীবনকে পৃথক হতে হবে। ... তা কি হয় বলুন? আমরা কি আর বড় মানুষ যে, আমাদের জীবিকার পরেও জীবনের চিন্তা করার সময় থাকবে?...

আমার ভ্রাতা, সুরাসঙ্গী ভদ্রাকে, মানে আমাদের কন্যাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে কিছুতেই মানতে চায়না। সে ঘুরে ফিরে আমাকে বাধ্য করে, তাঁকে ধর্মকথা শোনানোর জন্য। ... সঙ্গী, অর্থাৎ আমার ভ্রাতা সুরাসঙ্গী, এতে আমার উপর খুব রাগারাগি করে। ... কিন্তু কি বলুন তো নাথ, একটি মাত্র মেয়ে আমাদের। তাঁর সাধও কি করে অপূর্ণ রেখে দিই! "

বিচারের কাছে এই বাসবের কথা বেশ রোমাঞ্চকর লাগে। ... তিনি বলেন, "তো জীবিকা রূপে আপনারা কি করেন?" ... বাসব বললেন, "এই যে উন্মুক্ত স্থান, তাতে ক্ষেতি করি, আনাজাদি ফলন হয়, কিছু ফলের বৃক্ষও আছে। তাই দিয়ে আমাদের চলে যায়। ...

আমি, আর আমার ভ্রাতাদ্বয়, মারুত আর পাবক, এই তিনজন সেই ক্ষেতি করি"। ... বিচার বললেন, "আপনার এই ভ্রাতা, অর্থাৎ সঙ্গী?" ... বাসব বললেন, "সে সমস্ত ব্যাপারে ধারণা রাখে। তাই সে-ই আমাদেরকে সমস্ত কৌশল বলে দেয়"। ...

দেবী ইরা এবার কন্যাকে মানিয়ে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হলে, ব্যথিত চিত্তে এসে বললেন, "ক্ষমা করবেন নাথ, ছোট তো, বোধশক্তি কম। ... আপনারা কারা, তা যদি বুঝতো, নিশ্চয়ই আসতো। ... তবে চিন্তা করবেন না, ওর নতুন মানুষের সাথে মিশতে একটু কষ্ট হয়, তবে, একবার মিশে গেলে, খুব কাছের মানুষ করে নেয় । ... আপনারা তো আছেন এখানে। ও ঠিক মিশে যাবে আপনাদের সাথে। ... এই দেখুন না, আমার দেবর, মারুত, সে তো এখানে থাকতো না। সে অন্যত্র ক্ষেত্র প্রস্তুতের কর্ম শিখতে গেছিল, যখন আমি গর্ভবতী তখন। ... কিন্তু পরে পরে, কত সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ওর সাথে। ... এখন তো ওঁকে ঘিরেই সারাদিনটা কাটে ভদ্রার"।

বিবেক বললেন, "কেন মহাশয় মারুত! ... আপনি কি করেন, যার কারণে ভদ্রা আপনার সাথেই সারাদিন থাকে?" ... মারুত হেসে বললেন, "ও কিছু না নাথ, আমি ওর খেলার সাথি। ... তবে খেলার ছলে, আমাদের প্রিয় কন্যাকে বিভিন্ন উদ্ভিদের সাথে পরিচয় করাই, যা আমাদেরকে দীর্ঘায়ু করে রাখে, এই আর একি। ... অবশ্য, আমি এমন কিছু বিদ্যাও শেখানোর চেষ্টা করতাম, যা আমাদেরকে দীর্ঘায়ু হবার চিন্তার থেকে দূরে রেখে, আমাদেরকে অধিক সচেতন করে তোলে সত্য উপলব্ধির প্রতি। ... তবে, ভদ্রার একটু ধর্মচর্চার প্রতি মন তো, আর যেমন দাদা বললেন, আমাদের জীবিকা ধারণ করার পর, আর জীবনের ধারণা করার সময় কোথায়। সেই কথাই স্মরণ করিয়ে, ভ্রাতা সঙ্গী আমাকে সেই সব বিদ্যা, ভদ্রাকে শেখাতে বারং করেন। ... ঠিকই বলেন, তাই আমি আর সেই বিদ্যা শেখাই না ভদ্রাকে"।

এবার বিচার পাবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর আপনি ক্ষেতি করা ছাড়া কিছু করেন?" ... পাবল হেসে বললেন, "নাথ, ওই আমাদের কন্যার সাথে একটু সময় কাটানো; আসলে সেটা আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় কর্ম"। ... বিচারের কাছে এই পরিবার বড়ই মজাদার লাগছিল। সেই মজা থেকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি করেন আপনি আপনাদের কন্যার সাথে?" ... পাবক হেসে বললেন, "আমি ওঁকে রন্ধন শেখাই, যদিও ওর মাতাও ওঁকে রন্ধন শেখান। ... আর তার সাথে সাথে আমি ওঁকে সমস্ত কর্ম দ্রুত করার ব্যাপারে শিক্ষা দিতাম। ... আসলে, আমরা পাঁচজন, আর আমাদের বৌদিকে নিয়ে ছয়জন । ... কিন্তু সে তো একা। ... তাই চেষ্টা করছিলাম যে সকল কর্ম কি করে তাড়াতাড়ি করা যায়। ... কিন্তু ভ্রাতা সঙ্গী আমাকে সঠিক জিনিস দেখিয়ে দিলেন। তিনি দেখালেন, তাড়াতাড়ি করার শিক্ষা প্রদান করার ফলে, ভদ্রা তাড়াতাড়ি সমস্ত কিছু করে, ওর পিতা, আমাদের দাদার কাছে বসে, ধর্মশিক্ষা নিতে চায়। ... তাই, আমি আর সেই দ্রুততার শিক্ষা প্রদান করিনা"।

বিবেক হেসে বললেন, "আর দেবী ইরা! আপনি কি করেন?" ... দেবী ইরা হেসে উত্তর দিলেন, "এই গৃহকর্ম, রন্ধনকর্ম, আর কুটিরকে সুসজ্জিত রাখার কর্ম" । ... বিচার বললেন, "আর সেই সমস্ত কিছু কন্যাকে শেখান?" ... দেবী ইরা বললেন, "প্রথমে আমি

সেইসমস্ত কিছু শেখাতে চাইনি। প্রথমে আমি আমার কন্যাকে এই গৃহ, এই কুটিরই সমস্ত কিছু নয়, সেই শিক্ষা দিতাম। ... পরে, ভ্রাতা সঙ্গী আমার পতিদেবকে আমার এই শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে অপশিক্ষা, সেই কথা বলতে, তাঁর নির্দেশে, এখন সেই সমস্তই শেখাই, যা আমি করি"।

সুরাসঙ্গী বিকৃত হাস্য হেসে বললেন, "পুত্রীর মধ্যে এই যে ধর্মচিন্তা, সেই বীজ তো বৌদিই ঢুকিয়েছিলেন ওর মধ্যে!... আপনারাই বলুন, আমাদের মত পরিবারে অসব কি গুরুত্ব পেতে পারে?" ... দেবী ইরা, সেই কথাতে একটু লজ্জিত বোধ করলেন, যা বুঝিয়ে দিল বিবেক-বিচারকে যে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন।

সমস্ত কিছু মিলিয়ে, এই পরিবার তাঁদের কাছে বেশ অদ্ভুত লাগে। ... সকলকেই জানা হলো, কেবল তরুণী ভদ্রার সাথে তাঁদের আলাপ হলো না। ... কিছুদিন যাবত, সেই আলাপও হলো। ... বিবেক ও বিচারের কাছে বহু ধর্মকথার সম্ভার আছে। তাই ভদ্রার খুব প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠলেন তাঁরা দুই ভ্রাতা। ... শুদ্ধ হৃদয়ের কন্যা, এই ভদ্রা। মনের মধ্যেয় কোন দ্বেষ,ঈর্ষা, লোভ, আসক্তি কিছুই নেই। ... এককথায় জম্বুদ্বীপের বক্ষে, এমন অজানা অচেনা এক স্থানে, এমন দিব্য এক কন্যার সাখ্যাত লাভ করে, বেশ ভালোই লাগছিল বিবেক-বিচারের।

এইসমস্ত কিছুর মধ্যেই, একদিন বিবেক ভদ্রাকে প্রশ্ন করলেন, "তো তোমার এতো ধর্মচর্চা করার ইচ্ছা, তোমাকে সকলে বাঁধা দেয়, তোমার দুঃখ হয়না?" ... ভদ্রা উত্তরে কিছুটা ক্ষোভ উগ্রে দিয়ে বললেন, "সকলে বাঁধা দেয়না তো! ... শুধু ওই সঙ্গী সকলকে বাঁধা দেয়। ... আমার পিতার কাছে ধর্মকথার সম্ভার আছে। ... কিন্তু পিতা, মাতা, আর আমার দুই কাকা, সকলেই সঙ্গীকে বড় কেউ মনে করে, আর সকলে তার কথা শোনে। আর সঙ্গীও এমন হাবভাব করে যেন, ওই এই সংসারের জ্যেষ্ঠ"।

বিচার বললেন, "কিন্তু ভদ্রা, ধর্মকথা তুমি কেন শুনতে চাও?" ... ভদ্রা খানিক ভেবে বললেন, "সাধনা করবো বলে। ... সাধনা করে, মাতা সর্বাম্বার সখী হবো আমি। ... আমার মাতারও সেই একই সাধ ছিল। ... তাঁর সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু আমারও সাধ তেমনই হবার কারণে আমি ঠিক করেছিলাম, মাতার অপূর্ণ সাধকে পুড়ন করবো" । ... বিবেক বললেন, "একটা কথা জানো ভদ্রা। ... সাধনার সাধ যদি থাকে, তবে আমাদের বহু বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। ... কোন কিছুর প্রতি ক্ষোভ রেখে কি হবে? সাধনা কি হবে তাতে? ... হবেনা তো! ... তাহলে?"

ভদ্রা চুপ করে সেই কথা শুনে আনমনা হয়ে গেল, কিন্তু সেই বিষয়ে আর অন্য কোন কথা বললো না। ... কিন্তু কিছুদিন পরে, বিবেক ও বিচার একটা পরিবর্তন দেখতে পেল, সমস্ত পরিবারের মধ্যে। ... দেখে মনে হলো যেই, প্রাণখোলা, মনখোলা আবহাওয়া কুটিরে ছিল, তা আর নেই। ... কেমন যেন সকলেই সকলের থেকে কিছু গোপন করছে। ... বিষয়টা বিবেক-বিচার উভয়েরই নজরে আসে। ... তাই তাঁরা সেই বিষয়ের সত্যতা কতখানি, তা দেখার জন্য, লুকিয়ে লুকিয়ে সকলের উপর আলাদা আলাদা করে নজর রাখতে শুরু করলো।

বেশ কিছুদিন এমন দেখার পর, তাঁরা আবিষ্কার করলো, ভদ্রা লুকিয়ে লুকিয়ে, যখন সঙ্গী কুটিরে থাকছে না, তখন কখনো মাতার থেকে, অর্থাৎ দেবী ইরার থেকে, সেই জ্ঞান লাভ করছে যে কেমন করে মনকে ক্ষুদ্র-ভাবনার থেকে মুক্ত করে দিতে হয়। ... তো কখনো লুকিয়ে লুকিয়ে মারুতের থেকে সেই সকল বিদ্যার আহরণ করছে, যা তাকে দেহসর্বস্ব জ্ঞান থেকে মুক্ত করে দেয়। ... একই ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে পাবকের থেকে ভদ্রা সেই বিদ্যা নিতে শুরু করে, যা তাঁর গতিকে অদম্য করতে করতে অতিজাগতিক করে তুলতে পারে। আর পিতার থেকে ধর্মকথা লুকিয়ে লুকিয়ে শোনেন। ...

আর মজার বিষয় এই যে, কেউই জানেন না যে ভদ্রা লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল তাঁর থেকেই নয়, সকলের থেকেই কিছু না কিছু শিখছেন। আর সেই কারণে সকলেই এই তথ্যকে গোপন করতে চাইছেন অন্য সকলের থেকে যে তিনি গোপনে ভদ্রাকে কি শিক্ষা প্রদান করছেন। ... কিন্তু এমন চলতে চলতে একদিন বিবেক প্রথম নজর করলেন, আর পরে বিচারকে সেই দিশায় নিয়ে এনে দেখালেন যে, ভদ্রা, তাঁর পিতাকে সমস্ত কাকাদের থেকে এবং মাতার থেকে, কি কি শিখেছেন, তার বিবরণ দিচ্ছেন।

গোপনে বিবেক ও বিচার পিতাপুত্রির কথা শুনতে আগ্রহী হলে, তাঁরা বাসবকে বলতে শুনলেন, "পুত্রী, এমন কেন করেছ তুমি? সঙ্গী যদি জানতে পেরে যেত!" ... উত্তরে, দেবী ভদ্রা নির্ভীক ভাবে বললেন, "এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ তুমি পিতা, আর সর্বাধিক অনুভবও তোমার। তবে কেন সর্বক্ষণ তুমি সঙ্গীর থেকে ভয়ে থাকো?" ... উত্তরে বাসব বললেন, "শুধু আমি নই পুত্রী, সকলেই সঙ্গীকে ভয় করে। ... আসলে, সকলে সঙ্গীর গুনাগুণও জানে, তাই না... সকলেই জানে, সঙ্গী কতটা শ্রেষ্ঠ। ... পুত্রী, শ্রেষ্ঠত্ব জ্যেষ্ঠ কে, তার উপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে, কে অধিক যোগ্য তার উপর"।

সেই কথার উত্তরে ভদ্রা বললেন, "সঠিক কথা পিতা, যোগ্যতা বয়স অনুসারে নির্ভর করেনা। ... কিন্তু আমি জানি আমার পিতাই শ্রেষ্ঠ। আর শুধু আমিই নই, সকলেই জানেন, তুমিই শ্রেষ্ঠ। ...পিতা, একবার বিচার করে দেখ, কেউ কিন্তু এই পরিবারে আটকে এই কারণে নেই যে, সঙ্গী এখানে থাকেন বলে। ... সকলে এখানে থাকেন আপনার ও মাতার ভরসায়। ... এমনকি মাতাও থাকেন কেবল আপনার ভরসাতেই। ... আর সকলে সঙ্গীকে মানে! ... না পিতা, সঙ্গীকে কেউ মানেনা। সঙ্গীকে মানতে সকলে বাধ্য হয়, কারণ আপনি সঙ্গীকে মেনে চলেন বলে। ... দেখতে কি পাননা, যখন সঙ্গী থাকেনা এইস্থানে, তখন বাতাবরণ কতটা অন্যরকম থাকে! ... সকলে কত আনন্দে থাকে! ....

পিতা, আমার কথাটা একবার শুনে দেখুন। ... কিছুদিনের জন্য আপনি সঙ্গীকে প্রাধান্য না দিয়ে দেখুন। ... আমি সমস্ত কিছু দেখেই বলছি পিতা, কিচ্ছু অসুবিধা হবেনা । ... সঙ্গী কিচ্ছু করেনা। ... সঙ্গী আপনাদের বিভ্রান্ত করে । ... আপনারা কতসুন্দর গোমাতা নিয়ে এসে গোদুগ্ধ পান করে, স্বল্প ফলের সাহায্যেই জীবন কাটাচ্ছিলেন । ... কিন্তু দেখুন, সঙ্গী তাতে আপত্তি করলো। ... আসলে সঙ্গী এটা চায়ই না যে, এই সংসারকর্ম ছারাও আপনারা কিছু করুন। ... তাই যা কিছু আমাদেরকে সংসারের বাইরেও অগ্রগতিসম্পন্ন করতে পারে, সেই সমস্ত কিছুকে সঙ্গী বন্ধ করে রেখেছে। ...

পিতা, আমার কথা একটিবার শুনে দেখুন । ... একবার সমস্ত কিছুর হাল আপনি ধরুন । ... দেখবেন, সকলে কত সুন্দর সমস্ত কর্ম করে, তারপরেও, আপনার কাছে বসে ধর্মচর্চা করছেন । ... সঙ্গী যখন দেখবে যে সকলের সমস্ত কর্ম হয়ে গেছে আর আপনারা বসে বসে ধর্মচর্চা করছেন, তখন সে আপনাদের বাঁধা দিতে আসবেই আসবে। ... তখন সকলের হয়ে আপনি তাকে একবার বলে দেখ যে, এখানে ধর্মচর্চা হবে। ... তারপর সঙ্গীকে দেখবে, ঠিক আপনার অনুসরণ করবে"।

বিবেক ও বিচার, ভদ্রার কথনের বাঁধন দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। আর দেখলেন, যেমন ভদ্রা বলেছিলেন, তেমনই বাসবকে করতে। ... এরই মধ্যে একটি মাসের জন্য সুরাসঙ্গী দক্ষিণে যাত্রা করতে চাইলেন। ... মারুতের থেকে বিবেক ও বিচার জেনেছেন, দক্ষিণে একটি স্থানে, সঙ্গীর একটি সঙ্গিনী থাকে। ... তার সাথে সঙ্গীর গভীর তনুসম্পর্ক, অর্থাৎ আমোদপ্রমোদের সম্পর্ক। তাই সেই স্থানে মাঝে মধ্যে তিনি যান। ... সকলেই সেই কথা জানেন, কিন্তু সঙ্গীর অবদান অসীম এই সংসারের প্রতি, তা এই সংসারের কর্তা, অর্থাৎ তাঁদের দাদা, বাসব মনে করেন বলে, কেউ সঙ্গীকে কোনপ্রকার বাঁধা দেননা।

আর সেই একটি মাস, যেই কালে সুরাসঙ্গী বিহারে গেছিলেন, তারই মধ্যে, এই সম্পূর্ণ পরিবারে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। ... গোমাতা এনে তাঁর সেবা করা হলো, গোসেবা করে তাঁর থেকে দুগ্ধ পান, আর ফলাহারের মাধ্যমে সকলের উদর পূর্তি হয়ে গেল, আর সেই উদরপূর্তির কর্ম অর্ধেক প্রহরেই সমাপ্ত হয়ে যায়। এবং সন্ধ্যায় সকলে একত্রে বসে, ধর্মচর্চা করতে থাকলেন। ... সকল কিছু মিলিয়ে বাসব দেখলেন, ওই ছোট্ট ভদ্রা যা বলেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ...

অন্যদিকে একটি মাস পরে, সঙ্গী এসে সমস্ত কিছু পরিবর্তিত দেখে, অতিরিক্ত ক্ষিপ্ত হলেন। ... তিনি উগ্র ভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বাসবের সম্মুখে এসে বললেন, "এই সব হচ্ছে কি এই পরিবারে? আমি একটি মাস ছিলাম না, আর সমস্ত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল! ... আবার তোমরা গোসেবা আরম্ভ করেছ! ... আবার রাত্রি হলেই সকলে একসাথে মিশে ধর্মচর্চা! ... এসবের মানে কি? আমাদের ভদ্রা এর থেকে কি শিখবে?"

দেবী ইরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, "ভাই সঙ্গী! ... তোমার সমস্যাটা কি? আমরা ধর্মচর্চা করি সেটি! ... আমরা তো পরিবারের কোন কর্মই অবশিষ্ট রাখিনা। ... আহার, নিদ্রা, সমস্ত কিছু সময়ে সময়েই হচ্ছে। ... আর সেই সমস্ত কিছু করার শেষে যদি আমরা ধর্মচর্চা করি, তাতে আমরা অপরাধটা কি করেছি?"

সঙ্গী এবারে উগ্র হয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, আমার উপর কথা, তাও একজন যে আমাদের পরিবারের কেউ নয়!" ... মারুত এবং পাবক এবার ক্রোধিত হয়ে গিয়ে বললেন, "তুই আমাদের সকল ভ্রাতার মধ্যে সব থেকে কনিষ্ঠ। ... তোকে আমরা সকলে কষ্ট করে, লেখাপড়া শিখিয়েছি। ... আর সেই লেখাপড়া করে এইরকম অশিক্ষিত হয়েছিস তুই! ... বৌদি আমাদের এই পরিবারের কেউ নয়! ... বৌদি এই পরিবারটাকে ধরে আছেন বলে, এই পরিবারটি টিকে আছে। ... আর নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীর সাথে এই ভাবে কথা বলিস তুই! ... জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতাসম, জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী হলেন মাতাসম। ... তুই মাতাসমকে এই ভাবে অপমান করছিস!"

সঙ্গী উগ্র হয়ে বললেন, "বেশ, আমাকে নিয়েই তো যত সমস্যা! ... আমি আর এই পরিবারেই থাকবো না!" ... বাসব কনিষ্ঠভ্রাতাকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে গেলে, মারুত ও পাবক একই সঙ্গে বলে উঠলেন, "ক্ষান্ত হও দাদা। ... যাক ও এই পরিবার ছেড়ে। ... কোথায় যাবে ও! ... ওই অসভ্য কন্যাটির কাছে না, যে কেবল ততক্ষণই ওঁকে সহ্য করে, যতক্ষণ সে তার তনুকে সুখ দেয়। ... যাক ... সেখানে গেলে, ও বুঝতে পারবে, এই পরিবার ছাড়া কোন গতি নেই ওর। ... আর যদি এখানে থাকতে হয়, তবে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং বৌদির শাসনেই স্থিত হয়ে থাকতে হবে"।

সঙ্গী এরপর নিজের মস্তকে হাত দিয়ে বসে পরলেন। ... আর ধীরে ধীরে, সে সেই পরিবারের মতই হয়ে যেতে থাকলেন। ... সেই সমস্ত কিছু দেখে, বিচার বললেন, "অদ্ভুত লীলা না ভ্রাতা!" ... বিবেক একটু চুপ করে ছিল। নিদ্রা যাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু নিদ্রা আসছিল না তাঁর। ... বিচার বললেন, "কিছু কি ভাবছো ভ্রাতা!" ... বিবেক বললেন, "সমস্ত কিছু কেমন যেন জানা জানা মনে হলো না ভ্রাতা!"

বিচার হেসে বললেন, "এখানে আবার কি জানা জানা পেলে তুমি!" ... বিবেক চিন্তিত বেশে চুপ করে থাকলেন। খানিক পরে বিছানায় উঠে বসে পরলেন। বিচার বললেন, "কি হলো ভ্রাতা! ... পেলে কি জানা, সেই সংবাদ!" ... বিবেক উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "ভ্রাতা, একবার সকলের নামগুল স্মরণ করো... দেখ কিছু খুঁজে পাচ্ছ!"

বিচার বিরক্তির সাথে হেসে বললেন, "নামে কি এসে যায়!" ... বিবেক সমান ভাবে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ভ্রাতা, বাসব মানে ইন্দ্র মানে আকাশতত্ত্ব বা মন; মারুত মানে পবন মানে প্রাণবায়ু; পাবক মানে অগ্নি, মানে উর্জ্জা; সুরাসঙ্গী মানে জল মানে আমাদের বুদ্ধি; এবং ইরা মানে আমাদের দেবী বসুধা, মৃত্তিকাতত্ত্ব"। ...

বিচার হাস্যচ্ছলে বললেন, "আর ভদ্রা!... সেটাও বলো" ... বিবেক বললেন, "আমাদের মা"। ... এই কথাতে বিচারও উঠে বসে পরলেন, আর চমকে গিয়ে বললেন, "মা!" ...

বিবেক বললেন, "মন অর্থাৎ বাসব সমস্ত কিছুর অধিকারী, কিন্তু তাও তিনি অবহেলিত। ... তিনি সমস্ত ধর্মজ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু তাঁকে ধর্মচর্চা করতেই দেওয়া হয়না, আর দেয়না কে? বুদ্ধি, নিজের বিকারে আবদ্ধ হয়ে, অর্থাৎ জলতত্ত্ব। ... মনকে অধিকার করে বসে থাকে সে, আর স্থবির হয়ে, পায়ের উপর পা তুলে রেখে, সকলকে আবদ্ধ করে রেখে দেয় সে, কারুকে উন্নীত হতে দেয়না, সকলকে আহার, নিদ্রা মৈথুনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে, আর সে নিজে স্থবির অর্থাৎ কর্মবিমুখ থেকে দুষিত হয়ে ওঠে। ...

খেয়াল করে দেখ ভ্রাতা, বাসবের কোন ভ্রাতা কি পারেন! ... মারুত কি করেন! ... দেবী ভদ্রা তাঁকে পরবর্তী কালে চেনেন, ঠিক যেমন প্রাণবায়ু আমাদের সঙ্গে অন্তে যুক্ত হয়। আর তিনি করেন? তিনি জীবনকে ভৌতিক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করার বিদ্যা প্রদান করেন দেবী ভদ্রাকে, অর্থাৎ প্রানায়মের শিক্ষা দেন, যাও পবনের কর্ম। ... আবার দেখ পাবককে। ... কি করে রন্ধনের ব্যবস্থা করে,

অর্থাৎ অগ্নি। ... আর কি শিক্ষা দেন ভদ্রাকে? ভদ্রাকে তিনি গতির শিক্ষা দেন। অগ্নিতত্ত্ব আমাদের কি প্রদান করে ভ্রাতা? গতি, তাই না?

আর দেবী ইরা কি করেন? এই তনুই যে সর্বস্ব নয়, তার শিক্ষা দেন; ঠিক যেমন তনু সমস্ত চারভূতকে অর্থাৎ আকাশ বা মনকে, বরুণ বা বুদ্ধিকে, মারুত বা প্রাণবায়ুকে, আর অগ্নি বা প্রগতিকে বেঁধে রেখে দেন, তেমনই তিনি এই পরিবারটিকে বেঁধে রেখে দিয়েছেন।

আবার পরিস্থিতি যখন পালটে গেল, সেটা দেখ । ... সকলেই বুদ্ধির দাস হয়েছিলেন অর্থাৎ সঙ্গীর দাস হয়েছিলেন; আর যেই মুহূর্তে দেবী ভদ্রা সকলকে নিজের নিজের সামর্থ্যে স্থাপিত করলেন, তখন কি হলো, তখন সকলে মিলে মনকেই নিজদের অধীশ্বর মেনে নিলো, আর সকলে দেবী ভদ্রার অর্থাৎ চেতনার সেবকে পরিণত হলো। আর যখন সকলে পরিবর্তিত হয়ে গেল, তখন সঙ্গী অর্থাৎ বুদ্ধিও বাধ্য হলো চেতনার অর্থাৎ মাতার দাস হয়ে যেতে। ... কিছু বুঝলে ভ্রাতা!"

বিচার বললেন, "কিন্তু এই সমস্ত কেন? ... কি কারণে?" ... বিবেক উদাসীন ভাবে হেসে বললেন, "ওই আমরা মনে মনে কি ভেবেছিলাম! ... পঞ্চভুতের কোন প্রয়োজন নেই। কি মনে পরেছে! ... তাই মাতা স্বয়ং পঞ্চভূতকে নিয়ে লীলা করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, কি ভাবে পঞ্চভূত আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়। ... তিনি দেখিয়ে দিলেন, কি ভাবে পঞ্চভূত বুদ্ধির দাস হয়ে অবস্থান করে, আর এও দেখিয়েদিলেন যে সেই ভূতদের ভবিষ্যৎ কি। ... সাধককে নিজের চেতনার কাছে সমর্পিত হতে হয়। তবেই চেতনা মন, প্রাণবায়ু, প্রগতি, এবং তনু, এই সমস্তকে নিজ নিজ সামর্থ্যের বলে উজ্জীবিত করে, বুদ্ধিকে তাঁদের নিজদের বশ্যতায় স্থাপিত করে, আর তখনই এক সাধক উন্নতি করতে পারেন"।

বিচার বললেন, "অর্থাৎ নিজের পঞ্চভূত প্রথমে নিয়ন্ত্রিত না হলে, বিকারগ্রস্ত বুদ্ধির দাস হয়ে বিরাজ করে সমস্ত পঞ্চভূত, আর সেই অবস্থায় বুদ্ধি সাধনবিরোধী, তাই সাধন অসম্ভব। ... আর যেই মুহূর্তে ব্যক্তি নিজের মনকে নিজের সামর্থ্যে স্থিত করেন, সকল পঞ্চভূতকে নিজের সামর্থ্যে স্থিত করেন, তখনই মন সকল কিছুর উপর অধিকার স্থাপন করে নেয়। ... আর যেহেতু মন আমাদের মাতার প্রতি সমর্পিত, তাই তখন বুদ্ধির বিকারসমূহ কিচ্ছু করতে পারেনা, আর সাধকের সমস্ত সাধন মার্গ উন্মোচিত হয়ে যায়। ... আর আমরা মূর্খের মত পঞ্চভূতকে কনো প্রয়োজন নেই বলে বিরক্ত হচ্ছিলাম, তাঁদের উপস্থিতিতে! ... ভ্রাতা, আমাদের এক্ষণই দেবী ভদ্রার নিকট যেতে হবে, ... আমাদের সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে!"

বিবেক বললেন, "কিন্তু ভ্রাতা, একটি কথা আমার কাছে তো পরিষ্কার হলো না!" ... বিচার বললেন, "আবার কি ভ্রাতা!" ... বিবেকে উত্তরে বললেন, "আচ্ছা ভ্রাতা, মনকে আমরা নিজের সামর্থ্যের সাথে পরিচয় করাবো কি করে?" ... বিচার বললেন, "ভ্রাতা, আমরা মাতার লীলার ভেদ করে ফেলেছি। ... মাতাও সকলে শীঘ্রই অবলুপ্ত হয়ে যাবেন। ... তার আগেই আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে যেতে হবে। ... তোমার এই প্রশ্নের উত্তর তো একমাত্র মাতাই প্রদান করতে পারেন। ... চলো তাঁর কাছে চলো। ... দেবী ভদ্রার কাছে চলো। ... ভ্রাতা, মশালটা জ্বালো। ... এখনই যেতে হবে আমাদেরকে তাঁদের কাছে"।

বিবেক বললেন, "আমি আনছি ভ্রাতা মশাল" ... বিচার বললেন, "হ্যাঁ তুমি মশাল আনো, আমি চকমকি পাথরগুলি ওই বাতায়নের কাছে রেখেছি। ... আমিও সেগুলি আনছি। ... বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেলে, বিবেক বললেন, "ভ্রাতা, মশালটি তো দেখতেই পাচ্ছিনা!" ... বিচার বললেন, "আমিও পাথরগুলি পাচ্ছিনা। ... কিন্তু ভ্রাতা তুমি এতো দূরে চলে গেলে কেন!" ... বিবেক কোন শব্দ করলেন না, আর কিছুক্ষণ পরে বললেন, "ভ্রাতা, সমস্তই মায়া! ... তুমি উত্তরপূর্বের দিকে এসো, আমি দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে যাচ্ছি। ... আজ আমাবস্যা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছেনা। ... আন্দাজের বলেই আমরা একে অপরকে খুঁজে নেব"।

যেমন বিবেক বললেন, তেমন করে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর, বিবেক ও বিচারের শরীরে ধাক্কা লাগে । ... অন্ধকারের মধ্যেই বিবেক বললেন, "ভ্রাতা তুমি!" ... বিচার বললেন, "হ্যাঁ আমি অনুজ। ... কিন্তু অন্য কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছিনা যে!" ... বিবেক দুঃখের সাথে বললেন, "কিছু থাকবে, তবে তো খুঁজে পাবে! ... ভ্রাতা, যেই কুটিরে আমরা উঠেছিলাম, জানো আমি প্রথম যখন এই দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন এখানে কিচ্ছু ছিলনা । ... পরের মুহূর্তেই দেখেছিলাম, এই কুটিরটি ছিল। ... মায়া ভ্রাতা, মহামায়ার মায়া। ... তাঁর মায়াতেই এই কুটিরকে আমরা স্থিত দেখেছিলাম। আর এতক্ষণ তিনি আমাদের সাথে মায়া করে সমস্ত পঞ্চভুতের তত্ত্বকে বুঝিয়ে দিলেন, এককথায় সমস্ত পুরাণের সারকথার শিক্ষা প্রদান করলেন আমাদেরকে"।

বিচার নিজের নেত্রের অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, "আর কত নিরাশ করবো আমরা মাতাকে অনুজ! ... এবার তো আমরা মাতার সাথে দৃষ্টি মেলানোরও যোগ্য থাকছি না। ... নিজদেরকে আর মাতা সর্বাম্বার পুত্র বলতেও লজ্জা লাগছে। ... অনুজ, কাল প্রভাত হলে আমরা আবার পথ চলবো। ... কিন্তু আমরা আর নিজেদের পরিচয় হিসাবে মাতার নাম বলব না। ... আমরা সেই যোগ্যতা হারিয়েছি। ... আবার যেদিন সেই যোগ্যতা লাভ করবো, তখন মাতা আর দেবী ভদ্রা হয়ে নয়, আমাদের সম্মুখে তিনি আমাদের মাতা হয়েই আসবেন নিশ্চয়"।

বিবেক বললেন, "সঠিক বলেছ ভ্রাতা। ... আমরা অন্য নামে, অন্য পরিচয় খুঁজে নেব, আর সেই পরিচয়তেই আমরা পুনরায় নিজদেরকে মাতার পুত্র বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা অর্জন করবো। ... আমরা এতটাই পতিত হয়েছি যে, মাতা আমাদেরকে একবার তাঁর রূপের দেখাও দিলেন না। ... আমরা পঞ্চভুতের সত্য বুঝে যেতে, মাতা অবলুপ্ত হলেন। ... একটিবার, তাঁর দর্শনও পেলাম না ভ্রাতা। ... আমরা অযোগ্য হয়ে গেছি। ... আমাদেরকে আবার সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ভ্রাতা"।

পুত্রী, এই সেই অমৃত কথা, যেই কথার মাধ্যমে মাতা বিচার ও বিবেককে, পঞ্চভুতের স্বাভাবিক অবস্থান কেমন হয়, এবং সেই ভূতদের ভবিষ্যৎ, সাধকদের জন্য কেমন হতে হয় তা বোঝালেন। ... কিন্তু যাত্রার তো এখানে সবেই শুরু পুত্রী । ... খেয়াল করে দেখ। এই অধ্যায়ের থেকে, বিচার ও বিবেকের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে, কি ভাবে মনকে নিজসামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করতে হয়। ... অর্থাৎ বুঝতেই পারছো, এবারে তাঁদের যাত্রার উদ্দেশ্য, বা বলতে পারো, উদ্দেশ্যের অধ্যায় হবে, মনকে কি ভাবে নিজের সামর্থ্যের সাথে পরিচয় করাতে হয়, সেই শিক্ষালাভ"।

চিৎসামর্থ্য অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বলতে থাকলেন, "পুত্রী, সেই আমাবস্যার রাত্রে বিবেক ও বিচার একটি কদমও সম্মুখে যেতে পারলেন না। তাই তাঁদের প্রভাতের অরুণোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হলো। অরুণকালে, তাঁরা পুনরায় উত্তর দিশায় চলতে থাকলেন। ধুধু প্রান্তর, সামান্য জনমানসও নেই, এমন বিস্তর স্থান অতিক্রম করার পর, বিবেক ও বিচার একটি রাজ্যের মুখ্যদ্বার দেখতে পেলেন। রাজ্যে প্রবেশ করার সময়ে, তাঁদের যখন প্রহরীরা পরিচয় দিতে বলবেন, কি পরিচয় প্রদান করবেন, সেই চিন্তা করে, বিবেক ও বিচার দ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, দ্বার দেশে কোন প্রহরী নেই। ...

সেই দেখে, দুই ভ্রাতা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে, দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন, এবং বেশ কিছুদূর যাত্রা করে দেখলেন, কিছুদিন পূর্বেও, সেই স্থানে অনেকে বসবাস করতেন, সেই চিহ্ন রয়েছে, মানুষের পায়ের ছাপ ধুলার উপরে রয়েছে, হাটের স্থানে বিভিন্ন সবজীর ফেলে দেওয়া অংশ তখনও সম্পূর্ণ ভাবে পচনের শিকার হয়ে যায়নি। ... কিন্তু যেইদিন তাঁরা দুই ভ্রাতা গেছেন সেই স্থানে, সেইদিন একটি মানুষও নেই। ... একটি মানুষ তো বাদই থাক, একটি গৃহপালিত পশুও নেই। গৃহপালিত পশু যে ছিল, এবং কিছুদিন আগেও জাব গ্রহণ করেছে গোমাতারা, আহার গ্রহণ করেছে সারমেয়রা, তাও দেখলেন বিবেক ও বিচার, এবং তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন, এই পশুদের বিষ্ঠা দেখে। কিন্তু অদ্ভুত কথা, আজ একটি জীবও নেই।

দেখে যেন দুই ভ্রাতার মনে হচ্ছিল, ঠিক দুইদিন আগে, এই রাজ্য যেন কোন এক বিশেষ কারণে আচম্বিক ভাবেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ... দুই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিস্মিত ভাবে পথ চলছিলেন, দুই ভ্রাতা। আচমকা, তাঁদের এক বিশালাকায় ব্যক্তির সাথে ধাক্কা লাগে। এই পরিত্যক্ত স্থানে, কারুর সাথে ধাক্কা লেগে যাওয়ায়, একটু চমকিত হয়ে সতর্ক হলেন বিবেক ও বিচার । আর সতর্ক, তাঁদের থেকেও অধিক হলেন সেই সম্মুখে স্থিত দীর্ঘায়ু পুরুষটি। বিচার যুদ্ধ করতে অতিরিক্ত পছন্দ করেন। তিনি তো এই দীর্ঘতনু রনংদেহি পুরুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতও হয়ে গেলেন।

বিবেক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা ভ্রাতা! কি হচ্ছেটা কি? ... জানা নেই শোনা নেই, যুদ্ধ করতে শুরু হয়ে গেল!... এই মশাই, কে আপনি! আর এখানে কি করছেন!"

বিচারের কণ্ঠস্বর শুনে সেই দীর্ঘদেহী ব্যক্তির মনে হয় যেন এই দুই যুবা ক্ষতিকারক নন। ... তাই তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি ছেড়ে, সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "সেই প্রশ্ন তো আমারও! ... আমি তো ভাবলাম, আপনারা ওই দুষ্ট রাজা, বারির চর" । ...

বিবেক বললেন, "রাজা বারি! ... তাঁর রাজ্য এটা!" ... সেই যুবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সেই কথা শুনে, আর বলে উঠলেন, "না... এটা আমাদের রাজ্য! ... বারি যতই চেষ্টা করুক, আমাদের রাজ্যকে সে কিছুতেই হরণ করতে পারবে না" । ... বিবেক বললেন, "আচ্ছা

এখানে কি কিছু হয়েছে! ... আচমকা যেন সমস্ত মানুষ পশু কোথাও চলে গেছে এই রাজ্যকে পরিত্যাগ করে। ... আর আপনি কে? আপনাকে দেখেও তো কোন রাজপুত্রই মনে হচ্ছে!"

সেই যুবা এবার শান্ত হয়ে বললেন, "আমি এই রাজ্যের চার রাজকুমারের কনিষ্ঠ রাজকুমার । ... কিন্তু আপনারা কারা!" ... বিচার কিছু বলতে গেলে, বিবেক তাড়াতাড়ি করে বললেন, "আমরা কোন রাজকুমার নই। ... ছায়াদেবীরা ছিলেন না!... ওই দ্বারকাপুরী! ... উনাদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করতাম, আমরা দুই ভ্রাতা, জীবন ও মরণ। ... আজ, তাঁরা নেই, তাই কর্ম হারিয়ে, এই রাজ্য থেকে ওই রাজ্য ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি কোন রাজপরিবার আমাদেরকে, তাঁদের কোন কাজে বহাল করে। ... সেই সুত্রেই, এখানে আসা। ... আমাদেরকে কোন কাজ দিতে পারবেন যুবরাজ!"

বিচারের কথা বলার ধরন এমনই ছিল যে, সেই যুবরাজ মেনে নিলেন যে এই দুই ভ্রাতা জীবন ও মরণ, সত্যই বলছেন। ... তাই তিনি এই দুই ভ্রাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "আসুন আপনারা... আমার সাথে আমার মাতার নিকট আসুন। ... কাজ একটা আছে। ... হ্যাঁ রাজকাজই বটে। ... তবে সেই কাজ সম্পন্ন হলে, তবে রাজ্যের সমস্ত বাকি প্রজাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। ... আর তারপরেই আপনাদেরকে, আপনাদের পূর্ববৎ পেশা অনুসারে কর্মে নিয়োগ করা যাবে। ... কিন্তু তার পূর্বে, আপনাদেরকে একটি কাজ করে দিতে হবে। ... আসুন, মাতার সম্মুখেই সেই কর্ম আমি আপনাদেরকে বলছি"।

এতো বলে, যুবরাজ, জীবন ও মরণকে নিয়ে গেলেন রাজদরবারে, যেখানে বৃদ্ধা রাজমাতা, মাথায় হাত দিয়ে একাকী বসে ছিলেন। ... যুবরাজ, রাজমাতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন জীবন ও মরণকে। তিনি বললেন, "মাতা, এই দেখ, ঈশ্বর আমাদের সহায়। ... আমরা কি করে রাজা বারির সম্মুখে যাবো, বুঝে পাচ্ছিলাম না। ... দেখ, ঈশ্বর এই দুই যুবাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন" । ... এবার জীবন ও মরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের মাতা, এই রাজ্যের রাজমাতা, দেবী চেতা" । ... জীবন ও মরণ, বিশ্বস্ত সেনার ন্যায়, রাজমাতার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

রাজমাতা বললেন, "এদের কি করে পেলে, বাছা ধ্যান!" ... জীবন ও মরণ বুঝলেন, এই যুবরাজের নাম হলো ধ্যান। ... ধ্যান উত্তরে বললেন, "মাতা, এরা ছায়াদেবীদের গুপ্তচর ছিল । ... ছায়াদেবীদের নাশের পর, এরা কর্মহারা হয়ে রাজ্যে রাজ্যে কর্মের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে"। ... সেই কথা শুনে রাজমাতা একটু বিরক্তই হলেন যেন। তিনি বললেন, "গুপ্তচর নিয়ে তুমি কি করবে বাছা! ... গুপ্তচর নিয়ে তুমি বারিরাজ্য আক্রমণ করবে!"

জীবন ও মরণ বললেন, "আমরা যুদ্ধ করতে পারি। ... হ্যাঁ, ছায়াদেবী ও তাঁর পুত্ররা, নিজদের অতিরিক্ত বলবান মনে করতেন, তাই আমাদের যুদ্ধ করতে দেন নি। ... আর রাজমাতা, যুদ্ধ করতে পারি বলে কি স্বয়ং ভগবানের সাথে যুদ্ধ করবো! ... ভগবান আমাদের সমস্ত কিছু, আমাদের পিতামাতা তাঁরা, তাঁদের সাথে কি কেউ যুদ্ধ করে!" ... দেবী চেতা বললেন, "সেই কথাটা ছায়াদেবী আর তাঁর সন্তানদের বলোনি কেন তোমরা!"

মরণ অর্থাৎ বিবেক বললেন, "মাতা, আপনার মনে হয়, আমরা সামান্য কর্মচারী হয়ে সেই কথা বললে, যেই বলনিয়ে যারা সর্বক্ষণ দাম্ভিক, যারা স্বয়ং ভগবানকেও আক্রমণ করতে ছারে না, তারা আমাদেরকে জীবিত রাখতেন! ... আমার নাম মরণ... আমার ভ্রাতার নাম জীবন; রানিমা, আমার নাম তো মরণই থাকতো, আমার ভ্রাতার নামও পালটে মরণ রাখতে হতো, এমন করলে"।

রাজপুত্র ধ্যান বললেন, "বিচক্ষণ এঁরা মাতা। ... আর বড় কথা এই যে, আমি বারিরাজ্যকে আক্রমণ করবো না। ... আমি এমন কিছু করবো, যাতে আমার সকল ভ্রাতারা, আর সকল প্রজারা তাঁদের নিজদের রাজ্যে ফিরে আসে। ... তাই, যুদ্ধের চিন্তাও করবেন না। ... যুদ্ধ হবে, হ্যাঁ রাজা বারির যদি সাহস থাকে, তবে অবশ্যই হবে, কিন্তু আমার ভ্রাতাদের ফিরিয়ে আনার পর"।

জীবন বললেন, "আচ্ছা যুবরাজ, আমাদেরকে একটিবার বলবেন, কি হয়েছিল এই রাজ্যে । ... না আসলে, আমরা ছায়াদেবীদের সাথে থাকার কারণে, তাঁদের বহু যোজনা দেখেছি। ... তাঁরা তো সর্বক্ষণই কিছু না কিছু যোজনা নির্মাণ করতেন। ... তাই আমাদের এই যোজনা নির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভব আছে। ... তাই যদি পুরো কথা বলেন, তবে হয়তো, আমরাও কিছু যোগদান দিতে সক্ষম হবো"।

রাজকুমার ধ্যান ধিক্কার দিয়ে বললেন, "যোজনা দ্বারা কিছু হয়না। ... যোজনা স্থির করলে, যেমন ছায়াদেবীদের অবস্থা হয়েছিল, তেমনই হয়। ... যোজনা! ... তবে হ্যাঁ, পুরো কথা তোমাদের শোনা প্রয়োজন আছে, তা না হলে, তোমরা আমার কর্মে সহযোগ করতে পারবে না। ... তাই বলছি শোন। ...

রাজা বারি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা। ... মহাকামুক সেই রাজার তিন পত্নী, দেবী যোজনা, দেবী যাচনা এবং দেবী কল্পনা। এই তিন পত্নীর থেকে তিনি দুটি দুটি করে পুত্রী লাভ করেন। দেবী যোজনার থেকে লাভ করেন, নেত্রবালা এবং শ্রীনাখা; দেবী যাচনার থেকে তিনি লাভ করেন, তনুবালা এবং রসনা; এবং দেবী কল্পনার থেকে তিনি লাভ করেন ধুমরা এবং শ্রবণাকে। ... রূপে গুনে, তাঁরা তিলোত্তমা তো ননই, বরং বলতে পারেন, মলিন স্বভাব তাঁদের সর্বাঙ্গে দৃশ্যমান। তবে যেমন রাজা বারি ধূর্ত, তেমন তাঁর পত্নীরা, এবং তেমনই তাঁর কন্যারা।

এই সমস্ত কন্যা যখন হয়, তখন রাজা বারি, রাজা ছিলেন না, সামান্য বৈশ্য ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি নিজে কামাতুর এবং তাঁর পত্নীরাও সেই একই কামবাণে আবদ্ধ ছিলেন বলেই, তাঁরা উনার পত্নী হয়েছিলেন। ... তবে, এই সমস্ত কিছুর হিসাব পালটে যায়, যখন তিনি এক পুত্রীকে যমুনা নদীর তিরে লাভ করেন। সেই কন্যার নামকরন উনি করেন ভূমি। ... আর এই দেবী ভূমি হন, অত্যন্ত রূপবতী, এবং তার থেকেও বড় কথা, বারির জন্য তিনি হন বরদান। ... হ্যাঁ, এক কথায় মহারাজ বারি, এই দেবী ভূমির কথায় ওঠেন এবং বসেন। ... তবে, এখানে একটি গল্প আছে।

দেবী ভূমির সমস্ত কথাকে রাজা বারি মানেন, কারণ তিনি বৈশ্য থেকে ধনকুবের হয়ে, রাজা হয়েই-ছেন এই ভূমির জন্য। ... আর যেহেতু রাজা বারি এই ভূমিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন, আর একই সঙ্গে যেহেতু ভূমি, অত্যন্ত সরলমনা, তাই তিন রানি, যোজনা, যাচনা এবং কল্পনা, তাঁদের ছয়কন্যাকে দিয়ে, ভূমিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজদের বশে করে রাখেন । আর তাই এখন ভূমি তাই বলেন, যা এঁরা বলান, আর রাজা বারি তাই করেন যা এই ভূমি বলেন।

পূর্বেই বলেছি, এই ভূমি অত্যন্ত রূপবতী। ... তাঁর রূপে আকৃষ্ট হন প্রথম আমার অগ্রজ ভ্রাতা, অনল। ... কিন্তু যখন তিনি দেবী ভূমির নিকটে যাবার প্রচেষ্টা করলেন, তখন দেবী নেত্রবালা এবং শ্রীনাখা তাঁকে বশীকরণ করে বিবাহ করে নেন। ... এবং আমার ভ্রাতা তাঁদেরই কামপাশে আবদ্ধ হয়ে আছেন। একই ভাবে, আমার দ্বিতীয় অগ্রজ ভ্রাতা, বাতাসও যখন দেবী ভূমির প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তখন দেবী তনুবালা ও রসনা তাঁকে বশ করে রাখেন। আর অন্তে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আকাশকেও বশ করে নেয়, দেবী ধুমরা ও শ্রবণা।

আর এই তিনজনই, সেই বারিরাজ্যেই স্থাপিত হয়ে যান। কেন হন, তা আমি এখনও জানিনা। ... যেই স্ত্রীরা তাঁদের বশ করে নিয়েছেন, তাঁদের জন্য, নাকি দেবী ভূমির জন্য, নাকি রাজা বারি তাঁদের বন্দি করে রেখেছেন, কিচ্ছু জানিনা আমরা। ... কিন্তু ভ্রাতা আকাশ চলে যাবার পর, আমি ও মাতা প্রজাকে অনেকবার, হ্যাঁ মিথ্যাই সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে, তাঁকে ফিরিয়ে আনবো। ... কিন্তু তিনদিন পূর্বে, তাঁরা আমাদের সান্ত্বনাবাণীতে আর ভরসা রাখতে না পেরে, রাজ্যছেড়ে বারিরাজ্যে চলে যান সমস্ত গবাদি, সমস্ত পালিত পশু নিয়ে। ... আর আমি ও আমার মাতা, এখানে একাকী বসে আছি। ... না আছে আমাদের কোন প্রজা, আর না কোন সেনা!"

মরণ সমস্ত কথা শুনে বললেন, "বুঝেছি যুবরাজ। আপনার সমস্যা, বা কেবল আপনারই কেন বলবো, আপনার তিন অগ্রজ ভ্রাতারও সমস্যা ছিল এই যে, আপনারা এখানে স্থিত থেকে, ওদিকে কি হচ্ছে, তা ঠিক করে জানতে পাচ্ছেন না । ... হ্যাঁ যখন আপনার ভ্রাতাদের অন্য কেউ বশ করে নিলো, তখন আপনারা সেই সংবাদ পেয়েছেন, কিন্তু কি করে বশ হলেন, কে করল বশ, সেই তথ্য আপনাদের কাছে নেই। আর তা নেই বলেই, আপনার অন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারাও সেই জালে জরিয়ে গেছেন। এবং আপনিও কিছু করার পূর্বে সেই একই চিন্তন করছেন, অর্থাৎ না জেনে গেলে, আপনিও বন্দি হয়ে গিয়ে, আপনার মাতাকে আপনি একাকী করে দিতে পারেন"।

জীবন বললেন, "কোন চিন্তা করবেন না যুবরাজ। ... আমরা দুই ভ্রাতা বিভিন্ন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করতে সক্ষম। ... আমরা যেকোনো ভাবে, আপনার তিন ভ্রাতার অন্তর্ধানের রহস্য উদ্ঘাটন করে নিয়েই আসবো। ... যুবরাজ, আমরাই তারা, যারা রাজা ভণ্ডরামকে, সম্পূর্ণ শিবছেত্র এবং অম্বাপুরের সংবাদ প্রদান করেছিলাম। তাই আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। যখন ভগবানের সংবাদ লাভ করে আনতে পারি, তবে ওই শয়তানদের সংবাদ তো লাভ করে আনবোই"।

রাজমাতা দেবী চেতা ও যুবরাজের শুভকামনা নিয়ে জীবন মরণ এবার চললেন বারি রাজ্যে। সেখানে যা দেখলেন, তা যুবরাজের ব্যাখ্যার সাথে সম্পূর্ণ মিলে গেলেও, এমন এক রহস্য ভেদ করলেন, যা সত্যই না জানলে, এই ছয় বারিকন্যার জালে পরতেই হবে। ... সেই দেখে এসে, এবার তাঁরা যুবরাজের কাছে বললেন, "বলেছিলাম আপনাকে, আপনাকে এমন তথ্য দেব, যে এই সমস্ত ভূমিখণ্ডে অন্য কোন গুপ্তচর দিতে পারবে না। ...

যুবরাজ, বশীকরণ করে রেখেছেন, ঠিকই বলেছিলেন আপনি। ... কিন্তু বশীকরণ করে ছয় বারিকন্যা রাখেন নি আপনার ভ্রাতাদের। ... বসিকরন করে রেখেছেন, দেবী ভূমি। ... হ্যাঁ যুবরাজ, যেমন আপনি বললেন, তেমনই আপনার ভ্রাতারা, দুটি দুটি করে রাজকন্যার সাথে যুক্ত আছেন। ... কিন্তু সত্য এই যে, সেই দুটি দুটি করে রাজকন্যা, আপনার ভ্রাতাদের অত্যন্ত সম্মান ও মান্য করেন, এবং তাঁদেরকে নিজদের পতি বলেই মানেন। কিন্তু আপনার ভ্রাতাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে রেখে দিয়েছেন, দেবী ভূমি।

তবে এখানে আসল কাণ্ডারি হলেন রাজা বারির তিন পত্নী। ... তাঁর তিন পত্নীই, রাজাকে বুদ্ধি দিচ্ছেন যাতে তিনি দেবী ভূমিকে এই ভাবে বোঝান যাতে সে আপনার তিন ভ্রাতার কাছে ধরাই না দেন। ... এর ফলে, আপনার তিন ভ্রাতাও দেবী ভূমির মোহ ছেড়ে নির্গত হতে পারবেন না, আর তার ফলে, সমস্ত চেতারাজ্যের প্রজাও, বারিরাজার বশ হয়ে থাকবে। ... হে যুবরাজ, আপনি যা বললেন, তাই মনে হবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে, দেবী ভূমির জন্যই রাজা বারি বৈশ্য থেকে রাজা হয়েছেন। ...

কিন্তু আসল সত্য এই যে, দেবী ভূমির অসাধারণ রূপকে ব্যবহার করে, রাজা বারির তিন পত্নী বহু এমন যুবরাজদের আকৃষ্ট করে, তাঁদের রাজ্যকে অপহরণ করে, সেই রাজ্যসমূহের রাজা করেছেন রাজা বারিকে। অর্থাৎ যুবরাজ, আসল কাণ্ডারি এখানে রাজা বারি ও তাঁর তিন পত্নীই। তাঁদের ছয় কন্যাও শিশুর মত সরল, এবং দেবী ভূমি অত্যন্ত বেদনাগ্রস্ত। ছয় রাজকন্যা, আপনার তিন ভ্রাতাকেই স্বামী মেনে বসে আছেন; অন্য দিকে দেবী ভূমির জন্য এতো পুরুষ পাগল হবার পরেও, তাঁকে কোন পুরুষ পাগল করে দিতে পারেন নি বলে, তিনি উদাসীন।

আর তার এই উদাসীনতাকে কাজে লাগিয়ে, তিন রানি, একের পর এক দেশের যুবরাজদের আকৃষ্ট করেন, আর তাঁদেরকে নিজদের রাজ্যে স্থাপন করে রাখেন। আর দেবী ভূমি উদাসীন হবার কারণে, তাঁদের দিকে তাকানও না, আর তাঁদেরকে নিজের অভিপ্রায়ের কথা বলেনও না। ... আর সেই কারণে, কোন দেশের কোন যুবরাজ এখনও দেবী ভূমির মোহ ত্যাগ করতে পারেন না। ... অন্য দিকে, যুবরাজ, আপনার তিন ভ্রাতার প্রতি, রাজা বারির ছয় কন্যা আকৃষ্ট হবার পর থেকে, তিন রানি, নিজের ছয় কন্যাকেও এমন বুঝিয়েছেন যে, দেবী ভূমির নিকটে যেন কোন পুরুষ পৌছাতে না পারে। যদি পারে, তবে দেবী ভূমি সেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন, আর যদি তেমন হয়, তবে সকল রাজপুত্রের সাথে সাথে, এই তিন রাজপুত্র, অর্থাৎ আপনার ভ্রাতারাও চলে যাবেন, আর রাজা বারি, রাজার আসন থেকে পুনরায় চ্যুত হয়ে যাবেন"।

যুবরাজ ধ্যান, এই সমস্ত কথা শুনে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, জীবন ও মরণের, এবং বললেন, "বেশ, এবার আমি বারিরাজ্যে গমন করবো। ... তোমরা আমাকে কিছু কিছু তথ্য সঠিক সঠিক করে এসে বলো। ... আমাকে বলো দেবী ভূমি কখন কোথায় স্নানে যান, কখন কোথায় পূজা করতে যান, বা কখন কখন তিনি প্রাসাদের বাইরে যান, আর তাঁর সঙ্গে কে থাকে?" ...

মরণ বললেন, "যুবরাজ, সেই সংবাদ নেবার জন্য আমাদের আলাদা করে যেতে হবেনা। ... দেবী ভূমি, প্রভাতে এবং সূর্য অস্ত যাবার ঠিক পূর্বে, এই দুইবার স্নানে যান, যমুনা নদীর তিরে, ভূমিকা ঘাটে। সেই ঘাট থেকে নেমে, দেবী ভূমি, পূর্ণ অবগাহন করে, মৎস্যের ন্যায় সাঁতার কেটে স্নান করেন, একাকী এবং মহানন্দে। ... আর সেই স্নানের দৃশ্য দেখতে প্রায় ৩০টি যুবরাজ একত্রিত হন। ... আর এই যুবরাজদের মধ্যে, আপনার ভ্রাতারাও থাকেন, আর তাঁদেরকে বেষ্টন করে, ছয় বারিকন্যাও থাকেন । ... আর এরপর দেবী ভূমি মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে ওঠেন, এবং মন্দিরের অন্তরে চলে যান। ... সেই মন্দিরে কনো পূজারি থাকেনা। ... দেবী ভূমি একাকী সেই মন্দিরে গমন করে, নিজের বস্ত্র পরিবর্তন করেন, এবং সেই মন্দিরে স্থাপিত মাতার মূর্তির কাছে নিজের পূজা নিবেদন করে, সেখান থেকে তিনি উত্তরের দরজা দিয়ে চলে যান। উত্তরের দরজায়, রাজ্যের সেনা থাকেন। তাঁরাই দেবী ভূমিকে প্রাসাদ পর্যন্ত নিয়ে যান। ...

স্নানের জলে অবগাহন করার পর থেকে, মন্দিরের উত্তরের দ্বার পর্যন্ত যেই যাত্রা, দেবী ভূমি প্রতিদিন করেন, সেটি কোন যুবরাজ দেখতে না পাবার কারণে, যখন দেবী ভূমি ভূমিকাপারে বসে, নিজের অঙ্গে মুলতনি ও হলদি লেপন করেন, আর যখন তিনি মন্দিরের উত্তরদ্বার দ্বারা নির্গত হন, তখন তীক্ষ্ণ নজর রাখেন, দেবী ভূমির প্রতি"।

যুবরাজ ধ্যান বললেন, "অসাধারণ জীবন মরণ, সত্যই তোমরা যোগ্য গুপ্তচর"। ... (দেবী চেতার উদ্দেশ্যে) মাতা, আপনি চারটি থালের ব্যবস্থা করুন, আমি কিছুদিনের মধ্যেই ভ্রাতাদের নিয়ে আসছি। ... ভ্রাতাদেরকে সস্ত্রীক বরন করার জন্য বরনডালির ব্যবস্থা করুন"। ... (জীবন মরণের উদ্দেশ্যে) জীবনমরণ, তোমরা আমাকে সেখানে নিয়ে চলো, যেখান থেকে ভূমিকাঘাট এবং মাতার মন্দিরকে স্পষ্ট দেখা যাবে। ...

একবার আমাকে সেটি দেখিয়ে দিয়ে, আমার বলে দেওয়া স্থানে অপেক্ষা করবে, রথ নিয়ে... যেই মুহূর্তে আমি সেই রথে উঠবো, সেই মুহূর্তে এমন বেগে রথ চালিয়ে এই রাজ্যে প্রবেশ করাবে, যেন কেউ তোমার নাগাল না পায় । ... ঠিক আছে, পারবে তো? ... আর হ্যাঁ শোন, তোমাদের এই রাজ্যে আমি আজ এই মুহূর্ত হতে, প্রধান গুপ্তচর রূপে নিয়োগ করলাম। ... মাতার থেকে শিলমোহর দেওয়া কর্মে যোগদানের সংশয়পত্র গ্রহণ করে নিও। ... এক্ষণে আমাকে নিয়ে চলো, যেমন যেমন বললাম, তেমন তেমন কর"।

ঠিক যেমন যেমন বলেছিলেন যুবরাজ ধ্যান, তেমন তেমনই করলেন জীবনমরণ। আর সেই ঘাট এবং মন্দির দেখে নেবার পর, জীবনমরণকে রথে স্থাপিত হয়ে রথকে স্থির রাখতে বলে, যুবরাজ এগিয়ে গেলেন, ভূমিকাঘাটের বিপরীতে জঙ্গলের দিকে। ... আর জীবনমরণ লুকিয়ে লুকিয়ে, ধ্যান কি করতে চাইছেন, সেই সমস্ত কীর্তিকে দেখতে চাইলেন, উৎসাহ ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে।

তাঁরা দেখলেন, ক্রমে ক্রমে, দেবী ভূমির স্নানের সময় এবং মন্দিরে অবস্থান করার সময় বাড়তে থাকলো। ... আর যতই সেই সময় বাড়তে থাকলো, ততই দেবী ভূমির উদাসীনতা হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর মনের মধ্যে এক পুলক খেলতে থাকে, আর সাথে সাথে একটা সন্দিহান ভাবও প্রকট হয়। সর্বক্ষণ যেন, কিসের একটা সন্ধান করে চললেন তিনি। যেন এক অপরিচিত কারুর সন্ধান করতে থাকলেন তিনি, কিন্তু সেই সন্ধান যেন তিনি আনমনা হয়েই করছেন।

এই সমস্ত কিছু দেখে, জীবন মরণের মনের মধ্যে এক রহস্য জট পাকিয়ে যায়। ... এমন কি হচ্ছে দেবী ভূমির স্নানের সময়ে, বা যখন তিনি মন্দিরে অবস্থান করছেন তখন। ... সেই রহস্যের ভেদ করতে, যখন দেবী ভূমি যমুনার জলে পূর্ণভাবে অবগাহন করে স্নান করেন, তখন তাঁরাও জলের মধ্যে অবগাহন করতে থাকলেন । ... আর যা দেখলেন তাঁরা, তাতে তাঁরা হতচকিতই নন, মনে মনে নিজদেরকেই দুষতে থাকলেন।

তাঁদের মনে হয়, কার সঙ্গ দিচ্ছে তারা! ... এই ধ্যান যে অত্যন্ত নীচপ্রকৃতির একটি জীব! ... দেবী ভূমি যখন স্নান করেন, তখন জলতলে, তাঁর অঙ্গে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেন এই নীচ নরাধম! ... এতই নীচ সে যে এক স্ত্রীর সাথে এমন অভব্যতা করে চলেছেন! ... এমন কিছু দিন দেখার পর, জীবন ও মরণ একটি সুরঙ্গকে আবিষ্কার করলেন। এবং সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে যাত্রা করলে, তাঁরা তাঁদের মাতার সেই মন্দির, যাতে দেবী ভূমি স্নানের উপরান্তে যান, সেখানে ওঠেন । সেই সুরঙ্গ দেখে, তাঁরা হতবাক হলেন । এবং একদিন তাঁরা সেই সুরঙ্গের পথ ধরে, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে, একটি স্থানে নিজদেরকে আচ্ছাদিত করে রেখে দেন।

সেই দিন তাঁরা দেখেন, স্নানের উপরান্তে, যখন দেবী ভূমা সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন ধ্যান সেই সুরঙ্গ হতে প্রবেশ করেন, এবং দেবী ভূমিও যেন মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর আগমনের জন্য ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন। যখন তিনি উপস্থিত হন, তখন দেবী ভূমি নিজ অপরূপসুন্দর তনুকে ধ্যানের দীর্ঘদেহে অর্পণ করে দেন, এবং প্রতিদিন স্নানের শেষে, মন্দিরের মধ্যে, তাঁদের এই সঙ্গমক্রিয়া চলতে থাকে।

প্রায় দীর্ঘ দুইমাস এমন চলতে থাকলে, জীবন ও মরণ ধ্যানের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেইদিনেই দেবী ভূমি ধ্যানের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। ধ্যান সেই কথাতে আপ্লুত হলে, বললেন, "দেবী এবার আমাদের দুইজনকে এখান থেকে পলায়ন করে, আমার মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করে, দাম্পত্যজীবন শুরু করা উচিত"।

দেবী ভূমি বলেন, "নাথ, আপনি আমার জীবনে এসে, আমার জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে সুন্দর করে দিয়েছেন । ... আমার মধ্যের হতাশা, নিরাশা, সমস্ত কিছুর নাশ করে, আপনি আমাকে এক নবজন্ম দিয়ে দিয়েছেন প্রায়। ... প্রভু, আমি আপনার থেকে যেই প্রেমরস লাভ করেছি, তাতে আপনার সাথে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, সত্য অর্থে আপনার সঙ্গিনী হয়ে উঠতে আমি নিজেও লালায়িত। কেবল দেহের সঙ্গিনী নয়, এবার আমরা সার্বিক ভাবে একে অপরের সঙ্গী হয়ে উঠবো"। ...

উত্তরে ধ্যান বললেন, "তাই হবে দেবী। ... চলুন আজই আমরা যাত্রা করবো আমাদের মাতার উদ্দেশ্যে"। ... দেবী ভূমি বললেন, "কিন্তু নাথ, উত্তরের দ্বারে যে সেনা অপেক্ষা করছে!" ... ধ্যান বললেন, "দেবী, আমরা দ্বার দিয়ে নয়, এই সুরঙ্গ দিয়ে যমুনায় উঠবো, আর তারপর নদী পার হয়ে, আমরা অন্যপারে যাবো। সেখানে আমার রথ অপেক্ষা করছে, যা আমাদেরকে আমাদের মাতার সম্মুখে নয়ে যাবে"।

দেবী ভূমি সেই কথায় সম্মত হলে, জীবন ও মরণ তড়িঘড়ি করে, সুরঙ্গ দিয়ে যমুনায়, এবং যমুনা পার করে, অন্যপারে উঠে, রথের রসি ধরে অপেক্ষা করলেন। ... তাঁরা সেখানে উপস্থিত হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবী ভূমিকে সঙ্গে নিয়ে, যুবরাজ ধ্যান উপস্থিত হলেন। ... তাঁদের পশ্চাতে বহু যুবরাজ প্রাণপণে ছুটছিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপ করছিলেন, "আমাদের ভূমিকে অপহরণ করে নিলো... ওই দুষ্টকে হত্যা করো... ধরো ওঁকে। ধরো"।

সেই ভিড়ের মধ্যে আকাশ, বাতাস ও অনল, অর্থাৎ ধ্যানের তিন ভ্রাতাও ছিলেন। ... তাঁরাও পশ্চাৎধাবন করতে থাকেন ধ্যানের, এবং তাঁদের পিছনে পিছনে, ছয় বারিকন্যাও পশ্চাৎধাবন করেন। ... দীর্ঘক্ষণ পশ্চাৎধাবনের পরে, মরণ দেখলেন, তাঁদের পিছনে কেবলই ধ্যানের ভ্রাতারা, এবং বারিকন্যারা ছুটছিলেন। ... অন্যদিকে জীবন রথের গতি বহুল ভাবে বারিয়ে ছিলেন, ইতিমধ্যেই। ... সেই দেখে ধ্যান বললেন, "জীবন, রথের গতি কম করো। ... রথে আমার হবু পত্নী রয়েছেন, যিনি অন্তঃসত্ত্বা। আর রথের পশ্চাতে যারা আসছেন, তাঁরা এদিকে আসতে পারছেন কারণ তাঁরা এই পথ চেনেন, অর্থাৎ আমার ভ্রাতারা। ... তাই রথের গতি এমন রাখো জীবন, যাতে ভ্রাতারা আমাদের নিকটে পৌছাতে না পারেন, কিন্তু আমাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে হারিয়েও না ফেলেন"।

জীবন তেমনই করলে, দুই দিনের মধ্যে তাঁরা দেবী চেতার নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন । ... প্রাসাদে এসে মাতার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন ধ্যান, এবং অতঃপরে দেবী ভূমি প্রণাম করতে গেলে, ধ্যান কিছু দেখালেন মাতাকে, তাই দেবী চেতা বললেন, "থাক মা, ... এই অবস্থায় অধিক নিচু হতে নেই" । ... সেই বাক্যালাপ সমাপ্ত হতে হতে, সেখানে আকাশ, বাতাস ও অনল এসে উপস্থিত হন। ... বহুপথ তাঁরা কেবল দৌড়ে এসেছেন বলে নিশ্বাসের গতি তাঁদের অত্যন্ত গতিমান হয়ে ওঠে। ...

সামান্য প্রকৃতস্থ হলে, তাঁরা নিজদের অবস্থানের আশেপাশে দেখতে থাকলেন। যেন কি ভালো ভাবে চেনেন সেই স্থানকে। ... খানিক পরে, যখন তাঁদের দৃষ্টি তাঁদের মাতার দিকে পরল, তখন তাঁদের যেন সমস্ত চেতনা ফিরে আসে। ... তাঁরা মাতার স্কন্ধে, ক্রোরে, বক্ষে নিজদের স্থাপন করে, মাতার আলিঙ্গনের আনন্দ নিতে থাকলেন। ... বেশ কিছুক্ষণ পরে, তাঁদের হুঁশ হয় যে, তাঁরা এতদিন এই রাজ্যের থেকে দূরে ছিলেন, আর এও দেখেন যে তাঁদের ভ্রাতা তাঁদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন, দেবী ভূমিকে বিবাহ করে।

কিন্তু কেন তাঁরা বারিরাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। ... তাই বারি কন্যারা বললেন, "নাথ, ভূমিকে দেখিয়ে সকল রাজপুত্রদের পিতা নিজের রাজ্যে নিয়ে আসতেন। ... ভূমি সকলকেই বলতো যে, সে তাঁকেই বিবাহ করবে, যার সঙ্গ লাভ করে, সে নিজেকেই ভুলে যাবে। ... সেই সামর্থ্য কেউ নিজের মধ্যে দেখতে না পারলে, সকলেই নিজরাজ্যে ফিরে যেতে চান, কিন্তু

আমাদের মাতারা, অর্থাৎ দেবী যোজনা, যাচনা এবং কল্পনা, তাঁদেরকে আহার করার নাম করিয়ে এমন কিছু ওষধি প্রদান করেন, যে তাঁরা নেশাগ্রস্ত হয়ে, কেবলই ভূমিকে দেখতে থাকেন। আর সেই সুযোগে আমাদের পিতা সেই রাজ্যকেই অধিগ্রহণ করে নিতেন।

কিন্তু বিশ্বাস করুন নাথ, আমরা আপনাদেরকে নিজদের পতি বলে মনমধ্যেই স্থির করে নিয়েছি, আমাদের মাতাপিতার কৃতকর্মের দণ্ড আমাদের দয়া করে দেবেন না, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না নাথ। ... প্রশ্ন করে দেখুন, আপনার ভ্রাতাকে, আমরা জানতাম যে তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রতিদিন ভূমির সাথে একাত্ম হতেন। ... আর এও জানতাম যে ভূমি তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসে। ... তাই আমরা সবপ্রকার চেষ্টা করেছি, যাতে উনার আগমনের বার্তা পিতা বা আমাদের মাতাগণ না পান"। ...

এবার ক্রমে সকল প্রজাও এসে উপস্থিত হন চেতারাজ্যে। ... যেখানে তাঁদের রাজা আকাশ উপস্থিত, সেখানেই তাঁরা উপস্থিত। ... মাতা চেতা আনন্দিত হয়ে, বারি কন্যাদের সাথে নিজের তিন পুত্রেরও বিবাহ দিলেন। ... আর এই সমস্ত কিছুর পরে, সেখানে উপস্থিত হলেন সস্ত্রীক বারি। কিন্তু তাঁকে রাজসভায় পদচারণ করে উপস্থিত হতে হলো না। ... তাঁরা যে আসবেন, সেই কথা ধ্যান ভালো করেই জানতেন, তাই তাঁদেরকে বন্দি করার জন্য মৎস্যচাসের জাল ব্যবহার করেন।

সেই মৎস্যজালে আবদ্ধ হওয়া বারি রাজসভায় সস্ত্রীক উপস্থিত হলে, ধ্যান তাঁদের সম্মুখে টহল দিতে দিতে বললেন, "কি মহারাজ বারি! ... মৎস্যদের এই ভাবে ধরে, তাদের নিয়ে বাণিজ্য করতেন না আপনি! ... তা পোষাল না, তাই না! ... তিন পত্নীর বুদ্ধিতে লোভ জন্মে গেল। ... আর নক্কার জনক কর্ম করতে আরম্ভ করলেন! ... সকল রাজপুত্র, যাদেরকে আপনি বন্দি করে রেখেছিলেন, আপনার স্ত্রীদের দ্বারা, তাদেরকে মুক্ত করা হয়ে গেছে। ... আর তো আপনার রাজত্বও নেই। ...

বলুন এবার কি করবেন, আমাদের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকলে আপনি অন্য রাজাদের থেকে সুরক্ষিত থাকবেন, আর যদি তা না করে আবার রানিদের নিয়ে রাজত্ব গঠন করতে যান, তবে যেই যেই রাজার পুত্রদের আপনি বন্দি করে রেখেছিলেন, তাঁরা সকলে মিলে আপনার হত্যা করবে"।

বারি করজোড়ে রাজমাতা চেতার সম্মুখে পতিত হয়ে বললেন, "আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন রাজমাতা। ... আমি যে আমার এই কন্যা, ভূমিকে অত্যন্ত স্নেহ করি। ... তাঁর মুখখানি একটিবার না দেখলে, আমার যে জীবনই বৃথা হয়ে যায়। ... রাজমাতা, আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন"। ...

রাজমাতা চেতা গম্ভীর নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "বারি, তুমি আমাদের রাজ্যে থেকে, মৎস্যচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারো, কিন্তু তোমার এই তিন স্ত্রীকে তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ... তাঁদেরকে এই রাজ্যের সীমারেখার মধ্যে দেখা গেলেও, রাজ্যের সেনা তাঁদের হত্যা করবে।... যদি রাজি হও, তবে, তাঁদেরকে ত্যাগ করে, এখানে থেকে মৎস্য চাষ করে, তোমার সকল পুত্রীদেরকেই

তুমি দেখতে পাবে" । ... বারি তাতে রাজি হলে, সেখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করেন, আর কিছু মাস পরে দেবী ভূমি ধ্যানের বীজ থেকে লব্ধ সন্তানের জন্ম দেন, এবং রাজমাতা তাঁর নাম দেন সমাধি।

এই সমস্ত কিছু দেখে, জীবন ও মরণ নিজদের মধ্যে বললেন, "ভ্রাতা এবার আমাদের নিজদের পরিচয় প্রদান করা উচিত" । ... এতো ভেবে তাঁরা যখন রাজমাতাকে সমস্ত কথা বলতে গেলেন, তখন তাঁরা দেখলেন সম্মুখে কিচ্ছু নেই। ... কেবল রাজমাতা ক্রমশ তাঁদের মাতার রূপ হয়ে, ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হলেন। ... পুনরায় তাঁরা সেই ধুধু ময়দানেই দণ্ডায়মান রইলেন, কেবল পূর্বের বারে, সময়টি ছিল আমাবস্যার রাত্রি, আর আজকে সময়টা হলো দিনের বেলা।

বিচার এবার হতাশ হয়ে বসে পরলেন, আর নিরাশ হয়ে বলতে থাকলেন, "কেন আমাদের সাথে এমন বারবার হচ্ছে ভ্রাতা!" .. বিবেকও বিমর্ষ। সেই বিমর্ষ মুখেই সে বলল, আমাদের অজ্ঞানতার কারণে। মাতার থেকে আমরা সরে এসেছি, কিন্তু মাতা আমাদের থেকে সরে গেলে, আমাদের অস্তিত্বই যে অবলুপ্ত হয়ে যেত। ... দেখো ভ্রাতা, তিনি ঠিকই আমাদের সঙ্গে আছেন। ... তুমি যেমন বলেছিলে, জগন্মাতা ও জগৎপিতা হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তেমন ভাবেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন । ... কিন্তু আমরাই ঠিক করেছিলাম না, পিতামাতা করে তাঁদের সহায়তা নেবো না, তাই আমাদের মাতা হয়ে তিনি কখনোই সম্মুখে আসছেন না । কিন্তু জগজ্জননী হয়ে আমাদের মনের সমস্ত দ্বন্ধকে সমানে মিটিয়ে যাচ্ছেন তিনি"।

বিচার বললেন, "পূর্বের বারে না বুঝলাম, পঞ্চভুতের সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান ছিলাম, আমাদেরকে মা পঞ্চভুতের গুরুত্ব, এবং পঞ্চভূতকে কি উপায়ে আমাদের নিজদের সাধনে উপযোগী করতে হয়, তা দেখালেন এবং শেখালেন। ... কিন্তু এবার এই মায়ার অর্থ কি?"

বিবেক বললেন, "আমাদের প্রশ্ন ছিল, মনকে কি ভাবে নিজের সামর্থ্য স্মরণ করাতে হয় । ... মা আমাদের সেই উপায়ই দেখালেন। আর সাথে সাথে এও দেখালেন যে, আমরা আমাদের কর্মেরই ফল পাই, যেমন রাজা বারি পেলেন, আবার তাঁর পত্নীরাও পেলেন"।

বিচার বললেন, "আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে অনুজ, কিসের ভিত্তি তে তুমি এই কথা বলছো?" ... বিবেক বললেন, "আকাশ অর্থাৎ আকাশতত্ব বা মন, বাতাস অর্থাৎ পবন, অনল অর্থাৎ অগ্নি। বুদ্ধি নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে যোজনা, যাচনা, এবং কল্পনার মাধ্যমে, অর্থাৎ বিকারের বলে। আর এঁদের থেকে নিষ্পাপ, ছয় ইন্দ্রিয় রচিত হয়, কিন্তু এঁদের নিকৃষ্ট কর্মের কারণে নিষ্পাপ হয়েও তাঁরা পাপকর্মের শিকার হয়ে যান । তাঁরা কিছু করেন না, কিন্তু সকলে তাঁদেরকেই দোষ দিতে থাকেন, যেমন ধ্যান, প্রথমে এঁদেরকেই দোষ দিচ্ছিলেন।

এই সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির দ্বারা দেহের নির্মাণ হয়, অর্থাৎ ভূমি বা মৃত্তিকাতত্ত্ব, আর সেই ভূমির প্রতি বুদ্ধি আসক্ত হন। একই ভাবে ভূমি বা দেহের প্রতি আসক্ত মন তথা সকল ভূতই হয়ে থাকেন। আর এই আসক্তির কারণে, তাঁরা ইন্দ্রিয়দের সাথে যুক্ত হয়ে যান, ঠিক যেমন বারিকন্যাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন সমস্ত ভূতরা। ...

কিন্তু এখানে পথ দেখায় ধ্যান, যিনি চেতনার অর্থাৎ আমাদের মাতার, বা রাজমাতা চেতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে থাকেন। ... এই ধ্যান, তনুর মধ্যে হিল্লোল প্রদান করেন। তনু সেই হিল্লোলে আসক্ত হতে শুরু করে, এবং ধ্যানের মধ্যে তনু স্থাপিত হয়ে যায়, অর্থাৎ সঙ্গম হয় ধ্যান ও ভূমির।

এরপর, ভূমি যখন সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যানের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তখন ধ্যান ভূমিকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহকে নিজের অধিকারে রাখেন। ... আর সেই অধিকারের কারণে, সমস্ত ভূত, সমস্ত পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়রাও যুক্ত হতে বাধ্য হয় ধ্যানের সাথে, এবং ধ্যান তাঁদের সকলকে নিয়ে এসে স্থাপিত করেন মাতার কাছে, অর্থাৎ চেতনার সকাশে। এবং এই প্রভাবে বুদ্ধি নিজকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়, আর মন নিজের সামর্থ্যকে ফিরে পেয়ে চেতনার পাদদেশে স্থাপিত হয়ে, সমস্ত ভূতকে শাসন করেন।

ভ্রাতা, এর অর্থ এই যে, ধ্যানই সেই উপায়, যার মাধ্যমে মনকে নিজের সামর্থ্যের বোধ করিয়ে, বুদ্ধির উপর মনকে স্থাপিত করা যায়। ... একমাত্র ধ্যানই তা, যা আমাদের বুদ্ধিকে দেহসর্বস্ব বোধ থেকে মুক্ত করে, বুদ্ধির সমস্ত বিকার অর্থাৎ যাচনা, কল্পনা, বা যোজনার নাশ করে দেয়, এবং মনকে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ বা বশ্যতার থেকে মুক্ত করে"।

বিচার বললেন, "এর অর্থ এই যে, যোজনা মানে বিভিন্ন পরিকল্পনা, যাচনা মানে বিভিন্ন কামনা, এবং কল্পনা মানে সমস্ত ইচ্ছার দ্বারাই বুদ্ধি মনকে তথা ইন্দ্রিয় এবং দেহকেও নিজের বশ করে রাখেন। ধ্যান দেহকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে, বুদ্ধির সমস্ত যোজনাকে, যাচনাকে আর ইচ্ছাসমূহকে নাশ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মনকে উদ্ধার করে, এবং বুদ্ধিকে মনের কাছে পরাভূত করে!"

বিবেক এবার বিমর্ষ বদনে বললেন, "হ্যাঁ ভ্রাতা। ... আচ্ছা বলো তো ভ্রাতা, আমরা এতদিন মাতা ও পিতার সম্মুখে থেকে, কি শিখলাম! ... কিচ্ছু শিখিনী। ... খালি আমার মা জগজ্জননী, এই বলে অহংকার করে এসেছি। ... আর কিচ্ছু শিখিনী বলে, আজ মাকে এই কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে আমাদের জন্য। ... আমরা তাঁকে মাতারূপে না করে, জগন্মাতা রূপে কামনা করেছি; তাই তিনি আমাদের সম্মুখে এসে মায়ার রচনা করে, আমাদেরকে একের পর এক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের অঙ্গীকারের জন্য আমাদেরকে একটিবারও দেখা দিতে পারছেন না, আলিঙ্গনও প্রদান করতে পারছেন না! ... কি অপরিসীম বেদনার মধ্যে তিনি রয়েছেন, তাই না! ... শুধুই আমাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে!"

বিচার বিমর্ষ হয়ে বললেন, "কিন্তু ভ্রাতা, আমরা তো মনে মনে ভেবেছিলাম সেই কথা, ... সেই অনুসারে কোন কর্ম তো করিনি। ... যেই কর্ম আমরা করিনি, তার ফল আমরা পাচ্ছি কেন?" ... বিবেক বললেন, "হ্যাঁ আমারও সেই একই প্রশ্ন, কিন্তু (নেত্রের অশ্রু

মুছে) এবারেও কি মা আমাদের কাছে এসেও না দেখা দিয়ে, কেবলই তাঁর মায়ার দ্বারা কিছু তত্ত্বকে স্থাপন করে চলে যাবেন। ... ভ্রাতা আমি আর পারছিনা, মাতার স্পর্শ পেতে মন ব্যাকুল হচ্ছে । ... মাতার অঙ্গের সুগন্ধ নেবার জন্য মন ছটফট করছে। ... আর পারছি না ভ্রাতা। ... এই মায়াতত্ত্বের ক্রীড়া কেন ভ্রাতা! ... শুধু তত্ত্বই তো থাকতে পারতো, আবার মায়ার কি প্রয়োজন ছিল তাতে?"

বিচার বললেন, "প্রস্তুত হও অনুজ, আমরা শীঘ্রই পরবর্তী মায়ার মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি, এবার মাহা কি, ও কর্মফলের বিজ্ঞান বুঝতে হবে আমাদেরকে।... প্রস্তুত হয়ে যাও অনুজ"। ... বিবেক ক্ষোভ উগ্রে দিয়ে বললেন, "তুমি তো এমনই চেয়েছিলে। ... মাতার থেকে দূরে স্থিত হয়ে, মাতাকে জানা ও চেনা।... তাই তোমার তো খুশি হওয়া উচিত!" ... বিচার বললেন, "মাতার থেকে দূরে স্থিত হবার জন্য যে জীবনটাই বৃথা লাগবে, এমন কি ভেবেছিলাম অনুজ । ... কিন্তু মা তো আমাদের কষ্টটা দেখতে পাচ্ছেন। তবুও কেন আসছেন না!"

বিবেক বললেন, "আমরা আমাদের কর্মের ফলে বাঁধা, আর তাই তিনিও সেই একই কর্মের ফলে বাঁধা পরে গেছেন"। ... বিচার বললেন, "আমি তো সেটাই বুঝতে পারছিনা! কিসের কর্মফল... যখন আমরা শুধুই কিছু চিন্তা করলাম, কোন কর্ম করলাম না, তবে কর্মফল কেন? ... বলে, যে যার কর্মের ফল ভোগ করেন, ... কিন্তু আমাদের মাতা কি কর্ম করলেন, যে তার কর্মের ফল তাঁকেও এমন ভোগ করতে হচ্ছে? ... আমরা যতটা কষ্ট পাচ্ছি তাঁকে স্পর্শ না করার জন্য, তিনি তার দুইগুণ কষ্ট পাচ্ছেন"।

বিবেক বললেন, "হ্যাঁ ভ্রাতা, প্রথম তো আমাদের সাথে সাখ্যাত না করতে পেরে, দ্বিতীয়ত আমাদের মনে যেই পীড়া হচ্ছে, সেই পীড়ার জন্য ব্যাথা... আর কর্মের ফল কেন? ... ভ্রাতা তুমিই তো বললে, পরের মায়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমাদেরকে। ... সেই মায়াই আমাদেরকে কর্মের ফলের বিজ্ঞান প্রদান করে দেবে"।

কৃতমায়া অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন দেবী দিব্যশ্রীকে এবার বিচার ও বিবেকের তৃতীয় কাহানী বলতে থাকলেন, "পুত্রী, সন্তানদের এমন ব্যাকুল আহ্বানকে মাতা কি করে অদেখা করতে পারেন। বিবেক ও বিচার ব্যথিত চিত্তে পথ চলতে থাকলে, এবার একটি সামান্য গ্রামে তাঁরা প্রবেশ করলেন। তাঁরা উভয়েই জানতেন এবারে যে সেই গ্রামও নিশ্চয় তাঁদের মাতারই মায়া হবে। তাই জেনে, এবার তাঁরা প্রস্তুত থাকলেন যে, এক নূতন মায়া জগতের নির্মাণ হতে চলেছে, যাতে তাঁরা পতিত হতে চলেছেন।

সেই প্রস্তুতি নিয়েই বহুদূর যাত্রা করলেন তাঁরা সেই গ্রাম ব্যাপী, কিন্তু এবারের মায়ার ধারা ভিন্ন। কেউ তাঁদের কাছে আসেনও না, আর এবার তাঁরা কারুর কাছে যানও না। এরই মধ্যে, তাঁরা এক স্ত্রীকে দেখলেন হন্তদন্ত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ... ভদ্রমহিলার বয়স এই ৪৫ কি তার থেকে সামান্য অধিক হবে। তবে তাঁর রূপের বহর তখনও প্রত্যক্ষ তাঁর সমস্ত দেহমন্দিরে। ... তাঁর

অঙ্গের গোলাপি রং এখন একটু ফ্যাঁকাসে হয়েছে বয়সের কারণে, কিন্তু তাঁর তৈলাক্ত চর্মের ভাব এটা স্পষ্ট বলে দেয় যে, তিনি তাঁর যুবতি কালে অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

মুখের গড়ন তাঁর অনেকটা তাঁদের মাতার ন্যায়; নেত্র, নাসিকা, ওষ্ঠ, সমস্ত কিছুই অত্যন্ত নিখুঁত, যার কারণে এক স্ত্রীকে পরমাসুন্দরী বলা হয়। ... বয়সের জন্য তাঁর কেশে পক্কতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ততটাও পক্ক হয়নি কেশ, তাই কেবলই বয়সের চিহ্ন রেখে গেছেন সেই পক্কতার দ্বারা। ... হন্তদন্ত হয়ে এদিক সেদিক সন্ধান করার পরে, যখন তিনি যা খুঁজছিলেন, তা খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

যখন বেশ কিছু দূরে চলে গেলেন তিনি, তখন বিবেক ও বিচার দেখলেন, যেই বৃক্ষটির চারিপাশে সেই বিবাহিত মহিলাটি ঘোরাফেরা করছিলেন, সেই বৃক্ষ থেকে এক পুরুষ নেমে এলেন। ... এই পুরুষটিকেও অদ্ভুত দেখতে। ... সুঠাম চেহারা বলে দেয় যে, যখন তিনি যুবা ছিলেন, তখন কতটা বলশালী ও সুদর্শন ছিলেন । ... অঙ্গের রং তাঁর গৌর, এবং দেহের ভাব এমন যে অতিকায় পরিশ্রমী তিনি নন, কিন্তু সর্বক্ষণ কিছু না কিছু কর্ম তিনি করে চলেন। ইনার বয়স এই ৬০ বা তার থেকে সামান্য অধিক হবে, কারণ ইনারও কেশে পাক ধরেছে।

ইনি এবার বৃক্ষ থেকে নেমে, যেই দিকে সেই মহিলাটি গমন করলেন, ঠিক তার বিপরীত দিশায়, অর্থাৎ যেদিকে বিবেক ও বিচার দণ্ডায়মান হয়ে সমস্ত ক্রীড়া দেখছিলেন, সেই দিকে আসতে থাকলেন। বিবেক ও বিচার এবারে নিশ্চয় করেছেন যে তাঁরা কোন কারুর সাথে আলাপ করে, নূতন করে মায়ার প্রসার করবেন না।... তাই তাঁদের মনে এই পুরুষটি কেন বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন, তা জানার কৌতূহল থাকলেও, তাঁরা কেবলই দর্শকের স্থানে নিজদের রেখে, যা সম্মুখে হচ্ছে, তা দেখতে থাকলেন।

সেই প্রাপ্তবয়সের ব্যক্তি তাঁদের পাশ দিয়ে, তাঁদের দিকে না তাকিয়েই হন্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, যেন তিনি পলায়নের চিন্তা করছেন। ... সেই দেখে বিবেক ও বিচার সম্মুখের পথের অনুসন্ধান করলেন। ... কিন্তু সামান্য সময়ের মধ্যেই, তাঁদের নাম ধরে কেউ ডাকলেন, এমন মনে হলো তাঁদের। ... তাঁরা, এই গ্রামে তাঁদেরকে কেউ চেনেন কিনা, তার সন্ধান করার জন্য পিছনে ফিরতে দেখলেন, সেই প্রাপ্ত বয়সের ব্যক্তিটিই তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আমার কি সৌভাগ্য, সাখ্যাত মাতার পুত্রদের দেখছি এখানে। ... কিন্তু হে বরেণ্য, আপনারা এইখানে, মহাস্বর্গ থেকে এতো দূরে কেন?"

বিবেক বললেন, "আপনি আমাদের কি ভাবে চিনলেন?" ... সেই প্রাপ্ত বয়স্ক বললেন, "আপনাদের আমি দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করতে দেখেছিলাম। ... আমি ও আমার স্ত্রী সেই সময়ে, দ্বারকাপুরী থেকে বিতাড়িত হয়ে, প্রস্থান করছিলাম। ... আর সেই কালে আপনাদের দর্শন লাভ করে, আমরা উভয়েই অত্যন্ত ধন্য মনে করেছিলাম নিজদেরকে"। ... বিচার বললেন, "বিতাড়িত! আপনাদের বিতাড়িত করা হলো কেন?" ...

প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, "প্রভুরা, অধর্মীর রাজ্যে ধার্মিককে তো বিতাড়িতই করা হবে। ... মাতার আরাধনা করতাম আমরা। না কিছু চাইতাম না, কারণ আমরা মনে করিনা তাঁর থেকে কিছু লাভ করার যোগ্য আমরা, এমন কি তাঁর দর্শন লাভ করারও যোগ্য আমরা নই। ... কিন্তু তিনি সত্য। ... সত্য যে অব্যক্ত। সেই অব্যাক্ত ব্রহ্ম, ব্যক্ত রূপ ধারণ করে, আমাদের সকলের উপর কৃপা বর্ষণ করতে এসেছেন। তাই তাঁর স্মরণ করতাম। ...

আমাদের ন্যায় আরো ছয়সাতটি পরিবার দ্বারকাপুরীতে ছিল। ... কিন্তু সেখানের শাসক, অর্থাৎ ছায়াদেবীদের মনে হয় যে, আমাদের আবাহনেই মাতা স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে, দ্বারকাপুরীকে নষ্ট করে দেবেন। ... তাই আমাদের সকলকেই সেই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেন। ... জানিনা, আমাদের পরেও কারুকে বিতাড়িত করেছেন কিনা । ... কিন্তু আমরা সপ্তম দম্পতি ছিলাম, যাদেরকে ছায়াদেবীরা বিতাড়িত করেন। ...

(হেসে) আমার পত্নী অতি গোপনেই আরাধনা করতেন মাতার। সব আমারই কর্মের ফল । ... মাতার চঙ্কিনি রূপাদি, আবার পরানিয়তি রূপ প্রকাশ পাবার সাথে সাথে, হৃদয় এতো ভারি হয়ে ওঠে যে, আমরা তাঁর কথা জানতে পেরেছি, সেই ভাবকেই সৌভাগ্য মনে হয় আমাদের, আর আমরা একটা ছোট করে মাতার আরাধনা করার চেষ্টা করি। ... প্রভুরা, ছায়াদেবীর গুপ্তচর সেই তথ্য জেনে যান, আর সেই জেনে যাবার জন্য আমাদের কর্মের ফল ভুগতে হলো।... তবে হ্যাঁ, যেদিন আমরা তল্পিতল্পা নিয়ে স্বামীস্ত্রী নির্গত হচ্ছিলাম, সেইদিন আপনারাও দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করেন। ...

আপনারা দুই ভ্রাতা কি মায়াভেদের কথা বলছিলেন। ... তা আপনাদের নৈকট্য লাভ করতে গেলে, আমাদের থেকেও অধিক বিপদ আপনাদের হতো। তাই আমার ইচ্ছা থাকলেও, আমার স্ত্রী আমাকে আটকে দেন। সেই থেকেই আপনাদের অবয়বকে চিনি । ... কিন্তু প্রভু, আপনারা এই এতোদূরে! কিছুর সন্ধান করছেন? কিছু ভাবে কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?... আপনাদের পরিচয় সকলে জেনে গেলে, এমনিই সাহায্য করবে আপনাদেরকে। ... দাঁড়ান, আমি সকলকে বলে দিচ্ছি"।

বিবেক সেই প্রাপ্তের প্রস্তুতিকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম কি? ... আর আপনি এমন বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কেন?" ... সেই প্রাপ্ত করজোড় করে বললেন, "আজ্ঞে এই অধমের নাম সোম। ... আমি আমার স্ত্রীর থেকে পলায়ন করতে চাই। আর সেই কারণেই এই বৃক্ষের উপরে আশ্রয় নিয়ে ছিলাম। ... বৃক্ষের নিচে আমার স্ত্রী, দুর্গা অনেকক্ষণ আমার সন্ধান করেন। ... কিন্তু যখন শেষে আমাদকে খুঁজে পাননা, তখন তিনিও চলে যান"।

বিচার বললেন, "কিন্তু কেন পালাচ্ছেন, আপনার স্ত্রীর থেকে? ... আপনি কি কোন অপরাধ করেছেন?" ... সোম বললেন, "না না প্রভু, ... অপরাধের জন্য নয়। ... আর বলবেন না, সারাদিন আমার সেবা করতে থাকেন আমার স্ত্রী। ... আর এরাম সেবা পেলে কি আর ঈশ্বরে মন যায়! ... এবার আমার বয়স হয়েছে। তাই এবার আর ঈশ্বরকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে কর্ম করলে হবেনা। ওরকম

করতে গেলে, এবার আমাদের মানব জন্মই বৃথা হয়ে যাবে। ... আমার গিন্নিকে সেই কথা বলতে, তিনি বলেন, আপনি সাধন করুন, আমি আপনার সেবিকার বেশে সাধনসঙ্গিনী হবো। ...

তাঁর এই মায়া আমাকে বিরক্ত করে দিচ্ছিল, আমাকে সাধনের পথ থেকে অপসারিত করে দিচ্ছিল। ... তাই আমি স্থির করি, আমি গৃহত্যাগী হয়ে, সাধন করে, মাতার আশীর্বাদ লাভ করে তবেই প্রত্যাবর্তন করবো গৃহে। ... কি বলি প্রভু, আমার স্ত্রীর কাছে যেন আমার সেই কথার কোন গুরুত্বই নেই! ... সে আমাকে বলে কিনা, সংসারে থেকেই সাধন হবে। ... কোথাও যাবার দরকার নেই। ... অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি, শেষে দেখলাম না সকল বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। ... তাই দৃষ্টির আড়াল হতেই, আমি পলায়ন করেছি। ...

মায়া, বুঝলেন মায়া... যা সত্য নয়, তাকেই সত্য বলে স্থাপিত করে, সত্যের পথ থেকে ভ্রমিত করে দেওয়া ... সব মায়া। ... পলায়ন না করলে না, ওই মায়ার থেকে কিছুতেই ছাড়া পেতাম না। ... দেখুন না নাথ, উনি আমার পশ্চাৎধাবনও করেছেন। ... তাই তো সেই মায়ার থেকে বাঁচার জন্য, এই বৃক্ষে উঠে, আত্মগোপন করি"। ...

বিবেক বললেন, "আমরাও সেইপ্রকার এক কারণেই পলায়ন করেছি । ... আমরাও মাতাকে জানতে চাই। ... কিন্তু মাতা আমাদের বিবাহ দিতে চান। ... তাই আমরা একপ্রকার পলায়নই করেছি। ... আর আপনার ন্যায়ই আমরাও চাই যে, পূর্বে মাতাকে জেনে, তবেই আমরা প্রত্যাবর্তন করবো। ... মায়াকে না জেনে, মায়ায় প্রবেশের মানে কি বলুন তো! নিজদের সমস্ত জীবনকে মায়ার দাস করে রেখে দেওয়া। ... তাই সেই মায়াকেই জানতে বেড়িয়েছি বলতে পারেন"।

সোম বললেন, "তাহলে তো আপনাদের পরিচয় কারুকে বলা যাবেনা। ... বেশ বেশ, ... (খানিক থেমে) আচ্ছা প্রভু, যদি অভয় দেন, ... মানে জানি, আমি আপনাদের সহগামী কিছুতেই হতে পারিনা, তাও ওই বলে না, একই পথে চলা গুরু ও শিষ্যও সখা হন; তাই অনধিকারই বলছি, নাথ, আপনারা এই স্থানে নতুন। ... এই স্থানকে আমি ভালোকরেই জানি। ... আমার জন্মভিটা এটি। ... তাই আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন নাথ?"

বিবেক বললেন, "এতো অতি উত্তম কথা। ... কিন্তু সোম, আমার মনে একটি প্রশ্ন আছে । ... বেশ পথ চলতে চলতেই সেই প্রশ্ন করছি তোমাকে। ... চলো এগিয়ে চলো। ... এবার কোন দিশায় যাবো আমরা?"

সোম বললেন, "প্রভু, সেই দিকেই, যেই দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম। ... এই দিশায় একটি বন আছে। ... সেখানে আমরা আশ্রয় নিয়ে, অত্যন্ত সহজ ভাবে ফলাহারে জীবনও কাটাতে পারবো, আর সাধনাও করতে পারবো"। ... বিচার বললেন, "বেশ, বেশ, তো অনুজ, তুমি কি প্রশ্নের কথা বলছিলে?"

বিবেক বললেন, "আসলে সোমকে আমার এই প্রশ্ন করার যে, আপনি যে সাধন করার কথা বলছেন, তো সাধন করার জন্য কিছু পুঁজি লাগে। সেই পুঁজি আপনার কাছে আছে?" ... সোম বললেন, "সত্য বলেছেন প্রভু, মটরদানা সঙ্গে থাকবে, তবে না মটরদানা চর্বণ করার চিন্তা করবো। ... প্রভু, আমি যখন যুবা বয়সে ক্ষেতের কর্ম করতাম, তখন অম্বা নামের এক ছোট্ট কিশোরী, মাতারই কোন বেশ হবে, তিনি এসে আমাকে কর্মবিজ্ঞান বুঝিয়েছিলেন। ... নাথ, তারপর তো এই বিবাহ-আদি কর্মে নিযুক্ত হয়ে গেলাম, আর সেই কথার মন্থনও করা হয়নি। ... সেই মটরদানা আমারকাছে রয়ে গেছে। ... এবার চলুন, আপাদের সাথে সেই মটরদানা ভাগ করে নিয়ে, একসাথে চর্বণ করে পুষ্টি গ্রহণ করি"।

বিচার বললেন, "এতো বড় উত্তম কথা। ... চলো সোম, বনের পথেই যাওয়া যাক। ... সেখানেই বসে বসে সেই মটরদানা চর্বণ করা যাবে"। ... সোম বললেন, "প্রভু, আমাদের তবে বনে প্রবেশ করার আগে, একটু গ্রামটি পরিদর্শন করতে হবে। ... আসলে, মটরদানা তো! একটু লবণ মশলা না হলে, চর্বণ করলে কোন স্বাদ পাওয়া যায়না। ... চলুন, গ্রামের ভ্রমণ করতে করতে সেই মটরদানার জন্য লবণমশলা নিয়ে নিই"।

বিবেক বললেন, "এক কাজ করলে হয়না! ... আমরা বনে গিয়ে, সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করে, লবণমশলার সন্ধান করলে কেমন হয়। ... না আসলে সন্ন্যাসীর তো ভিক্ষা করতেই হয়। সেই ভিক্ষা করার কালেই না হয় লবণমশলার যোগার করা হবে"। ... বিচার বললেন, "আচ্ছা ভ্রাতা এই লবণমশলাটি ঠিক কি?" ... বিবেক হেসে বললেন, "ভ্রাতা, কর্মবিজ্ঞান যদি মটরদানা হয়, তবে লবণমশলা হল সেই কর্মগুলি, যাদেরকে দেখে কর্মবিজ্ঞানকে বোঝা সম্ভব হবে, আর এই দুই মিলে সাধনের পুঁজি"।

বিচার সে কথা শুনে মৃদু হাসলেন। হাসলেন নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য, আর নিজের অনুজের খুরধর বুদ্ধির জন্য। ... আর এবার দুই ভ্রাতা সোমের সাথে গেরুয়া বস্ত্র, ভিক্ষার মালসা, ও ভিক্ষার থলে ক্রয় করে, বনের মধ্যে যেতে থাকলেন। ... বনের মধ্যে গমন করে, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে, দুই ভ্রাতা সোমের সাথে ভিক্ষার ঝুলি ও মালসা নিয়ে নির্গত হলেন ভিক্ষা ও লবণমশলা লাভের উদ্দেশ্যে।

পথ চলতে চলতে একটি শ্রমিকের দিকে তাঁদের দৃষ্টি গেল। তাঁরা দেখলেন, শ্রমিকটি হন্তদন্ত হয়ে, জলাশয়ের দিকে গমন করলেন, এবং অনেকক্ষণ ধরে জলপান করলেন। ... জলপান করে শান্ত হয়ে পুনরায় নিজের কায়িক শ্রমে রত হলেন । ... সেই দেখে, বিচার বললেন, "আমরা ইনাকে কেন দেখছি অনুজ!" ... সোম বললেন, "সেই কিশোরী আমাকে যেটা বলেছিলেন, তা অনুসারে, যা কিছু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে আসছে, তাকে গ্রহণ করতে হয়, বিনা কোন কারণে। কোন দৃশ্য, কোন অনুভব কি কর্মে লাগবে, আমরা কেউ জানিনা। কোন দৃশ্যের মাধ্যমে, কি শিক্ষা আমাদেরকে, আমাদের মাতা, প্রকৃতি ও সময় বেশে প্রদান করছেন, তা আমরা কেউ জানিনা। তাই সমস্ত কিছুকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করতে হয়, এবং সময় আসার পূর্বে, তার মন্থন করে, তার থেকে অর্থ

নিষ্কাসনের প্রচেষ্টাও করতে নেই, কারণ সময়ের পূর্বে তা করলে, অসমাপ্ত সিদ্ধান্তকেই সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত ভেবে আমরা ভ্রমিত হই । ... তাই যা কিছু মাতা সম্মুখে এনে দেখাচ্ছেন, তা দেখে নিন, নাথ"।

বিচার একটু বিরক্ত হয়েই তা দেখলেন। ... বেশ কিছুক্ষণ তা দেখে, যখন দেখলেন, সেই শ্রমিক মনোযোগ সহকারে কর্মে লিপ্ত হয়ে গেছেন, তখন তাঁদের বামদিকে একটি কিশোরকে গুরুর সাথে পথ চলতে দেখলেন। ... গুরুটি সেই শিষ্যকে কিছু শিক্ষা দিতে চাইছেন, আর শিষ্যটির মনোযোগ অন্য কিছুতে, বা বলা যেতে পারে কোন কিছুতেই নেই । ... প্রতিটি গৃহে যাত্রা করে গুরু শিষ্যকে নিয়ে ভিক্ষালাভের আশা করেন, আর শিষ্যটি সেই গৃহিণীর থেকে পানিয় জলের আশা করেন। ... নিজরা ভিক্ষা গ্রহণ করে সেই গুরুশিষ্যের পিছনে পিছনে গমন করে বিচার, বিবেক ও সোম দেখলেন, সেই শিষ্যটি পরবর্তী গৃহ থেকে ভিক্ষা গ্রহণের কালে, গুরুকে বলেন, তাঁর মল ত্যাগ করা আবশ্যক, আর মল ত্যাগ করতে গমন করেন। ...

ঠিক এই ভাবে একটি গৃহের থেকে শিষ্যটি ভিক্ষা গ্রহণের সময় জলপান করে, আর পরের ভিক্ষা গ্রহণের কালে, সে পস্রাব করতে গমন করে। ... আর সেই ঘটনা বারংবার চলতে থাকার কারণে, গুরুটি ক্রোধিত হয়ে গিয়ে, শিষ্যটিকে বিশ্রীভাবে ভর্ত্সনা করেন। ... সেই দৃশ্য দেখে, সকলের খুব হাস্য আসে। ... আর সোম বলেন, "চলুন নাথ, আজকের মত ভিক্ষা লাভ করাও হয়ে গেছে, আর লবণমশলাও লাভ করা হয়ে গেছে"।

দুই ভ্রাতা, সোমের সাথে প্রত্যাবর্তন তো করেন। ... কিন্তু, প্রত্যাবর্তনের কালে, তাঁরা চিন্তন করেন যে, তাঁরা অন্ন তো গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই অন্নকে তারা রন্ধন করবেন কি উপায়ে? ... তাঁরা তো সন্ন্যাসবেশ ধারণ করে নিয়েছেন, এবার তো তাঁরা হাতে মুদ্রাও নিতে পারবেন না! ... এখন উপায়! ... সোমও সেই একই বিষয়ে বিচলিত থাকেন। ... কিন্তু যখন বনে নিজদের সামগ্রী যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন, তখন দেখেন, সমস্ত সামগ্রীর সাথে সাথে অগ্নিসম্পাতের জন্য চকমকি পাথর, শুকনো কাষ্ঠ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনের হাড়িও সেখানে রাখা রয়েছে। ...

সেই দেখে সকলেই বিচলিত হলেন, কে সেই হিতৈষী, যিনি তাঁদের যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু দিয়ে গেছেন? ... এদিক সেদিক অনেক দেখাদেখিও করলেন, কেউ সেখানে উপস্থিত কিনা! ... কিন্তু কারুকে দেখতে না পেয়ে, নিজদের ভিক্ষার অন্নকে রন্ধন করে আহার গ্রহণ করলেন সকলে। ... অতঃপরে বিশ্রাম নেবার কালে, বিবেক প্রশ্ন করলেন, "আমার কাছে দুটি জিনিস পরিষ্কার নয়। ... সোম, আপনি বললেন, প্রকৃতি ও সময় বেশে মাতা যা প্রদান করেন, তাকে গ্রহণ করে নিতে হয়, আর তাও নিরপেক্ষ ভাবে। ... এর অর্থও যেমন বুঝলাম না, তেমনই আপনি বললেন, আজকের জন্য প্রয়োজনীয় লবণমশলা গ্রহণ করা হয়ে গেছে। ... এরই বা অর্থ কি?"

সোম বললেন, "সেই বালিকা অম্বা, আমাকে যা বলেছিলেন, সেই নিরিখেই বলি আপনাদের নাথ। ... তিনি বলেছিলেন, জগন্মাতা, অর্থাৎ আমাদের মা, সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গেই সময় ও প্রকৃতি বেশে থাকেন। ... আমাদের সকলের লক্ষ্যও একটিই, আর তা হলো

তার কাছে ফিরে যাওয়া। ... আমরা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যাবার কারণেই ভ্রমিত, আর আমাদের ভ্রম তখনই নাশ হয়, যখন আমরা পুনরায় তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। ...

কিন্তু নাথ, আমরা চাইলেই, তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারিনা, আর তিনিও আমাদেরকে, আমাদের এই অবস্থাতেই, অর্থাৎ ভ্রমিত অবস্থাতেই ডেকে নিতে পারেন না। ... যেমন ওই গুরুকে আর শিষ্যকে দেখলেন। ... গুরু শিষ্যকে ভিক্ষা গ্রহণ শেখাতে এসেছেন, কিন্তু শিষ্যটি ভ্রমিত, আর তাই সে গুরুর দেওয়া শিক্ষাই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। ... তেমনই আমরাও ভ্রমিত হবার কারণে, মাতার কাছে কেন প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক, তা বুঝে পাইনা। ... আর বুঝে পাইনা বলেই, কখনো আমাদের মনে হয়, মাতার কাছে তো যাবো, তার পূর্বে এই কর্মটি করেনি, ওই সুখটা ভোগ করেনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ...

আর ঠিক সেই কারণেই, প্রথম মাতার দায় হলো আমাদেরকে এটি বোঝানো যে তাঁর কাছে যাবার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কর্ম নেই আমাদের সম্মুখে। তিনি এটা বোঝান আমাদেরকে যে সমস্ত কর্ম আমরা করতে চাই, সমস্ত সুখ আমরা ভোগ করতে চাই, সমস্ত দুঃখ থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই, একটিই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনের উপায়ের সন্ধান করতে। ঠিক কেমন বলুন তো? আমাদের এই ভিক্ষা করতে যাবার মতন। ...

আমাদের ভিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেহেতু আমাদের এই তনুকে না রাখলে আমরা সাধন করতে পারবো না, আর যেহেতু অন্য কোন কর্মে লিপ্ত হলে, সাধনের পরিবর্তে আমরা সেই কর্মেই যুক্ত হয়ে ভ্রমিত হয়ে যাবো, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ভিক্ষাবৃত্তি। ... সেই কিশোর শিষ্যটি কিন্তু ভিক্ষার প্রয়োজন এখনও বোঝেন নি, কারণ সে তো সাধনের প্রয়োজনই এখনো বোঝেন নি। ... আর বোঝেননি বলেই, গুরুটি তাঁর সঙ্গে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে ভিক্ষা গ্রহণ করাচ্ছেন।

অর্থাৎ নাথ, আমরা মাতার কাছে প্রত্যাবর্তনের কারণ বুঝিনা, জানিনা, আর তাই বিভিন্ন কর্মে নিজদেরকে নিযুক্ত করে নিই, আর সেই ক্রিয়া করে, আমরা যে নিজদেরকে ভ্রমিত করে দিচ্ছি, সেই কারণেই মাতাকেও সেই গুরুর মত, আমাদের অর্থাৎ নিজের শিষ্যদের হাত ধরে থাকতে হয়, আর তা তিনি ধরে থাকেন প্রকৃতি ও সময়ের বেশে। অর্থাৎ নাথ, সময় ও প্রকৃতির বেশে, তিনি আমাদের হাতটি সর্বক্ষণ ধরে থেকে, আমাদেরকে সদাসর্বদা মার্গ দর্শন করছেন, যাতে আমরা ভ্রমকে ভ্রম বলে অবিহিত করে, সেই ভ্রম থেকে মুক্ত হবার পথকে অবলম্বন করি।

এই সময় ও প্রকৃতিকে পৃথক পৃথক ভাববেন না যেন, আর এও যেন ভাববেন না যে এঁদের উপস্থিতি আপনার বাহ্যে। ... এঁরা আপনাদেরই, আমারই অন্তরের প্রকাশ, আমাদের অন্তরে স্থিত মাতার প্রকাশ। তিনিই আমাদের চেতনা, আর সেই চেতনাই আমাদের সম্মুখে সময় বা প্রকৃতি বেশে প্রকাশ পায়। ... আমাদের ভ্রম বা সত্যচিন্তা সকলই আমাদের অন্তরে স্থিত, আর সেই অন্তরে স্থিত ভ্রম বা সত্যচিন্তাই সময় বা প্রকৃতি বেশে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। ...

নাথ, এই কথার উপাদান, আমাদের আজকের লব্ধ লবণমশলার মধ্যেই রয়েছে দেখুন। ... আমরা কি দেখলাম যে একটি শ্রমিক অত্যন্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে নিজের পিপাসাকে মেটানোর জন্য জলপান করলেন, এবং অতঃপরে তিনি মনঃসংযোগ করে কর্ম করতে থাকলেন। ... অন্যদিকে আমরা দেখলাম যে একটি কিশোর, তাঁর গুরুর প্রদত্ত শিক্ষার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, জলপান করছেন, আর পস্রাব করতে থাকছেন। ... এর থেকে কি বুঝলাম আমরা নাথ? ... আমরা এই বুঝলাম, যেই কর্ম আমরা এই কারণে করি যে সেই কর্ম আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন সেই কর্মের ফল আমরা ভোগ করিনা।

যেমন দেখুন শ্রমিকটি কিন্তু বিপুল পরিমান জলপান করেন, কিন্তু তাঁর পস্রাব লাগেনা। ... অন্যদিকে দেখুন কিশোরটি একটু একটু করে জলপান করছেন, আর তার পস্রাব বারেবারে লাগছে। অর্থাৎ যেই কর্ম আমাদের সম্মুখে আসেনি, কিন্তু আমরা সেই কর্মটি করছি কেবলই নিজের বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, সেই কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হয়। ... ভিক্ষবৃত্তি করিয়ে, গুরুটি কিশোরের মানবোধকে ভঙ্গ করার চেষ্টা করছিলেন, আর কিশোরটি নিজের মান ভঙ্গ হতে দেবেন না, তাই কেবল জলই চাইছিলেন। ... কিন্তু সেই জল, কিশোরের উদরপূর্তি করতে পারেনা; বারে বারে পস্রাব লাগে আর সেই জল নিঃসৃত হয়ে যায়।

অর্থাৎ নাথ, আমরা যা কর্ম করি, তার ফল পাইনা। যেই কর্ম আমাদের সম্মুখে এসে আমাদের অবদানের কামনা করে, যখন আমরা সেই কর্ম করি, তখন আমরা সেই কর্মের থেকে কোন ফল লাভ করিনা, বা বলা যেতে পারে, আমরা সেই কর্মের থেকে তৃপ্তি লাভ করি, যেমনটি শ্রমিকটি জলপান করে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। ... অন্যদিকে, যেই কর্ম আমাদের সম্মুখে আসেনা, অথচ কেবলই নিজদের বুদ্ধিকে ব্যবহার করে, সেই কর্ম করি আমরা, তখন সেই কর্মের ফল আমাদের অবশ্যই ভোগ করতে হয়, ঠিক যেমন কিশোরটির জলপিপাসা না পেতেও জলপান করার জন্য, তাকে বারে বারে পস্রাব করতে যেতে হয়।

এই হলো কর্মের বিজ্ঞান নাথ, যা কিশোরী অম্বা আমাকে শিখিয়েছিল, ... অর্থাৎ আমরা কর্মের ফল লাভ করিনা, উপরন্তু আমরা কর্ম নিয়ে যেই চিন্তন করি, তার ফল আমরা ভোগ করি। ... এবার লবণমশলা দ্বারা আমরা কি দেখলাম দেখুন নাথ। কিশোরটি জলপান করছেন, আর পস্রাবে যাচ্ছিলেন। ... এই দুইয়ের মধ্যে, যে ব্যবধান, সেটি কি?"

বিচার বললেন, "সময় ব্যতীত হচ্ছিল, সেই ব্যবধানে। ... কর্ম করার পর, কর্মফল প্রাপ্তির সময় সেটি । সেতো, শ্রমিকটি যখন জলপান করলেন, তারপর কর্মে পুনরায় যোগদান করলেন, সেই ব্যবধানও তো কর্ম করার আর কর্মফল অর্থাৎ পুনরায় শ্রম করার বল একত্রীকরণের ব্যবধান"।

সোম বললেন, "সঠিক নাথ। ... অর্থাৎ সময় কি? সময় হলো আমাদের কর্ম করার ও কর্মফল ভোগ করার ব্যবধান। ... আর প্রকৃতি? ... যেটি আপনি বললেন, শ্রমিকটি জলপানের পর বললাভ করে, পুনরায় কর্মে যোগদান করলেন, সেই বল তিনি কোথা থেকে পেলেন? তাঁর প্রকৃতির থেকেই না । ... অর্থাৎ দেখুন নাথ, প্রকৃতিকেও তিনিই প্রস্তুত করছেন, আর সময়কেও । ... অর্থাৎ সময়

ও প্রকৃতি উভয়ই প্রকাশিত হচ্ছে, কর্মের কারণেই, আর তা প্রকাশ করছেন ব্যক্তি স্বয়ং। কিন্তু সেই সময় বা প্রকৃতির বিস্তার হচ্ছে কি করে?

যেই বল তাঁর কায়িক পরিশ্রম করার জন্য প্রয়োজন, সেই বল তিনি লাভ করেছেন, সেই প্রকৃতি তিনি লাভ করেছেন, সেই বার্তা শ্রমিকটিকে দিলেন সেই ব্যক্তির অন্তরের চেতনাই তো, আর তাই তো শ্রমিকটি অনুভব করলেন যে তাঁর পরিশ্রম করার বল তিনি পুনরায় লাভ করে ফেলেছেন আর তা বুঝে পুনরায় কর্মে যোগ দিলেন । ... অর্থাৎ, চেতনাই তাঁকে সেই বল প্রদান করলেন, আবার সেই বল তিনি একটি ব্যবধানের পর লাভ করেছেন, সেই বার্তা প্রদান করলেন । অর্থাৎ সময় ও প্রকৃতি, দুইই আমাদের কর্মের কারণে উপস্থিত হয়, আর দুইই মাতার অর্থাৎ পরাচেতনার প্রভাবে আমাদের সম্মুখে লব্ধ হয়। ... কিন্তু মাতা যে সেই চেতনা আমাদেরকে কেন প্রদান করেন, তা আমরা এখনো উপলব্ধি করিনি।

দেখুন নাথ, সেই গুরুটি তাঁর শিষ্য যে কি করছিলেন, জলপান করে ও বারে বারে পস্রাব করতে গিয়ে, তা তিনি দেখছিলেন, কিন্তু একটি সময় পর্যন্ত কিচ্ছু প্রতিবাদ করলেন না। ... আর যখন তিনি প্রতিবাদ করে কিশোরকে তিরস্কার করেন, তখন আর তিনি তাঁকে ভিক্ষা করতে দেন না। ... এরপর কি হলো, তা দেখার জন্য, চলুন নাথ, আমরা সে গুরুর কুটিরে যাই"।

বিবেক বললেন, "আমি সেই গুরুর আশ্রমকে আমাদের বনে প্রত্যাবর্তনের কালে দেখেছি। ... তা হলো বনের অন্যদিকটায়। ... চলুন সেইদিকে যাওয়া যাক"। ... আবার সকলে পথ চলতে থাকলে, বিবেক বললেন, "আচ্ছা নাথ, আপনি প্রথমে একটি কথা বলেছিলেন যে, যা সম্মুখে আসছে, তাকে দেখে যেতে নিরপেক্ষ ভাবে। কিন্তু যেই সমস্ত কিছু আমার সাথে যুক্তই নয়, আমি তা দেখবো কেন?"

সোম বললেন, "নাথ, যদি আমার অন্তরে স্থিত মাতা, অর্থাৎ চেতনাই আমার সময় ও প্রকৃতি হন, তবে আমার সম্মুখে তা কি করে আসতে পারে, যা আমার সাথে যুক্ত নয়? যা আমার সাথে যুক্ত নয়, তা আমার সম্মুখেই আসবে না, কারণ আমার সময় বা প্রকৃতি, সেই সমূহকে আমার কাছে আসতেই দেবেন না। ... অন্যদিকে নাথ, আমরা তার প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করি, যা সময় বা প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে আনেনই নি । আর তার একটিই কারণ, আমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে ভ্রমিত। আমরা ভ্রমিত বলেই, যা কিছু আমাদের সাথে যুক্ত নয়, আমরা সেই সমূহ কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হই, আর যা কিছু আমাদের সাথে যুক্ত, সেই সমূহকে অগ্রাহ্য করি।

আর এই কারণেই তো নাথ, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্থাৎ মাতার কাছে প্রত্যাবর্তন করার থেকে চ্যুত, বা ভ্রমিত। ... আমরা যদি আমাদের সম্মুখে যা উপস্থিত হচ্ছে, তাই আমাদের সাথে যুক্ত, এই জ্ঞানে তাকে গ্রহণ করি, তবে তার মন্থন করতে করতে, আমরা ঠিকই আমাদের লক্ষে উপনীত হতে পারি । ... কিন্তু আমরা তা না করার জন্য, আমাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রমিত হয়ে যাই। ঠিক যেমন শিষ্যটিকে ভ্রমিত অবস্থায় আপনারা দেখলেন। ... গুরু তাঁর সম্মুখে ভিক্ষার প্রশিক্ষণকে প্রসারিত করছেন, কিন্তু কিশোরটি সেই ভিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহ, এবং পস্রাবের নাম করে, এদিক সেদিক অহেতুক ভ্রমণের প্রতি আকৃষ্ট"।

বিবেক প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি কেন রাখবো, সেটা তো বললেন না সোম!" ... সোম হেসে বললেন, "নাথ, আমাদেরকেই দেখুন না, আমরা আমাদের সন্ন্যাসীর জীবন ব্যতীত করার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখতে পারিনি। সেই কারণে আমরা সন্ন্যাসীর বস্ত্র, ঝুলি এবং মালসা তো নিয়েছি যা আমাদের ধারণা ছিল সন্ন্যাসীর লাগে, কিন্তু রন্ধন করার সামগ্রী একত্রীকরণই করিনি, কারণ সন্ন্যাসীদের আমরা কেবলই দেখেছি, কিন্তু তাঁদের নিরপেক্ষ ভাবে দেখিনি, তাই তাঁদের জীবনধারাও আমরা জানিনা। ... অর্থাৎ নাথ, যখন আমরা আমাদের সময় ও প্রকৃতির দ্বারা দেখানো ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিদ্বারা দেখি, তখন আমরা সেই দৃশ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে সক্ষম হই। ... আবার যখন আমরা, আমাদের সময় ও প্রকৃতির দেখানো দৃশ্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দ্বারা দেখিনা, তখন আমরা কিছু দেখি আর কিছু দেখতে পাইনা।

অর্থাৎ, আমরা যখন কোন কিছুর প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দ্বারা দেখি, তখন আমাদের ইন্দ্রিয় তো তা দেখে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় থাকে, আর এর ফলে, আমরা জানতেও পারিনা যে কোনটি আমরা গ্রহণ করবো, আর কোনটি বর্জন করবো। ... আর তাই সম্পূর্ণটিই আমরা দেখি। ... আবার যখন আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি রেখে নিরীক্ষণ করি না, তখন আমাদের বুদ্ধি সক্রিয় থাকে । আর বুদ্ধি সক্রিয় থাকার কারণে, আমাদের মধ্যে একটি নির্বাচন পক্রিয়া চলমান থাকে, যা আমাদের বলতে থাকে, এটিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, আর এটি আমাদের বর্জন করতে হবে। আর এর ফলে, যা গ্রহণ করতে হবে, তাই আমরা দেখি, আর যা বর্জন করতে হবে, তা আমরা দেখিই না।

যেমন দেখুন না নাথ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন বলেই না, আপনি সেই গুরুর আশ্রম কোন স্থানে, তা দেখেছিলেন। না হলে, তাঁর আশ্রম কোথায়, আমরা জেনে কি করতাম। কিন্তু দেখুন, এক্ষণে আমরা সেখানেই যাচ্ছি, অর্থাৎ আমাদের কাজেরই জিনিস সেটি। ... অর্থাৎ নাথ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকলে, যা সম্মুখে সময় ও প্রকৃতি আনেন, তাকে আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করি, আর সঠিক সময়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন, আর কোনটি গ্রহণের জন্য প্রয়োজন নেই। ... কিন্তু, যখন আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখি না, তখন আমরা প্রায়শই এমন করি যে, যা অপ্রয়োজনীয়, তাকেই আমরা গ্রহণ করি, আর যা প্রয়োজনীয়, তাকে আমরা বর্জন করি"।

বিচার বললেন, "কিন্তু আমরা এমন করি কেন? যা প্রয়োজনীয় তাকে আমরা বর্জন করিই বা কেন, আর যা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়, তাই বা আমরা গ্রহণ করি কেন?" ... সোম বললেন, "বিকারগ্রস্ত-বুদ্ধির দাস হয়ে, আমরা আমাদের সমস্ত রিপু ও পাশের অনুরাগী হয়ে, আবেগকে ধারণ করি, আর এই আবেগই আমাদেরকে তাই গ্রহণ করতে বলে, যা আমাদের এই মিথ্যা সত্ত্বা, অর্থাৎ এই 'আমি'র পরিচয়কে গৌরবান্বিত করে, আর সেই আবেগই এই 'আমি'র পরিচয়কে যা কিছু গৌরবান্বিত করেনা, সেই সকল কিছুকে বর্জন করায়। ... অর্থাৎ, যেই সমস্ত কিছু আমাদের এই 'আমি'রূপ পরিচয়কে তিরস্কার করে, বা পুরস্কৃত করে, আমরা তাই গ্রহণ করি; আর যেই সমস্ত কিছু আমাদের এই 'আমি'র সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, আর সেই 'আমি'কে পুরস্কার বা তিরস্কার কিছুই করেনা, তাই আমরা বর্জন করি"।

বিচার বিড়বিড় বললেন, "এর অর্থ, আমরা যা দেখেছিলাম, অর্থাৎ বিকারগ্রস্তবুদ্ধির দাস হয়ে যখন মন থাকে, তখনই আমরা সমূহ বিপদকে আমন্ত্রণ করি, সেটিই সত্য" । ... সোম, বিচারের সেই অস্ফুট কথাকে উদ্ধার করতে না পারলে বললেন, "কিছু বললেন নাথ?" ... বিবেক বললেন, "তেমন কিছু নয়, মাতা আমাদেরকে তাঁর মায়াবেশে কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এই একই জিনিস দেখিয়েছিলেন, অর্থাৎ বিকারগ্রস্তবুদ্ধির দাসত্ব করলেই, সেই বিকারে আবদ্ধ বুদ্ধির বলে জীবন চালনা করলেই, আমরা রন্ধ্রেরন্ধ্রে ভ্রমের পাশে আবদ্ধ হই, আর সত্য থেকে বিমুখ হই, সেই কথাই ভ্রাতা বলছিলেন"।

বিবেক পুনরায় বললেন, "এর অর্থ, আপনার থেকে যা শিক্ষা গ্রহণ করলাম আমরা, তা হলো এই যে, আমাদের গন্তব্য স্থল হলো মাতার কাছে, কিন্তু আমরা সকলে সেই পথ থেকে ভ্রমিত । সেই পথ থেকে আমরা ভ্রমিত কারণ আমরা সেই বুদ্ধির প্রয়োগ করি বলে, যা আমিত্বের হলাহলে স্নান করে আবেগপ্রবণ ও বিকারগরস্ত। আমাদের এই ভ্রমকে নিবারণের চেষ্টা মা সমানে করতে থাকেন, আর সেই ভ্রম নিবারণের জন্য, তিনি আমাদের অন্তরে চেতনা রূপে বিরাজ করে, সেই চেতনার বিস্তার করেন আমাদের সম্মুখে। আর সেই বিস্তার তিনি করেন সময় ও প্রকৃতি বেশে। সেই সময় ও প্রকৃতি, যা দুই নয়, যা একেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রকাশ, যেখানে কখনো সময় প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়, আবার কখনো প্রকৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এখানেও আমাদের বুদ্ধি, আমিত্বে জরিয়ে বিকারগ্রস্ত ও আবেগপ্রবণ হবার কারণে, আমাদের পুনরায় ভ্রমিত করে। যা কিছু আমাদের সম্মুখে আসে, সেই সমস্তই আমাদের মাতা অর্থাৎ চেতনা আমাদেরকে আমাদেরই সময় বা প্রকৃতির প্রকাশ রূপে প্রকাশিত করেন, কিন্তু আমাদের আমিত্ববেষ্টিত-বুদ্ধি রিপুপাশে জর্জরিত হওয়ার ফলে, আবেগে তরান্বিত থাকে, আর সেই কারণে সেই সমস্ত প্রকৃতি বা সময়ের প্রকাশকেই গ্রহণ করে, যা আমাদের ভ্রমকে দূর করে না, উপরন্তু আমাদের ভ্রমকেই শক্তিশালী করে। ... আবার কখনো কখনো, আবেগতরান্বিত-বুদ্ধি আমাদের সেই সমূহ বস্তু বা ঘটনার প্রতিও আকৃষ্ট করে, যা আদপে আমাদের মাতা আমাদের সম্মুখে সময় বা প্রকৃতি বেশে নিয়েই আসেন না, অর্থাৎ যা আমাদের সম্মুখে আসেনি, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি, যোজনা, যাচনা ও কল্পনা, এই তিনবিকারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, সময় বা প্রকৃতির দ্বারা যা প্রকাশিত নয়, তাকে সম্মুখে নিয়ে এসে আমাদেরকে ভ্রমিত করে।

কিন্তু এই বুদ্ধি আমাদেরকে ভ্রমিত করে কেন? ভ্রমিত করার কারণ হলো আধিপত্য বিস্তার। ... বুদ্ধি আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাখতে আগ্রহী বিকারের কারণে, আর সেই আধিপত্য সে ততদিনই বিস্তার করে আমাদেরকে তার দাশ করে, আমাদের মনকে তার দাস করে রেখে দিতে সক্ষম, যতদিন আমরা ভ্রমিত থেকে, মাতার থেকে দূরে অবস্থান করবো। ... আর তাই সে সমানে আমাদের ভ্রমকে চিরস্থায়ী করার জন্য ব্যস্ত থাকে।

আর এই ব্যস্ততার মধ্যে, সে বহু কর্ম করে, আর সেই কর্মের ফল সে ভোগ করে। ... কিন্তু এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কর্ম সে করেনা, আর কর্ম সে করতেও পারেনা। ... সে কেবলই চিন্তা করে, ভ্রমের মধ্যে স্থিত থাকার চিন্তন করে, আর সেই ভ্রমের মধ্যে আবদ্ধ

থাকার চিন্তার কারণেই সে কর্মফল ভোগ করে। ... অন্যদিকে, সময় ও প্রকৃতির মাধ্যমে মাতা বিভিন্ন এমন কর্ম করান আমাদেরকে, যা আমাদের করণীয়। যখন সেই কর্ম আমরা করি, তখন তার থেকে কোন কর্মফল লাভ করিনা আমরা বা এককথায় বলতে গেলে, আমরা কর্মচক্রের থেকে মুক্ত হয়ে, ভ্রম থেকে মুক্ত হবার পথ দেখতে পাই আর তাই তৃপ্ত হই । ... কিন্তু আমরা সেই কর্ম করতে চাইনা, কারণ আমাদের বুদ্ধি তা করতে দেয়না, বরং আমাদের বুদ্ধি বিকারে আবদ্ধ আর সেই বিকারের কারণ হলো আমাদেরই আমিত্ব-বোধ। ... বিপরীতে আমাদের বুদ্ধি আমাদেরকে সেই কর্ম করায়, যা আমাদের সম্মুখে আমাদের মাতার দ্বারা বা চেতনার দ্বারা অর্থাৎ সময় ও প্রকৃতি বহন করে আনেনি। ... আর সেই সকল কর্মের থেকেই আমরা কর্মের ফল ভোগ করি, যাও স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সম্মুখে আসে"।

সোম বললেন, "না নাথ, স্বাভাবিক ভাবে আমাদের সম্মুখে তা আসেনা। ... আপনারা মাতার ষড়ভুজা রূপ দেখেছিলেন, সেখানে জেনেছিলেন, কোন কর্মের ফল আমাদের কাছে কখন আসবে, তা নির্ধারণ করেন স্বয়ং নিয়তি, অর্থাৎ মাতা স্বয়ং, আর তা তিনি এই ভাবেই সাজান, যাতে আমরা সেই কর্মের ফল ভোগ করে, উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের করনিয় কি ছিল, আর ক্রমে সেই করনিয় কর্মের দিকেই মনযোগী হয়ে, আমরা সমস্ত ভ্রমের থেকে মুক্ত হই। ... এই দেখুন না নাথ, আমরা সেই গুরুর আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত। ... সেই গুরুর মাধ্যমে মাতা কি কর্মফল সেই শিষ্যটিকে দিচ্ছেন দেখুন। ... এই কর্মফল কিন্তু তাৎক্ষনিক ভাবে কিশোরটিকে মাতা দেননি, কারণ তা তখন প্রদান করলে, কিশোরটি নিজের ভ্রমের ফলকে, নিজের বুদ্ধির অপকর্মকে বুঝতে পারতেন না। ... দেখুন নাথ"।

সকলে দেখলেন, সেই শিষ্যটি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছেন, আর বারে বারে গুরুর কাছে যাচ্ছেন, আহারের সন্ধানে। আর প্রতিবার সেই শিষ্যটি গুরুর কাছে যাচ্ছেন, প্রতিবার গুরুটি তাঁকে বলছেন, তিনি তো কোন ভিক্ষাই করেননি, তাই আহার করার ন্যায় কিছুই যে নেই!... শিষ্যটি প্রতিবার সেই কথা শুনছেন, গুরুর কুটির থেকে বেড়িয়ে আসছেন, আর ক্ষুধার জ্বালায়, দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে, ভূমিতে পরে যাচ্ছেন। ...

বিচার সেই দেখে, ব্যথিত চিত্তে, সেই কিশোরকে কিছু আহার প্রদান করতে অগ্রসর হলে, সোম বললেন, "না নাথ, এমন করবেন না। ... যেই কর্ম আপনার অন্তরে স্থিত চেতনা, আপনার সম্মুখে আনেননি, সেই কর্মে যোগদান করবেন না। ... আমরা এখানে কেবলই দর্শক হয়ে এসেছি। ... আমরা এখানে উপস্থিত থেকেও উপস্থিত নেই। ... আর আপনি কেবল শরীরের যাতনাটাই দেখছেন ওই কিশোরটির, কিন্তু সেই যাতনার কারণটিকে দেখতে পাচ্ছেন না। ... সেই যাতনার কারণ, তাঁর নিজেরই বুদ্ধির প্রয়োগ। ... বুদ্ধি প্রয়োগ করার কারণে, কিশোরটি তখন গুরুর আজ্ঞাকে অবহেলা করে, ভিক্ষাবৃত্তি করেন নি। ... আর এখন যেই ফল তাঁর কাছে আসছে, তা সেই কর্মেরই ফল, আর এই ফল তাঁর ভ্রমের থেকে তাঁকেই নির্গত করবে"।

বিচার বললেন, "এর অর্থ, আমাদের জীবনে মাতার নিকট যাত্রা করা ছাড়া, অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্থাপিত থাকাই ভ্রম। আর আমাদের বুদ্ধি সর্বক্ষণ আমাদেরকে সেই ভ্রম সমূহতেই আটকে রাখছে! ... অর্থাৎ সেটিই সেবা যা, সকলকে নিজের নিজের ভ্রম থেকেই মুক্ত করে, অন্য সমূহ সেবা করার কালে,আমাদের সর্বক্ষণ বিচার করা উচিত যে, সেই সেবা আমি যাকে প্রদান করছি, সেই ব্যক্তির ভ্রম এই সেবা লাভ করে পূর্বের থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে যাবেনা তো!" ...

সোম হেসে বললেন, "সঠিক নাথ। ... দেখুন এবার গুরু কি করেন, শিষ্যটির উদ্দেশ্যে" । ... সকলে দেখলেন, শিষ্যটি এবার ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন, ক্ষুধার জ্বালায়। ... সেই ক্রন্দন শুনে গুরু কুটির থেকে বেড়িয়ে এলে, কিশোরটি গুরুর চরণে পতিত হয়ে ক্রন্দন করে বলতে থাকলেন, "আর এমন ভুল করবো না গুরুদেব। ... আপনি যেমন যেমন বলবেন, তেমন তেমন করবো। ... আমি ভিক্ষা করবো। ... আমি বুঝে গেছি গুরুদেব, ভিক্ষা করা আমার লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই ভিক্ষাবৃত্তিই সেই উপায়, যার ফলে, আমাকে কোন অন্য কর্মে লিপ্ত না হতে হয়ে, আমি নির্বিঘ্নে আপনার থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারবো। ... আমায় কিছু আহার দিন গুরুদেব, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছিনা"।

গুরুদেব হেসে বললেন, "দাঁড়াও পুত্র, আমার ঝোলায় এই দুইটি ফল আছে। তা গ্রহণ করতে পারো তুমি" । ... কিশোরটি সেই ফল নিয়ে প্রচণ্ড গতির সাথে ভক্ষণ করতে শুরু করলেন। ... সেই দেখে, বিবেক বললেন, "চলুন সোম, এবার ফেরা যাক। ... আমাদের লবণমশলা সংগ্রহ সমাপ্ত হলো। ... মাতা আমাদের সর্বক্ষণ আমাদের অন্তরে চেতনা হয়ে বিরাজ করে, আমাদেরই প্রসারিত সময় ও প্রকৃতির মাধ্যমে আমাদের ভ্রমকে দূর করার চেষ্টা করছেন। ... আমরাই কেবল, মিথ্যা মিথ্যা নিজকে কর্তা জ্ঞান করে, মায়াতে ডুবে থাকি, আর নিজেকে ভ্রমিত করি"।

নিজদের সাধনশিবিরে প্রত্যাবর্তনের কালে, বিচারের সেই কথার উত্তরে সোম বললেন, "না প্রভু, মায়া নয়। ... মায়ার বিস্তার তো মাতাই করেন। ... প্রভু, বাস্তবে তো কিছুই নেই, না মন আছে, আর না বুদ্ধি আছে; না ভ্রম আছে আর না চেতনা আছে। ... কিন্তু আমরা আমাদের বুদ্ধির বলে, আমাদের ভ্রমকে সম্বল করে বিরাজ করি । ... সেই ভ্রমকে, সেই বুদ্ধির দেখানো ভ্রমমার্গকে আমরা বলি ভ্রমজাল। তাকে আমরা কখনোই মায়া বলিনা। ... কিন্তু আমাদেরকে মাতা মন ও চেতনার মাধ্যমে যেই অবস্থার মধ্যে ফেলেন, তাও যে বাস্তবে নেই। অর্থাৎ সেও একটা ভ্রম, তবে সেই ভ্রম আমাদেরকে আমাদের নিজভ্রম থেকে উদ্ধার করার জন্যই প্রস্তুত করা হয়। ... প্রভু, সেই ভ্রম, যা আমাদেরকে আমাদের ভ্রম থেকে উদ্ধার করে, তাকেই আমরা মায়া বলি, আর সেই মায়ার বিস্তার মাতা স্বয়ং করেন, তাই মাতার নাম মহামায়া।

অর্থাৎ প্রভু, আমাদের বুদ্ধি আমাদের কখনোই মায়ার কবলে ফেলেনা, সে আমাদেরকে ভ্রমের কবলে ফেলে। আর আমাদের চেতনা আমাদের কখনোই ভ্রমের কবলে ফেলেনা, আমাদেরকে সদাই মায়ার কবলে ফেলে, আমাদের উদ্ধারের মার্গ প্রদর্শন করেন; আমাদের অজ্ঞানতাকে দূর করেন। ... প্রভু আপনি একটু আগে বলছিলেন না, আপনাদের মাতা একটি মায়ার দ্বারা আপনাদের কিছু

শিক্ষা প্রদান করেছেন! ... দেখলেন, যেই মুহূর্তে তাঁর শিক্ষার থেকে আপনারা, আপনাদের ভ্রম থেকে উদ্ধার পেলেন, সেই মুহূর্তে আপনারা সেই বাতাবরণকে কি বললেন মায়া, অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই, অথচ তা আপনাদেরকে যথার্থের শিক্ষা প্রদান করে"।

বিবেক বললেন, "এর অর্থ, মায়ার থেকে আমরা পালাতে পারিনা, আর পালানোর চেষ্টা মুর্খামি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়! ... মায়ার থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, এই অনুভব একটা ভ্রম ব্যতীত কিছুই নয় । ... অর্থাৎ এই মুহূর্তেও আমরা একটি মায়ার মধ্যেই রয়েছি! ... আর মায়া আমাদের সদা সত্যের মার্গই দেখায়! ... ভ্রমিত আমাদের বিকারে আবদ্ধ বুদ্ধি করে, যা বলে যে মায়ার থেকে আমাদের নির্গত হতে হবে! ... অর্থাৎ ভ্রমকেও আমরা মায়া বলি, আবার মায়াকেও মায়া বলি, আর এই দুইয়ের ক্ষেত্রে একই শব্দ প্রয়োগ করে, আমাদের বুদ্ধি আমাদেরকে ভ্রমিত করে!"

খানিক থেমে থেকে, পুনরায় বিবেক বললেন, "হ্যাঁ তাই তো, ঈশ্বরীয় প্রেমকেও আমরা প্রেম বলি, আবার শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণকেও আমরা প্রেম বলি, আর এই দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি একই শব্দ প্রয়োগ করে, আমাদেরকে ভ্রমিত করে। ... একই ভাবে আসক্তি, বিরক্তি উভয়ের থেকে মুক্তিকেও বৈরাগ্য বলি, আবার বুদ্ধি কেবল বিরক্তকেও বৈরাগ্য বলে, আর এই ভাবে ভ্রমের রচনা করে। ... অনুরূপ ভাবে, যেই বিশ্বাসে কোন প্রকার অবিশ্বাস নেই, তাকেও আমরা বিশ্বাস বলি; আবার যেই বিশ্বাসের মধ্যে অবিশ্বাসই পরিপূর্ণ, তাকেও আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস বলে, আর এই ভাবে আমাদেরকে ভ্রমিত করে; ... আবার যেই ভক্তিতে কোন কামনা নেই, তাকেও ভক্তি বলি, আবার যেই ভক্তিতে কামনা পরিপূর্ণ, তাকেও বুদ্ধি ভক্তি বলে, আর এই ভাবে আমরা ভ্রমিত হই। ...

কিন্তু বাস্তবে, মায়া তাই যা আমাদেরকে ভ্রম থেকে উদ্ধার করে; প্রেম তাই, যেখানে 'আমি' বোধের নাশ হয়, এবং 'আমি' বা 'আমার' কোন অস্তিত্বই থাকেনা; ভক্তি তাই যাতে কোন প্রকার কামনা নেই; বিশ্বাস তাই, যাতে কোন প্রকার অবিশ্বাস নেই; সমর্পণ তাই, যাতে কোন প্রকার কর্তা বোধ নেই; বৈরাগ্য তাই যাতে আসক্তি বিরক্তি উভয়ই নেই। ... আর অন্য সকল কিছু যাকে আমরা প্রেম বলি, তা মোহ; যাকে মায়া বলি তা ভ্রম; যাকে ভক্তি বলি, তা কামনার তাড়না মাত্র; যাকে বিশ্বাস বলি, তা কেবলই নিজকে নিজে ছলনা করা। ... কিন্তু সোম, এতো শিক্ষা প্রদান করলে যখন আমাদেরকে, এবার একটি কথা আমাদেরকে বলো, বিবাহ করা কি মায়াকে আমন্ত্রণ করা না ভ্রমকে?"

সোম হেসে বললেন, "এই দেখুন নাথ, আমাদের কাছে শয়ন করার কোন স্থান ছিলনা; নিদ্রা যাবার চেষ্টা করলে, মশক আর শৈতপ্রবাহ আমাদেরকে নিদ্রা যেতেই দিতো না, তাই দেখুন আমাদের জন্য এই বিস্তরা প্রস্তুত করা রয়েছে"। ... বিচার বললেন, "কিন্তু এই বিস্তরা এখানে এলো কি করে? আমরা তো এর ব্যবস্থা করিই নি!" ... হাস্যবশে সোম বললেন, "প্রভাতেও তো আমরা রন্ধনের ব্যবস্থা করিনি, কিন্তু সেও তো আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল, তাই না!"

বিবেক ও বিচার, উভয়েই একত্রে বললেন, "কিন্তু এই সমস্ত চমৎকার হচ্ছে কি করে?" ... সোম হেসে বললেন, "কোন চমৎকার নেই প্রভুরা, আর কোন চমৎকার সম্ভবও নয়, কারণ সত্য বলতে গেলে, যেই ব্রহ্মাণ্ডের কোন অস্তিত্বই নেই, আর অস্তিত্ব সম্ভবই নয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা সত্য মানছি, এর থেকে অধিক বড় চমৎকার আর কিই বা হতে পারে? ...

চমৎকারের মধ্যে চমৎকার কি করে হতে পারে নাথ? ... কোন চমৎকার হয়ই না। ... যেই ঘটনার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে থাকেনা, সেই ঘটনাকেই আমরা চমৎকার বলি । আসলে চমৎকার হলো আমাদের অজ্ঞানতার ফল। ... হ্যাঁ প্রভু, যিনি যত অধিক অজ্ঞান, তিনি তত অধিক চমৎকারের আশা করেন। ... আর তত অধিক ভাবে নিজকে ভ্রমিত করেন। এই সমস্ত আমার স্ত্রীর কর্ম। যেই হাড়ি প্রভাতে দেখেছিলাম, তাও আমাদের গৃহে, আমার গিন্নির ব্যবহার করা হাড়ি; আর এখন যেই কম্বল দ্বারা বিস্তরা প্রস্তুত করা আছে, সেই কম্বল ও কাঁথা আমার স্ত্রীর নিজের হাতে বোনা কাঁথা"।

বিচার বললেন, "কিন্তু, তিনি তো আপনাকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেছিলেন" । ... সোমের স্ত্রী, দেবী দুর্গা সম্মুখে এসে বললেন, "কিন্তু আমি তো কোন ভ্রম নই নাথ। ... আমি কি করে আমার নাথকে একাকী ছেড়ে চলে যাই । ... নাথ, আমি যদি কোন ভ্রম হতাম, তবে আমার স্বামী যখন সত্যের পথে যাত্রা করছেন, তাঁকে ছেড়ে চলে যেতাম। ... তাই না!"

বিচার ও বিবেক একই সুরে বললেন, "এর অর্থ, সেই স্ত্রীর থেকেই দূরে স্থাপিত থাকতে হয়, যিনি ভ্রমের বিস্তারকে প্রশ্রয় দেন। আর সেই স্ত্রী আমাদের কাছে মাতারই অবদান, যিনি আমাদেরকে সত্যপথে যাত্রা করার প্রেরণা প্রদান করেন বা সহায়তা প্রদান করেন?" ... বনের আড়াল থেকে এবার দুর্গা নির্গত হলে, সোম ও দুর্গা উভয়েই সেই কথায় হাস্যপ্রদান করে সম্মতি জানালে, বিবেক ও বিচার, একে অপরের মুখ দেখলেন, এবং নিজদের নেত্রের ভাষায় বললেন, তাঁরা দেবী শ্রী ও শ্বেতার থেকে দূরে চলে এসে, নিজদেরকে মায়ার থেকে দূরে স্থাপিত করার চেষ্টা করে, নিজদেরকে ভ্রমিতই করেছেন। ... সত্য অর্থে, তাঁরা দেবী শ্রী ও শ্বেতার অভাবে, সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন যেন জরাজীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুর থেকেই কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না মাতাকে জানার ।

যেন মাতাকে জানার জন্যই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু তাও কোন এক ভাবে মাতাকে জানার থেকেই তাঁরা দূরে সরে আসছেন। ... তাঁদের চোখেচোখে যেই বার্তালাপ হয়, তাতে প্রত্যক্ষ থাকে এই কথা যে, দেবী শ্রী ও দেবী শ্বেতা তো মাতারই প্রকাশ। তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করলে তো মাতাকেই অন্য ও অনন্য ভাবে সঙ্গে পেতেন, আর তারফলে মাতাকে অধিক ভাবে জানতেও পারতেন তাঁরা। ... এই ভাবনার পর, তাঁদের দুইজনেরই নেত্র নিজদের কৃতকর্মের কারণে লজ্জিত হয়ে নিম্নগামী হয়ে যায়।

পরমুহূর্তে প্রভাত হবে হবে দেখে, সোম বললেন, "নাথ, এবার আমাকে যেতে হবে। ... আমি যেই ভ্রমের মধ্যে নিজকে স্থাপন করেছিলাম, অর্থাৎ আমি যে ভেবেছিলাম, আমার স্ত্রীর থেকে দূরে থাকলেই, আমি সাধন করতে পারবো, সেই ভ্রম আমার ভেঙে গেছে। ... আসলে আমার স্ত্রী আমাকে সাধন করার জন্য সত্য অর্থে কনোদিন কনো বাঁধা তো দেনইনি। ... কিন্তু, আমার বিকারগ্রস্তবুদ্ধি, তেমন কথাই সর্বত্র শুনতে শুনতে, বিনা বিচারেই এমন ধারণা করে নিয়েছিল যে, স্ত্রীর কারণেই আমার সাধন

হচ্ছেনা। ... প্রকৃত অর্থে তো আমার স্ত্রী, আমাকে সর্বক্ষণ সাধনার দিকে অগ্রসরই করেন। ... আমার আহার, নিদ্রা, সমস্ত কিছুর খেয়াল রাখেন তিনি। আর আমাকে মায়ার মধ্যে স্থাপিত করে রেখে, সর্বপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করে, আমাকে সাধন করার জন্য অগ্রসর করেন। ... যদি তিনি আমাকে সাধনার পথে বাঁধা দিতেন, তখন আমি যা করছিলাম, তাই সঠিক কর্ম হতো। কিন্তু তা তো নয়"।

বিবেক ও বিচার একত্রই বললেন, "আপনি কে আমরা জানিনা, তবে আমরা নিশ্চিত, আপনি সত্যই মাতার ভক্ত। মাতা তো তাঁর ভক্তদের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হন। ... আর সেই কারণেই তো আপনার মাধ্যমে, আপনার স্ত্রীর মাধ্যমেও, আমাদের বহু শিক্ষা প্রদান করলেন। ... সোম, আপনি ও আপনার স্ত্রী, আমাদের এইক্ষণে, আজকের দিনটির জন্য, আমাদের গুরু ও গুরুমা হয়ে বিরাজ করলেন, তাই আমরা আপনাদেরকে একটিবার প্রণাম করতে চাই, আপনারা বিদায় গ্রহণ করার আগে"।

সোম ও দুর্গা, সেই কথাতে সম্মত হলে, বিবেক ও বিচার নতমস্তক হয়ে, সোম ও দুর্গার চরণস্পর্শ করে প্রণাম করতে গেলেন। ... কিন্তু এই চরণ তাঁরা চেনেন। ... তাঁরা এবার তড়িঘড়ি করে, নিজেদের নতকরা শিরকে উন্নত করলেন, আর দেখলেন, তাঁদের রাম ও তাঁদের মাতাকে, আর রাম মুহূর্তের মধ্যে এবার অখণ্ড হয়ে গেলেন । ... অর্থাৎ সোম অন্য কেউই নন, পিতা, আর দুর্গা, তাঁদের মাতা ছিলেন। ... তাঁদের মার্গ দর্শন করার জন্যই, এতোলীলা করলেন তাঁরা!"

মাতা এবার বললেন, "পুত্ররা, তোমাদের পিতারই এক অবতার হলেন রাম, যিনি তোমাদের গুরু, আর সেই আমার বাহন, সোম। কিন্তু তোমার পিতা স্বয়ং এই কল্পে, আমার বাহন হতে প্রস্তুত । তাই তিনি এই প্রথম প্রকাশ করলেন যে তিনিই সোম বা সোমনন্দি, এবং তিনিই সদাশিব বা মহেশ্বর"।

মণের প্রশ্ন আর করতে হলো না, বিবেক ও বিচারকে। মাতা নিজেই উত্তর দিলেন, "তোমরা আমাদের পিতামাতারূপ সঙ্গ গ্রহণ না করে, কেবল জগন্মাতার সাহায্যে যাত্রা করবে বলেছিলে। তাই আমি তোমাদেরকে মায়ার মধ্যে স্থাপিত করে শিক্ষা প্রদান করছিলাম। ... কিন্তু দেবী চেতা ও ধ্যানের শিক্ষার পর, তোমরা ব্যাকুল হয়ে, আমাদের সঙ্গ কামনা করেছিলে। তাই আমরা স্বয়ং এসে তোমাদের মার্গদর্শন করেছি পুত্ররা। ... তোমরা এবার বিবাহ করতে আগ্রহী জেনে, আমার প্রথম চরণের শিক্ষা প্রদান করা হয়ে গেছে, এমন অনুভব করে তোমাদের সম্মুখে নিজকে প্রকট করলাম"।

বিবেক ও বিচার বললেন, "ক্ষমা মা, আমাদের মুর্খামির জন্য ক্ষমা; তোমার মনে ব্যাথা দেবার জন্য ক্ষমা; আর মা, দেবী শ্রী ও দেবী শ্বেতার মনেও বেদনার সঞ্চার করার জন্য ক্ষমা। ... আমরা বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, এই ভাবে, মায়ার দ্বারা মাতা সর্বাম্বা বিচার ও বিবেককে, মায়ার সত্যতা কি, তাও জানালেন, এবং কর্মফলবিজ্ঞানের আভাসও প্রদান করলেন। ... আর এবার বিবেক ও বিচার, নিজদের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য, বিবাহ করতে প্রস্তুত হলেন"।

ব্রহ্মলীলা

প্রভু ব্রিহ্মসনাতন দেবী দিব্যশ্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, "পুত্রী, আগের তিনটি কথা শুনলে, যেখানে আমার বিচার ও বিবেককে মাতা মার্গদর্শন করেছিলেন, আর সত্য বলতে আমার পঞ্চভূতকেও মার্গদর্শন করেছিলেন। সেই মার্গদর্শন লাভ করার পর, আমার অন্তরের পুরুষতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নিজের অহংকার ত্যাগের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, আর তাই প্রকৃতিতত্ত্বে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতিতত্ত্বতে আমার পুরুষ প্রকাশিত হতে তখনও পারেননি, কারণ তাঁর মধ্যে একটি নির্জনতার ভাব, এবং একটি সমাজভীরুতা কাজ করছিল।

পুত্রী, সেই একাকীত্বতার ভাব থেকে আমার মধ্যে একটি সখীরূপের জন্ম হয়, এবং সমাজভীরুতার থেকে জন্ম নেয় একটি এমন সত্ত্বা, যা নিজেকে আমার আরাধ্যা মাতা সর্বাম্বার ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করতো, এবং আমার পুরুষ যা প্রকৃতিতে পরিণত হতে ব্যস্ত, তাকে শাসন করার প্রয়াস করতো। মাতা সর্বাম্বা তাই এই স্তরে আমার পুরুষ যা প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়ে ওঠার তাগিদে শ্যামা বেশে স্থাপিত হয়েছিল তাকে, তথা আমার সখীভাবকে, এবং আমার সমাজভীরুতা যা অনুগ্রাহী বেশে স্থাপিত হয়েছিলেন, তাঁকে একত্রে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য এক মহালীলার অবতরণ করেন।

এবার আমি তোমাকে সেই একটিই অবিচ্ছিন্ন কথা, যা মাতারই মহালীলা, তাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্তন করে ব্যাখ্যা করছি শ্রবণ করো। যেমন অদ্ভুত সেই কথা, তেমনই বিচিত্র, এবং তেমনই অনবদ্য সত্যশিক্ষা সংগৃহীত এই কথা। তাই, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো"।

সাখ্যাত অধ্যায়

দেবী অনুগ্রাহী মাতা সর্বাম্বার একজন সেই প্রকার ভক্ত, যিনি নিজেকে মাতার শ্রেষ্ঠ ভক্ত রূপেই দাবি করেন। একদিন তিনি মাতার নামে, অনাহারে, অনিদ্রায় ভজন করতে করতে মূর্ছিত হন। যেই স্থানে মূর্ছিতা হয়ে শায়িত ছিলেন, সেই পথ দিয়ে বেশ কিছু স্ত্রী নদী থেকে কলসে জল ভরতে যাচ্ছিলেন । পথে এমন উদ্ভ্রান্ত বেশে পরমাসুন্দরী এক স্ত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় পরে যেতে দেখে, তাঁরা

তাঁকে তুলে একটি বৃক্ষতলে স্থাপন করে, মুখেচোখে বারিপ্রলেপ দিতে, তিনি সংজ্ঞা লাভ করে বলে উঠলেন, "মা কই! মা ...!" তাঁর এই প্রলাপ শুনে এক স্ত্রী বললেন, "মা! ... তুমি কি পথ হারিয়ে ফেলেছ বাছা! ... কে তোমার মা, কোথায় তোমার ধাম!"

দেবী অনুগ্রাহী আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠে উত্তর দিলেন, "আমার মা গো... মা সর্বাম্বা... আমি যে তাঁরই মেয়ে, তাঁর অণু"। ... অন্য এক স্ত্রী বললেন, "অণু! ... মানে অনুগ্রাহী!... মাতা সর্বাম্বার কন্যা!"... দেবী অনুগ্রাহী আনন্দের সাথে বললেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ... তাঁর অণু..."। ... সেই স্ত্রী বললেন, "তা বাপু অণু, অণু করার কি হয়েছে! ... এই জম্বুদ্বীপে একটিই অনুগ্রাহী আছে। তা বললেই হয় তুমি অনুগ্রাহী"।

দেবী অনুগ্রাহী লজ্জিত হয়ে বললেন, "ওই পুরো নামটা আর ভালো লাগেনা। মা যে আমায় অণু বলেই ডাকেন। শুধু অণু বলতেও আর ভালো লাগে না, কেমন যেন ছন্নছাড়া ছন্নছাড়া ভাব । মায়ের অণু বললে, মনে হয় যেন আমি তাঁর থেকে আলাদা হইনি, তাঁর সাথেই মিশে আছি। ... নিজের অস্তিত্বই সকল দুর্দশার কেন্দ্রবিন্দু বুঝলে গো বউ, আমার আমিই সব জ্বালার সারকথা।"

সেই স্ত্রীর সাথে অন্য যেই রমণীরা ছিলেন, তাঁরা এবার নিজেদের কাজে গেলেন। কেবল অনুগ্রাহীর সেই বউই সেখানে রইলেন। সেই স্ত্রী এবার বললেন, "কিন্তু মেয়ে, তুমি ভাই পথ হারিয়েছ। ... মাতা সর্বাম্বার ক্ষেত্র এখান থেকে সহস্র যোজন দূর । তুমি তো সম্পূর্ণ উল্টো দিশায় চলে এসেছ। ... যাই হোক, মাতার কন্যাকে যখন পেয়েছি, তখন কিছুদিন তাঁরই সেবা করি। ... তাঁরই তো পবিত্র অবতারতনুর অংশ, তাই তাঁর দিব্যতা তোমার মধ্যেও তো রয়েছে। সেই উর্জ্জার সেবা করেই না হয় মাতার সেবা করার ইচ্ছাকে পসমিত করি আপাতত"।

দেবী অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "পথ ভুল করিনি গো বউ। যদি পথ ভুল করতামই তবে কি আর আমার মাধ্যমে মায়ের সেবা করতে চাইতে! ... তুমি আমার মাধ্যমে মায়ের সেবা করতে চাইছ, এর মানেই হলো আমি ভুল পথে আসিনি। ... আর বউ, আমি যার উদ্দেশ্যে পথ চলছি, তাঁর কি কনো নির্দিষ্ট ধাম আছে! ... সকল ধাম যে তাঁরই ধাম । নিজের আমিতে মজে থেকে আমরা আমার ধাম, ওর ধাম করি"। ...

এই কথা বলে হেসে আবার বললেন অণু, "পথ কি আর আমি চলছি গো বউ, পথ তিনি চালাচ্ছেন। প্রেম তিনি জাগিয়েছেন, এবার প্রেমকে ঘন করবেনও তিনিই! ... পাগল হলে কি আর তাঁতে মেশা যায় গো, উন্মাদ হতে হয়, উন্মাদ ... নদীকে দেখনা। কেমন উন্মাদের মত সাগরে যাত্রা করে। ... তাই আমাকে একটু দৌড় করাচ্ছে গো। ... দৌড়তে দৌড়তে যত হাঁপিয়ে উঠবো, তত যে উন্মাদ হয়ে উঠবো। ...

যখন উন্মাদ হতে হতে মোহনা হয়ে যাবো, তখন সাগরে মিশে যাবো... মিশে যাবো গো বউ... মিশে যাব" । সেই স্ত্রী, যাকে দেবী অনুগ্রাহী বউ বলে সম্বোধন করছিলেন, তিনি এবার হাস্যমুখে বললেন, "বেশ বুঝেছি, তুমি পাগল হয়েছ, আমারই ভালো হলো, শুধু

মাতার কন্যার সেবা করলে হয়তো একটু অহংকার হতো, এবার তাঁর পাগল মেয়ের সেবা করতে গিয়ে, আমিও যদি একটু পাগল হতে পারি"।

এই বলে ক্লান্ত দেবী অনুগ্রাহীকে ধরে ধরে নিজের কুটিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন সেই স্ত্রী, আর পথে যেতে যেতে বললেন, "এই মেয়ে, আমার এক সখী আছে, সেও এক পাগল ভক্ত কন্যার সেবা করবে বলে দিন কতক ধরে স্বপ্ন দেখছে। ... আমি বরং তাকেও ডেকে নিই। যেই দিব্য সেবা করার সুযোগ আমি পাবো, সেই সুযোগ আমার সই কেন পাবে না! ... এই মেয়ে, তোমার আপত্তি নেই তো!"

অনুগ্রাহী সামান্য অভিমান করেই বললেন, "দেখ বউ, আমার সাথে একসাথে সহবাসে থাকবে, এ বেশ ভালো, আমারও ভালো লাগবে, সকলে মিলেমিশে থাকবো। ... তবে ওই সেবা কেন! ... সেবা ভগবানের করার ইচ্ছা থাকা উচিত, আমি কি ভগবান!" ... সেই বউ এবার বিদ্রোহী সুরে বললেন, "ও মা, মেয়ের কথা শোনো! ... তোমার মা কি বলেন জানো! ... তিনি বলেন, ভক্তই হলেন সাকার ভগবান। ভক্তের সেবাই হলো ভগবানের সেবা। ...

আর দেখনা, ভগবানের সেবা কি করা যায় গো! ... তিনিই তো সমস্ত কিছু হয়ে আছেন। ... উনিই তো সমস্ত সেবা করছেন। তাঁর সেবা করতে গেলে, উল্টে দেখি কি, তিনিই বেশি বেশি করে সেবা করছেন আমার। ... তখন বড় লজ্জা লেগে যায় । ... আর মনে মনে নিজেকে অপরাধীও মনে হয়। ... কেনই বা সেবা করবো ভাবলাম, আর কেনই বা তাঁকে বেশি বেশি করে পরিশ্রম করালাম, এই ভাব আসে। ... তুমি যে ভক্ত; ভক্তরূপী ভগবান। তোমার সেবা করতে পারলে যে মনে খুব আনন্দ হবে গো"।

দেবী অনুগ্রাহী এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তবে আমি তোমার সাথে যাবো না বউ। ... আমার সেবা নিতে একদম ভালো লাগেনা। ... কেমন যেন একটা অহংকার হয়"। ... এবার সেই বউ হেসে বললেন, "বুঝেছি, মাতা সর্বাম্বার ভগিনী, সংস্কারও তো তাঁর মতই হবে। ... বেশ তোমার যখন সই বেশেই আমাদের সেবা পেতে ইচ্ছা, তখন সই হয়েই না হয় সেবা করবো। ... এবার তো খুশী!"

দেবী অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "আর তোমার ওই সই, ওঁকে কি নামে ডাকো তুমি!" ... সেই বউ বললেন, "ওকে আমি সই বলেই ডাকি। ... আসলে আমাদের কনো নির্দিষ্ট নাম নেই। ... এখানে নামকরণ সংস্কারের বেলাই নেই গো মেয়ে। ... যার যাকে যেই নামে ডাকতে ইচ্ছা, সেই নামেই ডাকে । এই আমাকেই দেখনা, কেউ আমার গায়ের রঙের জন্য শ্যামা বলে ডাকে, আবার কেউ কাজলা বলে ডাকে। ... আবার আমার সই আমাকে সই বলেই ডাকে, আর তুমি বউ বলে ডাকো"।

অনুগ্রাহী এবার প্রশ্ন করলেন, "আর তোমার পতি! ... তোমার পতি আমাকে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে! আপত্তি করবেন না উনি?" ... বউ বললেন, "আমার পতিদেব সেই কবে যে আমার উপর রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেছিলেন, আর তো ফিরলেনই না।

জানো মেয়ে, আমার এই দশা দেখে, আমার সই তো বলেই দিয়েছে, সেও বিয়া করবে না। ... তুমি ওকে বুঝিও কেমন, সবার ভাগ্য কি এক ধারার হয়, তুমিই বলো"।

অনুগ্রাহী এবার চিন্তিত বেশে বললেন, "কিন্তু তোমাকে তোমার স্বামী ছেড়ে গেলেন কেন? কি করেছিলে গো তুমি! ... দেখতে তো তোমাকে ভারি মিষ্টি, অঙ্গের লঘুশ্যামা রঙ, কিন্তু সে তো আরো সুন্দর করে তুলেছে তোমাকে, স্বভাবও তো তোমার কটুবচনির ন্যায় নয়, তবে!" ... বউ বললেন, "আর বলো না গো মেয়ে, আমার ভক্ত সেবা করার খুব ইচ্ছা । সেই তিন চার বছর বয়স থেকে, যখন থেকে বোধ হয়। আমি তো লেখাপড়া জানিনা, খুব নিচু জাতের, তাই ভগবানকে তো আর পাবো না । ... ভক্তের সেবা করে যদি ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ একটু পেতে পারি... এই আর কি। ...

কিন্তু আমার পতির আবার তা পছন্দ নয়। ... উনার কথা এই যে, ছোট জাতের মেয়ের ছোট ভাবনাই থাকা উচিত। ... আমি চেষ্টাও করেছিলাম জানো মেয়ে, পতির আদেশের পালন করার। কিন্তু কোথাও ভক্ত এসেছে শুনলেই, কেমন যেন উদ্দীপনা জেগে যায় । ... আমার এই সই, সেও আমার মতই। সে-ই এসে আমাকে কোথায় ভক্ত এসেছেন, সেই খবর দিত। তাই আমার পতি তাকেও আমাদের গৃহে আসতে বারণ করে দেন। ... কিন্তু তারপরেও একদিন..."

অনুগ্রাহী বললেন, "একদিন কি!" ... বউ বললেন, "একদিন, এক ভক্ত আমাদের গৃহের সম্মুখে যে রাস্তা, তা দিয়ে গান করতে করতে যাচ্ছিল, তা শুনে যেন সমস্ত কিছু ভুল হয়ে গেল আমার। ... ভুলেই গেলাম, আমার পতি বলেও কেউ আছে । ... একবস্ত্রে সেই ভক্তের পিছনে পিছনে বেড়িয়ে পরি। ... যখন হুঁশ হয়, ফিরে আসি, তখন দেখি আমার পতি আর গৃহে নেই। আমার সই, তাঁকে পথে হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখে, প্রশ্ন করেছিল। ...

তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আমি ফিরলে যেন আমাকে বলে দেয় সে, আমার মাথা থেকে ভক্তির ভুত ছাড়লে, তবেই উনি ফিরবেন। ... আমার সই তাঁর চরণও ধরেছিল জানো মেয়ে । আমার জন্য কেঁদে কেটে সে আমার পতিকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল। ... পরে অবশ্য আমার কাছে সে ক্ষেদ করে বলেছিল যে, অমন না করলেই যেন ভালো হত। ... হয়তো তাঁর রাগ কমে গেলে ফিরে আসতেন, কিন্তু তাঁর অনুনয়ের ফলে তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আর কনোদিন তিনি ফিরবেন না"।

অনুগ্রাহী এবার ব্যাথিত কণ্ঠে বললেন, "তো তুমি আরো একটা বিয়ে করলে না কেন? নাকি তোমাদের সমাজ দ্বিতীয় বিয়েকে সমর্থন করেনা!" ... বউ এবার সেই কথার উত্তরে বললেন, "না না সমর্থন করে। ... অনেকের পতি এমন ছেড়ে চলে গেছে বোলে, স্ত্রীরা আবার বিয়ে করে। ... কিন্তু আমার মন না ভক্তের সেবায় মজে থাকে, পতির সেবায় নয়। ... হয়তো আমি আবার বিয়ে করলে, সেই পতির সেবাও না করে, আবার তাঁকে অপমান করে ফেলবো। ... তাই ..."

অনুগ্রাহী এবার হেসে বললেন, "তা বেশ করেছ। কিন্তু তুমি যে মাথায় সিঁদুর পরে রয়েছ!" ... বউ বললেন, "আমাকে সই বলেছে এই সিঁদুর পরে থাকতে । ... কাকভোরে আমার পতি ঘর ছেড়ে চলে গেছিলেন, তাঁকে বেড়িয়ে যেতে কেউ দেখেনি। ... যখন আমি বললাম আমি আর দ্বিতীয় বিয়ে করবো না, তখন সই বলল, যেন আমি এই সিঁথির সিঁদুর না মুছি। সিঁদুর মুছে ফেললেই, অন্য পুরুষেরা বিয়ে করতে প্রস্তাব দেবে। ... সিঁদুর থাকলে, কেউ আর এদিকে ঘেঁষবে না। ... এখন আর অসুবিধা নেই, তবে ..."

অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "তবে কি!" ... বউ হেসে বললেন, "সই বলে, ভগবানের সেবা কি আর আলুথালু ভাবে করা যায়! ... যেমন পতির সামনে স্ত্রী সেজেগুজে থাকলে, পতির হরষ হয়, তেমন ভগবানের কাছেও ভক্ত সেজেগুজে থাকলে, ভগবানের হরষ হয়। ... ও বলে, এই সিঁদুর পরে থাকলে নাকি আমাকে দেখে ভগবানের হরষ হবে । ... তা আমার প্রাণেশ্বরীর যদি আনন্দ হয়, তবে তা করবোনা কেন বলো!"

অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "বেশ বললে তো বউ। ... অনেক প্রকার ভক্ত দেখেছি আমি, মায়ের কাছে আসতে, কিন্তু তোমার ন্যায় সহজ ভক্ত আমি সত্যিই দেখিনি গো। ... তা হ্যাঁগো বউ, তুমি যে এই ভক্তদের সেবা করার জন্য এতো উচাটন থাকো, তো এই সেবা করে তুমি কি পাও, মানে কি পেতে চাও ভগবানের থেকে?" ... বউ উত্তরে বললেন, "পাওয়ার কি আছে গো মেয়ে! পেতে তো তাঁকেই চাই, তোমার মাকে। ... কিন্তু ভক্ত সেবার উদ্দেশ্য অন্য থাকে আমার"।

অনুগ্রাহী ভ্রুকুটি কুঞ্চিত করে বললেন, "অন্য উদ্দেশ্য, সেটা কি আবার!" ... শ্যামাবউ বললেন, "ওরে মেয়ে, তোমার মা, মানে আমার আরাধ্যা যে সবসময়ে ভক্তদের নিয়ে চিন্তায় থাকেন। ... কত ছোটাছুটি করেন উনি এদিক সেদিক, ভক্তদের সেবা করার জন্য। ... এই সেবাগুলোও তিনিই করেন, আমার মাধ্যমে, কিন্তু তাঁকে ছুটেছুটে তো আর আসতে হয়না। ... তাঁর একটু পরিশ্রম কমে, তাই করি গো"। ...

শ্যামাবউয়ের এমন ঈশ্বরীকে আপন করে ভাবার ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে দেবী অনুগ্রাহী আবার প্রশ্ন করলেন, "আর এই ভাবে তুমি মায়ের সেবা করো, তাই না! ... তো এই সেবার বিনিময়ে কি চাও তুমি!" ... শ্যামাবউ এবার বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন, "আচ্ছা মেয়ে, তোমার আমায় দেখে কি ব্যাপারী মনে হয়! খালি কি চাও, কি চাও, করে ফেরো! ... তোমার মা, আমার সমস্ত কিছু, আমার প্রেম, আমার মা, আমার সমস্ত কিছু তিনিই। তাঁর পরিশ্রম কমবে, তাই জন্য করি... এখানে আবার চাওয়ার কি আছে! ... চাওয়ার একটাই আছে, তাঁর যেন পরিশ্রম কম হয়"।

দেবী অনুগ্রাহীর হৃদয় যেন সেই কথা শুনে হাহাকার করে উঠলো। কি অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব! ... যেন অজান্তেই এই কন্যা নিঃস্বার্থ, যেন এই কন্যা পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা! ... মনে মনে বললেন, "মা, আমি নই, এই কন্যা যদি তোমাকে না পায়, তবে আমি তোমাকে লাভ করার যোগ্যই নই। ... হ্যাঁ, হয়তো এ যোগ জানেনা, রিপু জানেনা, পাশ জানেনা, সূক্ষ্ম, কারণ কিচ্ছুই জানে না। ... কিন্তু এ যা জানে, তা যে কেউ জানেনা। ... এ যে সত্যি করে তোমাকে ভালোবাসতে জানে!"

দেবী সর্বাম্বা অন্যদিকে নিজের থেকে এক পুরুষের সঞ্চার করলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনি যাবেন পিতা আমার সাথে!" ... সেই পুরুষ, পিতার সম্বোধন শুনে উত্তরে বললেন, "দেবী আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না যে, আপনি কেন যাচ্ছেন! ... অণু আপনার মেয়ে বলে নিজেকে দাবি করে, সে আপনার কাছে আজ নয়ত কাল ফিরে আসবেই... তবে এই উচাটনতার কিই বা অর্থ!" ... দেবী সর্বাম্বা এবার হেসে বললেন, "পিতা, আমি যে আমার কন্যার কাছে যাচ্ছি না! ... আমি যে আমার প্রেমিকের কাছে যাচ্ছি। ... আমাকে যে তাঁর কাছে যেতেই হবে... না হলে যে তাঁর প্রেমের অপমান করা হয়..."।

সেই পুরুষ হেসে বললেন, "দেবী, আমার অস্তিত্বই তো আপনার কারণে। আমার আপনাকে বলার কিছু থাকতেই পারে না। ... আপনি যেমন আদেশ করেছেন, তেমনই হবে" । এই বলে সেই পুরুষ বৃদ্ধ পিতা যুবতি সর্বাম্বার সাথে, যেই গ্রামাঞ্চলে দেবী অনুগ্রাহী অবস্থান করছিলেন, ঠিক তার পাশের গ্রামাঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

অন্যদিকে শ্যামাবউ দেবী অনুগ্রাহীকে নিয়ে নিজের ছোট কুটিরে উঠলে, সেখানে কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হলেন তাঁর সই। সই আসতে, তাঁকে গৃহমধ্যে নিয়ে আসেন শ্যামাবউ ও মহোৎসাহে মাতা সর্বাম্বার কন্যার সাথে আলাপ করালেন । সাখ্যাত জগজ্জননীর ভগিনীকে লাভ করে, সইয়ের এমনই আনন্দ হয় যে বারে বারে সে শ্যামাবউকে উত্তেজনাবশে আলিঙ্গন করতে থাকে। দেবী অনুগ্রাহীর সেই দৃশ্য দেখে এক অদ্ভুত ভাবনার উদ্বেগ হয়।

তিনি মনে মনে ভাবেন, ভক্তের স্বভাব নিজের ভক্তির ভাগ না দেওয়া, ভক্তি ভাগের প্রসঙ্গ উঠলেই সে স্বার্থপর হয়ে ওঠে । তবে কি এঁরা ভক্ত নন! ... যদি ভক্তই হতেন, তবে এই ভাবে নিজেদের ভক্তিকে বণ্টন করে নিতে তাঁদের কনো প্রকার আপত্তি তো নেইই, উপরন্তু যেন ভক্তির ভাগ দিতে পেরে অধিক আনন্দ লাভ করছেন এঁরা। ... এঁরা কি প্রকারের ভক্ত! ... বউয়ের ভাবও যেন অদ্ভুত! যেন মা তাঁর একান্ত আপন। এমনই আপন যেন মায়ের কষ্ট তাঁরই কষ্ট। ...

এমন ভক্ত তো দেখিওনি শুনিওনি! এ কেমন ভক্ত যে নিজের ভক্তির ফল নিয়ে চিন্তিতই নয়, কেবলই নিজের আরাধ্যার সুখশান্তি-আনন্দ এই সমস্ত নিয়ে চিন্তিত! কেমন যেন এক অদ্ভুত ভাব! যেন কনো সেবক নয়, কনো ভক্তই নয়, এক সতী স্ত্রী যেমন সর্বক্ষণ তাঁর পতির পরিশ্রম কি করে কম হয়, তাঁর পতির সুনাম কি করে স্ফীত হয়, তাঁর পতির মান কি ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই চিন্তায় থাকেন, এঁর ভাবও ঠিক তেমন।

ভক্ত তো আমি মাতার অনেক দেখেছি । সাখ্যাত নন্দী মহারাজ, নাগরাজ বাসুকি, পুণ্যতোয়া গঙ্গা, স্বয়ং সোমকে, শুক্রকে, নারদকে, ভৃগুকে, তথাপি শনিদেবকেও দেখেছি, যারা মাতা ও পিতার প্রমুখ ভক্ত সকল, তাঁদের সকলকেই দেখেছি মাতার কাছে আসতে। তাঁদের ভাবকেও স্পষ্ট করে দেখেছি। কিন্তু এমন ভাব তো কারুর মধ্যে দেখিনি! সকলেই আসেন, কি করলে মাতা তুষ্ট হবেন সেই ভাব নিয়ে, সকলেই মাতাকে যেন সদাতুষ্ট রাখতে আগ্রহী। ...

কিন্তু এই বউয়ের ভাব যেন সম্পূর্ণই ভিন্ন! মা কিসে তুষ্ট হলেন, সেই নিয়ে এঁর বিন্দুবিসর্গ চিন্তা নেই, এঁর চিন্তা কেবল মায়ের কিসে শ্রম কম হয়, কিসে মান অক্ষুণ্ণ থাকে, কিসে মায়ের কর্মে সুবিধা হয়। কিন্তু এই সমস্ত করে লাভ কি! এই সমস্ত করে তো আর মায়ের চরণ লাভ হয়না! ব্যক্তিগত জীবনে বা জীবনের কর্মধারাতেও সুফল আসে না! সত্য বলতে মায়ের কাছে এই বউ যে নিজকে রাখতেই চায়না যেন; সকল সময়ে যেন মাতার দৃষ্টির অগোচরে থেকে মাতার জন্য শুভকামনা করে ফেরেন এই বউ! ...

এই ভাব সত্যই বড় বিচিত্র । ... এক ভক্তের অন্তত ভগবানের চরণ তো লাভের ইচ্ছা থাকেই। ... উমম... একটু পরখ করে দেখতে হবে। হতে পারে যে এঁর কনো গভীর অভিসন্ধি আছে, আর সেই অভিসন্ধিকে লুকিয়ে রাখার জন্য, এ এক অদ্ভুত মায়ার রচনা করে রেখেছে। ... হুমম, তবে তার আগে এর সইয়ের ভাবটাও দেখতে হবে, আর ওর সই ওকে কি ভাবে চেনে, সেটাও দেখতে হবে।

ভাবানুরাগ অধ্যায়

এই সমস্ত চিন্তা করে অনুগ্রাহী এবার সইয়ের সাথে আলাপ করলেন। সইকেও দেখতে বড় মিষ্টি । তার গায়ের রঙ শ্যামাবউয়ের থেকে সামান্য উজ্জ্বল, তবে রূপ শ্যামাবউয়ের শারীরিক ও আননগত, দুইভাবেই অধিক । সই আর অনুগ্রাহীকে কথা বলতে দেখে, শ্যামাবউ বললেন, "সই তুই উনার সাথে কথা বল, আমি কিছু ফল কুরিয়ে আনি বুঝলি... উনি বহুদিন ধরে পথ চলছেন, আহার নিদ্রা কিচ্ছু নেই। ... উনার আহারের ব্যবস্থা করি বরং কিছু"।

সইকে একা পেয়ে সোজাসুজি নিজের প্রশ্নের উত্তর লাভ করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করলেন অনুগ্রাহী। তিনি বললেন, "সই, তোমার এই সই, মানে বউটি ভারি মিষ্টি স্বভাবের না!... আচ্ছা, ওর পতি ওঁকে ছেড়ে দিলে কেন!" ... সই হেসে বললেন, "ঈশ্বরে মাতাল যে, তাঁর কাছে কি আর সংসারে মজে থাকা ব্যক্তি বেশিদিন থাকতে পারে সই! ... আমার সই যে ঈশ্বরে মাতাল। ... ভক্তের সেবা করতে ঈশ্বরী প্রাণপণে ছুটে ফেরেন, তাই ওঁর একটাই কথা... যত পারবে ও ভক্তের সেবা করবে, যাতে জগন্মাতাকে হন্যে হয়ে ছুটতে না হয়"।

অনুগ্রাহী কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু এই সেবা করে ওর কি লাভ! ... ভগবানের সেবার ইচ্ছায় ভগবান প্রকট হন, দর্শন দেন, বরদানও প্রদান করেন। কিন্তু ভক্তের সেবায় কি লাভ!... ভক্তগনের কাছে কিই বা থাকে যে ওঁকে দেবে?" ... সই উত্তরে হেসে বললেন, "কিছু তো চায়না ও... শুধুই বলে, মা আমার সর্বক্ষণ ছুটে বেড়ায়... সবাই কিছু না কিছু চেয়ে বেড়ায়, আর উনি তা পুড়ন করার জন্য ছুটে ফেরেন। ... আরো কত কি বলতে থাকে ও সর্বক্ষণ। ...

কখনো বলে, মাকে আমার সর্বক্ষণ সকলের ইচ্ছা পুড়ন করে ফিরতে হয়; কখনো কারুকে বিদ্যা, কলা, চেতনা এইসব প্রদান করে ফেরেন; আবার কখনো কারুকে সম্পদ প্রদান করে ফেরেন; এছাড়াও তো সকলের ইচ্ছার সাথে যুক্ত হতে হয় তাঁকে, নাহলে ইচ্ছা

ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়না। ... ও বলে, কেবল ভক্তই মায়ের থেকে কেবল মাকেই চায়, মায়ের থেকে অন্য কিছু চায়না। ... তাই মা এই ভক্তদের যাতে কনো কিছুর অভাব না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখেন। ...

কি বলে জানো সই আমায়! ... ও বলে, ও তো কারুকে বিদ্যা, সম্পদা, শক্তি প্রদান করতে পারবে না... কিন্তু ভক্তের যা প্রয়োজন, তা তো যৎসামান্য। যদি সেটি পুড়ন করতে পারে, তবে ও বলে ওর মাকে একটু কম ছোটাছুটি করতে হয়। ... এই ভাবেই ও সকল সময়ে মাতাল। ভক্ত দেখলেই, ভক্তের কথা শুনলেই, তাঁর সেবা করতে ছুটে যায় । ... বলে যদি আমি একটু ছোটাছুটি করে মায়ের পরিশ্রমকে কমাতে পারি... এই সব"।

দেবী অনুগ্রাহী পুনরায় কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "আর তুমি! তুমি কি ওর সাথে সব সময়ে থাকো?" সই বললেন, "হ্যাঁ দিদি, আমাকে সবসময়ে ওর সাথে থাকতে হয়। ... আসলে ও নিজের কনো খেয়াল রাখতে পারেনা। ... সর্বক্ষণ খালি ভক্ত দেখলেই ছুটে ছুটে চলে যায়। ... আগে তো ভক্ত-ভণ্ডের ভেদও বুঝতো না... যেখানে সেখানে চলে যায়। ... আমি যদি সেই সময়ে ওর সাথে না থাকতাম, তবে ওর মত পবিত্রতমা নারীর, পবিত্রতাকে কবেই ওই ভণ্ডরা নস্যাৎ করে দিত। ...

তাই যে ওর সাথে সর্বক্ষণ থাকলেই ভালো হয়। ... তবে সত্য বলতে কি দিদি, আমার ওর সাথে থাকতে ভালোও লাগে। ঈশ্বরীর প্রতি ওর ভাব আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কি সুন্দর ঈশ্বরীকে ও নিজের কাছের জন মনে করে, তাঁর অধিক শ্রম, তাঁর মানসম্মান, তাঁর কষ্টলাগা এই সবের খেয়াল রাখে, আর এই খেয়াল রেখেই যেন ওর আনন্দ। ... কনো চাওয়া নেই, কনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নেই... খুব ভালো লাগে দিদি...

আসলে দিদি, আমি ওর সাথে সর্বক্ষণ লেপটে থাকি তো, তাই ওর সুবাদে অনেক ভক্তের দর্শন করেছি, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, ও নিজেকে ভক্ত তো বলে না... আমি যদি ভক্ত বলি ওকে, ও বলে ওরাম বলিসনা, আমি ছোট জাতের, আমি ভক্তি করছি জানলে, আমাকে আর ওরা ভক্তদের সেবা করতে দেবে না... মায়ের যেটুকু খাটনি কমছে, আবার তা বেড়ে যাবে। ... কিন্তু দিদি আমার মন বলে, ও যাদেরকে ভক্ত বলে তাঁদের সেবা করতে যায়, তাঁদের একজনও ওর মত ভক্ত নয়। ...

অশুদ্ধ ভক্ত দেখেছি, যারা নিজেদেরকে ভক্ত বলে দাবি করে বলেই সংসার তাদেরকে ভক্ত বলে। তারা তো কেবল এটা চাই ওটা চাই করে ফেরে। আবার শুদ্ধ ভক্তও দেখেছি। তাঁরা অন্যকিছু তো চাননা, কিন্তু মায়ের চরণটা, বা মায়ের সান্নিধ্যটা চায়। ... কিন্তু আমার সই! ওতো কিচ্ছু চায়না। ... দর্শনও চায়না জানেন দিদি । দর্শনের জন্য কামনা করতে আমি মাঝে মাঝে বলি ওকে। আমি বলি, তুই এতো মা মা করিস, একবার মায়ের দর্শন কামনা করতে পারিস তো... দেখবি মা তোকে ঠিক দর্শন দিতে আসবেন। ...

(ঈষৎ হেসে) ও কি বলে জানেন! ও বলে, কেমন সই তুই, যার পরিশ্রম হবে বলে আমি সর্বক্ষণ ভক্তদের সেবা করে ফিরি, আমিই তাঁকে আবার খাটাব! তাঁকে দর্শন দেবার জন্য ছোটা করাবো! ... না না সই, আমি তাঁর সামান্য প্রেমী, আর প্রেমীর ধর্ম কি জানিস!

শুধুই প্রেম করে যাওয়া । ... আরো কি সব বলে, আমার মাথায় ঢোকে না। ... বলে, প্রেমীর স্বপ্ন কি হয় জানিস! প্রেমী নিজেকে নিজের প্রেমের কাছে হারিয়ে দিতে চায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারলেই প্রেমের সার্থকতা। ... আমি যেন আমার প্রেমের কাছে নিজেকে একদিন হারিয়ে ফেলতে পারি... আমার আমি যেন সম্পূর্ণ ভাবে ঘুচে যায়। তবে না আমি প্রেম করতে পারলাম। ... তার আগে আবার প্রেম কি করলাম! ...

ও বলে, প্রেম কি ভাবে করতে হয়, তাঁর থেকে শিখতে হয় সই, দেখিসনা, তিনি কেমন ছুটে ছুটে আসেন ভক্তদের যাতে কনো অসুবিধা না হয়। প্রেমের সেই উৎকৃষ্ট রূপ দেখতে কি পাসনা সই! ... দেখ না, তিনি সাখ্যাত মহামায়া, কিন্তু তিনি সেই মায়াকে অনায়াসে ত্যাগ করে কি ভাবে সেবিকার ন্যায় ছুটে আসেন । ... আর বলে, আমায় দেখ্, এখনো আমার আমি গেল না... ভক্তের সেবা কে করে! আমার মধ্যে দিয়ে তিনিই তো করেন। কিন্তু দেখ আমাকে, সেই আমি সেবা করি, আমি সেবা করি এমন করতে থাকি । ... প্রেম করতে পারলাম কই রে সই, পারলাম আর কই!"

দেবী অনুগ্রাহী যেন এক অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করে গেছেন। যেন সমস্ত কিছুই অজানা তাঁর এই জগতে। তিনি অনেক কিছুই জানছেন, কিন্তু যেন কিছুই মানতে পারছেন না। তিনি আবার বললেন, "মা তো সশরীরে রয়েছেন, তুমি তোমার সইকে নিয়ে উনার কাছে গেলে না কেন!" ... সই উত্তরে হতাশ হয়ে বললেন, "বলেছিলাম, কিন্তু ও বলল, না রে আমি ছোট জাত। মায়ের কাছে ছোট বড় কিছু নেই জানি। ... কিন্তু সমাজ! সমাজ যে বড় নিষ্ঠুর রে সই, সমাজ বড় নিষ্ঠুর। ...

ও বলে, আমি যদি তাঁর কাছে যাই, সমাজ বলবে, ওই ছোট জাতের মেয়েটা জগজ্জননীকে অপবিত্র করে দিয়েছে। ... এই সমাজ এমনই দম্ভে মেতে থাকে যে ওরা ভাবে কেউ জগজ্জননীকেও অপবিত্র করে দিতে পারে। ... কিন্তু যাই হোক, আমার জন্য মাকে এমন কটুবচন শুনতে হবে, তা কি করে আমি করতে পারি সই । ... তাঁর কোমল হৃদয়কে আঘাত কি করে করতে পারি আমি, বলতো সই... এই সব বলে ও সর্বক্ষণ"।

অনুগ্রাহী যেন এক গভীর চিন্তার সাগরে ডুবে যাচ্ছিলেন। এ কেমন ভক্ত, এমন ভক্তের সাথে তো তাঁর কনোদিনও সাখ্যাত হয়নি। নিশ্চয়ই এই ভক্ত এক বিশেষ ভক্ত, হয়তো প্রচুর ধ্যানধারণা করে। তার কারণেই ... না... কতই আর ধ্যান ধারণা করবে! নন্দী মহারাজ, মহর্ষি নারদের থেকেও অধিক ধ্যান ধারণা করেন! ... না একবার এঁর ক্রিয়াসকলের বিষয়ে প্রশ্ন করে দেখেই নিই না।

অনুগ্রাহী শ্যামাবউয়ের সমস্ত কথা শুনে বিস্মিত হলেও, একটু পরীক্ষা করার ভঙ্গিতে বললেন, "পূজা আদি, ধ্যান ধারণা করে বোধ হয় বউ, তাই না!"... সই বললেন, "না দিদি। ... একবার এক ভক্ত ওঁর ভক্তি দেখে, একটি মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন জপ করতে, ৩০ লক্ষবার জপ করলে সিদ্ধি লাভ হবে, এমনও বলেছিলেন। ও কিছুদিন জপ করে আমায় বলল, ও জপ তপ আমার দ্বারা হবেনা সই। ... জপ করতে গেলে, মায়ের প্রতি নিষ্ঠাই হারিয়ে ফেলছি, খালি মনে হচ্ছে, এই বুঝি ভুল মন্ত্র আওড়ে ফেললাম"।

দেবী অনুগ্রাহী বেশ বুঝতে পারলেন, শ্যামাবউয়ের ভাব বড়ই বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মনে যেন এক শঙ্কা হলো। তাঁর মনে হলো, এই ভাব হয় নেহাতই ছেলেমানুষি, নয় সমস্তটাই ভণ্ডামি । একবার পরখ করে দেখা প্রয়োজন, যদি এটা ভণ্ডামি হয়, তবে তার ফল ও সঠিক সময়ে পেয়েই যাবে, আর যদি ছেলেমানুষি হয়, তবে ওকে শিক্ষিত করে, এক উন্নত ভক্ত করে তোলা যাবে।

এমন ভাবছেন, সেই সময়ে সেখানে কিছু সুন্দর ফল নিয়ে উপস্থিত হয় শ্যামাবউ। দেবী অনুগ্রাহীর স্নানের ব্যবস্থাও করে এসেছেন তিনি। তাই তিনি এসে বললেন, "এই মেয়ে, তোমার স্নানের জন্য হলদি, মুলতনি মাটি রেখে এসেছি, আর ধরা জলে, নিমপাতা, বেলপাতা আর জবাকুসুমের নির্জাস করে এসেছি। স্নান করে নাও । সেই কবে থেকে পথে পথে ঘুরছ, স্নান করে শরীর সতেজ করে এসে, এই ফলগুলো একটু খেয়ে নাও, শরীরে বল পাবে"।

অনুগ্রাহী পরীক্ষা করার এই সুন্দর সুযোগ মনে করে বললেন, "কিন্তু শরীর তো অনিত্য, এঁর পিছনে এতো পরিশ্রম করে কি হবে!" ... শ্যামাবউ সেই কথা শুনে হেসে বললেন, "দিদি গো, তুমি হলে সাখ্যাত জগদম্বার মানসকন্যা। তোমার জ্ঞানের কি আর সীমা আছে। কিন্তু আমি যে সামান্য এক নিচু জাতের মেয়ে, অত জ্ঞানবুদ্ধি আমার কোথায়! ... তবে হ্যাঁ, ভক্তদের মুখে শুনেছি, শরীর না থাকলে, সত্য কি তা উপলব্ধিই করা যায়না। ...

তাঁদের একজন আমাকে শিখিয়েছিলেন, তারতম্যেই সত্য উপলব্ধি। অসত্যে বিরাজ করেই সত্য উপলব্ধি সম্ভব। একবার সত্যে বিরাজ করলে, কি বা আর সত্য, কি বা আর অসত্য, সব একাকার হয়ে যায়। তখন আর সত্য কি বোঝাই যায়না। ... আসলে দিদি, সমস্ত ভক্তদের থেকে শুনেছিলাম, শরীর অনিত্য, ও মিছে। সেই শুনে, আমি শরীরের কনো যত্ন নিতাম না । সেই দেখে, ওই ভক্ত আমাকে এই কথা বলেছিলেন। ...

তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ এই শরীর মিথ্যা, কিন্তু মিথ্যা আছে বলেই না এতে থেকে সত্যকে জানা যায়। মিথ্যা যদি না থাকতো, তবে তো সত্যকে প্রত্যক্ষই করা যায় না। তিনিই বলেছিলেন, শরীর ক্ষয়শীল, একদিন এই শরীর নষ্ট হয়ে যাবেই, মিথ্যা যে... তাই এই শরীরের প্রতি কনো মোহ করতে নেই । কিন্তু সাথে সাথে এও বলেছিলেন, যদি এই শরীরের কোনরকম যত্ন না নাও, তবে রোগে জরাজীর্ণ হয়ে যাবে, আর তা হলে, শরীরের রোগের দিকেই মন চলে যাবে। ...

তাই, শরীরে যাতে রোগভোগ না আসে, সেই অনুসারে একে পুষ্টি দিও, এর ত্বককে আর এর অন্তরের যন্ত্রগুলিকে। ... তবে দেখবে, এই শরীর যতদিন নষ্ট হচ্ছে না, ততদিন এর দিকে নজর দিতে হবেনা, আর সত্যে মন দিতে পারবে। ... তিনি অদ্ভুত কথা বলতেন দিদি। ... তিনি বলতেন, এই শরীর ঠিক ততটাই মিথ্যা যতটা মন্দির। মন্দিরের অন্তরে থাকা ঈশ্বরবিগ্রহ সত্যের প্রকাশ, কিন্তু সেই বিগ্রহকে যেই মন্দির ধরে রাখে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ...

তিনি এই বিষয়ে আরো বলতেন, এই মিথ্যা মন্দিরের যদি যত্ন না নাও, তবে ধসে পরে যাবে, আর একবার তা হলে, বিগ্রহ সত্যকে আর উপলব্ধি করা যাবেনা। ... তেমনই এই শরীরটা নাকি সেই চেতনাবিগ্রহের মন্দির। তাই এই শরীরের যত্ন নিতে হয়। তবে তিনি এও বলতেন, মন্দিরে বেশি মন দিলে, সত্যে মন থাকেনা, মিথ্যাকেই সত্য মনে হয়। তাই এই শরীরে বেশি মন দিতে নেই। খালি এই যন্ত্রটা যাতে মনকে নিজের দিকে আকর্ষিত না করে, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হয়"।

অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "ভক্ত সেবা করে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ, তাই না!" ... শ্যামাবউ লজ্জা পেয়ে বললেন, "ভক্ত যে ভগবানেরই প্রতিবিম্ব। ... ভগবান সকল স্থানেই বিরাজমান, সকল জীবের মধ্যে তিনিই উপস্থিত। কিন্তু বাকি জীব যে নিজেদের চেতনাকে পরিত্যাগ করে, অহংকারের আরাধনায় মত্ত। তাই তাঁদের মধ্যে দিয়ে ভগবান কথা বলতে পারেন না । ... কিন্তু ভক্ত তো সবসময়ে নিজের চেতনাকে ফিরে পেতে ব্যস্ত, নিজের অহংকারকে নাশ করতে ব্যস্ত। ... তাই ভগবান ভক্তের বানীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হন। ... প্রতিটি শুদ্ধভক্তের মুখ থেকে তোমার মা-ই যে কথা বলেন গো দিদি"।

অনুগ্রাহী স্নানকর্মে যেতে যেতে দ্বিতীয় পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে গেলে, সেটিও ছাড়লেন না তিনি। তিনি বললেন, "শুদ্ধভক্ত আবার কি জিনিস! ... ভক্ত, ভক্তই হয়, তাই না!" ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "ঠিকই বলেছ দিদি তুমি, কিন্তু সমাজ! ... সমাজ যে ঈশ্বরের কাছে যারা যাচনা করেন, সেই যাচকদেরকেও ভক্ত বলে, তাই যারা যাচনা করেন না, তাঁদেরকে বোঝাতে শুদ্ধ শব্দটা ভক্তের আগে বসাতেই হয়। ... এই যা... কিন্তু তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না তো দিদি... বেলা হয়েছে... স্নান করে এসে আগে আহার করো... আহার করতে করতে আবার আমাকে জেরা করো"।

জেরা শব্দটা শুনে, অনুগ্রাহী একটু মনে মনে লজ্জাই পেলেন, কিন্তু সেই ভাব প্রকাশ না করে, স্নানে চলে গেলেন। স্নানজলে নিজের তনুকে অবগাহন করে রেখে, তিনি শ্যামাবউয়ের কথা ভাবলেন কম, আর কি উপায়ে তাঁকে আরো পরীক্ষা করা যায়, সেই চিন্তা বেশি করলেন। তাই তাঁর স্নানে একটু অধিক সময়ও লেগে যায়। স্নান সেরে এসে শুদ্ধবস্ত্র ধারণ করে, ফলগ্রহণে বসে, তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বউ, তোমার আরাধ্যা তো আমার মা। ... তো তুমি আমার সাথে চলো না সেখানে। ... আমি তোমাকে নিয়ে যাব"।

সেই কথা শুনে শ্যামাবউয়ের এক মুহূর্তের জন্য চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই মিয়মান হয়ে গেলে, দেবী অনুগ্রাহী প্রশ্ন করলেন, "কি গো যাবে না!" ... শ্যামাবউ ম্লান এক হাস্য প্রদান করে বললেন, "সমাজ বড় নিষ্ঠুর দিদি... সমাজ বড়ই নিষ্ঠুর। ... ঈশ্বরকেও লাঞ্ছন দিতে কুণ্ঠা করেনা এই সমাজ । ... সর্ব্বা আমার দেহ ধরে আছে, কত ভক্তের সেবা করে চলেছে দিবারাত্র। ... সমাজ যদি আমার মত ছোটজাতের মেয়ে তাঁর কাছে গেছে বলে, তাঁকে ম্লেচ্ছ বলে বসে! ...

জানি তিনি এইসমস্ত কথাতে কর্ণপাত করেন না। সমস্ত ভেদভাবের ঊর্ধ্বে তিনি। ... কিন্তু আমার মত মূর্খ তো আর সেই ভেদভাবের ঊর্ধ্বে নয়, আমার কারণে আমার প্রিয়তমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে, এই জ্বালা আমি কি করে সইব দিদি! ... আমার আমি যে এখনো

যায়নি গো... আমি যে এখনো আমার আমির থেকে মুক্ত হইনি। ... আমার কারণে তাঁর লাঞ্ছন লেগেছে, এই ভাব তাই আমাকে ব্যথিত করবেই"।

অনুগ্রাহী যেন এই কথা শুনে কেমন যেন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন, অহংকার রয়েছে তার ক্ষেদ করলো শ্যামাবউ, নাকি অহংকারের পূজা করলো! সামান্য ভেবে তিনি আবারও বললেন, "কিন্তু বউ, এই সুযোগ হাতছাড়া করা কি ঠিক হবে!... আচ্ছা তুমি কি চাও বলো তো, তোমার আরাধ্যা শরীর ধরে রয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে মন চায় না!" ...

শ্যামাবউ সেই কথাতে ভাবুক হয়ে গিয়ে বললেন, "মন তো চায়, বললেও শোনেনা। ... এতো বোঝাই, তোকে তিনি ছোটজাতের ঘরে জন্ম দিয়েছেন, যাতে তাঁর ভক্তদের সেবা করে তাঁর শ্রমকে লঘু করা যায়, সেই কারণে। ... তাঁর দর্শন বিলাস তোর জন্য নয়। ... কিন্তু মন কথা শোনে না দিদি। ... মাঝে মাঝেই সে উনার কাছে ছুটে চলে যেতে যায়। মন বলে, তাঁর কাছে যাবি না! তাঁর কাছে না গিয়ে তাঁকে ব্যাথা দিচ্ছিস না তো! ... এক তো তাঁকে ত্যাগ দিয়ে, জীব হয়ে সসীম বেশে বিরাজ করছিস। ... তোদেরকে অসীমস্বরূপে নিয়ে যেতে তিনি দেহ ধরে রয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে নিজেকে লীন করে দে না...

কিন্তু দিদি, কুণ্ঠা হয়; ভয় হয় মনে। তাঁকে ত্যাগ দিয়ে, নিজেকে জীব জ্ঞানে ভ্রমিত করে, তাঁকে ইতিমধ্যেই কত যন্ত্রণা দিয়েছি । এরপর যদি তাঁর কাছে যাবার কারণে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়, সেই যন্ত্রণা ... না না দিদি, নিজের মিলনসুখের কথা ভেবে, নিজের মুক্তির কথা ভেবে, নিজেকে জীব থেকে ব্রহ্ম করে তোলার কথা ভেবে, তাঁকে কলঙ্কিত করতে পারবো না। ... এমনিই বহু কলঙ্কের স্বীকার তিনি হয়েছেন। ... দেখনা, সর্বক্ষণ জীবরা তাঁর কাছে কিছু না কিছু যাচনা করেই চলেছে।

তাঁকে ত্যাগ দিয়েই জীব হয়ে তাঁকে বেদনা প্রদান করেছে । কিন্তু তাতেও হয়না। এই জীবরূপ ভ্রমকে আরো ভ্রমিত করার জন্য একের পর এক যাচনা করে চলে জীব। যিনি অধীর অপেক্ষায় বসে রয়েছেন, কবে আমরা পুনরায় নিজেদের জীবরূপ ভ্রমকে ত্যাগ করে, পুনরায় তাঁর সাথে মিলনে আবদ্ধ হয়ে, তাঁকে পরিপূর্ণ করে তুলবো, তাঁর থেকেই এই ভ্রমকে ঘনত্ব প্রদানের যাচনা করে থাকি আমরা, আর তাঁকে সমানে অধিক থেকে অধিক বেদনা প্রদান করি। ...

দেখনা, এমনিই তাঁকে আমরা যে জীব, সেই ভ্রমে থেকে তাঁর কাছে যাচনা করে করে, তাঁকে আমরা ভণ্ডের মত ঈশ্বরীর আসনে স্থিত করে, তাঁকে আমাদের যাচনাপূর্তির দাসীর মত ধারণা করি। ... অহোরাত্র তাঁকে মুখে ঈশ্বরী বলি, মুখে সত্য বলি, আর বাস্তবে তাঁকে নিজেদের দাসী মনে করে, তাঁকে আমাদের যাচনার পূরক বলে অঙ্গিকার করি । ... এরপর আর তাঁকে লাঞ্ছিত করতে পারব না। ... জানি দিদি, আমার আমি যায়নি বলেই আমি এরূপ কথা বলছি, কিন্তু থাক তবে এই আমি পরে। ... যদি এই আমিকে ত্যাগ করার জন্য তাঁকে লাঞ্ছিত করতে হয়, তবে তার থেকে এই আমি পরে থাকাই ভালো"।

অনুগ্রাহী এবার বুদ্ধি করে বললেন, "তারমানে তুমি তোমার আরাধ্যার শ্রম কম করবে বলে যে ভক্তদের সেবা করো, সেটা লোকদেখানি! ... তুমিও তো এমনই চাও যে তোমার আরাধ্যার শ্রম কমানোর কারণে, তিনি শ্রম করে নিজেই তোমার সামনে উপস্থিত হন, আর তোমার উপর কৃপা করুন। ... তাই না!" ... শ্যামাবউ সেই কথাতে যেন অত্যধিক ব্যথিত হয়ে বললেন, "কি বলছো দিদি! ... না না, আমি তো এক দাসীমাত্র তাঁর। ... তাঁকে প্রেম করি...

তোমার ন্যায় বা সইয়ের ন্যায় তাঁকে মা বলেও মনে করতে পারিনা। তিনি যেন আমার মিলনসঙ্গিনী। আমি যেন সর্বক্ষণ তাঁর সাথে মিলনের জন্যই অপেক্ষা করি। ... আমি যে এক ভোগী দিদি, তোমাদের মত ত্যাগী নই আমি। ... আমি একজন কলুষিত মনের ভ্রমিত জীব। ... আমার উপর তিনি করুণা কেন করবেন!" ... অনুগ্রাহী বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই তো। যে নিজের মায়ের সাথে মিলনের চিন্তা করে, সে তো কলুষিত বটেই। ... আর কলুষিত বলেই তো, আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো বলতেও, তিনি তোমাকে তাঁর কাছে যাবার প্রেরণা প্রদান করলেন না। ...

কিন্তু, তিনি করুণা করবেন না জেনেও এই ভক্তসেবা করো কেন তুমি! ... তুমি সুন্দরী, যৌবনা। তুমি তো ভোগবাসনার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখেও নিজেকে সুখী করতে পারো! তা, তেমন করো না কেন?" ... শ্যামাবউ এক তাচ্ছিল্যের হাস্য হেসে বললেন, "দিদি, মনে প্রেম জাগলে যে পাবার ইচ্ছা থাকেনা গো। ... কেবলই দেবার ইচ্ছা জাগে। ... আমার কাছে দেবার মত কিচ্ছু নেই । সঙ্গে রয়েছে এই কলুষিত অহংকার, এই আমার আমি। ... এটি তাঁর কাছে দেবার জিনিস নয়। ... আমি এই অহংকারের পোশাক পরে থাকি, তাই আমার প্রেয়সীও মায়ার পোশাক পরে নিজের লজ্জা প্রকাশ করেন। ...

যেদিন আমি নির্লজ্জ হয়ে, আমার এই অহংকাররূপ পোশাককে ছেড়ে ফেলে মিলনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবো, সেদিন তিনিও ঠিক নিজের লজ্জাবস্ত্ররূপ মায়াকে ছেড়ে ফেলে, আমাকে মিলনে আবদ্ধ করে নেবেন। ... আসল কথা দিদি, আমি যে এখনো শুদ্ধই হতে পারিনি! ... আমি যে এখনো নির্লজ্জই হতে পারিনি! ... সেই কারণেই তিনি আমাকে তাঁর কাছে যাবার প্রেরণা প্রদান করছেন না । ... (ঈষৎ মনের খেয়ালে হেসে) ... মিলন তো তাঁর কারণ দেহের সাথে হয়। ... আর তাঁর কারণ দেহ যে সর্বত্র নেই, সমস্ত কিছু সেই কারণের মধ্যেই বিরাজমান!

আমি তো আর ভক্ত নই যে আমার সেবা করতে তিনি দেহ ধরে শ্রম করবেন । আমি যে মিলনকামী! আমার সাথে মিলনের জন্য তিনি যে কারণ শরীরকেই কেবল প্রকাশ করবেন। সমাজ কেন, কাকপক্ষীও টের পাবেনা, আমি আমার আমিকে নির্লজ্জের মত ত্যাগ করে, তাঁর সাথে মিলিত হয়ে হারিয়ে যাব। ... কিন্তু দিদি, আমি যে সেই নির্লজ্জটাই হতে পারিনি! ... তাই তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন না। ... তিনি নয় দিদি, দোষী আমি। ... শূন্যই সত্য; শূন্যেরই চেতনা... সেই শূন্যই তিনি, সেই চেতনাই তিনি। ...

আমি সেই চেতনাকেই ত্যাগ দিয়ে পূর্ব থেকেই দোষী। সদা মিলনে আবদ্ধ থাকা এই ব্রহ্মসনাতন আমি, মিলনে অরাজি হয়ে অহংকাররূপ পোশাক পরে নিয়ে পুনরায় দোষ করেছি। আর আজ দেখ না, সেই পোশাককে নির্লজ্জ হয়ে ছারতে না পেরে, আবার

দোষ করছি। মিলনে তৎপর আমার প্রিয়তমা চেতনা, আমার দোষে ব্যথিত হয়ে, নিজেকেও মায়ারূপ লজ্জাবস্ত্রদিয়ে ঢেকে নিয়েছেন। ... সর্বদা তিনি তৎপর, সেই বস্ত্র ত্যাগ করে, আমার সাথে মিলনে রত হতে, কিন্তু এই দোষী আমিই সমস্ত সময়ে তাঁর বেদনার কারণ। ...

এই দোষী হতচ্ছাড়ি আমি কিছুতেই এই আমিরূপ পোশাক ছারতে পারছেনা । ... এক অজ্ঞানতার, অভক্তের কুণ্ঠা সর্বদা আমাকে সেই লজ্জাবস্ত্র ত্যাগ করতে আটকাচ্ছে। ... তাই, তিনিও আমার কাছে আসতে পারছেন না, আর আমার সাথে মিলনে আবদ্ধ হবার জন্য ব্যকুল হয়েও তিনি আমার সাথে মিলিত হতে পারছেন না। ... দোষী দিদি, আমি একজন দোষী, ... তোমার মাতার কাছে আমি দোষী। আমার প্রিয়ার কাছে আমি দোষী। ... এই দোষ থেকে মুক্ত না হতে পারলে, তাঁর মুখ দেখার অধিকার আমার নেই। ...

কি করে নিজের মুখ দেখাবো আমি তাঁকে! ... কি বলবো তাঁকে! ... তাঁকে এই বলবো, এই দেখ আমার নতুন পোশাক! ভালো লাগছে আমাকে এই পোশাকে! ... এই পোশাকের কারণেই যে সদামিলনব্যকুল আমার পরমপ্রিয়া ব্যথিত, আর আমি তাঁর কাছে গিয়ে সেই পোশাকেরই গুণগান গাইবো! ... সেই গুণগানে তিনি আনন্দ পাবেন! ... না দিদি, তাঁর বেদনাকে আরো অধিক বৃদ্ধি করবে আমার এই নতুন পোশাকের বড়াই । ... আমাকে ক্ষমা করো দিদি... আমি যেতে পারবো না! ... আমি তাঁকে এই পোশাক দেখিয়ে ব্যাথা দিতে পারবো না"।

দেবী অনুগ্রাহী যে কি বলবেন শ্যামাবউকে, তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না। আসলে তিনি যেন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে পরে গেছেন। তাঁর মায়ের প্রতি এমন মিলনকথা কারুর থেকে পূর্বে তিনি শোনেননি । সকলে তাঁকে মা বলেই সম্বোধন করেন। সেই মায়ের সাথে মিলনের কথা বলছে এই মেয়ে! না না, সত্যই এ বিকৃত মস্তিষ্কের, সত্যই এই মেয়ে কলুষিত ভাবনার। সত্যই এঁর সংস্পর্শে মায়ের আসা উচিত নয়। এঁর সংস্পর্শে এলে মা সত্যই কলুষিত হবেন।

আহারাদি সমাপ্ত করে, অনুগ্রাহী ঈষৎ এদিক সেদিক ভ্রমণ করছিলেন সইয়ের সাথে । সই অনেক কথাই বলছিল শ্যামাবউ সম্বন্ধে। কিন্তু অনুগ্রাহীর যেন কনো কথা কানেই ঢুকছিল না। সে অনবরত ভেবে চলেছিল কিছু কথা। তাঁর স্মরণ আসে, কিছুদিবস আগে, মায়ের দেখানো স্বপ্নের বিচার করার শেষে, তাঁর মনেও এমন বিচার আসে । কিন্তু সেই বিচার করে, সে নিজেই লজ্জিত হয়ে যায়। ... তবে কি, এই বিচার তাঁর মনে এসেছিল, কারণ তিনি সেই সময়ের অদূর ভবিষ্যতে এই শ্যামাবউয়ের সাথে সাখ্যাত করবেন, সেই উদ্দেশ্যে ছিল!

তাঁর সেই ভাবনা কি তবে এই শ্যামাবউয়ের উপিস্থিতির পূর্বাভাস ছিল! না, হতে পারে এমনটা। তবে তো এই শ্যামাবউকে আরো প্রশ্ন করা উচিত। প্রশ্ন করলে হয়তো, তিনি যে ভাবনায় এই শ্যামাবউয়ের ভাবকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এই ভাবনায় রত হয়ে তিনি পুনরায় কুটিরে প্রত্যাবর্তন করলেন শ্যামাবউয়ের উদ্দেশ্যে। শ্যামাবউকে দেখলেন তাঁর আরাধ্যা দেবীর এক মৃৎমূর্তিকে সাজাচ্ছিলেন।

তাঁর কাছে যেতে তিনি অনুগ্রাহীর উপস্থিতিকে অনুধাবনও করেন না । অনুগ্রাহী তাই নিজে থেকেই বললেন, "তোমার আরাধ্যাকে বুঝি এমন দেখতে!" ... শ্যামাবউ সেই কণ্ঠস্বরে ঈষৎ আচম্বিত হয়ে গিয়ে, দেবী অনুগ্রাহীর উপস্থিতি নিশ্চিত হয়ে বললেন, "না গো ... তিনি এমন দেখতে নন। ... তিনি যদি এমনই দেখতে হতেন, তবে যে আমার মন ভরে যেত। ... কিন্তু মন ভরে না তো! ... কত কত মাটির গহনা তৈরি করে উনাকে সাজাই... কিন্তু মন ভরে নাতো!"

ঈষৎ থেমে নিজে থেকেই আবার বললেন শ্যামাবউ, "আসলে তিনি তো নিরাকারা... নিরাকারের সৌন্দর্যকে সাকারে প্রকাশিত হয় দিদি!" ... দেবী অনুগ্রাহী আর অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে, সরাসরি নিজের পুনরাগমনের কারণে ফিরে গিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কেমন গো! ... সকলের মা যিনি, তাঁর সাথে মিলনের কথা ভাবতে তোমার কুণ্ঠা হয়না! ... তোমার ভয় করেনা!"

শ্যামাবউ হেসে বললেন, "কেন ভয় পাবো গো! ... আমার সেই পোশাক, সেই পোশাকের নাম জানো? সেই পোশাকের নাম হলো স্বয়ম্ভু। দিদি! সেই স্বয়ম্ভুরূপ পোশাকই তো আমার লজ্জাবস্ত্র। আমি তো সেই লজ্জাবস্ত্র ছাড়ার কথাই বলছি। ... তুমি ভাবছো এই শরীরের কথা! ... (হেসে) ... দিদি, তুমিও না! ... এক স্বয়ম্ভুরূপ ভ্রম বস্ত্র ছারতে পারছিনা বলে চিন্তা করছি; আবার তুমি বলছো সেই ভ্রমের নির্মিত ভ্রম অর্থাৎ পঞ্চভূতের শরীরের মিলনের কথা!

দিদি, ওই সমস্ত খোল আবার খোল নাকি! ... ওসব তো ইতরের পোশাক। ... আমি ছোটজাতি ঠিকই দিদি, তবে ইতর করে আমার প্রেয়সী আমাকে রাখেননি। ... তাই ওই দেহ, মন, বুদ্ধির লজ্জাবস্ত্র নিয়ে আমি চিন্তিতই নই। ... ওই পঞ্চভূতের দেহের মিলন! ... ও আবার মিলন কোথায় গো দিদি! ... ও তো মৈথুনক্রিয়া! ... বংশবৃদ্ধি করার উপায় মাত্র তা। ... ও আবার মিলন নাকি গো! (এই বলে হেসে গড়িয়ে পরলেন শ্যামাবউ)

কিন্তু দিদি, এই স্বয়ম্ভুরূপ লজ্জাবস্ত্রই তো অহংকার। ... এটাই তো আমার আমি গো। ... এই আমি আমি ভাব না গেলে, তাঁর সাথে মিলন হবে কি করে? ... এই 'আমি'টাই তো সেই লজ্জাবস্ত্র, এই স্বয়ম্ভুভাবই তো সেই লজ্জাবস্ত্র যা ধারণ করে, যা আমি নই, সেই স্বয়ম্ভুটিকেই আমি মনে করে যাচ্ছি, আর তার কারণেই তো তোমার মাতার সাথে মিলন অসম্ভব। ... তোমার মাতা যে সক্রিয় ব্রহ্ম, তিনি যে পূর্ণভাবে অখণ্ড, অনন্ত শূন্য। ... যদি আমি কিছু, এই বোধ থাকে, তবে আমি শূন্য কি করে হলাম ভাই! ... আর যদি শূন্যই না হতে পারি, তবে তোমার মাতার সাথে মিলন সম্ভব কি উপায়ে? ...

আর তুমি বললে কুণ্ঠা! ... ভাই, সেই মিলনকেই তো মহাসমাধি বলে গো! ... মহাসামাধি তো সেই মিলনই, যেখানে আমি আমার স্বয়ম্ভুরূপ লজ্জাবস্ত্রকে ছেড়ে ফেলে, মাতার সাথে একাত্ম হয়ে, তাঁর অনন্তশূন্যে নিজের এই আমিটিকে বিসর্জন দিয়ে দেব... সেই কর্মে কুণ্ঠা তো থাকে,... এই যেমন আমার আছে। ... ওই স্বয়ম্ভুকে নিজের অঙ্গে চাপিয়ে রেখেছি লজ্জাবস্ত্র করে। ... আর সেই লজ্জাবস্ত্রই আমাকে কুণ্ঠিত করে রেখেছে।

তোমার মাতা কে জানো? তিনি হলেন পরাচেতনা বা পরানিয়তি। এই কথার অর্থ জানো? ... তিনি আমাদের এই লজ্জাবস্ত্র, অর্থাৎ এই স্বয়ম্ভুরূপ ভ্রমকে ছাড়িয়ে, আমাদেরকে ব্রহ্মস্বরূপ করে দেবার জন্যই ব্রহ্মময়ী। ... হ্যাঁ গো দিদি, আমি পরেছি ভ্রমের লজ্জাবস্ত্র, যার নাম স্বয়ম্ভু। ... আর তোমাদের মাতা, আমার লজ্জা নিবারণের অপেক্ষা করার জন্য যেই লজ্জাবস্ত্র ধারণ করেছেন, তার নাম ব্রহ্মময়ী, বা চেতনা।

তাঁর এই চেতনাকেই তোমরা মা বলো, আবার প্রেমী কৃষ্ণ বলে। তোমাদের মাকে কৃষ্ণ বললেই, তাঁর সাথে মিলনচিন্তা করা সঠিক, আর মা বললেই মিলনচিন্তা করা বেঠিক! ... না গো দিদি । ... এই অহংকাররূপ ভ্রমরূপ স্বয়ম্ভুপোশাক পরে থাকলে, তাঁকে মা বলো, বা কৃষ্ণ বলো, মিলন হওয়া অসম্ভব। ... মিলনের জন্য পোশাক ত্যাগ করে নির্লজ্জ হতেই হয় যে!...

আর মা বললে না ভাই! ... মা বলে যখন যখন তোমরা তাঁকে ডাকো, তখন তখন তাঁর মধ্যে আনন্দ ও বিরহ, দুই স্রোতই একত্রে ক্রিয়া করে, সেই বিষয়ে তোমার বোধ করি ধারণা নেই। তাঁর আনন্দ হয় কারণ অন্তত মা জ্ঞানে তাঁকে দূরে সরিয়ে না রেখে, কাছে তো রাখলে। আর অন্যদিকে, বিরহের কারণ একটিই। যতক্ষণ মা বলে ডাক, ততক্ষণই এই অহংকাররূপ, ভ্রমরূপ স্বয়ম্ভুপোশাক, অর্থাৎ এই 'আমি'টিকে ত্যাগ না করার অঙ্গিকার সেটি। মা আছেন, তাই তাঁর সন্তান আছেন।

মা নাম দিয়ে তাঁকেও এক অহংকারের পোশাক পরিয়ে দিলে, আর সন্তান নাম দিয়ে নিজেকেও এক অহংকারের পোশাকে আবদ্ধ করলে। ... সন্তান তো আর মায়ের সাথে মিলনে আবদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু এই সন্তানরূপ অহংকারের খোল যে কতটা বেদনা প্রদান করে প্রিয়ার মনে, তার ধারণাও করতে পারো না দিদি গো, তার ধারণাও করতে পারো না। ... তিনি যে শূন্য আর পোশাক পরেই চেতনা! যতক্ষণ তুমি এই স্বয়ম্ভুপোশাক, বা এই আমিটিকে নির্লজ্জের মত ত্যাগ করতে পারবে না, ততক্ষণ তিনিও যে তাঁর চেতনারূপ লজ্জাবস্ত্র ত্যাগ করবেন না; আর যতক্ষণ না তুমি ও তিনি উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপে আসছ, ততক্ষণ যে মিলন হবে না!

তোমাদের মাতার সেই লজ্জাবস্ত্র অর্থাৎ চেতনার কারণে, তাঁর সাথে মিলনকে বর্জন করলেই যে আমরা নিজরাও লজ্জাবস্ত্র ধারণ করে স্বয়ম্ভু। আর তুমি যেই লজ্জার কথা বলছো! ... সে তো এই স্বয়ম্ভুরূপ ভ্রমের নির্মিত নূতন ভ্রমপর্দা। তা ধারণ করে তো আমরা এটাও ভুলে যাই যে আমরা শিব, আমরা স্বয়ম্ভু। ... তখন তো আমরা নিজদেরকে কেবল কাপড়ের আস্তরণে নয়, কাপড়ের উপর উত্তরীয় ধারণ করে নিয়ে শিবও থাকিনা, জীব হয়ে যাই।

আমরা স্বয়ম্ভুরূপ পোশাক পরে নেওয়ার জন্যই মাতার বেদনার অন্ত নেই। ... তাঁর নিত্যমিলনাবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ থেকে তাঁকে চ্যুত হতে হয়। তারপরে আবার যখন আমরা সেই স্বয়ম্ভুশিবরূপ লজ্জাবস্ত্রের উপর চাদররূপী পঞ্চভূত চাপিয়ে শিবরূপকে ভুলে গিয়ে পঞ্চভূতরূপ জীব মনে করি নিজেকে, তখন প্রিয়ার বেদনার ভান করতে পারছো দিদি! ... মিলনের সমস্ত সম্ভাবনাই তখন সমাপ্ত হয়ে যায় তাঁর কাছে। ... তিনি আর চেতনারূপী লজ্জাবস্ত্র নন, মাতা রূপ নূতন উত্তরীয় ধারণ করে নেন, আর আমরা সন্তানরূপ বদ্ধজীব হয়ে যাই"।

দেবী অনুগ্রাহী এবার চমকিত হলেন শ্যামাবউয়ের কথা শুনে। তিনি নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, "এই সমস্ত কথা তুমি কোথা থেকে জানলে! ... এই সমস্ত গুহ্য কথা কেবলমাত্র আমি আমার জননীরই মুখে শুনেছি... তোমায় এই সমস্ত কথা কে বলেছে! ... কনো ভক্ত! ... কি নাম সেই ভক্তের!" ... শ্যামাবউ তাঁর আরাধ্যাকে সাজাতে সাজাতেই ঈষৎ হাস্যে বললেন, "না গো ভাই, কনো ভক্ত বলেন নি। আসলে কি বলো তো ভাই, ... মানুষ পঞ্চভূতের খোলে লুকিয়ে থাকতে থাকতে, সেই খোলকেই সত্য বলে মনে করে ফেলে। আর তাই ভাবে যে এই খোলের দ্বারা রচনা করা গ্রন্থ, ভাষ্যেই জ্ঞানের উপস্থিতি। ... আসলে তো জ্ঞান আমাদের অন্তরে স্থিত। ... সবার কাছে সেই জ্ঞানের দ্বার খোলা... কিন্তু ওর পিছনেও সেই অহংকারের খোল! সেই স্বয়ম্ভুরূপ খোল!...

সে-ই তো অন্তরের জ্ঞানকে স্বীকার না করিয়ে, গ্রন্থে মুখ গুঁজে রেখে দেয়। ... অন্তরে যে তোমার মাতাই সেই অহংকারের খোলে, যাকে তোমরা স্বয়ম্ভু বলো, তাঁর অন্তরে বসে আছেন। তিনিও অনন্ত, তাঁর জ্ঞানও অনন্ত। ... তাঁর থেকেই যা জানার জেনেছি, যা বোঝার বুঝেছি। ... আর তাঁর প্রেরণাতেই ভগবতীর অপার প্রেমকে অনুভব করেছি। ... দিদি গো, তাঁর প্রেম অনুভব করার পর যে নিজেকে প্রেমী বলতেও লজ্জা করে । ... সেই কবে অহংকারের খোল নিয়েছি। এই খোল নেবার পর থেকে নিজের প্রিয়তমা, ব্রহ্মময়ীকে তো ভুলেই গেছি। ...

কিন্তু তিনি! একদণ্ডের জন্যও তিনি আমাকে ভোলেননি । ... প্রতিনিয়ত প্রেম করে থাকেন তিনি... অবিরাম প্রেমস্রোত প্রবাহ করতে থাকেন। প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে আমাদের সন্তানরূপ পঞ্চভূতের খোল ছাড়িয়ে, আমাদের 'আমি' রূপ স্বয়ম্ভুখোল ছাড়িয়ে, তাঁর প্রেমকে অনুভব করাতে তিনি ব্যস্ত ... তাঁর প্রেমের কাছে, আমাদের প্রেম যে তুচ্ছ বললেও অধিক সম্মান দেওয়া হয়ে যায়। ... আমরা প্রেমের চেষ্টা করি মাত্র, প্রেম তো তিনি করেন। ... আমরা বিশ্বাসের চেষ্টা করি মাত্র, বিশ্বাস তো তিনি করেন। ... এই দেখনা, তিনিই যে স্বয়ং চেতনা, স্বয়ং ব্রহ্মময়ী, স্বয়ং পরব্রহ্ম, তা জানার পরেই না তাঁর প্রতি বিশ্বাস জন্মেছে। ... কিন্তু তাঁর বিশ্বাস! ... যখন আমরা অহংকারের খোলকেই সর্বস্ব কিছু মনে করে ফিরি, যখন পঞ্চভূতের নির্মিত সন্তানরূপ খোলকেই সর্বস্ব কিছু মনে করি, তখনও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস করতে থাকেন। ...

তিনি এই বিশ্বাস করতে থাকেন যে কোন না কোনদিন আমরা নিশ্চয়ই এই খোল থেকে বেড়িয়ে আসবো, সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর সাথে আবার মিলিত হবো। এই বিশ্বাস আমাদের কোথায় দিদি! ... নেই দিদি, নেই। ... সর্বক্ষণ আমরা আমাদের প্রেমের, আমাদের ভালোবাসার, আমাদের বিশ্বাসের সুখ্যাত আর প্রচার করে ফিরি। কিন্তু একবার তাঁর প্রেম, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর বিশ্বাসকে ঠিক করে দেখতে পেলে, নিজের প্রেমকে, নিজের বিশ্বাস, ভালোবাসা যে কতটা নগণ্য, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে... তাই না ভাই!"

অনুগ্রাহী এক সম্পূর্ণ অন্য জগতে এসে পরেছেন যেন। এ যেন তাঁর জননীর মুখে শোনা কথার প্রতিবিম্ব! ... তাঁর ভাবই যেন এঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ! ... কে এই শ্যামাবউ! ... তাঁর উপর অবিশ্বাস করে কনো ভুল করছেন না তো তিনি! ... এবার তিনি নিশ্চিত, তিনি যে তাঁর

স্বপ্নের অন্তে বিচার লাভ করেছিলেন, তা এই শ্যামাবউয়ের সাথে যে তাঁর আলাপ হবে, তারই পূর্বাভাস ছিল। ... কিন্তু এক্ষণে তাঁর করণীয় কি! ... এই মহাভাবের প্রবাহে যেন তিনি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন!

যেন মনে হচ্ছে, তিনি একটি সামান্য তৃণ আর সেই তৃণকে এই প্রকাণ্ড ভাবধারা ভাসিয়ে নিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছে! ... না মার্গ দর্শন প্রয়োজন। মায়ের ধ্যান করতে হবে । তাঁর কাছ থেকে মার্গদর্শন কামনা করতে হবে। এমন কেন মনে হচ্ছে, এবার এই শ্যামাবউকে আর প্রশ্ন করে বিব্রত করলে, স্বয়ং মাতাকেই ব্যাথিত করছেন । ... কেন মনে হচ্ছে যেন যতটা প্রেমে উন্মাদ এই শ্যামাবউ তাঁর মাতার প্রতি, ততটাই প্রেমে উন্মাদ তাঁর মাতাও এই শ্যামাবউয়ের প্রতি!

তিনি ধ্যানস্থ হলেন, কিন্তু তাঁর ধ্যান বারংবার ভেঙে যায়। যেন তাঁর মাতা তাঁর নিজের অবস্থানে নেই, যেন তিনি তাঁর খুব কাছে রয়েছেন, কিন্তু তাঁর অবস্থানকে তিনি প্রত্যক্ষ করতেই পারছেন না। এমনই ভাবে যখন বারংবার অনুগ্রাহীর ধ্যান হয় আর ভেঙে যায়, তখন এক কণ্ঠস্বরে তাঁর ধ্যান পুরপুরি ভেঙে যায়। এ কি, এ তো শ্যামাবউয়ের আর সইয়ের কণ্ঠস্বর! হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেড়িয়ে এসে তিনি দেখলেন, শ্যামাবউ কোথাও দ্রুতবেগে ছুটে গেলেন, আর তাঁর সই তাঁর এই বেড়িয়ে যাওয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত।

পূর্বরাগ অধ্যায়

অনুগ্রাহী এগিয়ে যেতে, সই বললেন, "দেখ না দিদি... এ কি নতুন পাগলামি শুরু হলো! ... কি না... এক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর উনাকে যেন ডাকছে! ... কোথাও কনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছ তুমি! ... এই রাত্রি বেলায় একাকী বেড়িয়ে চলে গেল! এই পাগল মেয়েটাকে নিয়ে আর পারিনা!" ... অনুগ্রাহী সামান্য চেষ্টা করলেন অনুভব করতে, কনো কণ্ঠস্বর শুনতে পান কিনা, কিন্তু কনো শব্দই তিনি শুনতে পেলেন না। তাই অবশেষে বললেন, "এই রাতবেরোতে বউকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। ... চলো আমরাও ওর সাথে যাই... চলো, এখনো নিশ্চয় ও বেশিদূর যায়নি"।

এই বলে সই ও অনুগ্রাহী সামান্য অগ্রসর হতেই, শ্যামাবউকে দেখতে পেলেন, আর তার নিকটে যাবার চেষ্টা করলেন। ... কিন্তু এ কি! যেন শ্যামাবউয়ের সাথে তাঁদের দূরত্ব কিছুতেই কমছে না! ... শ্যামাবউ ধীরে ধীরে নাচের তালে তালে হেটে হেটে যাচ্ছে, আর তাঁরা দুইজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন... কিন্তু যেন তাঁদের দূরত্ব যতটা প্রথমে ছিল, ততটাই থেকে যাচ্ছে। কিছুতেই সেই দূরত্ব কমছে না! ... কখনো অনুগ্রাহী ডাকলেন, "ও শ্যামাবউ" ... আবার কখনো সইও ডাকলেন, "সই, সই" বলে, কিন্তু সেই সমস্ত কণ্ঠস্বর যেন কেউ শ্যামাবউয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করার আগেই অবলুপ্ত করে দিচ্ছে!

তবে কি কেউ শ্যামাবউকে বশ করে নিল! ... অনেক সময়ে ধরে এমন সমস্ত প্রচেষ্টার পরেও যখন কনো কিছু হলো না, তখন সই ও অনুগ্রাহী দেখলেন, শ্যামাবউ যেন দাঁড়িয়ে পরেছে একস্থানে। ... সই উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকলো, "সই, ওদিকে যেও

না... ও আমাদের গাঁ নয়..." । ... কিন্তু শ্যামাবউ যেন কিছুই শুনতে পেলো না! সম্মুখে একটি শীর্ণকায় নদী, পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করা যায়, তবে কোমর ডুবে যায় সেই জলে । ... পাশে সাঁকো রয়েছে নদী অতিক্রম করার জন্য, কিন্তু শ্যামাবউ যেন নিজের মধ্যেই নিজে নেই!

সে জল পেরিয়েই এগিয়ে চলল । সই ও অনুগ্রাহীর চেতনা হারায়নি। তাঁরা জল নয়, সাঁকো ধরেই নদী অতিক্রম করে শ্যামাবউকে ধরে ফেলবে, এমন মনে করে এগিয়ে যায়। ... কিন্তু সেই একই ভাব। অতি দ্রুত পদচারণ করেও যেন শ্যামাবউ পর্যন্ত তাঁরা পৌছাতেই পারে না। শ্যামাবউ এবার নদীরই ধারে একটি স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পরে। সই এগিয়ে যেতে নিজের চরণকে অগ্রসর করলেও, অনুগ্রাহী তাঁর হাত ধরে, সইকে আটকে দেন।

তাঁরা দুজনেই সামান্য দূরে স্থিত হয়ে দেখতে থাকেন। শ্যামাবউ একটি স্ত্রী একাকী বসে রয়েছেন, তার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। হ্যাঁ, সঙ্গীতের এক লয় ভেসে আসছে এবার। সেই স্ত্রীটিই নিজের খেয়ালে গাইছেন। বড় মধুরও সেই সঙ্গীতের ধুন। কিন্তু এই ধুনই কি শ্যামাবউ অত দূর থেকে শুনে আসছিল! কই এই ধুন তাঁরা তো শুনতে পাননি! ... শ্যামাবউ যেন সেই স্ত্রীকে পূর্ব থেকেই চেনেন। ... সে সরাসরি সেই স্ত্রীর বামপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে, প্রথমে হাঁটুগেরে বসলেন, আর তারপর সেই স্ত্রীরই ক্রোরে নিজের মস্তক রেখে তাঁকে এক অদ্ভুত আপনার জনের ন্যায় আলিঙ্গন করে স্থিত থাকলেন।

সেই স্ত্রী যেন সেই সমস্ত কিছুর কিছুই জানেন না। তিনি তাঁর সঙ্গীতে মত্ত । আর শ্যামাবউও যেন সমস্ত কিছু থেকে দূরে। ... তাঁর জগতে যেন কেবল তিনি আর সেই সঙ্গীত পরিবেশনকারী স্ত্রীই উপস্থিত, বাকি আর কারুর উপস্থিতিই নেই। অনুগ্রাহী ও সই, অদূর থেকেই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেই সঙ্গীতের ধুন চলতে থাকে, আর তারপর একসময়ে সেই ধুন স্তব্ধ হয়ে যায়। এবার সেই স্ত্রী শ্যামাবউয়ের উদ্দেশ্যে কিছু বলছেন। তিনি কি বলছেন, তা অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে, অনুগ্রাহী ও সই সামান্য নিকটে গেলেন শ্যামাবউ আর সেই স্ত্রীর।

কথোপকথনের ধারা অনুধাবন করে অনুগ্রাহী সইকে প্রশ্ন করলেন, "বউ কি এখানে মাঝে মাঝেই আসে!" ... সই উত্তরে বলল, "না দিদি, আমরা কেউ এইখানে আসি না। ... এই গ্রামের আর আমাদের গ্রামের মানুষের মধ্যে খুব রেষারেষি... দুই গ্রামের মরদরা সব সময়ে বিবাদে জরিয়ে থাকে"। ... অনুগ্রাহী বুঝলেন, কিছু দিব্য নয়তো আসুরিক ঘটনা ঘটছে এক্ষণে। তাই এবার নিস্তব্ধে শ্যামাবউ ও সেই স্ত্রীর কথা শুনতে থাকলেন।

সইয়ের কান সেই সকল কথার দিকে গেল না। তাঁর নজর সেই স্ত্রীর দিকে। এমন সুন্দরী স্ত্রী তিনি এর পূর্বে কনোদিনও দেখেন নি। যেমন দুধ-আলতা দেহের রঙ, তেমন সুন্দর মুখশ্রী। শরীরে স্বল্পই গহনা, কিন্তু যেইটুকু গহনা রয়েছে, তা যেন তাঁর রূপকে আরো অধিক সুন্দরী করে তুলেছে। মুখশ্রীও দেখলেন তাঁর চন্দ্রের আলোকে, যেন জগতের শ্রেষ্ঠ অঙ্কনশিল্পীর দ্বারা নিখুঁত ভাবে আঁকা। মুখের মধ্যে এক অদ্ভুত লাবণ্য যেন সমস্ত জীবকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করছে।

দেহগঠনও অত্যদ্ভুত সেই ললনার। যেন এক আকর্ষণীয় নারীর দেহভাব যেমনটা হওয়া উচিত, ঠিক ঠিক তেমনটা। এমন নারী, তাঁদের এই অঞ্চলে তিনি কোনদিনও দেখেন নি। এঁর রূপ তো এমন যে, পুরুষ তাঁর প্রতি আকর্ষিত হোক বা না হোক, সমস্ত স্ত্রীও তাঁর প্রতি আকর্ষিত হবেন। সেই রূপ দেখে বেখেয়ালে থাকা সইকে বেশ কিছুবার অনুগ্রাহী ডেকেও সাড়া না পেয়ে, তাঁর শরীর ধরে নাড়া দিতে, তিনি চমকে উঠে, একপ্রকার সাধারণ কণ্ঠস্বরেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ... কি কি!"

দেবী অনুগ্রাহী নিজের দক্ষিণকর দ্বারা সইয়ের মুখকে আটকে রেখে বললেন, "আসতে! ... আমরা এখানে আছি জানতে দেওয়া যাবে না। ... তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ সই, কি কথা বলছে ওরা!" ... সই যে তাঁদের কোন কথার দিকে কর্ণপাতই করে নি, সেই কথা বলার আগেই, অনুগ্রাহী বললেন, "শ্যামাবউ নিশ্চয়ই এই স্ত্রীকে আগে থেকে চিনতো... না হলে, এই ধরনের কথা কেন বলছে!" সেই কথা শুনে এবার সইও শ্যামাবউ ও সেই স্ত্রীর কথোপকথনে মনোযোগ দিল।

অনুগ্রাহী ও সই শ্যামাবউয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল । সে বলছে, "প্রিয়া, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে! ... আমার দুই নয়ন যে তোমাকেই খুঁজে বেড়িয়েছে! ... ও প্রিয়া, তুমি কিন্তু তোমার কণ্ঠসঙ্গীত দিয়েই আমাকে এমন ভাবে ডেকো। নাহলে অত দূর থেকে আমি তোমার আহ্বান শুনবো কেমন করে!" ... সেই দেবী একটি কথাও বললেন না, কেবলই তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরে গীত গাইতে থাকলেন। অনেক ক্ষণ এই ভাবে শ্যামাবউ আপন ভাবে অনেক কথা বলে চলার পর, সেই দেবী কনো উত্তর না দিলে, তিনি এবার বললেন, "কি গো প্রিয়া, কিছু বলছো না যে!"

সেই দেবী এবার সঙ্গীত থামিয়ে বললেন, "তোমায় দেখে কেবল সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমার ভাব ব্যক্ত করছিলাম। শব্দে এতো সামর্থ্য কোথায় যে তোমাকে শুনিয়ে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করবো!... তাই যে এই সুর। ... আর সাথে সাথে তোমার অপার সৌন্দর্য দেখছিলাম। ... কি হাল করেছ নিজের! ... সর্বক্ষণ খালি সেবা করে ফের... নিজের যত্ন নাওনা কেন!" ... সেই কথা শুনে আনন্দে আটখানা শ্যামাবউ হেসে বললেন, "কেন তুমি তো সইকে রেখেছ আমার কাছে, আমার দেখভাল করার জন্য । ... ও যেমন রাখে, আমি তেমন রয়েছি। ... ও তো আমার অনেক খেয়াল নেয়! তবে এমন কেন বলছো!"

সেই দেবী হেসে বললেন, "তাহলে কেশ বাঁধনি কেন? ... তুমি তো জানো, আমার সুগন্ধি পুষ্প খুব পছন্দের, তবে সুগন্ধি পুষ্প দিয়ে কেশ বন্ধন করো নি কেন?" ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "আচ্ছা বাবা, কাল করে আসবো, আর তোমার জন্যও সুগন্ধি পুষ্পের মালা করে আনবো, তোমার কেশকে সেই মালায় মুরে দেব। ... আসলে প্রিয়া, সর্বক্ষণ তোমার খেয়ালে ডুবে থাকতে থাকতে, কখন যে সময় কেটে যায়, জানতেও পারিনা। ... এই তুমি এসে গেছ, আর আমার কনো চিন্তা নেই। ... আমি এবার খুব সাজবো দেখো... যেমন যেমন সাজলে, তোমার মন ভালো থাকবে, তেমন তেমন সাজবো"।

সেই দেবী হেসে বললেন, "কিন্তু, লোকে অকথা, কুকথা বলবে তোমাকে... তার কি করবে!" ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "সেগুলোকে তোমারই প্রেম অনুভব করবো। প্রেমিকাকে প্রেমিক যেমন অকথা কুকথা বলে উত্তেজিত করে, তেমনই মনে করবো,

আর সেই সমস্ত কথায় লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবো। ... সমস্ত মুখ দিয়ে তুমিই তো কথা বলবে, তাই না... তাই সমস্ত কথা তো তোমারই। ... যত লোকে বলবে, তত জানবো, তুমি আমাকে তোমার প্রেমে বেশি বেশি করে উত্তেজিত করে তুলছো।... আর যত উত্তেজিত হবো, তত তোমার সাথে মিলনের জন্য আরো আরো ব্যাকুল হবো । ... এমন ব্যাকুল হবো যে নিজেকে নিজে ভুলেই যাবো"।

সেই দেবী এবার মিষ্ট হাস্যে বললেন, "আর যদি আমাকে নিয়ে কেউ অকথা কুকথা বলে!" ... শ্যামাবউ আবার লজ্জিত হয়ে বললেন, "তবে জানবো, তুমি নিজেই নিজের নিন্দা করে আমাকে বিব্রত করার চেষ্টা করছো। ... যত বেশি নিন্দা করবে তুমি তোমার, তত বেশি আকৃষ্ট হবো তোমার দিকে। ... ততই যে তোমার নিরহঙ্কার দেখতে পাবো, আর তত বেশি নিজেকে তোমার মধ্যে হারিয়ে দিতে ইচ্ছা জাগবে। ... মিলনানন্দে উন্মাদ হয়ে যাবো"। ... সেই দেবী বললেন, "আর যদি তোমার সই-ই তোমায় কিছু বলে!" ...

শ্যামাবউ এবার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে বললেন, "বড় গায়ে লাগবে সেই কথা। ... হ্যাঁ প্রিয়া, সেই কথা শুনে মনে হবে যেন তুমি আমাকে আলিঙ্গন করার জন্য ব্যাকুল। আমি কাছে আসছিনা বলে, তুমি এমন কথা বলে, আমাকে বারে বারে আলিঙ্গন করার জন্য আহ্বান করছো"। ... সুন্দরী দেবী বললেন, "আমার উপর রাগ হবে না!" ... শ্যামাবউ এবার দেবীর ক্রোরেই লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বললেন, "হবে তো, যখন মিলনের জন্য ব্যকুল হবো, আর তুমি আমাকে আহ্বান করবে না... তখন রাগ হবে না বুঝি! ... যখন কেউ আমাকে কনো কটুকথা বলে তোমার আহ্বানবার্তা দেবে না, তখন রাগ হবে না বুঝি! ... যখন সই কটুকথার মাধ্যমে আমাকে তোমার আলিঙ্গনের বার্তা দেবে না... হবে তো তখনও রাগ"।

এই সমস্ত কথা শুনে দেবী অনুগ্রাহী ধীর কণ্ঠে সইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "ও বুঝেছি, এর অর্থ শ্যামাবউয়ের মায়ের প্রতি নয়, এই স্ত্রীর প্রতি প্রেম ওর আকর্ষণ। ... আর এই প্রেমেই সে উলোমালা থাকে। ... এর কারণেই ওর পতি ওকে ত্যাগ দিয়ে চলে গেছে। ... আর এই স্ত্রীর মন মজানোর জন্যই ভক্ত সেবা করে। ... এবার সমস্ত কিছু পরিষ্কার হলো আমার কাছে। ... তাই ভাবি, আমার মায়ের এতো এতো ভক্ত দেখেছি, এমন ভাব তো কারুর মধ্যে দেখিনি!"

সেই কথা শুনে সইও ধীর কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু দিদি, আমি এই স্ত্রীকে এঁর আগে কখনো দেখিনি! আর আমার সইকেও এঁর কাছে আসতে কোনদিন দেখিনি। ... তবে!" দেবী অনুগ্রাহী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "তুমি এই সময়ে তোমার সইয়ের সাথে থাকো কনোদিন?" ... উত্তরে সই বললেন, "না তা থাকিনা, বৈকাল শেষ হলে, আমি আমার ঘরে গিয়ে কেশবন্ধন করি, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করি, তারপর নিশিকালে একবার সইকে দেখে গিয়ে নিদ্রা যাই। আসলে সইকে নিশিকালে একবার না দেখলে আমার নিদ্রা আসতে চায়না ... তাই"...

দেবী অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "আজ আমি এখানে আছি, তাই তুমি গৃহে যাওনি... আর তাই এই দৃশ্য দেখতে পেলে । ... কি তাই তো!" ... সই বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সই বললেন, "কিন্তু সেই সঙ্গীত! ... সেই সঙ্গীতের সুর! ... সেই সুর তো আমি আপনি

কেউ শুনতে পাইনি, তাইনা!" উত্তরে অনুগ্রাহী বললেন, "কেউ যখন একই সুর রোজ শোনে, তখন সে সেই আওয়াজ বহু দূর থেকে ভেসে এলেও শুনতে পায়, কারণ তার মন সেই আওয়াজ শোনার দিকেই পরে থাকে। ... সেই কারণেই তোমার সই সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। ... অন্য কিছুই নয়"।

একটু থেমে দেবী অনুগ্রাহী পুনরায় বললেন, "তোমার সই কনো ভক্ত যে নয়, তা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম। আর তাই বারে বারে প্রশ্ন করছিলাম। ওর ভাব কনো ভক্তের মত নয়ই। আমি মায়ের কাছে অনেক ভক্তদের আসতে দেখেছি । তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রেষ্ঠ ভক্তও। তাঁদের ভাবের সাথে শ্যামাবউয়ের ভাবের কনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই দ্বন্দ্বে ছিলাম । ... এখন বুঝে গেছি, ঈশ্বরভক্তির ভাব ওর ভণ্ডামি। আসলে ও এই স্ত্রীর প্রেমে উন্মত্ত। ... আর ও জানে যে এই স্ত্রীর প্রতি ওর ভাব যদি সকলে জেনে যায়, তবে ওকে দূর দূর করে তারিয়ে দেবে। ... তাই এই ভণ্ডামি করে ফেরে"।

সই যেন সমস্ত কথা শুনলো, কিন্তু সেই কথাগুলোকে মেনেও মানতে পারলো না। ... না না, তার সই ভণ্ড! ... হয়তো তাই। সাখ্যাত মাতা সর্বাম্বার কন্যা কথাগুলি বলছেন, তিনি কি করে ভুল হতে পারেন!... তাই বিচার করে তিনি এবার বললেন, "আচ্ছা দিদি, এবার আমাদের কি করণীয়!" ... দেবী অনুগ্রাহী উত্তরে বললেন, "প্রথমত, আমাদের একটু দূরত্ব রাখতে হবে শ্যামাবউয়ের থেকে। আর দূর থেকে সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে, সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে শ্যামাবউয়ের আসল চরিত্র দেখাতে হবে । ... একটা ভণ্ড কখনো পার পেতে পারেনা... কখনো না। ... তুমি কি বলো এই বিষয়ে?"

সই বললেন, "ঠিকই দিদি। একটা ভণ্ড যদি পার পেয়ে যায়, তবে তাকে দেখাদেখি হাজার হাজার ভণ্ড জন্ম নেবে, আর সেই প্রতিটি ভণ্ড আসল ভক্তদের সমাজে ভিত্তি নষ্ট করে দেবে। ... আমি কালই গাঁয়ের সকলকে নিয়ে এসে দেখাবো সইয়ের কীর্তি" । ... দেবী অনুগ্রাহী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না, এখনই নয়। ... আগে আমাদেরকে শ্যামাবউয়ের প্রতিটি চালের উপর নজর রাখতে হবে। ... কোন সময়ে দেখা করতে আসে, তাঁর প্রেমীর সাথে, সমস্ত কিছু দেখে জেনে, তারপর হাটে হাড়ি ভাঙতে হবে, যেন সে পালানোর কনো স্থান না পায়"।

সই যেন যোদ্ধা বেশে সেজে উঠে বললেন, "বেশ তাই হবে"। ... অন্যদিকে শ্যামাবউকে সেই দেবী বললেন, "আচ্ছা শ্যামা! তুমি যে আমাকে এতো প্রেম করো, তোমার মনে কনো কুণ্ঠা হয়না! ... তুমি যে আমার সাথে মিলনের ইচ্ছা রাখো, তোমার কনো কুণ্ঠা হয় না! ... যদি তোমাকে কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে হয়, আমাকে প্রেম করার কারণে, তবে!" ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "কলঙ্ক! ... কলঙ্কের কালি তো আমি মেখেই রয়েছি প্রিয়া! ... নিজের থেকে তোমাকে আলাদা করে, আমি যে আমার নিজের নেত্রেই কলঙ্কিত! ... সেই কলঙ্কের বোঝা যে বড়ই ভারি। ... সেই কলঙ্কের কাছে, সমাজের কলঙ্ক, সে আর কি এমন! ...

আর তুমিই তো বলো, সমস্ত সমাজ, ব্রহ্মাণ্ড, সব আমারই কল্পনায় আঁকা! ... কলঙ্ক যে আমার উপর বর্তাবে, সেও নিশ্চয়ই তোমারই এই প্রেমলীলার অঙ্গ। হয়তো, তোমার প্রেমকে সবার সম্মুখে স্থাপন করার জন্যই এই কলঙ্কের রচনা!" ... সুন্দরী দেবী বললেন,

''বেশ... এখন এসো তুমি শ্যামা । ... সকলে তোমার পথ দেখছে নিশ্চয়ই। ... সময়ের মধ্যে তুমি প্রত্যাবর্তন না করলে, সকলে চিন্তিত হয়ে পরবে। ... তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়তো, এখানেও এসে পরবে। ... যাও এখন তুমি'' ।

সেই কথায় শ্যামাবউয়ের দুই নয়ন ভরে এলো। তিনি বললেন, ''কিন্তু, তোমায় ছাড়া আমি কি করে থকবো! ... তোমায় ছাড়া আমি নিদ্রাই বা কি করে যাবো! ... আমার সমস্ত অস্তিত্ব যে তোমাকে ঘিরেই! ... তোমার অঙ্গের সুবাস যেন আমাকে বেষ্টন করে থাকে সর্বক্ষণ; তোমার মিষ্ট কণ্ঠস্বর যেন আমার কানকে সর্বক্ষণ ভরে রেখে দেয়; তোমার এই দিব্যরূপ যেন আমাকে সর্বদা প্রেমমিলনের আহ্বান জানায়। ... আমি কি করে থাকবো প্রিয়া! ... তোমার থেকে আর কতদিন আমাকে আলাদা রাখবে এই ভাবে?''

সুন্দরী স্ত্রী বললেন, ''মিলনের জন্যই তো তোমার কাছে আমি এসেছি। ... মিলন তো আমাদের হবেই... কিন্তু মিলনের আগে, মিলনের বাসনাতে ডুবে থাকতে ইচ্ছা করে যে শ্যামা । ... তোমার করেনা বুঝি!... তোমায় ছাড়া আমারও যে দিন কাটে না । ... কিন্তু মিলনের বাসনাতে ডুবে থাকার জন্য, তোমার রূপ, রস, গন্ধ, স্বরে, আমি সর্বদা ডুবে থাকি । ... সর্বক্ষণ তোমার রূপের স্মৃতি, তোমার দেহগন্ধের স্মৃতি, তোমার প্রেমরসের স্মৃতি আর তোমার প্রেমমিশ্রিত কণ্ঠস্বরকে স্মরণ করেই আমি যে জীবনযাপন করি প্রিয়তমা!... তুমিও তো তেমনই করো... তাই না!''

মনের অনিচ্ছাতেও, সুন্দরীর কথানুসারে শ্যামাবউ নিজের বেখায়ালেই একপ্রকার নৃত্যগীত করতে করতে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। দেবী অনুগ্রাহী ও সইও তাঁকে অনুসরণ করে গৃহে ফিরে এলেন । দেবী অনুগ্রাহী নিজেকে আড়ালে রেখে, সইকে আগিয়ে দিলেন, তাঁকে কি বলেন শ্যামসুন্দরী তা শোনার জন্য। ... সই সম্মুখে যেতেই, শ্যামাবউ তাঁর হস্তদুইখানি ধরে, ঘুরনতির মত ঘুরে নিজের আনন্দ ব্যক্ত করতে থাকলেন। কখনো নৃত্য, কখনো ছন্দ আবার কখনো শিশুর ন্যায় লম্ফ করে করে আনন্দ ব্যক্ত করতে থাকলেন তিনি।

সেই আনন্দের রেশ দেখে, একমুহূর্তে সইও বিগলিত হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সইকে এমন আনন্দ পেতে কনোদিনও দেখেন নি। ... তিনি হাস্যমুখে বললেন, ''কি হয়েছে সই! ... আজ যে তোমার আনন্দের কনো সীমা নেই । ... এতো আনন্দের কারণ কি?'' ... শ্যামাবউ উৎফুল্লতার সাথে বললেন, ''সই, আমার প্রেম আমাকে আমার থেকে নিয়ে যেতে এসেছেন। ... আমার যে এবার মিলনের সময় এগিয়ে আসছে। ... আমার এই আমি আর বেশিদিন নেই সই। ... এবার যে আবার আমি সেই আমার মুক্তভাবে চলে যাবো। ... আমার প্রেম আমাকে নিতে এসেছেন সই... হ্যাঁ সই, আমাকে নিতে এসেছেন তিনি''। ...

নিজের থেকেই আনন্দে উন্মাদবৎ হয়ে তিনি বললেন, ''জানিস সই, তিনিও আমাকে প্রচণ্ড প্রেম করেন। ... সত্য কি জানিস, আমার থেকে ঢের গুণ বেশি প্রেম করেন তিনি আমায়। ... না হলে দেখ না, তাঁর এতো কাজ। সমস্ত কিছু ছেড়ে তিনি এসেছেন! ... সই, আমার সাথে যাবি কাল!'' ... সই বললেন, ''যাবো! ... কো...কো... কোথায়! কোথায় যাবো?'' ... শ্যামাবউ আনন্দের সাথে নৃত্য করতে করতেই বললেন, ''তাঁর সাথে তোর আলাপ করাবো। ... যাবিনা! ... তোর সইয়ের প্রাণ এসেছেন রে'' ।

সই চিন্তিত ও কুণ্ঠিত বেশে বললেন, "না না... আমি কেন যাবো!" ... শ্যামাবউ নাছোড়বান্দার মত করে বললেন, "তা বললে কেমন করে হবে! ... আমার সই, আমার প্রাণের সাথে দেখা করবে না! ... চল না কাল আমার সাথে, তুই আমার কত যত্ন নিস, তোর তো অধিকার রয়েছে, তাঁর সাথে আলাপ করার। ... না তোকে যেতেই হবে কাল আমার সাথে"। ... সই যেন চিন্তায় পরে গেলেন। ঘুরন্তির ন্যায় শ্যামাবউয়ের হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর নেত্র যায় অনুগ্রাহীর দিকে। দেবী অনুগ্রাহী তাঁকে চোখের ইশারায় সম্মতি জানাতে বললে, সই এবার হেসে বললেন, "বেশ যাবো... কাল যাবো" ...

শ্যামাবউয়ের যেন আনন্দের শেষ নেই । শিশুর মত কখনো এখানে কখনো সেখানে সে ঘুরে বেড়ায়। ... সই বললেন, "সই, রাত্রি হয়েছে, আমাকে আমার গৃহে একবার যেতে হবে। ... আমার পিতামাতার জন্য ফলমূল সমস্ত প্রস্তুত করে আসতে হবে"। ... শ্যামাবউয়ের যেন সময়ের কনো হিসাবই নেই। তিনি বললেন, "ও রাত হয়েছে না! ... আচ্ছা, তুই করে আয় সই। ... রাত্রে আসিস কিন্তু"। ... সই চলে গেলে, সেই কক্ষে অনুগ্রাহী প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেও আনন্দের সীমা নেই শ্যামাবউয়ের। সেই দেখে অনুগ্রাহী বললেন, "আজ যেন খুব আনন্দে রয়েছ বউ!"

শ্যামাবউ আনন্দের সাথে বললেন, "হ্যাঁ গো দিদি, আজ আমি সব থেকে সুখী ব্যক্তি। ... আজ আমার প্রেম আমাকে মিলনের বার্তা দিয়েছে যে! ... আমার প্রেম আমার সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। ... আমার থেকে সুখী ব্যক্তি আর একটিও নেই আজ"। ... অনুগ্রাহী কিছুটা নাটকীয় কণ্ঠস্বরে বললেন, "প্রেম মানে প্রেমিকা তোমার!" ... শ্যামাবউ হেসে বললেন, "ওই হলো প্রেমিক, প্রেমিকা, যাই বলো না কেন! তাঁর কি কনো লিঙ্গ হয় নাকি!" ... অনুগ্রাহী বললেন, "কিন্তু এ কেমন কথা! ... এক স্ত্রী হয়ে, অন্য স্ত্রীর প্রতি প্রেম! ... একে কি সমাজ স্বীকার করবে!"

শ্যামাবউ এবার মিষ্ট হেসে বললেন, "দিদি, আপনি তো সাখ্যাত জগন্মাতার সহোদরা । আপনি তো পরম জ্ঞানী। ... আপনি তো ভালো করেই জানেন, লিঙ্গভেদ কেবলই যৌনমিলনের প্রতিবন্ধক। প্রকৃতি সমস্ত কর্মের ফল নির্ধারণ করে রাখে। আর একমাত্র পুরুষ ও স্ত্রীর যৌনমিলনকেই প্রকৃতি সন্তানরূপ ফল প্রদান করেন। তাই যৌনমিলনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্ত্রীপুরুষের মিলনই প্রাকৃতিক, এবং এর অন্যথা হলো অপ্রাকৃতিক এবং অধর্ম। ... কিন্তু দিদি, আপনি তো পরমজ্ঞানী । আপনি তো জানেনেই প্রেম ও যৌনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিভাষা। ...

যেখানে প্রেম, সেখানে যৌনতা কনো প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম নয়, কারণ প্রেম যে পঞ্চভূতের ইয়ত্তারও অতীতের ভাব । প্রেম যে সমস্ত চাওয়াপাওয়ার ঊর্ধ্বে স্থিত, তাই না! ... যৌনতা যেখানে সন্তানলাভের উদ্দেশ্যেই স্থিত, সেখানে প্রেম কেবল নিজকে বিলীন করে দেবার উদ্দেশ্যেই স্থিত। ... আর যেখানে যৌনতা নেই, সেখানে লিঙ্গভেদ কেন দিদি!... সত্য অর্থে কেবলই শূন্য সত্য, আর শূন্যের তো কনো লিঙ্গই সম্ভব নয়। ... বাকি এই প্রকৃতি, যা আমাদেরই চেতনাত্যাগের ফলে কল্পনা মাত্র, তাতে স্ত্রীপুরুষ তো

আমরাই রেখেছি, যাতে আমাদের কল্পনা প্রসারিত হতে থাকে, সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে। ... তবে প্রেমের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ ভেদ কেন দিদি!"

দেবী অনুগ্রাহীর সেই কথা শুনে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মায়। তাঁর মনে হয়, এক তো ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে, তার উপর আবার জ্ঞানের কথা! ... না যদিও মন একটু হাল্কা হচ্ছিল; মনে হচ্ছিল সকলের সম্মুখে তোর ভণ্ডামো কে না এনে, তোকে বুঝিয়ে সরিয়ে আনবো; এবার তো তোকে সকলের সম্মুখে কলঙ্কিত করতেই হবে। তোকেও কলঙ্কিত করবো, আর তোর প্রেমিকাকেও। ... তোর কলঙ্ক স্ত্রীকে প্রেম করার জন্য আর ভণ্ডামি করার জন্য, এই দুই কারণেই হবে; আর সেই স্ত্রীর কলঙ্ক হবে এক স্ত্রীকে প্রেমবার্তা দেবার কারণে। ... এবার দেখ তুই, এই সর্বাম্বাকন্যা কি করে।

মনে মনে এতো কথা চললেও, বাইরে কনো প্রকাশ না করে, মিষ্ট হেসে আহারের ব্যবস্থার দিকে মন দিলেন দেবী অনুগ্রাহী। শ্যামাবউয়ের আহারে কনো মন নেই, তাও দেখলেন দেবী অনুগ্রাহী । কিন্তু তিনি আর কনো কথাই বললেন না। মনে মনে স্থির করলেন, এবার তোর উপর নজর রাখবো, আর ওই স্ত্রীর উপরেও। না, সইকে তুই নিজেই নিয়ে যাবি, তাই সইকেই বলি, তোর উপর নজর রাখতে, আর আমি বরং একবার ওই স্ত্রীর ঘরে যাই। দেখি, যদি শ্যামাবউকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানো যায়, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে নেওয়া ঠিক হবে।

বিড়ম্বনা অধ্যায়

সেই সমস্ত বিচার করে দেবী অনুগ্রাহী বললেন, "বউ, আমি আগামীকাল প্রভাতে মায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। ... আবার পরে দেখা হবে, কেমন। ... আসলে, তোমার এখন ভক্ত সেবায় মনও নেই তাই..." । শ্যামাবউ বললেন, "ছি ছি দিদি, ভক্ত সেবায় কেন মন থাকবে না! ... আমার প্রেমীর যে প্রাণ এই ভক্ত সকল। তাঁদের সেবা না করলে যে আমার প্রেমীকেই ব্যাথা দেওয়া হবে। ... এমন বলো না... যতই মিলন আহ্বান আসুক না কেন, ভক্তের সেবা আমি করেই যাব। ... তবে হ্যাঁ, তোমার মা, সাখ্যাত জগন্মাতার কাছে তুমি যাবে, সেখানে তোমায় কি করে আটকাই! ... রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে পর দিদি। অনেক পথ অতিক্রম করবে, আহার নিদ্রার কনো ঠিক থাকবে না। ... তাড়াতাড়ি শুয়ে পর"।

দেবী অনুগ্রাহী তাড়াতাড়ি শুয়ে পরার ভান করে দেখতে থাকলেন শ্যামাবউ কি কি করেন। ... তিনি দেখলেন, শ্যামাবউ বারে বারে বাগানের দিকে যান, কিছু সুগন্ধি পুষ্প কুরিয়ে আনেন, আর সেই পুষ্প দিয়ে তিনি নিজেকে সাজান, আর বড় জলাধারের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেন। এই দেখতে দেখতে একসময়ে দেবী অনুগ্রাহী নিদ্রা যান। প্রভাত ঠিক করে হবার পূর্বে তিনি উঠে পরেন, কিন্তু শ্যামবউ তখনও নেই গৃহকক্ষে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চলে এলেন। তিনি এসে বললেন, "দিদি, তুমি উঠে পরেছ, এই নাও, কিছু ফল একটি ঝোলায় দিয়ে রাখলাম। ...

অধিক খাদ্য নিলে, পথ চলতে বেশি ক্লান্তি হবে, তাই অল্পই ফল দিয়েছি । পথে আবার কখন আহার পাবে, তাই এইটুকু ফল নিয়ে যেও দিদি" । ... অনুগ্রাহী বললেন, "আর মাকে তোমার কি বার্তা দেব বউ?" ... শ্যামাবউ সেই কথা শুনে হেসে বললেন, "বার্তা!" ... আবার খানিক হেসে বললেন, "তিনি তো সমস্ত কিছুই জানেন। ... তাও যখন তুমি বলছো দিদি, তবে তাঁকে বলো, এইখানে তাঁর এক প্রিয়া থাকে, যে তাঁর আদেশ লাভ করার অপেক্ষায় বসে আছে। ... তিনি সেটিও জানেন, তবুও তোমার মনের ইচ্ছা যে তুমি আমার কনো বার্তা তাঁকে দেবে, তোমায় নিরাশ করবো না" ।

ভোর ভোর বেড়িয়ে পরলেন অনুগ্রাহী, কিন্তু প্রথম তিনি গেলেন সইয়ের কাছে। সই প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রা যাবার পূর্বে শ্যামাবউয়ের কাছে আসেন, কিন্তু পূর্বের দিন তিনি আসেন নি। কিন্তু শ্যামাবউও এমনই ভাবে নিজের শৃঙ্গারচিন্তায় মত্ত, যে তাঁর সইয়ের আগমন ঘটেনি, সেই দিকে কনো দৃষ্টিই নেই। ... সইয়ের দ্বারে দেবী অনুগ্রাহী যেতে, সই তাঁকে গৃহে প্রবেশ করিয়ে সেবা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনুগ্রাহী বললেন, "ব্যস্ত হয়ওনা সই। ... আমি তেমন দূরে যাচ্ছিনা। আমি ওই সুন্দরী স্ত্রীর কাছে যাচ্ছি। মাতা সর্বাম্বার কন্যা, তাই যে কেউ আমাকে থাকতে দেবে। ...

দেখি, প্রয়াস করে, যদি তোমার সইকে কলঙ্কের থেকে মুক্ত করতে পারি । ... তুমিও এইদিক থেকে তোমার সইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ। ... আমি ওইদিক থেকে ওই স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কারুকে বদনাম করার আগে, একবার তো তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত, তাই না!" ... সই সেই কথা শুনে খুব আনন্দ পেলেন, হাজার হোক, তাঁর ছোটবয়সের সই। ... তাঁর বদনাম হবে, সেটা যেন তিনি মন থেকে মেনেনিতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু ভণ্ডামি করলে যে শাস্তি পেতেই হবে । ... তবে দেবী অনুগ্রাহী যেই চেষ্টার কথা বললেন, তা হলে খুব ভালো হয়। তবে সই কলঙ্কের হাত থেকে বেঁচে যায়।

দেবী অনুগ্রাহী এবার পাশের গ্রামে, সেই স্ত্রীর ঘরের সন্ধান করতে চলে যান। অন্যদিকে সই সর্বক্ষণ শ্যামার কাছে কাছে থেকে তাঁর উপর নজর রাখেন। শ্যামার যেন অদ্ভুত ভাব। কখনো সে নিজের শৃঙ্গার করতেই ব্যস্ত। এই পুষ্প দিয়ে নিজেকে পুর সাজিয়ে নিলেন, আবার পরের মুহূর্তে যেন প্রেমীর সাথে দেখা হচ্ছে না, সেই বিরহে কাতর। মাঝে মধ্যেই সইকে বলে ওঠেন, "কখন সন্ধ্যা হবে বলতো সই! ... শৃঙ্গার প্রস্তুত, সমস্ত কিছু প্রস্তুত, কিন্তু সন্ধ্যা আর যেন হচ্ছেই না!"

সই কেবল অন্তরে বিরক্তি নিয়ে এক হাস্য প্রদান করেন, উদ্দেশ্য তাঁর কেবল শ্যামার উপর নজর রাখা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সমস্ত দ্বিপ্রহর ধরে শ্যামা কেবল স্নানের জলই প্রস্তুত করে গেল। তাতে নিমপাতার নির্যাশ, বেলপাতার নির্যাশ যেমন দেয়, তেমন দিয়েছে, তার সাথে সাথে তাতে কখনো গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়, তো কখনো রজনীগন্ধার পাপড়ি, বেল ফুলের পাপড়ি, এই সমস্ত ছড়াতে থাকে। কেমন যেন নিজেকে নিয়ে নিজে উলোমালা আজ শ্যামা। শ্যামার এমন নিজের যত্ন নিতে কখনো দেখেনি তো সই!

সন্ধ্যা হতে, জুঁইয়ের ফুল, শিউলির ফুল, স্বর্ণচাপা ফুল আর হাসনাহেনা ফুল ফুটতেই, এমন ভাবে শ্যামা ব্যস্ত হয়ে পরলো যেন এই সময়েরই অপেক্ষা করছিল সে। দ্বিপ্রহরে সামান্য কিছু ফল গ্রহণ করেছে, একটু দুধও গ্রহণ করেনি । আজ তাঁর গোধন, পবিত্রার দুগ্ধ

নিষ্কাসনও করেনি সে। পবিত্রা শ্যামার পরম সখী। কম খেয়াল রাখেনা সে শ্যামার। আজ শ্যামা তাঁর দুগ্ধ নিষ্কাসন করেনি, তাই গৃহের দ্বারের সামনেই এসে সে বসে পরেছে। শ্যামার মনেও নেই যে সে দুগ্ধ নিষ্কাসন করেনি । ... বেশ কিছুক্ষণ পবিত্রাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিত্রা! কি হয়েছে বোন তোর! ... কি হয়েছে বাবা!"

পবিত্রা কেবলই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দেখে, শ্যামা তাঁর কাছে যেতে, সে নিজের মাথা শ্যামার শরীরে ঘসতে থাকে, শ্যামা খানিকক্ষণ তাঁকে আদর করতে করতে, তাঁর হুঁশ হয়, আজ তো তিনি দুগ্ধ নিষ্কাসনও করেন নি, পানও করেননি। ... তাই শ্যামা, এবার পবিত্রার দুগ্ধ নিষ্কাসন করলেন, আর সামান্যই পান করে, বাকি সমস্তটা একটি মাটির পাত্রে এমন করে রাখলেন, যেন তা তিনি কোথাও নিয়ে যাবেন। অন্যদিকে, সমস্ত ফুল নিয়ে এসে, হাসনাহেনা, জুঁই, শিউলি, সমস্ত ফুল দিয়ে দুটি মালা গাঁথলেন, আর বাকি সমস্ত পুষ্প নিজের স্নানের জলে মিশিয়ে স্নান করতে গেলেন।

সইও নিজের ঘর থেকে শ্যামার সাথে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। এঁরই মধ্যে দেখলেন, শ্যামা কেমন যেন এক হন্তদন্ত হয়ে স্নানের স্থান থেকে অর্ধবস্ত্র পরিধান করে বেড়িয়ে পরলেন। কি যেন এক অদ্ভুত তারা তাঁর মধ্যে কাজ করছে। যেমন তেমন করে, যেই শাড়ীটি বার করে রেখেছিলেন, সেই ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ীখানা শরীরে চাপিয়ে নিলেন । স্নান করার পরে শরীরে লেগে থাকা বারিকণাও তিনি মোছেন নি। ... সেই স্নানের জলকণা আর সেই শাড়ীর অগোছালো ভাবে ধারণ করা, সব মিলিয়ে শ্যামাকে আজ যেন অদ্ভুত সুন্দরী লাগছিল সইয়ের। ... পুষ্পের জলে স্নান করেছে সে, তাই অঙ্গ থেকে অদ্ভুত সুন্দর সুবাসও আসছিল। ...

সেই অবস্থাতেই, তাড়াতাড়ি করে শ্যামা সইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, "সই, এই দুগ্ধের পাত্রটি নিয়ে তাড়াতাড়ি আয় আমার সাথে। ... তিনি ডাকছেন। ... এই বলে, দুইটি পুষ্পের মালা হাতে নিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকলেন। ... পথে ছুটতে ছুটতেই নিজের কেশে একটি পুষ্পমালা লাগালেন। ... আর দ্বিতীয়টি হাতে নিয়ে ছুটতে থাকলেন। সই, ধীরে সুস্থে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে গেলেন, যেই স্থানে পূর্বের দিন শ্যামা তাঁর প্রেমিকার সাথে দেখা করেছিলেন। শ্যামা সেখানে পোঁছে, ছুটে যাবার কারণে হাঁপাতে থাকলেন।

অঙ্গে তাঁর ঘর্মের বারি, স্নানের পরে শরীরে লেগে থাকা বারি সমস্ত চন্দ্রের আলোকে চিকচিক করতে থাকলে, দেবী অনুগ্রাহী, যিনি ঈষৎ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিও আজ শ্যামাকে দেখে চমকিত হলেন । মনে মনে ভাবলেন, সেজেগুঁজে থাকেনা, তাই অমন লাগে। আজ যেন তাঁকে কনো দেবী মনে হচ্ছে । ... শ্যামা নরম অথচ এক বিদ্বেষী কণ্ঠস্বরে বললেন, "প্রিয়া, তুমি এমন করে ডাকো কেন বলো তো! ... আমি তো স্নানটা সেরেই আসতাম। ... আমার প্রেমের কাছে আসবো, তা স্নান না করে আসা যায়! ...

দেখ প্রিয়া, আজ কত পুষ্প দিয়ে স্নান করেছি। ... তুমি বলেছিলে, মাথায় পুষ্পের মালাও পরেছি... আর এই দেখ তোমার জন্যও এনেছি। ... (প্রেমের অভিমান দেখিয়ে) ভেবেছিলাম, মাথায় বেণি করে মালা দিয়ে আসবো। ... তা এমন ভাবে তুমি ডাকলে! ... দেখ না, স্নানের পর শরীরের জলটাও মুছতে পারিনি!" ... সুন্দরী স্ত্রী বললেন, "শ্যামা, স্নানের পর তোমার শরীরের মাটির মত

রঙকে দেখবো বলেই তো, তোমাকে এই ভাবে ডাকলাম। শৃঙ্গারের ইচ্ছা, অথচ শৃঙ্গারের অবকাশ না পেয়ে তোমাকে যেমন সুন্দর দেখতে লাগবে, সেই রূপ দেখার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই তো ..."

শ্যামা সেই কথায় লজ্জা পেয়ে গেলে, সুন্দরী স্ত্রী শ্যামার নিকটে গিয়ে, লজ্জায় নিম্নগামী অপরূপা সুন্দরী মুখখানা নিজের হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, "লাজ লাগলো বুঝি!" ... শ্যামা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথা নিচু করে, বক্র লাজুক দৃষ্টি রেখে বললেন, "লজ্জা দিয়ে মন ভরেনি বুঝি, আবার লজ্জা পেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করে আরো লজ্জা দিচ্ছ! ... সুন্দরী তো তুমি... আর আমাকে সুন্দর বলছো তুমি হ্যাঁ! ... রসিকতা করছো না!" ... সুন্দরী বললেন, "রসিকতা তো একটু করছি, কিন্তু তোমার রূপ নিয়ে বিন্দুমাত্রও রসিকতা করছি না। ... তোমার রূপের জন্য তো আমি পাগল!"

শ্যামা আবার লজ্জার বশে বললেন, "মিছে কথা... কত কত রয়েছে তোমার, আর এই আমার রূপে নাকি তুমি পাগল!" ... সুন্দরী হেসে বললেন, "প্রিয়তমা! যাচক তো সত্যই আমার প্রচুর, কিন্তু প্রেমিকা যে তুমি একাই শ্যামা! ... রাজার দরবারে কতই না সুন্দরী যাচক আসেন, কিন্তু তাঁর প্রেমিকার, তাঁর রানীর থেকে অধিক রূপবতী কারুকে চোখে লাগে রাজার!" ... খানিক থেমে, সুন্দরী আবার বললেন, "আচ্ছা শ্যামা, তুমি যে বড় খালিহাতে চলে এলে! ... জানো আমি সারাদিন না খেয়ে রয়েছি! তুমি কখন আসবে, আমায় নিজে হাতে খাওয়াবে, তার অপেক্ষায় দিন কাটালাম। ... আর তুমি কিনা! ...

আসলে, খুব খিদে লেগেছিল, তাই তো তোমাকে এমন ভাবে ডাকলাম। ... কিন্তু তুমি তো খালি হাতেই এলে!" ... শ্যামা এবার লজ্জা ত্যাগ করে মুখ উঠিয়ে বললেন, "এ মা, না না ... আমি এনেছি তো... আরে সত্যি তো, সই! ... সই কোথায় গেলি!" ... দেবী অনুগ্রাহীর সাথে একত্রে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সই সুন্দরী ও শ্যামার লীলা দেখছিল। এবার সে আড়াল থেকে বেড়িয়ে এলো, হাতে তার দুধের বাটি। ... শ্যামা বললেন, "সই কোথায় চলে গেছিলি তুই!" ... সই একটু ইতস্তত করে বললেন, "তুই যেই ভাবে ছুটলি সই, সেই ভাবে ছুটলে তো এই হাতের দুধের বাটিতে একফোটা দুধ আর অবশিষ্ট থাকতো না... তাই"।

শ্যামা হেসে বললেন, "বেশ করেছিস সই... এই কারণেই তো তুই আমার সই! ... দেখলে প্রিয়া, কত খেয়াল রাখে সই আমার! ... এবার তুমিই বলো, আমার আর নিজের খেয়াল রাখার কিই বা প্রয়োজন আছে!" ... সুন্দরী বললেন, "কিন্তু আজ যে বড় খেয়াল রেখেছ নিজের!" ... শ্যামা লজ্জা পেয়ে বললেন, "সে তো তোমার কাছে আসবো বলে... এই নাও, এই দুধটুকু খাও তো।... খালি পেটে বেশিক্ষণ থাকা ভালো না... আর শোনো কাল থেকে বেশি করে খাবার নিয়ে আসবো। ... নিজের হাতে মিষ্টি করে, বা যা তুমি খেতে চাইবে, তাই করে নিয়ে আসবো। ... আজকে এই দুধটুকু এনেছি, লক্ষ্মী মেয়ের মত তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো"।

সুন্দরী বললেন, "দুধ! ... না না, দুধ খাবো না... অন্য কিছু খেয়ে নেব পরে"। ... শ্যামার এক নতুন রূপ দেখল সবাই এবার। সেই লজ্জাবতী শ্যামা এবার যেন শাসনকর্ত্রী হয়ে উঠেছেন। তিনি এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "পরে যা খাবে খাবে, এখন এই দুধটুকু খেয়ে নাও। ... নাহলে কিন্তু আমি এখনই চলে যাবো এখান থেকে" । ... সেই শাসনে সুন্দরী ছোট বাচ্চার মত বলে উঠলেন, "আচ্ছা,

আচ্ছা... খাচ্ছি... তুমি খাইয়ে দাও... না হলে খাবো না" । ... শ্যামা এবার মনের আনন্দে সুন্দরীকে ছোট বাচ্চাকে যেমন মাথার পিছনে হাত রেখে দুধ খাইয়ে দেয় মা, তেমন করে দুধটুকু খাইয়ে দিয়ে, নিজের আচল দিয়ে মুখ পুঁছিয়ে দিলেন সুন্দরীর ।

সুন্দরী হেসে বললেন, "এমন শাসন, এমন প্রেম আর কোথায় পাব প্রিয়া! ... সকলেই তো আমার যাচক। ... সকলেই আমার থেকে কেবল চেয়ে যায়, আমাকে কেউ কিছু দিতে এলেও, তার পেছনেও থাকে যাচনার লালসা । ... কিন্তু এই মন থেকে, প্রাণ থেকে শাসন দেখিয়ে আহার করানোর কেই বা আছে প্রিয়তমা! ... জানো শ্যামা, আমি তাই বারে বারে ছুটে আসি তোমার কাছে। ... দেখ না, সেই কতদূর থেকে চলে এসেছি, বাবার হাত ধরে, ... সে তো শুধু তোমার জন্যই, তাই না!"

শ্যামা আবার তাঁর দুষ্টস্বভাবে ফিরে গেছেন। তিনি বললেন, "দূর থেকে! ... কেন! দূর কেন! ... এই তো এখান থেকে এখানে । তোমার আবার আসতে সময় লাগে না কি!... খালি বাহানা... আমি তো তোমাকে ডাকিও নি! ... মনে মনেই..." । ... সুন্দরী বললেন, "মনে মনে কি! ... মনে মনে তো আমার জন্য সেই হাপিত্যেশ করে বসেছিলে প্রিয়া! ... ডাকোনি ঠিকই... সেটা কি জন্য! অভিমানে নয় তো!" ... শ্যামা এবার কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "না না! ... ছি ছি... অভিমান কেন! ... আসলে আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যেদিন যোগ্য হয়ে উঠবো, সেদিন তুমি ঠিকই আসবে। ... মিছি মিছি আগেভাগে তোমায় ডাকাডাকি করে তোমার উপর জোর খাটিয়ে, তোমায় বিব্রত করা কেন!"

সুন্দরী হেসে বললেন, "এই কারণেই তো বললাম প্রিয়া, যাচক আমার প্রচুর, প্রেমিক আমার তুমিই । প্রেমিক বলেই তো এই বিশ্বাস তোমার যে তুমি যোগ্য হলে, আমি নিশ্চয়ই আসবো, আর যতক্ষণ না আসছি, ততক্ষণ এই কারণেই আসছিনা যে তুমি যোগ্য হওনি । ... তা যাই হোক, তোমার সইয়ের সাথে আমার আলাপ করাবেনা বুঝি!... এই তোমার সই!" ... সই নিজের মধ্যেই নিজে ছিলেন না । মনে এক প্রকার ভেবে আসেন, কিন্তু যখনই এই সুন্দরীর সামনাসামনি হন, অমনি যেন তাঁর সৌন্দর্যের জালে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। ... তিনি এক প্রকার অপ্রস্তুত হয়েই বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ওর সই। ... সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমি ওর ছায়া হয়ে থাকি" । ...

সুন্দরী এবার হেসে বললেন, "এতদিনের সঙ্গী, তা সেই ছায়া আজ কায়ার পিছনে না থেকে সামনে যেতে চাইছে কেন! ... ছায়া বোধ হয় আলোকের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, তাই না! ... পশ্চাতে ফেলে রেখে আলোকের ছটায় কায়ার সম্মুখে ছায়া চলে যেতে চাইছে। ... তাই না!" ... সই যেন একপ্রকার ভয়ঙ্কর ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পরলেন সেই কথা শুনে। ... দেবী অনুগ্রাহী, যিনিও দূর থেকে সেই কথা শুনছিলেন, তিনিও হতবাক হয়ে গেলেন এই কথা শুনে । মনে মনে তিনি বললেন, "এর মানে শ্যামা সমস্তই জানে, আমরা কি করছি! ... আর সে দিনের বেলাতেও সুন্দরীর সাথে দেখা করে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে! ...

হুমম... যত ভাবছি শ্যামাবউকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবো, যেন সে নিজেই সেই কলঙ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । ... হয়তো কলঙ্কিত হবে, সেটাই ওর নিয়তি। ... ভণ্ডামির শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে" । ... শ্যামা, সুন্দরীর কথার প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, "না না প্রিয়া, ও আমার পরম সখী। সব সময়ে ও আমার কত যত্ন করে, ও ছাড়া আমি তো একপ্রকার অন্ধই। ... ও আমার সব সময়ের সাথী। ... শিশুকালে, পিতামাতার থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবার পরেও সে আমার খেলার সাথী, আবার বয়সকালে আমার পতি যখন আমায় ছেড়ে গেছিলেন, সেই দুঃসময়েরও সাথী। আবার এখন যখন আমার প্রেম আমার সম্মুখে, তখনও আমার সাথী"।

এবার সই বললেন, "সই, এবার আমাদের ফেরা উচিত। রাত হয়েছে অনেক। এবার যদি না ফিরি তবে বাপমা আমার সন্ধান করতে করতে সকলকে বলে ফিরবেন, আমি হারিয়ে গেছি । ... চলো, এবার ফেরা যাক"। ... শ্যামার যেন ফেরার কনো ইচ্ছা নেই। আর সেই সুন্দরীরও যেন শ্যামাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবেই, তাঁর চোখ ছলছল করে উঠলো। ... শ্যামা কান্নার সুরে বলে উঠলেন, "প্রিয়া, কবে বলতে পারো, কবে তোমাকে ছেড়ে এই ভাবে আর চলে যেতে হবেনা আমায়। ... কবে তোমার সাথে এমন অল্প সময়ের জন্য নয়, চিরতরে মিশে যাবো! ... বলো না প্রিয়া! ... বলো না"।

সুন্দরী নিজের নেত্রের বারি ধারণ করে বললেন, "খুব শীঘ্রই প্রিয়া, খুব শীঘ্রই। ... আমিও সেই ক্ষণের জন্য ব্যকুল হয়ে আছি। ... আমিও সেই ক্ষণের জন্য উদ্গ্রিব হয়ে আছি"। ... সই একপ্রকার শ্যামাকে টানতে টানতেই নিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্যামা সুন্দরীর দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে, নিজের নেত্রের বারি বিসর্জন দিতে দিতে বলতে থাকলেন, "আমি জানি প্রিয়া সেই ক্ষণকে তুমি সঠিক ক্ষণেই আটকে রেখেছ। ... আমি অপেক্ষা করছি, সেই ক্ষণের। ... কাল আবার আসবো... সঙ্গে ভালো মন্দ আহার নিয়ে আসবো"।

শ্যামা চলে গেলেন, সুন্দরী নিজের নেত্রের অশ্রু মুছতে মুছতে নিজের গৃহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় দেবী অনুগ্রাহী তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালেন । অনুগ্রাহী সুন্দরী দেবীমূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে, বেশ কিছুক্ষণ তাঁর অপরিসীম রূপ দর্শন করে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "কেন ওই নিরীহ মেয়েটাকে ভ্রষ্ট করছেন আপনি!... কি ক্ষতি করেছে ও আপনার?" সুন্দরী দেবী বললেন, "কি বলছো কি বাছা! ... সে আমাকে অপরিসীম প্রেম করে। তার প্রেমের মধ্যে কনো কলুষ নেই"।

অনুগ্রাহী বললেন, "কথা বলার আগে আমাকে এটা বলে দিন যে, কি নামে আপনাকে অভিবাদন করবো"। ... সুন্দরী হেসে বললেন, "শ্যামা আমাকে প্রিয়া বলেই ডাকে... আর আমার পিতা আমাকে সর্ব্বা বলে ডাকেন। ... এছাড়া আমার গাঁয়ে অনেকে অনেক নামে ডাকতো... তা তুমি ভাই আমাকে সর্ব্বা বলেই ডাকতে পারো" । ... অনুগ্রাহী এবার নিজের চোয়াল শক্ত করে নিয়ে বললেন, "দেখ, শ্যামা একজন সরলমনা স্ত্রী । স্বভাব চরিত্রও ওর খারাপ নয়, মিষ্ট স্বভাবের এবং পরোপকারীও। ... তা তুমি ওর এতো বড় সর্বনাশ করছো কেন! ... তোমার কারণে ওর পতি ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ... আর আজ ওকে দিয়ে তুমি সেই অন্যায় করাচ্ছ, যার কনো ক্ষমা নেই"।

সর্ব্বা হাস্যময় মুখেই ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, "হ্যাঁ এটা তো ঠিকই যে আমার প্রতি প্রেমের কারণেই ওর স্বামী ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ... কিন্তু সেইক্ষেত্রে ওর কিই বা করার আছে? ও তো ওর স্বামীর কনো প্রকার অযত্ন করে নি। ... কিন্তু ওর স্বামীর ঈর্ষা হয়ে যায়। ... কেন তার পত্নী তাঁকে সেই পরিমাণ প্রেম করে না! ... হ্যাঁ, তো ভাই তোমার নাম কি!" ... অনুগ্রাহী বললেন, "অনুগ্রাহী আমার মাতার দেওয়া নাম"। ... সর্ব্বা বললেন, "ও তার মানে তুমি মাতা সর্বাম্বার কন্যা! ... (ঈষৎ হেসে) ... তাহলে তুমি নিশ্চয়ই প্রেম সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই জানো। ... তারপরেও এই সমস্ত প্রশ্ন আমাকে কেন করছো অনুগ্রাহী!"

এবার অনুগ্রাহী ঈষৎ ক্রোধ প্রদর্শন করে বললেন, "স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রেম, এ কি করে সম্ভব! ... এতো অধর্ম!" ... সর্ব্বা হেসে বললেন, "রাম হনুমানের প্রেম সম্ভব, কৃষ্ণ সুধামার প্রেম সম্ভব, আর আমার শ্যামার প্রেমেই তোমার আপত্তি!... শোনো মাতার কন্যা, শ্যামা আমায় যেই প্রেম করে, সেই প্রেমকে সংসারী মানুষের নিকৃষ্টতম প্রেমের সাথে তুলনা করে, শ্যামার প্রেমের অপমান করো না। হতে পারো তুমি সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যাসম, কিন্তু প্রেমের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, ... তোমার মাতাকে প্রশ্ন করে দেখতে পারো, তিনি তোমাকে এই বলবেন যে তিনি স্বয়ংও প্রেমের ঊর্ধ্বে নন"। ...

পুনরায় দেবী সর্ব্বা তাচ্ছিল্যের ভাষায় বললেন, "ছি ছি! ... সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা হবার পরেও, তোমার এই আক্কেল! ... তুমিও সংসারী মায়াগ্রস্ত মানুষদের যৌনতার দুর্গন্ধ মিশ্রিত, আকাঙক্ষার আর কামনার পর্বতের স্তূপে সজ্জিত, আসক্তি ও বিরক্তিতে মণ্ডিত, অভব্য অর্বাচীন নারকীয় পীরিতকে প্রেম আখ্যা দিলে! ... লজ্জা করলো না তোমার এই ভাবনা ভাবতে! ... তোমার নিজের সম্মানের চিন্তা নাই থাকতে পারে, ... কিন্তু সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা তুমি... তাঁর সম্মানের কথা তো একবার চিন্তা করতে তুমি! ... তোমার প্রতিটা ভাবনা তাঁর প্রদত্ত সংস্কারের প্রতীক। ... আর তুমি কিনা, তাঁর এইভাবে উপহাস করে ফিরছ!"

অনুগ্রাহী এবার সেই কথা শুনে ক্রুদ্ধ আবেশে বললেন, "নিজের অসভ্যতামিকে ঢাকার জন্য আমার উপর কালিমা লেপন করছো দুশ্চরিত্রা নারী! ... বেশ, তোমার আসলরূপ তবে সকলের সামনে এনে স্থাপিত করতেই হবে। ... দুঃখের কথা এটাই যে, তোমার প্রকৃতরূপ প্রকাশ্যে আনার কারণে ওই সরল সাধাসিধে শ্যামার চরিত্র নিয়েও টানাটানি করতে হবে। ... কিন্তু, এটাই হয়তো নিয়তির খেলা। ... তাই নির্বিচারেই আমাকে সেটা করতে হবে"।

দেবী সর্ব্বা এবার রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "নিজের অভিপ্রায়কে নিয়তির নামে চালিত করে নিয়তির অবমাননা করো না অনুগ্রাহী । ... আমার অপমান করো কিচ্ছু এসে যায় না আমার। ... কিন্তু শ্যামা আমার প্রেম। তাঁর চরিত্রে যদি তুমি সামান্যও আঁচ দেবার চেষ্টাও করো, ভুলে যাবো যে তোমার সাথে জগন্মাতার সম্মানের সম্পর্কও বর্তমান। ... আমার এই কথাকে সাবধানবানী বলেই জেনে রেখো, আর নিজের কর্মের ফল নিজেই ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থেকো অনুগ্রাহী" । এই বলে দেবী সর্ব্বা সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেবী সর্ব্বার প্রত্যাগমনের সময়ে তাঁর ক্রুদ্ধ আবেশের ছবিকে অনুগ্রাহী ভুলতে পারে নি। তাঁর মস্তক, কর্ণলতি, নাসিকা, গলদেশ, বক্ষদেশ, কটিদেশ, হাত ও বাজু, চরণের নূপুর, সমস্ত কিছুই যেন তাঁর ক্রুদ্ধ আবেশে আন্দোলিত হচ্ছিল। ... ঈষৎ ভয়াবহই লাগছিল সে, কিন্তু ভয়ের কি আছে! ক্রোধে আস্ফালন করার কালে সকলকেই এমন ভয়াবহ দেখতে লাগে । ... সেও জগন্মাতার সন্তান। ... সাখ্যাত জগন্মাতা তাঁর রক্ষক, তাঁর আবার চিন্তা কি! ... চোখের সামনে অন্যায়কে দেখে, অধর্মকে দেখে, চোখ বন্ধ করে থাকলে, সে মাতার কাছে মুখ দেখাবে কি করে! ... না, এর প্রতিকার এবার করতেই হবে।

সমস্ত কথা দেবী অনুগ্রাহী রাত্রের অন্ধকারে সইকে এসে বলতে, সই বললেন, "দিদি, আমার মনে হয়, একটিবার সর্ব্বার পিতার সঙ্গে আলাপ করে নিলে ঠিক হবে। ... কন্যার ভাবগতিকের যদি কনো সমাধান পিতার কথার থেকে পাওয়া যায়। ... আর দিদি, সইয়ের ভাব, ... হ্যাঁ ঠিকই, ওর মধ্যে যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, আসক্তি, বিরক্তি, কনো কিছুই নেই। ... হ্যাঁ এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, আমি ওকে ছোট থেকে দেখছি। ছোট থেকেই ও এইরকম, আর যত বয়স বেড়েছে, ততই ও এরকম হয়ে উঠেছে। ...

আর জানো দিদি, আমি যখন ওর পতির পথ আটকাতে গেছিলাম, তখন ওর পতি আমাকে কি বলেছিলেন! ... উনি বলেছিলেন, 'প্রতিটা মানুষের শরীরের একটি ক্ষুধা থাকে, আমারও আছে। ... তোমার সই, আমার কাছে আসলেই পাথর, আর ওর প্রেমের কথা ভাবলেই ও পবন। ... হ্যাঁ পবন পবিত্র, কিন্তু তা দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করা যায়না... আর পাথর দিয়েও তা হয়না । ... ওর শরীর মিছে হতে পারে, আমার শরীর সত্য। ... ওর শরীর মিছে, তাই ওর শরীরের ক্ষুধাও মিছে। আমার শরীর সত্য, তাই আমার শরীরের ক্ষুধাও সত্য। ... তুমি করবে আমার শরীরের ক্ষুধাকে শান্ত। ... তবে আমি তোমার কাছে থেকে যাচ্ছি ... বলো'। ...

দিদি, এই কথা শুনে আমি আর কিছু বলতে পারিনি উনাকে । ... বললে, তাঁর নজর এবার আমার দিকে এসে পরতো ... কিন্তু এর থেকে আমি এটুকু বুঝেছিলাম যে সইয়ের কামনা বাসনার উপর কনো টান নেই । ... ও পবিত্র দিদি। ... একবার দেখে নাও না, একবার পরখ করে নাও না। ... আমার সইটা শিশুকালে পিতামাতা হারিয়েছে, যৌবনের শুরুতেই পতি হারিয়েছে । ... ওর মধ্যে দুঃখের কনো ভাব প্রত্যক্ষ নয় ঠিকই, কিন্তু ওর জীবনে সুখদায়ক কিচ্ছুই ঘটেনি । ... ওর যদি কলঙ্ক রটে, তবে ওর সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে দিদি। ... একবার দেখ না"।

কুমন্ত্রণা অধ্যায়

দেবী অনুগ্রাহী সেই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে পরের দিন প্রভাতে দেবী সর্ব্বার গৃহে গেলেন। সেখানে যেতে দেবী সর্ব্বাকে গৃহকর্ম করতে দেখেন তিনি। কলসে জল ভরে আনা থেকে আরম্ভ করে গরুর দুগ্ধ নিষ্কাসন, এই সমস্ত কর্ম করছিলেন তিনি। পরনে তাঁর সেই স্বর্ণ আভুসন, আর এক সুন্দর শাড়ী। রাতের অন্ধকারে ঠিক করে সর্ব্বার রূপকে নিরীক্ষণ করতে পারেন নি অনুগ্রাহী। এখন

তিনি উনাকে দেখে একপ্রকার তাঁর রূপের ঝলকে স্তম্ভিতই হয়ে গেলেন। অদ্ভুত দুধে-আলতা গায়ের রঙ, আর তাতে হাতের করতলে, এবং পদতলে আলক্তের ছবি যেন, কনো অংশে তাঁকে কনো দেবীর থেকে কম দেখাচ্ছে না। ...

এমনকি তাঁর রূপ এমনই যে, তাঁর নিজের রূপও যেন উনার কাছে কিচ্ছুই নয় । দেহের গঠনও তাঁর অত্যন্ত অদ্ভুত। নারীত্বের সমস্ত শারীরিক বিশেষণ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ লালিমার সাথে স্থাপিত, কিন্তু তারপরেও তাঁর চেহারার মধ্যে যেন এক পুরুষালি শক্তির সঞ্চার রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তা দেখা যায়না, কিন্তু উনার চালচলনের নিরীক্ষণ করলে, তবেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব । একই সঙ্গে যেন নারীত্বের সমস্ত মোহিনীভাব এবং পুরুষের সমস্ত দৃঢ়তা মিলেমিশে রয়েছে। ...

অনুগ্রাহী ভাবেন, প্রথমেই সর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করার আগে, কৃয়ৎ আশেপাশে খবর লাগানোই ভালো হবে। নিজের পরিচয় বললে, যেকেউ তাঁকে সমস্ত কথা খুলেই বলবে। এমন ভেবে তিন চারটি গৃহে যেতে, তিনি একই সংবাদ সকলের থেকে পেলেন। সকলেই বললেন, "এই কিছুদিন যাবত ইনারা এখানে এসেছেন। ... সর্ব্বার পিতা সকলকে বলেছে, তাঁদের ঘর বিন্ধাঞ্চলের দিকে। এই পূর্বাঞ্চলে তাঁদের আসার কারণ, তাঁর কন্যা। তাঁর কন্যার সেখানে নাকি একদম মন টিকছিল না, এই পূর্বাঞ্চলের প্রতি তাঁর বরাবরের আকর্ষণ। তাই এই দেশে আগমন"।

এই সকল কথা শুনে দেবী অনুগ্রাহী ভাবলেন, 'সকলে যখন একই কথা বলছেন, তখন এটাই সত্যি কথা । কিন্তু যদি এটা সত্যি কথা হয়, তবে কালরাত্রে যখন সর্ব্বাকে আমি অভিযোগ করলাম, তার কারণেই শ্যামার পতি তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তার কনো প্রতিবাদ করলো না কেন! ... প্রতিবাদ তো করলোই না, উপরন্তু বলল, এটা ঠিকই যে শ্যামা তাঁকে প্রেম করে বলেই, ওর পতি ওকে ছেড়ে চলে গেছে! ... এর অর্থ কি! ... এর অর্থ একটিই হতে পারে, শ্যামা ইনাকে আগে থেকেই জানতো। ... কিন্তু সুদূর বিন্ধাঞ্চল থেকে এই পূর্বাঞ্চলে সে আসবে শ্যামার সাথে দেখা করতে! ... বা অন্য কনো কারণে! ... না ... আর একটা জিনিস হতে পারে, ... ওরা মিথ্যে বলছে যে ওদের বিন্ধাঞ্চলে ঘর ছিল। ... হয়তো, এই পাশাপাশিই ওদের ঘর!"

এই সকল কথার থেকে কনো মীমাংসা না লাভ করলে, অনুগ্রাহী এবার সর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করলেন । ঘরের মধ্যে পালঙ্কে সর্ব্বার বৃদ্ধ পিতা বসে ছিলেন, ফলের বাগান থেকে ফল নিয়ে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে আছেন তিনি। সর্ব্বা তখন বাইরেই ছিল ঘরের, অনুগ্রাহী তাকে দেখেছেন, কিন্তু তিনি অনুগ্রাহীকে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখতে পাননি। গৃহের মধ্যে সর্ব্বার পিতাকে একাকী দেখে, অনুগ্রাহী তাঁর চরণবন্দনা করে বললেন, "কাকা, আমি অনুগ্রাহী, মাতা সর্বাম্বার কন্যা"।

সেই বৃদ্ধ নেত্রে কম দেখেন, ভালো করে অনুগ্রাহীর কপোল দুটি নিজের করমধ্যে স্থাপিত করে, এদিক সেদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললেন, "ও তুমি তাঁর কন্যা! ... কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য। ... ওরে সর্ব্বা..." । দেবী অনুগ্রাহী তাড়াতাড়ি করে বৃদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি যে আপনার সাথেই আলাপ করতে এসেছি কাকা। ... আপনি এই গাঁয়ের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আপনার

সাথে তাই আলাপ করতে এলাম"। ... বৃদ্ধ সামান্য হেসে বললেন, "ও আমার সাথে! ... আমি তো মেয়ে, এই গাঁয়ের নই। ... বিন্দ্যাঞ্চলে, নর্মদাতটে আমার গাঁ। ... এই আমার মেয়েটা খুব বায়নাক্যা করছিলো, এখানে আসবে। ... তাই"।

অনুগ্রাহী সেই কথায় ভদ্রতার হাস্য প্রদান করে বললেন, "তা সমস্ত জমিজমা ছেড়ে এসেছেন সেখানের?" ... বৃদ্ধ এবার বৃদ্ধের ন্যায়ই হাসতে হাসতে বললেন, "জমি জমা! ... একটা ঘর ছিল, আর দুটো গরু ছিল মাত্র। ... আসলে আমি অল্প বয়সে সোনার খনি পাই একবার গরু চরাতে গিয়ে, সেই সোনার থেকেই যা উপার্জন। ... ওই দেখো না, আমার মেয়েকে কিছু সোনা দিয়ে গয়না গরে দিয়েছিলাম। (হেসে) ... ও এখনো সেই গয়নাগুলোকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে"।

অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "তা এই স্থানের প্রতি আপনার কন্যার এমন আকর্ষণ কেন? ... না আসলে, আপনারা তো সেই নর্মদা দেশের লোক, সেখান থেকে এখান তো ... আসলে মানে, অনেকটাই দূর... তাই ...!" বৃদ্ধ হেসে বললেন, "এই স্থানের সাথে, আমার আর আমার মেয়ের অনেকদিনের পরিচয় বুঝলে মা... কত আসতাম ওকে নিয়ে এখানে। ... এখানের আবহাওয়া ওর খুব ভালো লাগে। ... একটু বড় হয়ে যেতে আর যখন ওকে আনতাম না, তখন ও বায়না করতো এখানে আসার জন্য। ... আমি সেই বায়নায় তেমন গুরুত্ব দিতাম না ... তবে এই শেষবারের যেই বায়না, বুঝলি মা... (হেসে)... সে একবারে নাছোড়বান্দা"।

অনুগ্রাহী ঈষৎ হেসে বললেন, "তাই আর থাকতে পারলেন না... কিন্তু এখানে আসতেন কেন আপনারা!" ... বৃদ্ধ হেসে বললেন, "আমি সোনার গহনার বাণিজ্য করতে আসতাম। ... আর মা-হারা মেয়ে তো... মেয়েটাকে একাকী কোথায় রাখি, তাই সঙ্গে করেই নিয়ে আসতাম"। ... অনুগ্রাহী মনের কথাকে মনে চেপে রাখতে না পেরে, মুখেই বলে উঠলেন, "হুমম, আর সেইখানেই সর্ব্বা শ্যামার আলাপ"। ... বৃদ্ধ বললেন, "কিছু বললে মা! ... বয়স হয়েছে তো, আসতে কথা শুনতে পাইনা"।

অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "ও কিছু নয়, ... আচ্ছা কাকা, শ্যামাকে আপনি চেনেন!" ... বৃদ্ধ বললেন, "শ্যামা! ... না তো মা... কে বলো তো সে!" ... অনুগ্রাহী মাথা চুলকে বললেন, "এখানে এটাই সমস্যা, কারুর নির্দিষ্ট কনো নাম নেই। ... না আপনার মেয়ের কনো বান্ধবী আছে এখানে... মানে এই পূর্বাঞ্চলে?" ... বৃদ্ধ হেসে বললেন, "অমন রূপের মেয়ের কেউ বন্ধু বান্ধব হয়না রে মেয়ে। ... আমার মেয়ের রূপ তো আর সামান্য নয়। ... সকলেই ওর কাছে যাচকের মত হাত পাতে। ... ওর আবার বন্ধু কবে হলো!...

কখনও আলেকালে কেউ একজন হয়ে যায়, বুঝলে।... আমার মেয়েটা ওই একটি বন্ধুর জন্য হাপিত্যেশ করে বশে থাকে । একবার তার কাছে কেউ যাচনার হাত না বারিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে, নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিতে রাজি থাকে আমার মেয়েটা। ... সুন্দরী তো তুমিও কম নয় মা। ... সুন্দরী স্ত্রীদের যন্ত্রণা তো বোঝই... সকলেই তাদের যাচক, কেউ তাদের প্রেম করে না... সকলেই কিছু পেতে হাত বাড়িয়ে বসে থাকে। ... কেউ কিচ্ছু দিতে চায়না। ...

হ্যাঁ দেবে, যাচনা পূর্ণ হলে তবে দেবে। আর কি দেবে? (হাসি) কিছু মাটির ডেলা । ... সুন্দরীদের প্রেম করবে কে? কে আছে এমন যে তার থেকে কিচ্ছু চাইবে না... কে আছে যে সুন্দরীর ভোগ্য সৌন্দর্য দিকে না তাকিয়ে, তাঁর মনেও যে কিছু বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে, তা ভাববে!" ... অনুগ্রাহী যেন নিজের কথা রাখার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "সেরকম কেউ কি এখানে আছে আপনার কন্যার?" ... বৃদ্ধ নিজের বার্ধক্যজনিত নিমজ্জিত নেত্রকে উপর দিকে তুলে অনুগ্রাহীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বয়স হয়েছে, আমি কি আর মেয়ে বাইরে কি করে বেড়াচ্ছে, তার খবর রাখতে পারি মা! ...

তবে হ্যাঁ, কিছুদিন যাবত, বিশেষ করে এখানে আসার পর থেকে সর্ব্বার মুখে আমি একটা তৃপ্তির হাসি দেখতে পাচ্ছি। ... এক বাপের আর কি চাওয়া থাকতে পারে বলতো মা... মেয়ের মুখে এমন তৃপ্তির হাসি! ... দেখলেই যে বাপের মনটা জুরিয়ে যায়, তাই না বল!" ... অনুগ্রাহী চাতুর্যের সাথে বললেন, "তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন না তার সাথে, যার কাছে থাকার কারণে আপনার মেয়ে আনন্দে আছে?" ... বৃদ্ধ হেসে বললেন, "সেই বন্ধু ছেলে না মেয়ে, কি করে জানি বলতো! ... তবে কি জানিস, মেয়ে হলে ঠিক আছে, তবে ছেলে হলেই চিন্তা"।

অনুগ্রাহী চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কেন ছেলে হলেই তো ভালো! বিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন!" ... বৃদ্ধ হেসে বললেন, "বয়স অল্প, অনুভব কম। ... মা, পতিকে বা পত্নীকে যদি মানুষ প্রেম করে, তবে ঈশ্বরকে প্রেম করবে কি করে! ... ঈশ্বরে প্রেম না করতে পারলে যে কিচ্ছুই হলো না... দেহ ধরাই সার... দেহ ধরে ঈশ্বরকে ব্যাগার খাটানো ... তাই না! তুমি তো জগদম্বার কন্যা বললে । তুমি তো ভালোই বুঝবে বাছা এই কথা ..."

অনুগ্রাহী বুঝে গেলেন, "এ বাপ যেমন, মেয়েও তেমনই হয়েছে", আর তাই অপেক্ষা না করে সেখান থেকে বৃদ্ধকে প্রণাম করে বিদায় নিতে বললেন, "এখন আসি কাকা। ... একটা কাজ আছে । ... আবার পরে আসবো" । ... বৃদ্ধ বললেন, "ও চলে যাবে, আমার মেয়ের সাথে আজকে আর তোমার আলাপটা হলো না। ... ঠিক আছে মা, আবার এসো । ... সেদিন তোমাদের ভাব করিয়ে দেব"। ... অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "ঠিক আছে কাকা। ... আজ আসছি"।

অনুগ্রাহী গৃহ থেকে সবে বেড়িয়ে পিছন ঘুরেছেন, সর্ব্বা গৃহে প্রবেশ করছিলেন। পশ্চাৎ থেকে তিনি গতকাল রাত্রের দেখা অনুগ্রাহীকে একনজরে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পিছনে ডাকলেন না। কেবলই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে একটু মুচকি বক্র হাস্য প্রদান করলেন, এবং নিজের ভ্রুকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে একটিবার মস্তককে আন্দোলিত করলেন। তারপর অন্দরে প্রবেশ করে গেলেন। ... অন্যদিকে অনুগ্রাহী নিজের মনে মনে গজরাতে থাকলেন, "যেমন মেয়ে তেমন তার বাপ"।

এই বলতে বলতে তিনি সরু নদী ও তার উপরে সাঁকোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁকে এক সাধুবেশধারী ডাকলেন পিছন থেকে। অনুগ্রাহী দাঁড়িয়ে পিছন ঘুরতে সেই সাধু বললেন, "শ্যামা মায়ের সন্ধান করছিলে তুমি মা, ওই ঘরে!" ... অনুগ্রাহী

বললেন, "তুমি চেন ওঁকে!" ... সেই সাধু বললেন, "সে যে মস্ত বড় সাধু গো মা... মস্ত বড়। ... নিজেকে সে সাধু বলে না, ভক্তও বলে না... ভক্তের সেবা করে ফেরে। ... কিন্তু তাঁর ন্যায় ভক্ত আমি এই ত্রিভুবনে একটিও দেখি নি গো"।

অনুগ্রাহী হেসে বললেন, "যদি জানেন যে তাঁর ভক্তি, যেটার কথা আপনি বলছেন, তা আসলে ভণ্ডামি!" ... সাধুটি বললেন, "কি বলছো মা! ... ভণ্ডামি! ... আমি তাঁর কাছে সেবা গ্রহণ করেছি। আমি জানি অমন নিঃস্বার্থ ভাবে, পূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে সেবা করার মানসিকতা কারুর নেই। ... কেউ নেই, এই সম্পূর্ণ জম্বুদ্বীপে স্বয়ং মাতা সর্বাম্বা ছাড়া আর একজনও নেই"। অনুগ্রাহী বললেন, "বেশ তো, ওকে একবার পরীক্ষা করেই দেখে নাও না... করবে, আমার কথা মত ওকে একবার পরীক্ষা! ...

আমার পরিচয় দিলে হয়তো তুমি করবে। ... আমার নামা অনুগ্রাহী"। ... সাধুটি বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে বললেন, "অণু... মানে ... সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা! ... কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! ... হ্যাঁ দেবী, নিশ্চয় করবো পরীক্ষা। ... তোমার কথা যে ঈশ্বরীর নির্দেশ মা। ... নিশ্চয় করবো পরীক্ষা। ... তো কি করতে হবে আমাকে মা?" ... দেবী অনুগ্রাহী বললেন, "প্রথম কথা, যা কিছু আমরা করবো, তা লুকিয়ে লুকিয়ে করবো। ... তাই এখান থেকে চলো। ... কনো নিরিবিলিতে থাকা বৃক্ষতলে আমরা আশ্রয় নিই"।

সাধুটি অনুগ্রাহীর কথা অনুসারে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলে, অনুগ্রাহী বলতে থাকেন, "সাধু মহারাজ, একটি ভক্তের প্রথম চিহ্ন হলো সে নিজের আরাধ্যকে সর্বক্ষণ শুদ্ধ বস্তুই প্রদান করেন, তাই না!" ... সদুত্তর লাভ করে দেবী অনুগ্রাহ আবার বললেন, "তাহলে, আমরা প্রথম শ্যামার সেই শুদ্ধতার পরিচয় গ্রহণ করবো। ... মহারাজ, যেই গৃহ থেকে আমি তখন নির্গত হলাম, সেই গৃহের কন্যাই শ্যামার আরধ্যা। ... রোজ সেই কন্যাকে শ্যামা ভোগ প্রদান করে, তারপরেই নাকি সেই কন্যা আর শ্যামা আহার করে। ...

তাই প্রথম আমাদেরকে সেই ভোগের সামগ্রীকে অশুচিতে পূর্ণ করতে হবে। ... তুমি সেই ভোগকে বিভিন্ন ভাবে অশুচিগ্রস্ত করবে। (চোয়াল শক্ত করে) দেখবে, তোমার চোখে দেখা সব থেকে বড় ভক্ত কত বড় ভণ্ড একজন"। ... সাধুটি বললেন, "বেশ। তারপর?"... অনুগ্রাহী বললেন, "একে একে, ওর অন্ন, বস্ত্র, প্রাণের নিশ্চয়তা, মনের সুখ সমস্ত কিছু কেড়ে নেব আমরা। ... দেখবে, এই সমস্ত কিছু চলে যাবার সাথে সাথে ওর ভক্তির মুখোশ খুলে ওর ভণ্ডামির স্বরূপ বেড়িয়ে আসবে। ...

আর এই সমস্ত কিছুর অন্তে, যদি আমরা সফল না হই, ওর ভণ্ডামো কে প্রকাশ্যে না আনতে পারি, তবে ওকে আমরা কর্মের এমন জালে বাঁধবো যে তার কর্মফলের বিচার করেই ও সেই কর্ম করা থেকে কেঁপে উঠবে। ... এমন ভাবে ন্যায় অন্যায়ের জালে ওকে বিঁধবো, যে সমস্ত মানুষের কাছে ওর মুখোশ ও নিজেই খুলে ফেলে দেবে। ... বলুন রাজি আপনি? আমার নির্দেশ মত সমস্ত কিছুর দ্বারা শ্যামাকে পরীক্ষা করতে, আপনি কি প্রস্তুত!"

সাধু মহারাজ এবার বললেন, "তুমি যেমন বলবে, আমি তেমন তেমন করবো। সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা আমাকে আদেশ দিচ্ছেন, আমি সেই কর্ম করার কালে কেন বিচার করবো! ... আদেশ দাও দেবী"। ... অনুগ্রাহী এবার সেই সাধুর উদ্দেশ্যে বললেন, "বেশ,

প্রথমে শ্যামা যেই বাগিচা থেকে ফল তুলে নিয়ে আসে ওর আরাধ্যের জন্য, সেই বাগিচার সমস্ত ফল আমরা নামিয়ে সমস্ত গাছ খালি করে দেব"।

শ্রবণাগ্রহী সাধুর উদ্দেশ্যে এরপর অনুগ্রাহী বললেন, "এর পর আমরা সন্ধ্যার ঠিক একটু আগে, শ্যামা যখন কনো ফল না লাভ করে ফিরবে, তখন তার দ্বারের সম্মুখে একটু গোমাংস রেখে দেব। ... তারপর আমরা দেখব, আর কিছু কিছু গাঁয়ের বিশেষ মানুষকেও দেখাবো, শ্যামার আচরণ। ... কি ঠিক আছে!" ... সাধু বললেন, "আমি এই গাঁয়ের মাথাকে চিনি । তিনিও আমাকে চেনেন ও খুব মান্য করেন। ... আমি কি তাঁকে গিয়ে কিছু বলবো দেবী?"

দেবী অনুগ্রাহী কর্মে সহযোগ লাভ করে মনে করলেন, "সাখ্যাত পরানিয়তি তাঁর জননী; তাঁর মাতাই তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করছেন"। ... তিনি বললেন, "এতো খুব ভালো কথা। আপনি শীঘ্রই তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন। আপনাকে যা কিছু বললাম, আমি তাঁকেও সেই একই কথা বলবো"। এই বলতে সাধু দেবী অনুগ্রাহীকে গ্রামের মাথার কাছে নিয়ে যান।

সমস্ত কিছু কথা শুনে গাঁয়ের মাথা বললেন, আমাদের কনো প্রমাণ লাগবে না । সাখ্যাত মাতা সর্বাম্বার ভগিনী আমাদেরকে এই বিষয়ে বলছেন। এরপর আমাদের আর কিই বা প্রমাণ লাগতে পারে! ... আমরা এইমুহূর্তে শ্যামাকে গ্রামের বাইরে বার করে দিচ্ছি"। ... সেই কথা শুনে অনুগ্রাহী বললেন, "না মহোদয়, এমন করবেন না । দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, দোষীকে দোষী বলা যায়না, কারণ অনেক কেউ তাঁর পক্ষ থেকেই আপনার বিরোধ করবে সেই কালে। ... তাই আমাদের সকলের সামনে প্রমাণ করতে হবে, শ্যামার প্রকৃত চরিত্র"।

পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামের কিছু মাথাকে সঙ্গে নিয়ে, সইকে শ্যামার পাশে থাকার নির্দেশ দিয়ে, বাগিচার সমস্ত ফল উত্তোলন করে নেন দেবী অনুগ্রাহী সেই সাধুর সঙ্গে একত্রিত হয়ে। বৈকালে ফল সংগ্রহে বেড়িয়ে শ্যামা একটিও ফল দেখতে না পেয়ে, হতাশ হয়ে বাগান থেকে আসতে আসতে সইকে বললেন, "আজ প্রিয়ার একি লীলা সই! সারাদিন সে না খেয়ে বসে থাকে। এই সন্ধ্যায় যা নিয়ে যাই, তাই আমি ও সে একত্রে আহার করি । পবিত্রা গর্ভবতী হয়েছে, তাই তাঁর দুগ্ধ নিষ্কাসন করছিনা, যাতে সেই দুগ্ধ তাঁর শরীরকে সন্তানপালনের পুষ্টি দিতে পারে। ...

আর আজ বাগানে কনো ফল নেই দেখ্। ... কি করি এখন! যদি কিছু না নিয়ে যেতে পারি, তবে যে প্রিয়া অনাহারেই থাকবে!" ... সই সেই কথার উত্তরে বললেন, "একদিন না অনাহারে থাকবেন উনি! ... এতে অসুবিধার কি আছে?" ... শ্যামা সেই কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বললেন, "এ কেমন কথা সই! ... আমি যেটুকু নিয়ে যাই তাঁর কাছে, তিনি তা ছাড়া কিচ্ছু আহার করেন না! ... আর আমিই... হা ভগবতী, কিছু তো আহার দাও মা! ... তাঁর কনো কামনা নেই, কনো বিচার নেই। ... কিছু তো আহার দাও মা... কিছু দিয়ে তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় করো মা!"

সই বললেন, "এ কি সই! ... যেই ভগবতীর কাছে তুমি নিজের জন্য কিচ্ছু চাইলে না আজ পর্যন্ত, সেই ভগবতীর কাছে, আজ তুমি একজন অন্য ব্যক্তির জন্য আহার চাইছো!" ... শ্যামা উদ্বেগের মধ্যেই এক মিষ্ট হাস্য দিয়ে বললেন, "এই লীলা তাঁর সই। ... আর তুমি তাঁকে ঠিক করে চেনই না। ... নিজে অভুক্ত থেকে যাবেন, তাঁর তো সহস্র পীড়া সইবার অভ্যাস আছে; কিন্তু নিজে অভুক্ত থেকে প্রেমীর মনে পীড়া দেবেন, ... আসলে এই প্রেম বেদনাই যে তাঁর প্রিয় খাদ্য। ... প্রেমের বিরহে যখন তাঁর প্রেমী ক্রন্দন করেন, তখন সেই প্রেমীর প্রেমভাবকেই তো তিনি ভক্ষণ করেন। ...

কিন্তু এই সমস্ত লীলা চলবে না। ... তিনি অভুক্ত কেন থাকবেন। ... বেশ আজ যখন তিনি কিছুই দেবেন না, তখন তিনি আজ আমার মাস খাবেন। ... আমার মাসই আজ তাঁর ভোজন হবে, কিন্তু ভক্তের প্রেমভক্ষণের নাম করে তিনি অভুক্ত থাকতে পারেন না। ... কেমন দেখ না সই, ভক্তের সঙ্গে লীলা করবেন বলে, নিজেকে খালি খালি যাতনা দেন। ... সেই অনাদি কাল থেকে তিনি আছেন, সম্মুখে যৌবন রাখলেও অন্তরে বৃদ্ধা হয়ে গেছেন, কিন্তু বালস্বভাব তাঁর আর ঘোঁচে না! ... বালকের মত ক্রীড়া করে । ... সময়ে আহার না করলে, শরীরের যে অহেতুক কষ্ট হয়, সেই কষ্টে তিনি থাকলে আমাদের ভালো লাগে বলো তো!"

সই বললেন, "সই, কি হয়েছে তোর! ... তুই এরকম প্রলাপ করছিস কেন? ... শান্ত হয়ে যা সই, কিছু না কিছু ব্যবস্থা ঠিক করা যাবে"। ... সেই কথা শুনে শ্যামা বললেন, "হ্যাঁ ঠিকই তো... আমিও না! ... তাঁর লীলায় পুরো মজে গেছিলাম আসলে। ... চল সই, কিছু কন্দ নিয়ে আসি। ... আগুন জ্বালিয়ে, সেই কন্দদিয়েই কিছু আহার নির্মাণ করে নেব। ... তিনি অনাহারে কিছুতেই থাকবেন না। ... এই সমস্ত হট চলবে না। ... বাচ্চাদের মত খালি খেলা করার চিন্তা!"

সই সেই কথা শুনে একটু থমকে গেলেন। অনুগ্রাহীর পরিকল্পনা যে এতে ভেস্তে যাবে, সেই ভেবে তিনি বললেন, "সই, এক কাজ করি চল্, আগে গিয়ে আমরা আগুনের ব্যবস্থাটা করে আসি। তারপর না হয় কন্দমূল নিয়ে এসে তাকে রন্ধন করা যাবে"। ... শ্যামা সরলমনা। সইয়ের কথায় সায় দিয়ে গৃহে আগুনের ব্যবস্থা করতে গেলেন। সইও তাঁর সাথেই ছিলেন। গৃহের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শ্যামা নিজের মত দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে চলছিলেন দেখে, সই আতঙ্কে ছিটকে এলেন। ... সেই দেখে শ্যামা বললেন, "কি হলো সই!"

সই প্রেতাত্মা দর্শনের ন্যায় মুখভঙ্গি করে শ্যামার দৃষ্টিকে ভূমির দিকে আকৃষ্ট করলেন। শ্যামা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঈষৎসামান্য গোমাস দ্বারে পরে রয়েছে। ... সেই দেখে, শ্যামার মুখ আনন্দে ভরে উঠলো। সই সেই মাসে হাত দেবেনা, শ্যামা জানেন। তাই নিজেই সেই মাসকে তুলতে গেলেন । সই বললেন, "কি করছিস সই! ও যে গোমাংস!" ... শ্যামা হেসে মাস তুলতে তুলতে বললেন, "বুঝলি না সই, আজ বেটির খুব খিদে লেগেছে। ... তাই তো বাগানের সমস্ত ফল সরিয়ে দিয়ে এই গোমাস রেখে দিয়েছে"।

সই বললেন, "তারমানে তুই গোমাস রন্ধন করে নিয়ে যাবি! ... তোর প্রিয়াকে আহার করিয়ে তো সেই আহার তুইও গ্রহণ করিস! তা তুই শেষে গোমাংস ভক্ষণ করবি নাকি!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "আহার তো আহারই হয় সই। ... সহস্র মুখে তিনিই তো সমস্ত আহার গ্রহণ করেন। তা সে ব্যাঘ্রের মুখ দিয়েই হোক, আর গোমাতার মুখ দিয়েই হোক। ... তাই গোমাতার মুখের আহার, সেই ফলমূল, ঘাসপাতা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তবে ব্যাঘ্রের মুখের আহার, এই মাস কেন নয়! ... তিনি যখন আজ সংস্কার ভেঙে দেবার আহ্বান করেইছেন, তখন তাই নিশ্চয় তাঁর ইচ্ছা। ... আমাদের তো তাঁর ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলে পালন করা উচিত, তাই না!"

পরীক্ষাস্পর্ধা অধ্যায়

সই বললেন, "তা বলে, নিজের মান ইজ্জত সংস্কার সমস্ত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "যখন আমার এই দেহই এক অহংকারময় কল্পনা, তখন এই দেহের সাথে যুক্ত সংস্কার, মান, ইজ্জত কি করে সত্য হতে পারে সই! ... এই দেখ্ না, আমি এতক্ষণ 'আমি' 'আমি' করে কেমন অহংকার করে বেড়াচ্ছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, আমি থাকতে আমার প্রেমী অভুক্ত কি করে থাকতে পারে! ... তাই তো তিনি আমার অহংকারকে আঘাত করে, আমাকে চেতনার পথে নিয়ে যাচ্ছেন । ... এ তো তাঁর কৃপা সই, তাঁর কৃপা!"

দেবী অনুগ্রাহী এবার আড়াল থেকে সমস্ত গ্রামের লোক এবং সাধু, যারা এই দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "দেখলেন, ঈশ্বরের নাম করে, কেমন অধর্ম করে বেড়াচ্ছে শ্যামা!" ... গ্রামের লোকেরা বলতে থাকলেন, "না না, এর একটা বিহিত হওয়া খুব প্রয়োজন। ... এই ভাবে এক অনাচারীকে আমাদের সমাজে আমরা স্থান দিতে পারিনা"। ... সাধুটি বললেন, "শান্ত হন আপনারা। ... আপনারা মানুষের সৃষ্ট নিয়মকেই সত্য বলে মান্যতা দিয়ে এই সমস্ত কিছু ভাবছেন, কিন্তু এক ভক্তের সমর্পণকে দেখতে পাচ্ছেন না। ... আমার মনে হয়, এখানে শ্যামাকে দোষারোপ নয়, তাঁর উদার দৃষ্টিকে দেখা আবশ্যক"।

গ্রামের মাথা বললেন, "আপনি সাধু, আপনার মন ঈশ্বরে গত হয়েছে। তাই আপনি সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাচ্ছেন। আমি বলছিনা, এ আপনার ভ্রম। ... কিন্তু আমাকে এই সমাজ চালনা করতে হয়। সকলকে একটা নিয়মে আবদ্ধ করে রাখা আমার কর্তব্য, না হলে সকলেই উচ্ছন্যে যাবেন। ... তাই এমন অনাচারীকে আমরা সমাজে রাখতে পারবো না" । ... দেবী অনুগ্রাহী মিষ্ট হেসে বললেন, "মহাশয়, আবেশের মধ্যে এসে কনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক নয়। ... আমাদের আরো অনেক প্রকারে শ্যামার পরীক্ষা নেওয়া উচিত। ... তবেই আমার মনে হয়, আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো"।

গ্রামের লোকেরা অনুগ্রাহীর কথায় সমর্থন করলে, সকলে দেখলেন, অগ্নি সংযোগ করে, সেই গোমাসকে জ্বালিয়ে, সেই মাস নিয়ে শ্যামা তাঁর প্রিয়ার কাছে গেলেন । প্রিয়ার কাছে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার গোমাংস খেতে ইচ্ছা হয়েছে বললেই তো

হতো! এমন লীলা করার কি দরকার ছিল! ... আমি তো চিন্তায় পরে গেছিলাম, আজ বোধ হয় তোমায় অভুক্ত থাকতে হবে!" ... দেবী সর্ব্বা হেসে বললেন, "হ্যাঁ এটা ঠিকই যে আজ গোমাস খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তবে আমি তো কিছু করিনি শ্যামাপ্রিয়া!" ...

শ্যামা ঈষৎ অভিমানী হাস্য প্রদান করে বললেন, "না, তুমি তো কিছুই করো না। ... করেন তো তিনি, সেই ভগবতী। ... মানুষ নিজের অহংকারে চূর হয়ে ভাবেন, তিনিই কর্ম করেন। আর ভগবতী তাঁদের অহংকারের মায়া হয়ে, তাঁদের নেপথ্যে থেকে সমস্ত কর্ম করে চলেন। ... মানুষ তাই নিজের মায়াতেই বদ্ধ হয়ে ভেবে মরে, সে-ই সমস্ত কিছু করেছে। ... অসব ছলনা এই শ্যামার কাছে চলবে না হ্যাঁ! ... তোমার প্রেম, আমার অহংকাররূপী হলাহলকেও কণ্ঠেই রোধ করে রেখে দিয়েছে, সারা শরীরে মিশতে দেয়নি। ...

কথা বলার কালে, প্রভুর ন্যায় আমাকেও অহংকারের সহায়তা নিতেই হয়, তবে সেখানেই তোমার প্রেম আমার অহংকারকে, আমার আমিকে সীমিত করে রেখেছে... তুমি তো তা জানোনা, তেমন নয়! ... তবে, এই লীলার অবতারণা করো কেন! ... আচ্ছা তুমি কেন বোঝ না বলতো!... তুমি আর বাচ্চাটি নেই, যে লীলা করবে আর আনন্দে হাততালি দেবে । ... তোমারও বয়স হয়েছে। কিন্তু না, এখনো বাচ্চাদের মত লীলা করে বেড়ায় । ... এমনিই এতো এতো যাচক তোমার, তাদের জন্য কষ্টের শেষ নেই তোমার। ... তারপর আমার জন্য কষ্ট কেন সহ্য করো তুমি?"

সর্ব্বা এবার হেসে বললেন, "নিজের লোকের জন্য কষ্ট করলে যে বড় আনন্দ হয় প্রিয়া! ... সেই আনন্দকে অনুভব করতে কি তুমিও লালায়িত থাকো না! ... তাহলে আমাকে কেন বলছো কেবল! ... এমন বকলে কিন্তু আমি কিচ্ছুটি দাঁতে কাটবো না, হ্যাঁ এই বলে দিলাম"। ... শ্যামা আবার অভিমানী সুরে বললেন, "এই দেখেছ, তোমায় কিচ্ছুটি বলা যায়না। ... কিছু বললেই, নতুন লীলা । ... খেয়ে নাও, সাড়াদিন কিচ্ছুটি খাওনি। ... শোনো, এবার থেকে আমি সন্ধ্যায় না, আমি সকাল, বিকাল আর সন্ধ্যা তিনবারই আসবো। ... একবেলা খেয়ে বসে থাকো তুমি...

শ্রম তো কম করো না । ... তা শ্রম করতে পুষ্টি তো দরকার না! ... কই, খেয়ে নাও... খাও না!" ... সর্ব্বা অভিমান দেখিয়ে বললেন, "না তুই খালি আমায় বকিস, আমি খাবো না" । ... শ্যামা এবার নিজের হাতে সামান্য গোমাস নিয়ে বললেন, "অমন করে না লক্ষ্মীটি খেয়ে নাও... এই দেখ, আমি তোমায় খাইয়ে দিচ্ছি । ... আচ্ছা বাবা, আর বকবোনা । ... এবার খেয়ে নাও" । ... সর্ব্বা বললেন, "ঠিক বলছিস, আর বোকবি নাতো?" ... মুখে আহার তুলে দিয়ে শ্যামা বললেন, "আচ্ছা প্রিয়া, আমি যদি তোমায় এমন না বকি, তোমার ভালো লাগবে?...

যদি সর্ব্বক্ষণ নমতুষ্টি নমতুষ্টি করি, তোমার ভালো লাগবে!... কি হলো বলো! ... তখন তো বলে ফিরবে, তুই আজকাল আমাকে একটুও ভালো বাসিস না, কই আমায় ভালোবেসে বকিসনা তো একদম!" ... সর্ব্বা এবার সামান্য হেসে, গোমাস নিয়ে শ্যামাকে খাইয়ে দিয়ে বললেন, "এই কারণেই তো তোকে এতো ভালোবাসী । ... তুই তো আমাকে আলাদা করে দেখতেই পাসনা। ... আমি যে

তোর, মা, আমি যে তোর" । ... শ্যামা এই কোথায় জীব কেটে বললেন, "অমন কথা বলতে নেই প্রিয়া, তুমি যদি আমার হয়ে যাও, তবে তোমার এতো যাচকের কি হবে! ... আমি তোমার, তুমি সবার"।

সর্ব্বা হেসে বললেন, "দেখলি পার্থক্য প্রিয়ামা... কেমন ভাবে তুই নিজেকে আমার কাছে বন্দি করলি, আর আমাকে ছেড়ে রাখলি! ... এমন ছেড়ে রাখিস কেন রে! কি করে পারিস রে! ... আমাকে শেখা না, আমি তো পারিনা এমন ছেড়ে রাখতে!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "আবার নতুন লীলা হ্যাঁ! ... (ঈষৎ ঢং করে) আমাকে শেখাবি! ... বলি প্রেম করতে এই শ্যামা শিখলো কার থেকে? তোমার থেকেই না!... সর্বক্ষণ সকলে গরল খেয়ে বসে বসে মজা নিচ্ছে, আর উনি তাঁদের যাচনার জন্য ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন, আর আমাকে বলতে এসেছে, কি করে ছেড়ে রাখিস! ... প্রেম মানেই যে স্বাধীনতা প্রদান করা, এই শ্যামা এই জটিল কথা জানলো কি করে! ... তোমার থেকেই না!"

সর্ব্বা বললেন, "অফ তুই না, বুঝেও বুঝিস না। ... নিজে সর্বক্ষণ আমাকে মহান করে রাখিস কেন? প্রেম প্রেমীকে মহান করে দেখানোতেই আনন্দ পায়, তাই জন্যই না! ... তবে, তুই কি একাই প্রেম করিস আমায়, আমি তোকে প্রেম করি না! ... আমি কেন তোকে মহান করে দেখাবো না! ... আমার ওতেই আনন্দ। ... নিজে আনন্দ নেয়, আমাকে আনন্দ নিতে দেয়না, মুখপুরি কোথাকারের" । ... শ্যামা হেসে বললেন, "এবার আমার সমস্ত খাবার হজম হয়ে গেল। ... তুমি যতক্ষণ না আমাকে এমন গালি দাও না, ততক্ষণ মনেই হয়না, তুমি আমাকে প্রেম করো"।

এই সমস্ত বার্তালাপ শুনিয়ে সকল গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে অনুগ্রাহী বললেন, "দেখলেন, স্ত্রী স্ত্রীর প্রেম, একে আপনারা মান্যতা দিতে পারবেন! ... দেখলেন নিজের চোখে!" ... গ্রামের প্রধান বললেন, "এর পরেও আমাদের অপেক্ষা করতে বলছেন আপনি দেবী! ... আমাদের এই মুহূর্তে এই স্ত্রীকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা উচিত নয় কি!" ... অনুগ্রাহী এবার হেসে বললেন, "হে মহাজন, এখনই এই সামান্য অপবাদে যদি এই স্ত্রীকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন, তবে যে এই মেয়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়ে নেবে, আর তাতে কি অধর্মের নাশ হবে! ...

না, অপেক্ষা করুন, সমস্ত কলঙ্ককে একত্রিত করুন, আর তারপর তা লেপন করুন, যাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপে শ্যামার বদনাম হয়ে যায়, আর এই অধর্ম যাতে কনো স্থানে স্থান না পায় । তবেই এই অধর্মের চিরতরে নাশ হবে" । ... সাধুটি বললেন, "দেবী, আপনি সাখ্যাত জগন্মাতার কন্যা। ... আপনার কথাকে অমান্য করার সামর্থ্য আমার তো নেই। ... কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শ্যামা তাঁর এই প্রিয়ার মধ্যে সাখ্যাত জগন্মাতাকে দেখতে পাচ্ছেন, যা আমরা পাচ্ছিনা। ... আমরা কিছু ভুল করছি না তো! ... এই অপার প্রেমকে বিচার করার সামর্থ্য আমাদের আছে তো!"

সাধুর উদ্দেশ্যে গ্রামের প্রধান বললেন, "বেশ, আপনার যদি এতই মনে কুণ্ঠা থেকে থাকে, তবে আপনি এই কন্যার সাথে শাস্ত্রার্থ আলোচনা করছেন না কেন! ... আপনার মতে তো এঁর মাহাত্ম অসীম। তবে নিশ্চয়ই আপনাকে শাস্ত্রার্থ আলোচনায় পরাস্থ করতে

পারবে এই কন্যা, কি দেবী অনুগ্রাহী, আপনি কি বলেন!" ... দেবী অনুগ্রাহী এবার চিন্তিত বেশে বললেন, "শাস্ত্র অতি শুষ্ক, আর শাস্ত্র কালের ঊর্ধ্বে গমন করে না। কালের নির্দেশ অনুসারেই শাস্ত্র প্রবাহিত হয়। ... তাই শাস্ত্র আজ একপ্রকার, কাল ভিন্নপ্রকার, এমন আমার মাতা বলেন। ...

তাই, আমার মনে হয়, শাস্ত্রার্থ নয়, এই কন্যার সাথে আধ্যাত্মচর্চা করা উচিত। আধ্যাত্ম হলো এই নশ্বরজগতের একমাত্র সনাতন। ... সমস্ত কিছু পরিবর্তনশীল, কিন্তু আধ্যাত্মের মূল প্রবাহ কখনোই পরিবর্তনশীল নয় । ... এমনটাও আমার পিতা বলেন। তাই সাধুমহারাজ, আপনি এঁর সাথে আধ্যাত্মচর্চা করুন । ... তবে..."। গ্রামের প্রধান বললেন, "তবে কি দেবী!" ... অনুগ্রাহী বললেন, "শাস্ত্রার্থ অনেক পরের কথা, আগে এঁর অন্য সহজ পরীক্ষাগুলি নেওয়া উচিত আমাদের। ...

এঁর আহারের প্রতি নজর নেই, সেই ক্ষেত্রে সংস্কার ওকে কনো প্রকার বাঁধা প্রদান করে না, এটাই যদি সত্য হয়, তবে তো এঁর বস্ত্র, আভুসন, প্রাণ, মন, জ্ঞান, সুখ-দুঃখ, এই সবের উপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, তাই না! কি বলেন সাধু মহারাজ!" ... সাধু বললেন, "সঠিক দেবী। ... শুধু তাই নয়, কর্মের ফলের চিন্তা, ন্যায় অন্যায়ের চিন্তারও পরীক্ষা করা উচিত । ... আধ্যাত্ম আত্মের বিচার করায়। ... আর আত্ম অর্থাৎ আত্মারূপ স্বরূপ তো এই সমস্ত কিছুর পারে স্থিত । ... সেই বিচারে যাবার পূর্বে, আগে আমাদের বাকি পরীক্ষণ করে নেওয়া উচিত"।

অনুগ্রাহী চিন্তা করে বললেন, "বেশ এবার তবে, আহার নয়, কাল এঁকে নির্লজ্জ হবার অবস্থায় পতিত করা যাবে । আর সাথে সাথে এঁর প্রাণের প্রতি মোহও দেখে নেওয়া যাবে" । ... সাধু বললেন, "কালকে এঁর পরীক্ষণ আমি করবো। ... একই সাথে, এঁর কল্পনার প্রতি আকর্ষণ, প্রাণের প্রতি, আর সঙ্গে জ্ঞানের প্রতি ও সুখের প্রতি আকর্ষণকেও পরখ করে নেব... আমাকে আজ্ঞা দিন দেবী"। ... অনুগ্রাহী সম্মতি দিলে, সাধু মহারাজ গ্রামের লোকেদেরকে কি করতে হবে, সেই সমস্ত মন্ত্রণা প্রদান করলেন।

পরের দিন বৈকালে শ্যামা যেই তাঁর একটিমাত্র সুন্দর শাড়ীকে ধৌত করে করে রেখে দিয়ে তাঁর প্রিয়ার কাছে তা ধারণ করে যান, সেই বস্ত্রকে প্রথমে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে ভিজিয়ে দেন। শ্যামা সেই বস্ত্র দেখে বলেন, "এ আবার কেমন লীলা প্রিয়া তোমার । ... আজ তুমি আমার লজ্জা নিয়েই রসিকতায় মত্ত হয়েছ!... বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা, এইরূপ বেশে আমি তোমার কাছে যাবো, তবে তেমনই হোক"। ... এই বলে শ্যামা সেই রঙ ও জলে সিক্ত শাড়ীই ধারণ করে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে গেলেন।

কিন্তু শ্যামা সেই সিক্ত শাড়ী পরিধান করায়, সেই শাড়ীতে যা যা রঙ দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত রঙ তাঁর অঙ্গেও প্রকাশিত হয়ে যায়। সিক্ত শাড়ীর ফলে, তাঁর যৌবন উন্নত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, আর বিভিন্ন রঙে রেঙে ওঠায়, তাঁকে অপরিসীম সুন্দরী দেখাতে থাকে। ... তাঁর সেই অসামান্য রূপ ও যৌবন, গ্রামের সমস্ত পুরুষকে বিহ্বল করে কামুক করে তোলে। ... আর সেই বেশে যখন শ্যামা তাঁর প্রিয়ার কাছে যাত্রা করেন, তখন সাধুমহারাজ তার বাকি পরিকল্পনাকে প্রস্ফুটিত করতে শুরু করেন।

শাড়ীর বিভিন্ন রঙের মধ্যে লহুও প্রদান করে, লাল রঙ প্রদান করেছিলেন। আর গ্রামের সমস্ত সারমেয় জীবদের সুরাপ্রদান করে, ঈষৎ লহুপ্রদান করে লহুর জন্য ক্ষুদার্থ করে তোলেন । গন্ধের প্রতি আকৃষ্ট সমস্ত সারমেয়কে মদ্যপ অবস্থায়ে এবার ছেড়ে দিলে, সেই লহুর গন্ধ শ্যামার শাড়ীর থেকে আসার কারণে সকলে শ্যামাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ... প্রথমে শ্যামা সেই সারমেয়দের লক্ষ্য করেন নি । কিন্তু যখন তারা তাকে ঘিরে ধরে, বিশ্রী ভাবে নিজেদের হিংস্র দন্ত বিকশিত করে, রক্তচক্ষু নিয়ে শ্যামাকে আক্রমণ করতে আগ্রহী হন, তখন শ্যামা তাদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন।

শ্যামার সাথে সই উপস্থিত ছিল। সই একটি বৃক্ষে উঠে গিয়ে শ্যামাকে বলেন, "সই, সারমেয় বৃক্ষে উঠতে পারে না, তুমি বৃক্ষে উঠে এসো। ... ওদের থেকে বেঁচে যাবে"। ... কিন্তু শ্যামা সেই কথা শুনে হেসে বললেন, "সই, এই শরীর অনিত্য। ... এই অনিত্য শরীরকে যদি ভক্ষণ করে কিছু জীব তৃপ্ত হয়, তবে তাই হোক। ... এই সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই তো বিরাজ করছেন। ... তিনিই তো এঁদের মধ্যে দিয়ে আহার করে তৃপ্ত হবেন। ... আমার হয়তো এই শরীর ধরে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ... তাই তাঁর এমন বিধান"।

সই এবার বললেন, "এমন হট করো না সই। ... এতে কারুর ভালো হবে না!" ... এই দৃশ্য দেখে, আর শ্যামার অভিপ্রায় দেখে, এবার অনুগ্রাহীও বিচলিত হয়ে সাধু মহারাজকে বললেন, "সাধু মহারাজ, এর কনো উপায় করুন... ওই সারমেয়জীবরা তো শ্যামাকে জ্যান্ত চিবিয়ে নেবে! ... ওরা মদ্যপ... কিছু করুন সাধু মহারাজ!" ... সাধু হেসে বললেন, "কেন দেবী! ... আপনিই তো বললেন, অধর্মের সম্পূর্ণ নাশ হওয়া উচিত। ... এই দেখুন, আজ অধর্মের বীজেরই নাশ হতে চলেছে।... দেখুন অধর্মের বীজ, এই শ্যামারই আজ নাশ হয়ে যাবে"।

অনুগ্রাহী যেন এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ... তাঁর মন বিচলিত হয়ে বলতে থাকলেন, "মা, এই কন্যাকে এমন ভাবে নৃশংসতার শিকার হতে দিওনা। ... ওর রক্ষা করো মা। ... ভণ্ডের ন্যায় হলেও, তোমার নাম ও জীবনভর নিয়েছে। ওকে তার ফল দাও মা"। ... শ্যামা অন্যদিকে অবিচল থেকে চলতে থাকলেন তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁর সই তাঁকে বারংবার বাঁধা দেবার চেষ্টা করলে, তিনি বললেন, "যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমি আমার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাবোই। ... যদি সামান্য প্রাণ থাকতেও তাঁর কাছে পৌছাতে পারি, তবে এই খোল ছাড়ার অন্তিমক্ষণে তাঁকে একবার দেখে, প্রাণ জুরিয়ে যাবে"।

কিন্তু সারমেয়রা মদ্যপ, তাঁরা এই সমস্ত কথার কনো ভাব বুঝতেও পারছিল না, আর বোঝার চেষ্টাও করছিল না। ... শ্যামার শাড়ীর আঁচল ধরে একটি সারমেয় বেশ খানিকটা শাড়ী ছিরে নিল শ্যামার থেকে। ... শ্যামা এবার অদ্ভুত ভাবে দেখল, শাড়ীর যেই অংশটা সারমেয়রা ছিনিয়ে নিল, সেই অংশ নিয়েই তারা উলোমালা হয়ে রইল, আর নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে থাকলো। ... সেই দেখে শ্যামা কিছুটা হতবাক হয়ে, শাড়ীর যেই অংশ থেকে সারমেয়রা ছিঁড়ে নেয়, সেই অংশটি নাসিকার কাছে তুলে এনে গন্ধ শোঁকেন।

তিনি দেখেন, সেই স্থান থেকে গোরক্তের গন্ধ বেরুচ্ছে । ... শ্যামা ভাবেন, তাহলে নিশ্চয়ই কাল গোমাস তুলে নিয়ে যাবার সময়ে এখানে কিছু রক্ত পরেছিল, আর সেই গন্ধের কারণেই সারমেয়রা আমার পশ্চাৎধাবন করছিল । ... না, আরো সামান্য স্থানে এই গন্ধ আসছে। ... সেই অংশটাও কেটে দিই তবে । ... এই বলে, আরো সামান্য শাড়ীর অংশ তিনি কেটে ফেলে দিলেন। ... আর এই অর্ধশাড়ী পরা অবস্থায় তিনি যেমন দেখতে লাগলেন, তা সমস্ত গ্রামের পুরুষদের অসহনীয় কামবাণে বিদ্ধ করে দেয়।

এই অবস্থায় যখন শ্যামা দেবী সর্ব্বার সম্মুখে পোঁছন, তখন সর্ব্বা তাঁর প্রিয়াকে এই অবস্থায় দেখে, চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন, "এ কি প্রিয়া, তোমার এমন অবস্থা কে করলে! ... এমন অবস্থা কি করে হল তোমার!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "বলতে গেলে, সারমেয়জীবরা করেছে... কিন্তু করেছ তো তুমিই প্রিয়া! ... হয়তো তোমার আমাকে এইরূপে দেখে ঈষৎ উত্তেজিত হবার ইচ্ছা হয়েছিল। ... তাই..."। ... সর্ব্বা এবার শ্যামার বস্ত্রে হাত দিয়ে বললেন, "একি শ্যামা, এ তো সিক্ত! ... তুমি ছেড়ে ফেল এই শাড়ী এখনই... এই শাড়ী পরে থাকলে, তোমার শরীর খারাপ করবে"। ...

শ্যামা বললেন, "কিন্তু এই শাড়ী খুলে ফেলে, আমি কি শাড়ী পরবো! ... আর তো কনো শাড়ী নেই আমার কাছে!" ... সর্ব্বা এবার বললেন, "বেশ এক কাজ করো। ... ওই ঝোপে চলো। তুমি আমার শাড়ীটা পরে নাও । ... আমি তোমার শাড়ীটি পরে, আমার ঘর থেকে অন্য শাড়ী পরে আসছি। ... আমার ঘর নিকটে। আমি ওটা ছেড়ে একটি শুদ্ধ বস্ত্র পরে এক্ষণি আসবো" । ... শ্যামা বললেন, "কিন্তু এই শাড়ী কেবল সিক্ত নয়, এতে প্রচুর রঙও রয়েছে। কি করে জানিনা, কিন্তু রয়েছে। ... এই রঙ সমস্তও তো তোমার গায়ে লেগে যাবে প্রিয়া!... তার থেকে থাক, যেমন আছে, তেমনই থাক"।

সর্ব্বা এবার ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "এটা আমার আদেশ জেনো। ... ঝোপের আড়ালে চলো, বস্ত্র পরিবর্তন করো" । ... শ্যামা এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত সর্ব্বার পিছনে পিছনে, ঝোপের আড়ালে গেলেন। বস্ত্র পরিবর্তন করার পূর্বে, শ্যামাকে শীর্ণনদীর জলে স্নান করিয়ে, তাঁর অঙ্গের সমস্ত রঙকে ধুইয়ে নিতে বললেন। আর সর্ব্বা সেই রঙে রঙিন সিক্ত শাড়ী ধারণ করলেন। ... কিন্তু সেই শাড়ী ধারণ করার পরে যা রূপ হল তাঁর, সেই দেখে সমস্ত গ্রামের পুরুষ নিজেদের গৃহে নিজেদের কামাতুর পত্নীদের কাছে নিজেদের কামনার উদ্গিরন করতে চলে গেলেন।

এই সমস্ত কিছু দেখে গ্রামের প্রধান বললেন, "এই নিকৃষ্ট স্ত্রী আমার গ্রামের সকল পুরুষকে কামনার বাণে বিদ্ধ করে দিয়েছে। এই স্ত্রীর কারণে আমার গ্রামের সকলে গোমাস খাচ্ছে । ... এর হত্যা করব আমি আজ" । ... সাধু হেসে বললেন, "মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন মহাশয় আপনি। ... এই স্ত্রীর কারণে কিচ্ছু হয়নি, যা কিছু হয়েছে, তা আপনার গ্রামের সকলেরই কর্মের ফল। ... শ্যামা অন্য কিছু আহার না পেয়ে গোমাস খেয়েছে। কিন্তু আপনার গ্রামের মানুষের কাছে কনো সংস্কারই নেই । তাই তারা আমোদপ্রমোদের জন্য গোমাস খাচ্ছে। ...

শ্যামার কাছে বস্ত্র না থাকার কারণে সেই এইরূপ বস্ত্র ধারণ করেছে। ... কিন্তু আপনার গ্রামের মানুষজন আপনার বর্বরতার শিকার। ... আপনি এঁদেরকে সংস্কারের নাম করে সঙ্কীর্ণতার দাশ করে রেখেছিলেন। তাই আজ তাঁরা নিজেদের দাসত্ব থেকে বেড়িয়ে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে, বেহেল্লা হয়ে উঠে, বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কামুকীর ন্যায় মহিলারা সাজছেন, আর পুরুষরা সেই কামুকভাবে নিমজ্জিত। ... এ আপনারই বরবরচিত শাসনের ফল, এর দায় শ্যামাকে কেন দিচ্ছেন?... আমার নেত্রে তো সে ফুলের ন্যায় পবিত্র। ... সম্পূর্ণ পবিত্র"

সেই কথায় লজ্জিত বোধ করলেন গ্রামের মাথা, কিন্তু সাধুমহারাজের পরীক্ষণ তখনও সমাপ্ত হয়নি। দেবী অনুগ্রাহী সামান্য থিতিয়ে গেছেন। সারমেয়জীবদের ওই ভাবে শ্যামাকে ঘিরে ফেলার পর থেকে তাঁর মধ্যে এক অপরাধবোধ ক্রিয়া করছে। তিনি মনে মনে অনুশোচনা করতে থাকছেন, আর সেই অনুশোচনার কথা সই এবং সাধুকেও তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, "একজনের অধর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, আমিও যে অধর্মের সঙ্গ দিয়ে ফেলছি সই! ... না না, আজ যদি শ্যামার কিছু হয়ে যেত, আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতাম না"।

কিন্তু অনুগ্রাহী বা সাধুর মধ্যে কিন্তু কিন্তু ভাব এসে গেলেও, এই সমস্ত ক্রীড়ার মধ্যে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষেরা গ্রামের সমস্ত নারীপুরুষকে বিভ্রান্ত করার দায় শ্যামাকেই দিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। আর তাঁদের প্রেরণাতেই সাধু মহারাজকে তাঁর পরীক্ষণ চালিয়ে যেতে হয়। গ্রামের মানুষেরা শ্যামার কুটিরবাড়িকে জ্বালিয়ে দেন। শ্যামা কুটির হারিয়ে, সেই অগ্নির মধ্যেই প্রবেশ করে, কনো প্রকারে নিজের আরাধ্যের মৃত্তিকামূর্তিকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। সেই অগ্নিতে শ্যামা ক্ষতিগ্রস্তও হন, কিন্তু নিজের আরাধ্যের মূর্তিকে সুরক্ষিত বাঁচিয়ে আনতে পারার আনন্দে সেই ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে শ্যামার মনও যায়নি।

শিক্ষাদান অধ্যায়

সাধু মহারাজ এবার শ্যামার কাছে এসে উপস্থিত হতে, শ্যামা সেই অগ্নিতে স্নান করা অবস্থাতেও সাধুমহারাজকে দেখে আপ্লুত হয়ে বললেন, "ভক্তসাধু, তুমি! ... কেমন আছো গো! ... এ মা... তুমি এখানে এলে, আর আমাকে তোমার সেবা করার সুযোগ দিলে না ভক্তসাধু! ... আমার সেবা বুঝি তোমার ভালো লাগে নি!" ... সাধু মহারাজ বললেন, "না মা, অমন বলতে নেই। ... এমন আন্তরিক সেবা তো আজ পর্যন্ত আমি কখনো কোথাও পাইনি। ... তোর সেবা পেয়ে তো আমার এমন মনে হয়েছিল যেন সাখ্যাত জগন্মাতা আমার সেবা করলেন। ... কিন্তু তোর এ কি অবস্থা মা! ..."

সাধু মহারাজ আবার বললেন, "গ্রামের মানুষ তোর এমন দুর্দশা করছে কেন মা! ... কি করেছিস তুই?" ... শ্যামা বললেন, "জানি না ভক্তসাধু। নিশ্চয়ই কনো অপরাধ করে ফেলেছি। নাহলে ওরা এমন কেন করবে! ... আর অপরাধ নিশ্চয় ওদের সাথে না, সাখ্যাত জগদম্বার সাথেই বোধ করি আমি কিছু অন্যায় করে ফেলেছি। তাই তিনি আমাকে এমন সাজা দিচ্ছেন। ... না ভক্তসাধু। আমাকে

এক্ষণই তাঁর কাছে যেতে হবে। ... আমার কনো কাজে নিশ্চয়ই তিনি খুব ব্যাথা পেয়েছেন। ... (ঊর্ধ্বগগনে তাকিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে শীর্ণনদী পানে ছুটতে থাকলেন শ্যামা আর বলতে থাকলেন) প্রিয়া, আমি কি করে ফেললাম প্রিয়া... কি করে তোমার কোমল হৃদয়ে আমি ব্যাথা দিয়ে ফেললাম"।

সাধুমহারাজ ও সই শ্যামাকে আটকাবার অনেক চেষ্টা করলেন। ... সাধু মহারাজের উদ্দেশ্যে ছিল, শ্যামার মনে ভীতির সঞ্চার করে কল্পনাপ্রবণ করে তোলা। ... কিন্তু শ্যামার মন যেন একটিই রঙে মজে আছে, আর তা তাঁর প্রিয়ার রঙ। ... সমস্ত কিছুর কর্তা তাঁর প্রিয়ার প্রেম, এই তাঁর বিশ্বাস, আর তাঁর বিশ্বাস এমন যে তাঁর প্রাণ, অন্নের চিন্তা, জ্ঞানের বোধ, সুখের চিন্তা, এমনকি মনের কল্পনা, সমস্ত কিছুই দিশাহীন হয়ে পরেছে । ... সাধু মহারাজ এবার হেসে দেবী অনুগ্রাহীর কাছে এসে বললেন, "দেবী, ইনি তো ঋষি! ... পঞ্চভূত যাকে ছুতেও পারে না, তিনি ঋষি অতিরিক্ত কি দেবী!"

অনুগ্রাহী বললেন, "সাধু মহারাজ, আমি ঘোরতর অন্যায় করে ফেলেছি। ... আমার সামান্য কিছু মিথ্যা সংস্কারের কারণে আমি একজন মহাপ্রেমীকে আঘাত দিয়ে ফেলছি। ... শ্যামা সত্য বলেছিল, প্রেমে যৌনতার কনো স্থান থাকেই না। আর যেখানে যৌনতার স্থান নেই, সেখানে কিসের নারীপুরুষ! ... আমিই অন্ধ ছিলাম, আমিই আমার মিথ্যা সংস্কারের ভারে আক্রান্ত ছিলাম। ... কিন্তু ঈশ্বরের নামে এই প্রেম কেন! ... ভ্রান্তি শ্যামায় নয়, ভ্রান্তি ওই সর্ব্বার মধ্যে। ... সর্ব্বা শ্যামার ঈশ্বরপ্রেমকে কাজে লাগিয়ে, ওর ঈশ্বরীর ভূমিকায় নিজেকে বসিয়ে রেখেছে। ...

আর সেই কারণে শ্যামা নিজের ঈশ্বরপ্রেমকে ওই সর্ব্বার উপর অর্পণ করে ভক্তের স্থানে ভণ্ড হয়ে উঠেছে। ... সাধু মহারাজ, সই, শ্যামাকে আমাদের এবার বাঁচাতেই হবে ওই সর্ব্বার হাত থেকে । ... কিন্তু কি করে?" সই বললেন, "হ্যাঁ দিদি, ঠিকই বলেছ। সর্ব্বা অত্যন্ত সুন্দরী, আর শ্যামার ভগবতী প্রেমকে কাজে লাগিয়ে, আর নিজের সৌন্দর্যের দ্বারা ওকে এই বিশ্বাস দেখিয়েছে যে ওই সাখ্যাত ভগবতী। ... ও আসলে একজন যোগিনী। নিজের যোগবলে মায়া দেখিয়ে, আমার সইকে ও বশ করে, আজ এমন দুর্দশায় পতিত করে দিয়েছে সইকে। ...

সাধু মহারাজ, আপনার তো অনেক সিদ্ধি। আপনি সইকে বাঁচান!... দিদি, তুমি তো সাখ্যাত সিদ্ধিদাত্রীর কন্যা! ... দিদি, আমার জনমদুখিনী সইকে বাঁচাও। ... এই ভাবে ওকে কষ্ট পেতে আমি দেখতে পাচ্ছিনা দিদি। ... দিদি, সেই যে আমার সমস্ত কিছু । ... আমার ঘরে মা বাপ আছে কেবল... কিন্তু সই-ই যে আমার একমাত্র সঙ্গী । আমি ওকে আমার কন্যার মত শাসন করি। আমার আহারের প্রতিটি গ্রাস মুখে তোলার আগে ওর কথা মনে পরে। ... ওর কিছু হয়ে গেলে, আমি বাঁচবো না দিদি!... ওকে বাঁচাও"।

অনুগ্রাহী এবার বললেন, "আর একটি বার আমাকে পরীক্ষা করতে হবে শ্যামাকে। ... আমি দেখতে চাই, শ্যামা কি সত্যিই ভগবতী ভ্রমে সর্ব্বার প্রেমে স্থাপিত! ... ওকে আধ্যাত্মিকচর্চার মধ্যে স্থাপিত করতে হবে সাধুমহারাজ। ... তবেই ও সর্ব্বার মধ্যে ভগবতীকে দেখছে কিনা, আমরা নিশ্চিত হতে পারবো। ... হতেও তো পারে, সর্ব্বার প্রতি ওর প্রেমকে ও সঠিক প্রমাণ করার জন্য এইরূপ

ভগবতী প্রেমের ভণ্ডামি করছে! ... তখন আমরা সর্ব্বাকে আঘাত করলে, সর্ব্বার প্রতি অন্যায় করা হয়ে যাবে। ... হতেও তো পারে, সর্ব্বা শ্যামার প্রেমকে আঘাত না করার জন্য ওর প্রেমে সাড়া দেয়। ... না না সাধু মহারাজ, আমাদের একবার পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত"।

সাধু মহারাজ উত্তরে বললেন, "সঠিক বলেছেন দেবী। একটিবার আমাদের আরো পরীক্ষণ করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। ... আর যদি দেখি যে আমাদের শ্যামা ভণ্ড নয়, তবে ওই সর্ব্বাকে আমাদের উত্তর দিতে হবে"। ... অনুগ্রাহী উত্তরে বললেন, "না ... সর্ব্বাকে উত্তর দিতে গেলে, শ্যামা আমাদেরকেই ভুল বুঝবে। ... আমাদের শ্যামাকে প্রথমে গ্রামবাসীর কোপের সম্মুখে রাখতে হবে । ... যখন ওর সর্ব্বা ওকে এই বিকট পরিস্থিতিতে বাঁচাতে আসবে না, তখন ও বুঝে যাবে যে সর্ব্বা একজন ভণ্ড, আর সে নিজের অপার রূপকে ব্যবহার করে, ওর ভক্তির ভোগ অন্বেষণ করে এসেছে এতোকাল। ...

সাধু মহারাজ, শ্যামা যদি ভণ্ড না হয়, তবে ও একটি সুন্দর জীবন লাভ করার অধিকারী । ... আমরা সর্ব্বাকে আঘাত করলে, ওর মনে এক ক্ষতের চিহ্ন হবে, যা ওর জীবনকে ব্যথিত করে তুলবে । ... এর থেকে শ্রেয় এই যে, আমরা ওর সামনে সর্ব্বাকে ভণ্ড প্রমাণ করে দিই। তবে ওর মন সামান্য সময়ের জন্য ব্যথিত হলেও, ঈশ্বরীর কৃপায়, তাঁর ভণ্ডকে ঈশ্বরী ভ্রম করার ভ্রম কেটে যাবে, আর তখন আমি গ্রামবাসীর থেকে ওকে উদ্ধার করে, আমার মায়ের কাছে ওকে নিয়ে যাবো। ... এমন অনবদ্য ভক্তকে মা লাভ করে, খুব তৃপ্ত হবেন"।

সাধু মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তবে তার পূর্বে আমাদেরকে এটি নিরীক্ষণ করে নেওয়া প্রয়োজন যে ভণ্ডটি কে, শ্যামা না সর্ব্বা!... কিন্তু শ্যামাকে কি ভাবে রাজি করাবো আমরা, আধ্যাত্মিক চর্চা করার জন্য!" ... সেই কথা শুনে দেবী অনুগ্রাহী গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "শান্ত হন গ্রামবাসীরা। শান্ত হন আপনারা। ... এই ভাবে উত্তেজনা ছড়ানোর সময় এটা নয়। ... শ্যামা ভণ্ড কি না, তার প্রমাণ প্রয়োজন আমাদের আর তার কারণে আমাদেরকে ওকে আধ্যাত্মিকচর্চার মধ্যে স্থাপন করতে হবে। ... আমরা শ্যামাকে নিয়ে আসছি। ...

আপনারা শ্যামাকে সর্ত দেবেন, আধ্যাত্মিক চর্চা করে নিজেকে শুদ্ধ প্রমাণ করতে। যদি ও নিজেকে শুদ্ধ প্রমাণ করতে পারে, যদি ওর আধ্যাত্মিক চর্চায় আপনারা সকলে তৃপ্ত হন, তবে ওকে আপনারা গ্রহণ করবেন, নয়ত বর্জন করবেন। ... ঠিক আছে?" ... দেবী অনুগ্রাহীর সর্ততে সকলে রাজি হলে, সই, অনুগ্রাহী ও সাধু মহারাজ শ্যামার সন্ধানে নির্গত হন । ... অন্যদিকে শ্যামা ক্রন্দনরত অবস্থায়, দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে সর্ব্বার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন । ... শ্যামা সেই দিকেই গেছেন নিশ্চয়, এমন মনস্থির করে সর্ব্বার গৃহের উদ্দেশ্যে অনুগ্রাহী বাকি দুই সঙ্গীকে নিয়ে যান।

দেবী অনুগ্রাহীর ধারণাই সত্য, শ্যামা সর্ব্বার গৃহেই এসেছেন। অনুগ্রাহীরা যখন সেই স্থানে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা দেখলেন, শ্যামার ডাকে দেবী সর্ব্বাও কুটির থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেড়িয়ে এলেন। সেই দেখে সকলে একটি বৃক্ষের আড়ালে স্থান নিয়ে, সর্ব্বা ও শ্যামার

কথোপকথন কোন দিশায় অগ্রসর হয়, তা নিরীক্ষণের চেষ্টা করলেন । সর্ব্বা সম্মুখে আস্তেই, শ্যামার শরীরে অগ্নির তাপের চিহ্ন দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, "কি হয়েছে তোর! ... কে করেছে এমন হাল আমার শ্যামার! ... ভিতরে আয়... দাঁড়া ওষধি তৈরি করি তোর... কেদারের ছাল নিয়ে আসছি!"

সকলে দেখলেন, সর্ব্বার গায়ে গামছা দিয়ে, দ্রুত বেগে কেদার গাছের ছাল, গোলাপের পাপড়ি, মিষ্ট ঘাস ইত্যাদি সংগ্রহ করে, তাদেরকে একত্রে মিশ্রিত করে, নির্যাশ নির্মাণ করলেন; এরপর সর্ব্বা শ্যামাকে ঘরের দালানেই নিজের ক্রোরে শুইয়ে রেখে, সেই লেপ বিভিন্ন স্থানে দিয়ে দিতে থাকলেন । ... শ্যামা বারে বারে তাঁর ক্রোড় থেকে উঠে পরতে চেষ্টা করলেন, আর সর্ব্বা একপ্রকার ধরে বেঁধেই শ্যামাকে নিজের ক্রোরে শুইয়ে রেখে সেবা করতে থাকলেন। ...

শ্যামা এবার বললেন, "এ কেমন লীলা তোমার প্রিয়ে! ... আমি কি অপরাধ করে ফেলেছি! ... আমার কোন কর্মের জন্য তুমি এতো ব্যাথা পেলে যে সমস্ত কিছুতে অগ্নি সম্পাত করে দিলে স্নেহা! ... বলো প্রিয়া!" ... সর্ব্বা উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "এখন এই সমস্ত কিছুর সময় নয় প্রিয়ে ... এখন আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো... তারপর অন্য বিষয়ে কথা বলবো" । ... শ্যামা বললেন, "প্রাণপ্রিয়ে, আমার ক্ষত আমার শরীরে নয়, আমার মনে। ... আমার অন্তর যে বেদনার জ্বালায় জ্বলে পুরে খাক হয়ে যাচ্ছে! ...

প্রিয়ে আমাকে বলো না, আমি কি ভাবে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম! ... এর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমার মনের জ্বালা কিছুতেই শান্ত হবে না। ... আমি তোমাকে ব্যাথা দিয়ে ফেলেছি, সে তো নিশ্চয়। ... কিন্তু কি ভাবে স্নেহা! ... আমার অন্তরমন যে সেই যন্ত্রণায় ছটফট করছে! ... আমার জীবন যার কারণে, আমার জীবন যার জন্যে, আমার আমিই যেই কারণে... সেই আদি কারণকে আমি কি উপায়ে ব্যাথা দিয়ে ফেলেছি! ... কেন আমার প্রিয়ার হৃদয় এই ভাবে জ্বলে উঠেছে, বলো প্রিয়া!"

সর্ব্বা এবার একবুক ব্যাথা নিয়ে, নিজের দুই আঁখিতে অশ্রু নিয়ে শ্যামাকে বক্ষস্থলে আঁকরে ধরে, ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকলেন, "আমার জ্বালা, কি আর বলবো মা! ... আমার জ্বালার অন্ত নেই। ... প্রতিমুহূর্তে আমার কাছে উপস্থিত যাচকের দল, আমার কৃপা যার উপর বর্ষণ হয়, তার পরখ করতে থাকে। ... তাঁদের নিজেদের ভক্তি কেবলই নামের ভক্তি, ভক্তির নামে ভণ্ডামো তা... ভক্তির নামে যাচনায় পরিপূর্ণ। ... কখনো সেই যাচনা আমার থেকে কিছু চায়, আবার কখনো আমাকেই চায়। ...

কিন্তু তাঁদের সন্দেহ সর্বদা সেই শুদ্ধভক্তদের প্রতি, যারা আমার কাছে নিজের নিজেটাকেও অর্পণ করে বসে আছে। ... আর তাঁদের নেত্রে, আমার প্রেমীদের শুদ্ধতার প্রমাণ দেবার জন্য, আমাকে আমার সর্বাধিক অপ্রিয় কর্মই করতে হয়, আমাকে আমার প্রিয়তমদেরকেই ব্যাথা দিতে হয়। ... ক্ষমা করিস মা আমায়, ক্ষমা করিস!" ... শ্যামা এবার ক্রোড় থেকে শিশু কন্যার মত উঠে পরে বললেন, "এর মানে, আমি তোমাকে ব্যাথা দিইনি প্রিয়া! ... তাই না!" ...

সর্ব্বা ক্রন্দনরত অবস্থাতেই বললেন, "না মা, তুই আমাকে ব্যাথা দিতেও পারিসনা। ... সেই ব্যাথা দিলে যে, সেই ব্যাথার কথা স্মরণ করে, তুইই নিজের দেহত্যাগ করে দিবি! ... তোর প্রেম যে বাঁধনছাড়া প্রিয়া! ... তুই যে আমার সমস্ত কিছু! ... আমি যুগে যুগে তোর প্রিয়া, আমি যুগে যুগে তোর!" ... শ্যামা এবার আনন্দের সাথে বললেন, "তাহলে তুমি কাঁদছ কেন, বলো! ... আমাকে ব্যাথা দিতে হয়েছে, আমাকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য। ... এই দেখ আমি সুরক্ষিত, আমি শুদ্ধ, তুমি তো প্রমাণ করে দিয়েছ। ... আবার ব্যাথা কেন পাচ্ছ তবে!... চোখের জল মোছ... মোছ বলছি!"

সর্ব্বা এবার নেত্রের জল মুছতেও নিজের হস্ত উঠিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে, শ্যামা নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে সর্বার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকলেন, "ধুর বোকা মেয়ে! ... এমন করে কেউ কাঁদে! ... বাচ্চা হয়ে যাচ্ছ তুমি দিন কে দিন । ... শরীর তো নশ্বর প্রিয়া! ... এর আবার ব্যাথা কি! ... এই শরীরকে যত আমরা আমাদের না ভেবে আমরা স্বয়ং ভাবতে থাকি, ততই এই শরীরের ব্যাথা, ব্যাধি আমাদের মনকে ব্যথিত করে। ... কিন্তু আমায় দেখ! ...

তুমি তো আমার অহংকারকে আমার কণ্ঠেই রোধ করে রেখে দিয়েছ! ... আমি তো তাই জানি, এই শরীর আমার, কিন্তু আমি এই শরীর নই। ... তাই শরীরের কনো যন্ত্রণা আমাকে ব্যাথা দেয়নি সোনা! ... সত্যি বলছি। ... আমি কাতর হয়ে গেছিলাম এটা ভেবে যে আমি তোমাকে অজান্তেই হয়তো ব্যাথা দিয়ে ফেলেছি, আর তাই তুমি ব্যাথার আগুনে দ্বগ্ধ হচ্ছ। ... আমি বুঝে গেছি, হ্যাঁ এটা তোমারই মনের ব্যাথার আগুন ছিল। কিন্তু সেই ব্যাথা আমাকে কষ্ট দিতে হবার কারণে তুমি পেয়েছ। ...

কিন্তু এই দেখ, আমার কনো কষ্ট নেই। তোমাকে ব্যাথা দিয়ে ফেলিনি, আর আমার মনের ব্যাথার কারণ কিই বা থাকতে পারে! ... আমার কোন ব্যাথা নেই, আমি কনো ব্যাথা পাইনি ... এই যে বাচ্চা মেয়ে! ... এবার চোখের জল মোছ! ... সোনা লক্ষ্মী মেয়ে না আমার তুমি! ... আমি ব্যাথা পাইনি। ... কষ্ট পেওনা এবার... তুমি এভাবে কষ্ট পেলে কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে প্রচণ্ড!" ... সর্ব্বা এবার ক্রন্দনমিশ্রিত নয়নেই হেসে উঠে বললেন, "এত প্রেম করতে কার থেকে শিখলি রে তুই! ... আমি তো কনোদিন এত প্রেম করতে পারিনি কারুকে! ... কার থেকে শিখলি! ...

হ্যাঁ রে শ্যামা, আমাকে তোর দাসী করে নে না! ... আমি তোর দাসী হয়ে, তোর প্রেমে ডুবে থাকতে চাই। ... এমন প্রেম থেকে আমি কিছুতেই দূরে থাকতে পাচ্ছি না... দেখ না, সেই দূর দেশ থেকে ছুটে ছুটে এসেছি, শুধুমাত্র তোর জন্য । ... মা, শোন, আমার কথা শোন। ... বাড়ি ঘরদোর পুরে গেছে, তুই আমার কাছে থাক লক্ষ্মীটি। ... আর কোথাও যাসনা" । ... শ্যামা এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "তা এই মুহূর্তে হয়না প্রিয়া। ... যাদের কাছে তুমি আমাকে শুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য এত কষ্ট বুকে নিলে, তাদেরকে এবার শুদ্ধতার প্রমাণ দিতেই হবে। ...

এবার এই শুদ্ধতার তেজের অগ্নিতে তাঁদের সমস্ত অশুদ্ধতাকে জ্বলেপুরে ছাই হতে হবে, যতক্ষণ না তা হবে, ততক্ষণ আমার বুকের জ্বালা মিটবে না। ... ওরা আমার প্রিয়াকে বাধ্য করেছে, হৃদয়ে ব্যাথা তুলে নিতে। যেই অশুদ্ধতার অহংকারের বিষে বিষাক্ত হবার

আসক্তিতে তাঁরা নিজেদেরকে শুদ্ধতার মায়ায় বদ্ধ করেছে, এবার তাঁদেরকে সেই মায়াত্যাগ করতেই হবে। ... এবার তাঁদের চেতনাকে স্বীকার করতেই হবে। ... তা না হলে আমার হৃদয়ের জ্বালা মিটবে না। ... তা না হলে, আমার আরাধ্যকে তাঁরা আবার আবার করে কষ্ট পেতে বাধ্য করতে থাকবে। ... আজ আমাকে আঁটকেও না প্রিয়া। ... অনুমতি দাও আমায়"।

এই বলে দৃঢ়তার সাথে শ্যামা নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করতে গেলে, দেবী সর্ব্বা বললেন, "এইবারে যদি তাঁদের অহংকার আমার প্রিয়াকে আঘাত করার প্রয়াসও করে, তবে তাঁরা হয় নিজেদের অশুদ্ধতা ত্যাগ করবে, নয় সমূলে সমস্তজীবনের জন্য পিশাচে পরিণত হবে। ... এই আমার বচন। ... যাও শ্যামা।... যাও, বিজয়ী ভবঃ"।

শ্যামা আগ্রাসী মূর্তিতে এগিয়ে গেলে, অনুগ্রাহী তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন, শীর্ণনদীর ধারে। শ্যামা অনুগ্রাহীকে দেখে যৎপরনাস্তি ভাবে আনন্দিত হয়ে বললেন, "দিদি! ... তুমি এসেছ! ... কেমন আছো গো দিদি!" ... অনুগ্রাহী মৃদু হেসে বললেন, "এখানে এসে শুনলাম, গ্রামবাসী তোমার বাড়ি পুরিয়ে দিয়েছে!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "সবই তোমার মায়ের লীলা গো দিদি। ... মানুষ ভাবে কর্ম তাঁরা করে, কিন্তু কর্ম করার সামর্থ্য কি তাঁদের আছে! ... সকলেই যে তাঁর হাতের পুতুল গো"।

অনুগ্রাহী সেই কথা শুনে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "কিন্তু আমার শ্যামাবউ তো আমার মায়ের পরম প্রিয়ভক্ত, তাঁর এমন দুর্দশা তিনি কেন করবেন?" ... শ্যামা হেসে বললেন, "দিদি, তাঁর কি একটা শ্যামা গো! ... তাঁর তো অজস্র শ্যামা। ... তাঁকে তো সমস্ত শ্যামার কথাই ভাবতে হবে, তাই না। ... তাই যেই শ্যামাকে তিনি জানেন যে তাঁর উপর রেগে যাবে না, তাকে একটু ত্যাগ করান, যাতে বাকি শ্যামারা একটু সুখ অনুভব করে। ... ভগবান হবার জ্বালা কম গো দিদি, বহু জ্বালা"।

অনুগ্রাহী ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, "তুমি এখনও তাঁর গুণগান করছো, তিনি তোমার বাড়ি পুরিয়ে দিলেন, তোমায় পথে নামিয়ে নিয়ে এলেন! এর পরেও!" ... শ্যামা আবার হেসে বললেন, "দিদি গো, যেমন শিবদেহ তে আমাদের মন ভরে না, তাই শিবের গলার বিষকেই আমাদের নিবাস করে নিয়েছি আমরা, তেমনই এই বিশাল পৃথিবী ঘরে আমাদের মন ভরে না, তাই আমরা ছোট ছোট ঘর করে নিয়েছি... সবই অহংকার আর তাঁর মায়ার লীলা দিদি... সবই পুরুষপ্রকৃতির লীলা"।

অনুগ্রাহী এবার সত্য সত্যই অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আমি সত্য বলছি বউ, এই অবস্থাতেও তুমি আনন্দ করার মত কি পাচ্ছো! ... কি জিনিস তোমাকে এখনও আনন্দ দিচ্ছে বলোতো!" ... শ্যামা হেসে বললেন, "দেখ দিদি, তোমার মায়ের তো অনেক শ্যামা। তা তিনি বাকি শ্যামাদের ছেড়ে, এই শ্যামার উপর বিশ্বাস করে, এঁর ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিলেন । তাঁর এই বিশ্বাস যে, এই শ্যামাকে শত নিপীড়ন করলেও, সে তাঁকে ভুল বুঝবে না। ... কারুকে না কারুকে তো নিপীড়ন প্রদান করে ভারসম্য স্থাপন করে রাখতেই হবে। ... সেই বিশ্বাস যদি এই অধমকে করা হয়, তবে এই ভক্তের আনন্দ হবে না! ...

কোন ভক্ত চায়না বলো তো, সে তাঁর আরাধ্যের অন্তত কনো কাজে লাগুক! ... যেই ভক্ত ঈশ্বরের কনো কাজে কনোদিন লাগে, সেই ভক্তের আনন্দের কি আর সীমা থাকে!" ... অনুগ্রাহী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ভক্তি, ভক্ত সম্বন্ধে পূর্বের যত ধারণা ছিল, সমস্ত যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! ... কি ভক্তি, কোনটা ভক্তি! ... খানিক সেই বিচার করে, কনো মীমাংসায় পৌছতে না পেরে, তিনি নিজের কথায় ফিরে এসে বললেন, "শ্যামা, আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। ... সকলকে বুঝিয়েছি, আর রাজিও করেছি"।

শ্যামা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "এ মা, তুমি এতো কষ্ট করতে গেলে কেন দিদি! ... তুমি আমার আরাধ্যার কন্যা, আমার অতি প্রিয়, আমার কোথায় তোমার সেবায় দিনরাত জ্ঞাপন করা উচিত, তা নয়। ... ছি... ছি ছি!" ... অনুগ্রাহী সংযমী হয়ে বললেন, "দেখ শ্যামাবউ, এখন ওইসব ভাবার সময় নয়। ... আমি সকলকে বলেছি, তুমি হলে পুণ্যাত্মা, আমার মায়ের বড় ভক্ত। ... সেই শুনে সকলে বলেছে, তাহলে তাঁরা তোমার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে, কিন্তু তোমাকে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে আধ্যাত্মচর্চায় পরাজিত করতে হবে... চলো বউ, আর না করো না... তোমার সাথে ন্যায় করাতে পারলেই আমার শান্তি"।

শ্যামা হেসে বললেন, "সে তো নিশ্চয়ই যাবো দিদি। আমার আরাধ্যার প্রিয়পাত্রের বচন, সে তো আমার কাছে আদেশের থেকে কম কিছুতেই নয়। ... কিন্তু এ কেমন কথা দিদি! ... মায়ের বড় ভক্ত! আধ্যাত্মচর্চায় পরাজিত করা! ... দিদি, ভক্ত তো ভক্তই হয়। ভক্তের আবার বড় ছোট হয় না কি! ... কে আগে জন্মাল, কে পরে জন্মাল, তাতে কি মায়ের স্নেহ কমে! ... নাকি কে মাকে বেশি ভালোবাসে, সেই অনুসারে মা ভালবাসা প্রদান করে । ... হ্যাঁ, ঈশ্বরীকে প্রেমিকার আসনে স্থাপিত করলে, তিনি সেই বিচারে লিপ্ত হন, কিন্তু মাতৃ আসনে বসালে তো তাঁর স্নেহের কোন তারতম্য থাকে না। ...

আর রইল কথা, আধ্যাত্মিকচর্চা! দিদি, আধ্যাত্ম হলো এই নশ্বর জগতের একমাত্র ধ্রুবক । কাল, স্থান, পাত্র পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্মের তারতম্য ... উমহুম, অসম্ভব। ... সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সমস্ত ক্ষেত্রেই আধ্যাত্ম অটল, অপরিবর্তনীয়ই থাকে। ... হ্যাঁ, কাল, স্থান, পাত্রের সাথে সাথে মানুষের অহংকারের ধারা আর মায়ার ধারা বদলায়, তাই আধ্যাত্ম স্থাপনের প্রক্রিয়া বদলে যায়, কিন্তু আধ্যাত্ম তো পরিবর্তিত হয়না। ... তবে সেখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আসছে কেন দিদি! ... সত্য তো সত্যই হয়, তাই না"।

সাধু মহারাজ এবার গ্রামের সমস্ত মোড়লদের সঙ্গে নিয়ে এসে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে বললেন, "শ্যামা, তোমাকে আমার সাথে আধ্যাত্মচর্চা করতে হবে, আর বিচারক হবেন এই মোড়লরা। এটিই দেবী অনুগ্রাহীর বিধান"।

শ্যামা হাস্যবশে বললেন, "বা ভারি সুন্দর বিচার তো! ... বিষ্ণু মহেশের জ্ঞানতর্কের বিচারক হবেন দক্ষ!"

গ্রামের মোড়লরা এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন শ্যামার এই কথাতে এবং শ্যামার উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক হয়ে বললেন, "আগেই বলেছিলাম, এই স্ত্রী পাপিষ্ঠ, অধর্মী; এ গ্রামের মরদদের কামনায় মত্ত করে দিয়েছে, এ এক স্ত্রীকে প্রেম করে সমস্ত সীমা অতিক্রম করে দিয়েছে।... এর নাশই আবশ্যক"।

একটি দিব্যস্বর এবার হেসে বললেন, "গ্রামের মরদদের কামনার জ্বালায় কে স্থাপিত করেছে মোড়লমশাই? শ্যামা না আপনারা! ... শ্যামার বস্ত্রকে কে সিক্ত করেছিলেন মোড়লমশাই? শ্যামা না আপনারা? সেই বস্ত্রে রক্ত লাগিয়ে দেবার বুদ্ধি কাদের ছিল? শ্যামার না আপনাদের? শ্যামার বাড়ির দ্বারে গোমাংস রেখে, সমস্ত গাছের ফলকে ছিনিয়ে কে নিয়েছিল মোড়ল মশাই? শ্যামা না আপনাদের অহংকারে বাতাস করা অনুগ্রাহী?"

শ্যামা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, "প্রিয়া, তুমি কেন?"

মাতা সর্বাম্বা এবার সকলের সম্মুখে দিব্য আবেশে প্রকট হয়ে বললেন, "না শ্যামা, আর নয়। এঁদেরকে বহু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যাতে এঁরা উৎকৃষ্ট প্রেমের উদাহরণ দেখে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠার জন্য, নিজেদেরকে নিকৃষ্ট অনুভব করা আবশ্যক। অহংকারে দম্ভে মদে চুড় অনুগ্রাহী না নিজেকে শুদ্ধ করতে পেরেছে, আর না এই গ্রামবাসিদের। উপরন্তু যিনি শুদ্ধ ছিলেন, সেই সইকেও কলুষিত করে দিয়েছে সে"।

দেবী অনুগ্রাহী এবার সম্মুখে এগিয়ে এসে বললেন, "মা তুমি? তুমিই শ্যামার প্রিয়ার বেশে ছিলে? তুমিই শ্যামার সর্ব্বা! কেন হে মাতা সর্বাম্বা! কেন আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হলেনা!"

মাতা সর্বাম্বা এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, "কারণ তোমরা আমার দর্শন লাভ করার জন্য শুদ্ধতা অর্জন করো নি। আর তা যে করোনি, তার প্রমাণ এই যে তুমি স্বয়ং আমার সাথে সাখ্যাত করেও আমাকে চিনতে পারো নি। কই শ্যামা তো আমাকে প্রথমবার দেখেই সনাক্ত করে, তাও চন্দ্রের আলোকে। সে কি করে চিনতে পারলো আমাকে? কারণ সে আমাকে প্রেম করে, সে আমাতে বিলীন হতে চায়। এমনকি সইও আমাকে দেখে চিনতে না পারলেও, আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চায়, কারণ শ্যামার সংস্পর্শে থেকে তাঁর মধ্যে শুদ্ধতা নিবাস করেছে"।

মাতা সর্বাম্বা আবারও গম্ভীর স্বরে বললেন, "কই সাধু মহারাজ! আপনি কি এখনো আমার থেকে মুক্ত থাকবেন?"

সাধু মহারাজ বললেন, "না মাতা, আমি তো আপনারই প্রকাশ, দেবী শ্যামা ও দেবী অনুগ্রাহী তথা সইকে পরীক্ষা করার জন্য। আপনার আদেশেরই অপেক্ষা করছিলাম, আপনাতে লীন হবার জন্য"। এতো বলে সাধুমহারাজ প্রথমে সর্ব্বার পিতা হন, তারপর

মাতা সর্বাম্বার মধ্যে লীন হয়ে গেলে, সই নতজানু হয়ে করজোড়ে বললেন, "মাতা, ক্ষমা ... ক্ষমা মাতা। আমি একি অধর্ম করে ফেললাম। ... আমার পবিত্রতমা সইএর উপর আমি সন্দেহ করে বসলাম!... আমার দণ্ড নিশ্চয় করো মা"।

দেবী সর্বাম্বা হাস্যবশে বললেন, "সই, তুমি আমার কাছে নয়, তোমার সই, শ্যামার কাছে অপরাধী। ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর কাছে করো"।

সই উত্তরে বললেন, "তাঁর দিকে তো তাকানোর সাহসও নেই আমার। ... আমার উপর সে বিশ্বাস করতো। সে স্নেহ করতো আমাকে। নামেই সই, কিন্তু বাস্তবে যেন সে আমার মাতা হয়ে আমাকে স্নেহ করতো। ... আমি যে আমার নিজের জননীর উপরই অপরাধ করে ফেলেছি। আর তাঁর দিকে আমি কি করে দৃষ্টি রাখি"।

শ্যামা সম্মুখে এসে সইয়ের দুই স্কন্ধ আকর্ষণ করে তাঁকে দণ্ডায়মান করে বললেন, "ছি ছি সই, এমন কথা বলতে নেই। ... তুই আমার প্রাণের সখী। তুই আমার অত্যন্ত আপন। আমি তোর উপর কনো রকমই ক্রোধ করিনি। সত্য বলতে আমি কারুর উপরেই ক্রোধ করিনি। ... সকল কিছু যে আমার সর্ব্বা, মাতা সর্বাম্বাই করছিলেন, যাতে আমি আমার লজ্জাবস্ত্র, এই স্বয়ম্ভুরূপ অহং ত্যাগ করে, তাঁতে চিরতরে মিলিত হতে পারি। তাহলে কারুর উপর আমি ক্রোধ কেন করবো সই?"

সই বললেন, "যদি ক্রোধ করে না থাকো সই, তাহলে আমাকে তোমার মধ্যে লীন করে নাও। আমি আর আমার পৃথক অস্তিত্ব রাখতে ইচ্ছুক নই। ... আমাকে তোমার সাথে মিলনে আবদ্ধ করে দাও । যেমন তুমি বলো, তুমি তোমার স্বয়ম্ভুরূপ লজ্জাবস্ত্র ত্যাগ করতে পারো নি, তাই মাতাও তাঁর ব্রহ্মময়ীরূপ লজাবস্ত্র ত্যাগ করতে পারেন নি, আর তাই তোমাদের মিলন হচ্ছে না, তেমনই সই, আমি আমার লজ্জাবস্ত্র ত্যাগ করার জন্য আজ প্রস্তুত; আমাকে মিলনে আবদ্ধ করো সই"।

দেবী শ্যামা এবার বিহ্বল হয়ে মাতা সর্বাম্বার উদ্দেশ্যে তাকালে, মাতা সর্বাম্বা হাস্যবেশে, বরহস্ত প্রসার করলে, সই শ্যামার মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। সেই দেখে অনুগ্রাহী মাতা সর্বাম্বার সম্মুখে এবং শ্যামার সম্মুখে উপনীত হয় বললেন, "শ্যামা, আমি লজ্জিত, আমি মিথ্যাই অহংকার করে গেছি যে আমি মাতা সর্বাম্বার কন্যা। ... যদি সত্যই কন্যা হতাম, তাহলে তুমি তো আমাকে বহুবার বুঝিয়েছ যে, যৌনমিলনের চিন্তায় তুমি নেই, পঞ্চভূতের প্রেমে তুমি আবদ্ধ নও; তোমার লজ্জাবস্ত্র কি দ্বারা নির্মিত, আর মাতার লজ্জাবস্ত্র কি দ্বারা নির্মিত, তাও বলেছ, তারপরেও আমি এই অবিশ্বাস কেন করলাম! ... কেন তোমাকে পরীক্ষা করার বিচার এলো আমার মনে, আর কেন আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এমন বিশ্রী উপায়ের অবতারণা করলাম!"

শ্যামা হেসে বললেন, "দেবী অনুগ্রাহী, আপনি এখন ভুল ভাবছেন যে, আপনি কনো ভাবে হলেও কর্তা। কর্তা এক আপনার মাতা, সাখ্যাত ব্রহ্মময়ী, মাতা সর্বাম্বা, অন্যত্র কেউ নন। তিনিই আমার প্রেমের পরীক্ষা নিয়েছেন, আপনি নন। আর তিনি সেই পরীক্ষা নেবেন বলেই আপনার মধ্যে সেই চেতনাকে স্থাপন করেছেন, যেই চেতনাকে বহন করে আপনি এতসব কিছু করেছেন বলে দাবি করছেন।

দেবী অনুগ্রাহী, আপনি একটিও কিচ্ছু করেন নি। আমার প্রিয়া সর্বাম্বাই আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে আমার মধ্যে এখনো আহারের ভেদভাব আছে, নাকি আমি তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, উনি যা আহার দেবেন, তাই গ্রহণ করতে পারি কিনা। তিনিই আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে আমি আমার গৃহকে হারিয়ে ব্যকুল হয়ে যাই, নাকি তাঁর ইচ্ছাই আমার কাছে সর্বোপরি এবং সর্বোপ্রিয় হয়। তিনিই আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সারমেয়দের হিংসায় আমি ভীত হই, নাকি তাঁদের কাছে প্রাণত্যাগ করতে হলেও, তাকে তাঁরই ইচ্ছা জেনে আনন্দিত হই।

তিনিই আমাকে পরীক্ষা করার জন্য, আমার দেহলজ্জাকে বিনষ্ট করে দেখলেন, আমার মন সেইদিকে যায় নাকি আমার কাছে ভয়, লজ্জা, ক্রোধ, কামনা সমস্ত বিকার রূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়ে, আমার থেকে তা খসে গেছে । ... সত্য অর্থে অনুগ্রাহী, তিনি আমাকে পরীক্ষাও করেন নি। যেই স্বয়ম্ভু খোলকে আমি আঁকড়ে ধরে ছিলাম, আর কিছুতেই তার আসক্তি ত্যাগ করতে পারছিলাম না, সেই খোলকেই তিনি আমার থেকে ত্যাগ করিয়ে দিয়ে আমাকে মিলনের জন্য প্রস্তুত করলেন। ... আর তা করার জন্য আপনাকে তিনি এই পরীক্ষার চেতনা প্রদান করেছেন। তাই বিচলিত হবেন না।

আর আরো সত্য বলতে, দেবী অনুগ্রাহী আপনি আমার থেকে আলাদা কেউই নন, যেমন আমার সইও আমার থেকে পৃথক কেউ ছিল না। যেমন আমার একাকীত্ব বোধের থেকেই আমার সইএর জন্ম। তেমনই আমার সমাজের প্রতি যেই চিন্তা আমাকে মিলনের থেকে অবরুদ্ধ করছিল, আপনি সেই ভাব। ... তাই আমার সেই ভাবের নাশ করে, আমাকে সম্পূর্ণ নির্লজ্জ করার জন্যই আপনার উপস্থিতি, এবং আপনার মাধ্যমে মাতার ক্রিয়া। ... আসুন আমার মধ্যে লীন হয়ে, আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্লজ্জ করে দিয়ে, আমার আমিকে নাশ করে দিন, যাতে ব্রহ্মময়ীর সাথে এই শ্যামা মিলিত হয়ে, পূর্ণব্রহ্ম হয়ে উঠতে পারে, শূন্যে লীন হয়ে যেতে পারে"।

দেবী অনুগ্রাহী এবার সমস্ত গ্রামবাসিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে শ্যামার মধ্যে লীন হয়ে গেলে, শ্যামা মাতা সর্বাম্বার উদ্দেশ্যে বললেন, "প্রিয়া, আর কত মুহূর্ত তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিলনকামী হয়ে থাকবো? এবার দেখো আমি নির্বস্ত্র, আমি সমস্ত লজ্জার ত্যাগ করে দিয়েছি। পিয়াজের মত সমস্ত ভ্রমের খোল ত্যাগ করে আমি আজ নির্বস্ত্র, নগ্ন, মিলনের জন্য অধির। ... আর কত অপেক্ষা হে প্রিয়া?"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "অপেক্ষা আর নয় শ্যামা, আর তুমি শ্যামা থাকবে না প্রিয়া। আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করে, নিজেকে শূন্যসম করে দাও, পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে যাও, ব্রহ্মসনাতন হয়ে যাও। তবে শ্যামা একটিই কথা। কিছু লীলা আমাকে করতে হবে, আমি তোমার মধ্যে স্থিত হবার কালে, । তাই, তুমি ব্রহ্মসনাতন তো হয়ে উঠবে, কিন্তু সম্পূর্ণতা লাভ করবে না। ... তোমার অন্তরে এখনো কিছু বিকার অবস্থান করছে, তার নাশ আমাকে করতে হবে। ...

সেই লীলার উপরান্ত তুমি সম্পূর্ণ ভাবে ব্রহ্মসনাতন হয়ে বিরাজ করবে, এবং সময় আসলে, তোমার কাছে কিছু পুরুষ, স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গবেশে উপস্থিত হয়ে আমার সত্যতার, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন। তাই আমি তোমার মধ্যে মিলিত হয়ে থাকলেও, যখন

যখন তাঁরা তোমার কাছে এসে উপনীত হবেন, তখন তখন আমি তোমার পুরুষকে আমার থেকে মুক্ত করে, আমারই ছত্রছায়ায় স্থাপিত করবো, যাতে তুমি তাঁদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে পারো। আর যখন সেই শিক্ষাদান সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আমার মধ্যে চিরতরে লীন হয়ে তুমি মহাসমাধিতে তোমার অবতারলীলার সমাপ্তি ঘোষণা করবে"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, এই হলো ব্রহ্মলীলার সমাপ্তি, এবং এরপর মাতা আমার পুরুষের সাথে নয়রূপে লীলা করে, আমার সমস্ত অবশিষ্ট বিকারের নাশ করে, আমাকে পূর্ণভাবে ব্রহ্মসনাতন করে তোলেন। এবার আমি তোমাকে সেই সকল কিছুর বিবরণ প্রদান করছি শ্রবণ করো"।

নবগুহ্যলীলা

দেবী দিব্যশ্রী জানেন, এরপর তাঁর পিতা তাঁকে মাতা সর্বাত্মার নয়টি লীলার কথা বললেন, যেই লীলার মাধ্যমে তিনি তাঁর পিতার সমস্ত ভ্রম ও ভ্রান্তির নাশ করে, তাঁর মধ্যে পূর্ণপ্রকাশিত হয়ে তাঁকে পূর্ণব্রহ্মঅবতারের স্বরূপের সাথে পরিচিত করেছেন। তাই তিনি অধির অপেক্ষায় রইলেন, আর প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বলতে থাকলেন।

কৈলাস অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যবশে বললেন, "প্রথম মাতার লীলার কথা শোনো পুত্রী। এই সমস্ত লীলা মাতা আমার অন্তরে করছেন, আর মাতা সর্বাত্মা ব্যতীত যা কিছু চরিত্রকে এই সমস্ত লীলার মধ্যে পাবে, তাঁরা আমারই সমস্ত পরিণত বিকার। অর্থাৎ, যখন বিকাররা পূর্ববৎ ছিল, তখন তাঁরা নিজেদেরকে অসুর বলতেন, কিন্তু যখন ভূতবিহীন হয়ে গেল বিকাররা, যখন মরিচারা লৌহ থেকে খসে গেল, তখন আমার ভূতরা একাক সাধু হবার ঢং করে, আমার পুরুষকে বেষ্টন করার প্রয়াস করেন। তাই পুত্রী, এই যে নয় কথার বিবরণ দেব, সেখানে বহু সাধুনামকে লক্ষ্য করতে পারবে, তবে জেনে রেখো, তাঁরা সকলেই আমার বিকারের বাহক ভূতগণ, আর তাঁদের ভ্রমগুলি আমার অবশিষ্ট বিকার।

এই প্রথম সর্বাত্মা লীলাকথা ঋষি লোমশ, ঋষি মুচকন্দ এবং ঋষি বাল্খিল্যদের কথন। মাতার মহাবতারের উপস্থিতির কালেই, তাঁরা মাতার লীলায় অংশ নেবেন বলে জম্বুদ্বীপে জন্ম নেন, কিন্তু তা নিলে কি হবে, ভ্রমের জগতে ভ্রমের বশে জন্ম নেবার পরে পরে, তাঁরা নিজেদের জন্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই ভুলে যান।

তবে তাঁদের অন্তরে ঋষিস্বভাব তখনও বিদ্যমান ছিল, এবং বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে, তাঁরা সেই ঋষিত্বের আভাস লাভ করে একত্রিত হয়ে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে থাকলেন। তাঁদের এই যাত্রার মধ্যে বহু সাধারণ মানুষও অংশ নিতে থাকলেন। এবং ঋষিগণ নিজেদের তপতেজে, সেই তীর্থের মাহাত্ম জেনে, সেই মাহাত্ম সকল তির্থযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে, সকলকে এই বলতে থাকেন যে এই তীর্থ তীর্থ ভ্রমণের ফলে, তাঁদের সমস্ত পাপ ধৌত হয়ে যাবে এবং তাঁরা সুখে জীবনযাপন করতে পারবেন।

এমনই যাত্রা চলতে চলতে, এক সময়ে তাঁরা কৈলাসের পথে মানসসরবরের তীরে উপস্থিত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নিশিকালে সেই স্থানে উপস্থিত হবার কারণে তাঁরা স্থির করেন যে পরেরদিন প্রভাতে সকলে সেই পবিত্র মানসসরবরের হ্রদে স্নান করে বহুপুণ্য অর্জন করবেন, এবং সমস্ত পাপ ধৌত করে ফেলবেন। ঋষিগণদের পুণ্যলাভ ও পাপক্ষয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ফলে, বহু যুবা ও যুবতী তাঁদের মাতাপিতাকে তাঁদের সায়াহ্নকালে সেই তীর্থে নিয়ে আসেন।

প্রভাতে যখন ঋষিগণ নিদ্রাত্যাগ করলেন, তখনও সূর্যের দীপ্তি গগনে প্রকাশমান হয়নি। সেই অবস্থায় তাঁরা মানসসরবরের উদ্দেশ্যে স্নান করতে গেলে দেখলেন, এক বৃদ্ধা সেখানে উপস্থিত হয়ে বেশ কিছু নুরিপাথর সংগ্রহ করছিলেন। বৃদ্ধার কাছে গিয়ে ঋষিগণ বললেন, "কি বুড়িমা! ... এই পাহাড়ের দুর্গম পথে কি করে এলে তুমি!" ... সেই বুড়ি নিজের কুঁজো শরীরকে সামান্য উত্তোলন করে বললেন, "কে বাবা তোমরা! ... আমাকে চেন না, আমি তো এখানেই থাকি গো!"

ঋষি লোমশ বুড়ির উদ্দেশ্যে বললেন, "তা এখানে এতো ভোর বেলায় কি করছো!" ... বৃদ্ধা বললেন, "বাবারা, সবাই আসে এখানে, নিজেদের পাপ ধুয়ে চলে যায়। এই পাথরগুলোর পাপ আর ধোয়া হয়না। ... তাই আমি, এই পাথরগুলোর পাপ ধোবো বলে একত্র করছি। ... এই ঝিলের জলে ধুলেই চলে যাবে কিনা পাপ। ... তাই একত্র করছি"। ... ঋষি বাল্কিল্য বুড়িমার সাথে রসিকতা করতে বললেন, "তা কি করে বুঝবে, পাথরগুলোর পাপ গেল কি না!"

বুড়িমা হেসে বললেন, "কি বলো গো, শিবের ধামে এসে শিবের মহিমা জানো না! ... এই দেখবে এসো ... দেখাচ্ছি তোমাদের"। ... এই বলে বুড়িমা, একটি পাথরকে জলে অবগাহন করাতেই, ঋষিগণ দেখতে পেলেন, একটি পাথরের প্রতিমূর্তি ঝিলের জল থেকে উন্নীত হয়ে, ঝিলের পারে গিয়ে স্থিত হয়ে যায়"। ... সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে, ঋষিগণ বললেন, "বুড়িমা, তুমি তো আমাদের থেকেও বেশী রসিক। ... বেশ জাদু দেখাচ্ছ তো!"

বুড়িমা বললেন, "রসিকতা নয়গো, তোমরা নিজেরাই অবগাহন করে দেখ না, এই ঝিলের জলে"। ... ঋষি লোমশ, বাল্কিল্য, মুচকুন্দ, সকলেই সেই কথা শুনে অবগাহন করতে দেখলেন, সত্যই তাঁদের এক প্রতিমূর্তি ঝিলের তিরে উঠে গিয়ে অবস্থান করলো।... বুড়ি এবার হেঁকে বললেন, "বাবারা, এবার তোমরা পারে উঠে এসো... আরো অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাবে"। ... ঋষিগণ তাই করতে, তাঁরা সত্যই এক অনবদ্য দৃশ্য দেখতে পেলেন। ... তাঁরা দেখলেন, তাঁদের থেকে মুক্ত হওয়া প্রতিবিম্ব তাঁদের মধ্যে পুনরায় আশ্রয় নিল। ...

সেই অবাক দৃশ্য দেখে ঋষি মুচকুন্দ সেই বুড়িমাকে বললেন, "বুড়িমা, এটা কি হলো!" ... বুড়িমা হেসে বললেন, "ওই যে হ্রদের জলে অবগাহন করলে। এই হ্রদের জলের ছোঁয়াতে তো পাপ শরীরে থাকতে পারে না। ... তাই সে তোমাকে ছেড়ে পারে চলে এলো। ... কিন্তু তোমার পাপ যে তোমারই সম্পত্তি। তোমায় ছেড়ে থাকবে কি করে! ... তাই যখন উঠে এলে, তখন আবার তোমার সম্পত্তি তোমার কাছে ফিরে এলো"।

ঋষি বাল্কিল্য এবার উঠে এসে বললেন, "কিন্তু বুড়িমা, আমি তো দেখলাম, আমার থেকে দুটি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হলো। আর তিরে উঠে আসতে দুটিই আমার মধ্যে আবার স্থান করে নিল... এর অর্থ কি?" ... বুড়িমা হেসে বললেন, "বাবা, তোমরা এতো বড় বড় সাধু, এটা জানো না, পাপ পুণ্য যে দুটিই বিচার। ... তোমার বিচারে তারা আছে, তো তারা তোমার সম্পত্তি। ... কিন্তু যেই ঝিলের জল পাপ হরণ করে, সে তো পুণ্যও হরণ করে। ... পাপপুণ্য যে দুটিই একের এদিক আর ওদিকের দৃষ্টি মাত্র! ...

তাই তোমাদের পাপ, পুণ্য দুইই পারে এসে বসেছিল, আর তোমরা উঠে আসতে, তোমাদের কাছে তারা ফিরে গেল । ... হয়ে গেল"। ... ঋষি লোমশ এবার বললেন, "তাহলে পাপমুক্তি কোথায় হলো!" ... বুড়িমা হেসে বললেন, "পাপপুণ্য মুক্ত হলে কেমন লাগে, তা বোঝার জন্যই তো এই অবগাহন বাছারা । একবার সেই অনুভূতি হয়ে গেলে, এবার পাপপুণ্য দুইই মন থেকে তারিয়ে দাও। ব্যাস আনন্দই আনন্দ। ... ঠিক আছে, এখন চলি। ... মেলা কাজ পরে আছে। ... পরে দেখা হবে আবার" । ... এই বলে বুড়িমা চলে গেলে, সকল ঋষিগণ একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক নেত্রে যেন সকলেই কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু কেউই কিছু বললেন না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, ঋষি বাল্খিল্য বললেন, "এত মানুষকে নিয়ে এসেছি আমরা, পুণ্য অর্জন করে, মহেশ্বরের দর্শন লাভ করবো। ... তা কি হবে না!" ... এক যুবতী অবিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী ঋষিগণদের নিকট থেকে যাচ্ছিলেন। ঋষিগণদের কথা শুনে তিনি বললেন, "তা কেন হবে না গো! ... জানো তোমরা, এই যে এতো সন্তানরা নিজেদের বৃদ্ধ পিতামাতাদের নিয়ে এসেছেন এই স্থানে, পুণ্য তো এদেরই হবে গো। ... পুণ্য করার থেকে, পুণ্য করানোতে যে অধিক পুণ্য হয়। ... জানো না তোমরা!"

ঋষি বাল্খিল্য একটু উগ্র মেজাজের। তিনি একটু চিন্তায় ছিলেন। তার মধ্যে এই স্ত্রীর এই কথা তাঁর ভালো লাগে না। তাই তিনি উগ্র হয়েই বললেন, "আমরা জন্মজন্মান্তরের ঋষি। ... জানো আমাদের কাছে কত পুণ্য সঞ্চিত আছে। ... কিন্তু সেই পুণ্য সঞ্চয়ে এখনও আমরা মহেশ্বরের দর্শন লাভ করতে পারিনি। ... তাই এতো মানুষকে পুণ্য করাতে নিয়ে এসেছি। ... তা আমাদের তুমি, সেই দিনের এক ছুকরি জ্ঞান প্রদান করতে এসেছ!... যাও এখান থেকে!...

আর কি সমস্ত আজে বাজে কথা বলছো! পিতামাতাকে পুণ্য করাবে বলে নিয়ে এসেছে সন্তানরা। আসল পুণ্য অর্জন তো পিতামাতার হবে। পিতামাতার পুণ্য সঞ্চয় হলে, সন্তানরাও সামান্য ভাগ পাবে তার" । ... সেই স্ত্রীকে এই ভাবে অপমানিত করে দিলে, ঋষি মুচকন্দ সেই ঋষি বাল্খিল্যকে থামিয়ে বললেন, "আহা, স্ত্রীতে মাতার অধিক প্রকাশ । তাঁকে এইভাবে অপমান করো না। ... অজ্ঞানী হতেই পারে। ... আচ্ছা পুত্রী, কি নাম তোমার? আর এখানে কার সাথে এসেছ!"

সেই স্ত্রী বললেন, "আমার নাম সুচিত্রা। ... আর আমি এখানে বহুকাল ধরে রয়েছি, মহেশ্বরের দর্শন লাভ করার ইচ্ছা নিয়ে" । ... ঋষি বাল্খিল্য সেই কথা শুনে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বাচালতা দেখেছেন ঋষিবর এই কন্যার! ... এই স্বল্পজ্ঞান নিয়ে, মহেশ্বরের দর্শন লাভ করবে উনি! ... যাও এখান থেকে" । ... ঋষি লোমশ হেসে বললেন, "আহা, তা মহেশ্বরের দর্শন লাভ করতে ইচ্ছা হয়েছে, ক্ষতি কি! ... আচ্ছা পুত্রী, প্রভুর দর্শন কোন দিশায় গেলে লাভ হবে জানো তুমি?"

সুচিত্রা বললেন, "হ্যাঁ ঋষিবর, ওই তো উত্তরপূর্ব দিশায়, যেদিকে দেবী কৈলাসের শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে, সেই দিকে" । ... ঋষিবর বললেন, "বেশ পুত্রী, আমাদের সাথে এই সমস্ত তীর্থযাত্রীরা এসেছেন। এঁদেরকে পুণ্যস্নান করিয়ে নিয়ে, আমরা যাত্রা করবো সেইদিকে। ... তুমি আমাদের নিয়ে যাবে সেই দিশায়!" ... সুচিত্রা হাস্যমুখে বললেন, "আপনারা ঋষি, পিতাতুল্য। ... এই কন্যা যদি এই সামান্য সেবা করতে পারে আপনাদের, সেই সুযোগ কি করে সে ছেড়ে দেয়। ... নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো ঋষিগণ" ।

সকল তীর্থযাত্রীদের এর পর স্নান করিয়ে, ঋষিগণ সুচিত্রার সঙ্গে উত্তরপূর্বে যাত্রা করলেন। ঋষি লোমশ পথে সুচিত্রাকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা পুত্রী, তুমি কেন বললে, সন্তানরাই পুণ্য অর্জন করছেন, বৃদ্ধপিতামাতারা নন!" ... ঋষি বাল্কিল্য সুচিত্রা নামক স্ত্রীর প্রতি অকারণেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন । যেন তিনি সুচিত্রার কনো কথাই শ্রবণ করতে আগ্রহী নন । ... তাই তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন, সুচিত্রার উত্তর না শোনার অভিপ্রায় নিয়ে। ...

সুচিত্রা অন্যদিকে বললেন, "ঋষিবর, আমার প্রভু যখন মাতার পূর্ণস্বরূপকে ধারণ করে, পূর্ণসূর্য অবতাররূপে এসেছিলেন, তখন বলতেন, যেখানে পাপস্খলন হয়, সেখানে পুণ্যস্খলনও হয়। তাই কনো ঝিলে অবগাহন করে যদি পাপের স্খলন হয়, তবে সেখানে অবগাহনের কালে পুণ্য স্খলনও হয়। কারণরূপে তিনি বলতেন, পাপ ও পুণ্য দুইই মানুষের বিচারধারায় স্থিত, তাদের বাস্তবে কনো অস্তিত্ব নেই। ... যিনি তস্করবৃত্তি করেন, মিথ্যাচার করেন, তিনি মনে করেন, তিনি পাপী। ...

আবার যিনি তস্করকে তিরস্কার করে, তাকে দণ্ড দেন, তিনি মনে করেন যে তিনি পুণ্যবাণ। ... কিন্তু সেই তস্করও এক বৃত্তবানের সেই ধন, যেই ধন তিনি কিছু ব্যক্তিকে দারিদ্রতার শিকার করিয়ে উপার্জন করেছেন, সেই ধনকে তাঁর থেকে লুণ্ঠন করে, তাঁর কর্মের ফল প্রদান করে পুণ্য অর্জন করেন। আবার যিনি সেই তস্করকে দণ্ড দেন, তিনি সেই তস্করের নির্দোষ শিশুসন্তানকে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে, পাপ অর্জন করেন। ... কিন্তু সমাজ সেই কর্মকে পুণ্য বা পাপ বলে না বলে, তস্কর নিজেকে পুণ্যবাণ বলতে পারেন না, আবার তস্করকে যিনি দণ্ড দিয়েছেন, তিনিও নিজেকে পাপী ভাবতে পারেন না।...

তাই প্রভু বলতেন, পাপ পুণ্য সবই মনের খেয়াল। আর তিনি বলতেন যে এই সমস্ত তীর্থস্থানে এসে পাপস্খলন করার কালে, পুণ্যস্খলনও করে, পাপপুণ্যের বিচারের অতীতে স্বল্প সময়ের জন্য গমন করেন। স্নানের শেষে ঝিলের তিরে, বা কুণ্ডের কিনারায় উঠে এলে, সেই পাপপুণ্যের বোধ পুনরায় তাঁর মনের মধ্যে উঠে আসে । কিন্তু এই ঝিলে স্নান করলে, পাপস্খলন হয়, এমন লোকপ্রচারের কারণে, তাঁর মনে এই কুণ্ডে অবগাহনের কালে, পাপ বা পুণ্য উভয় বোধই থাকেনা। ...

ঋষিবর, সেই কথার অনুসারে, যিনি কারুকে পাপপুণ্যের অতীতে নিয়ে যান, তিনি তো সর্বাধিক পুণ্যবাণ, কারণ তিনি কারুকে ব্রহ্মবোধ লাভ করার উপায় করে দিচ্ছেন। তাই এই বৃদ্ধজন পুণ্য অর্জন করলেন না, কেবল পাপ ও পুণ্যের অতীতে উঠে, একমুহূর্তের জন্য পবিত্রতার স্বাদ গ্রহণ করলেন মাত্র, আর তাঁদেরকে যেই সন্তানরা এই স্থানে এনেছিলেন, তাঁরা সেই পবিত্রতার সাথে তাঁদের পিতামাতাকে পরিচয় করালেন। তাই, পুণ্য তো সেই সন্তানরাই অর্জন করলেন, তাই না!"

ঋষি লোমশ বললেন, "বাহ, তুমি তো কন্যা বেশ সুন্দর জ্ঞান অর্জন করেছ। ... তা তুমি এতো জ্ঞান সঞ্চয় করেও কেন মহেশ্বরের দর্শন লাভ করো নি!" ... সুচিত্রা দুঃখী হয়ে বললেন, "ঋষিবর, আমি এইস্থানে অনেক দিন ধরে উপস্থাপন করছি। ... আর এই উপস্থাপনের কালে, বহু তীর্থযাত্রীকে এই ঝিলে অবগাহনের যথার্থতার ব্যাখ্যা করে করে, বহু পুণ্য অর্জন করে ফেলেছি। ... তাই প্রভুর দর্শন লাভ করতে পারছি না"। ...

ঋষি মুচকুন্দ এবার কিছু বলতে গেলে, ঋষি বাল্খিল্য ঋষিবরকে একপ্রকার ভর্ত্সনা করেই বললেন, "এই মূর্খ স্ত্রীর সাথে কেন এতো কথা বলছেন! ... মূর্খতার সীমা দেখুন এঁর। ... পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য মহেশ্বরের দর্শন লাভ হচ্ছে না! ... আর আমরা মহেশ্বরের দর্শন লাভ করবো বলে, সেই কোন কাল থেকে তীর্থ করে করে পুণ্য সঞ্চয় করছি। ... কেন এই মূর্খের সাথে কথা বলছেন ঋষিবর!"

সেই কথা শুনে ঋষি মুচকুন্দই কেবল নন, ঋষি লোমশও চুপ করে যান। ... কিন্তু সুচিত্রার নেত্র যেন এক অন্য কিছুর সন্ধান করছিল। ... তবে ঋষিবরদের সুচিত্রার মনোভাবের উপর কনো দৃষ্টি নেই আর। ... তাঁরা একপ্রকার মন থেকে সুচিত্রাকে ত্যাগই দিয়েদিয়েছেন। ... সুচিত্রার যদিও সেই ত্যাগের দিকে কনো মাথাব্যাথা নেই। সে নিজের মত পথ চলতে থাকে। ...

কিছুক্ষণ পরে, ঋষিগণের কাছে এক যুবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, "ঋষিবর, আপনারা কৃপা করুন। ... কৃপা করুন আমার সন্তানের উপর"। ... ঋষি লোমশ বললেন, "কি হয়েছে তোমার সন্তানের!" ... সেই যুবক বললেন, "প্রভু, আমার স্ত্রীকে এক সাধুবাবা দেখে বলেছিলেন, তাঁর সন্তান এক বিশেষ সেবক হবেন মহেশ্বরের। ... সেই কথার জন্য আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এই তীর্থে আসি, যাতে আমাদের সন্তান মহেশ্বরের পদতলেই বড় হয়ে উঠতে পারেন। ...

কিন্তু এখানে এসে, আমার স্ত্রীর প্রসববেদনার কালে, এমনই দুর্বলতা দেখা দেয় যে, সে সন্তানের জন্ম দিতে পারছে না। ... মৃত্যুর কোলে ঢলে পরছে সে। ... আমি এক সাধুর কাছে তাঁকে নিয়ে গেছিলাম। সাধুবাবা বললেন, আমার স্ত্রীকে তিনিই ঠিক করতে পারবেন, যার কাছে প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় আছে । ... আপনারা তো ঋষি। আপনারা একাকজন তো পুণ্যের সাগর । ... হয়তো মহেশ্বর আপনাদেরকে এইকারণেই পাঠিয়েছেন। ... কৃপা করুন ঋষিবর। ... আমার স্ত্রীকে পুণ্যদান করে ঠিক করে দিন"। ...

ঋষি বাল্খিল্য উত্তেজিত হয়ে বললেন, "মূর্খ যুবক। ... পুণ্য তোমার স্ত্রীকে দান করার জন্য সঞ্চয় করিনি আমরা । ... প্রভুর দর্শন লাভ করবো বলে সঞ্চয় করেছি আমরা। ... আমাদের পথ ছাড়ো মূর্খ যুবক। ... তোমার সন্তানের জন্ম হবার থেকে আমাদের মহেশের সাথে সাখ্যাত করা অনেক অধিক প্রয়োজনীয়। ... পথ ছাড়ো আমাদের"। ...

যুবক হতাশ হয়ে নয়নের জল মুছতে থাকলে, দেবী সুচিত্রা তাঁর কাছে এসে বললেন, "কি হয়েছে যুবা! ... তুমি কাঁদছ কেন! ... জীবন তো নশ্বর। একদিন না একদিন তো চলে যাবেই। ... তবে এই অশ্রুজল কেন!" ... যুবা ক্রন্দন করতে করতে বললেন, "দিদি! ... সারাটা জীবন কেবল ক্ষেতে কর্ম করে গেছি, আর মনে মনে ভেবে গেছি, প্রভু তোমার সেবা করতে পারলাম না। ... আজ এতকাল পরে, আমার সন্তানকে যখন শুনলাম মহেশের সেবক হবে, তখন প্রাণটা ভরে গেছিল। ...

মনে হয়েছিল, যেই কাজ আমি আমার স্ত্রী করতে পারলাম না, সেই কাজ আমাদের সন্তান তো করতে পারবে। ... আমাদের প্রভুর সেবা করার সুযোগ পাবে আমাদের সন্তান। তা দুচোখ ভরে দেখতে পাওয়াও তো অশেষ ভাগ্য, তাই না দিদি!" ... দেবী সুচিত্রার

নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "ঠিক আছে যুবা। ক্রন্দন করো না। ... এক সাধু মহারাজ যখন তোমার স্ত্রীর সন্তান প্রভুর সেবক হবেন বলেছেন, তখন তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। ...

আমি এক অত্যন্ত সাধারণ কন্যা। তাই পুণ্য কি করে তোমার স্ত্রীর কাছে অর্পণ করতে হয় জানিনা। ... কিন্তু প্রভুর যদি তেমনই ইচ্ছা থাকে, তবে অবশ্যই তিনি আমার থেকে সমস্ত পুণ্য নিয়ে তোমার স্ত্রীকে প্রদান করবেন। ... চলো, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো"। ... ঋষি বাল্কিল্য সেই দৃশ্য দেখে মুখবিকৃত করে পথ চলতে থাকলে, ঋষি মুচকুন্দ এবং ঋষি লোমশ, সেই দৃশ্য দেখে কৌতূহল বশত কি করেন সুচিত্রা তা দেখতে গেলেন। ...

ঋষি বাল্কিল্য বিরক্ত হলেও, তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গদানের উদ্দেশ্যে সেই দিশায় গেলেন। ... দেবী সুচিত্রাকে তাঁরা দেখলেন, সেই যুবার স্ত্রীর মাথোপরে উপস্থিত হয়ে বসতে, আর তাঁর মস্তকে নিজের স্নেহহস্ত রাখতে। ... ঋষিগণ নিজেদের তপদৃষ্টে দেখলেন, দেবী সুচিত্রার স্পর্শমাত্রই যুবার স্ত্রীর শরীর উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকলো, আর কিছুকাল পরেই, তাঁর দেহ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো। ... সেই দৃশ্যদেখে দেবী সুচিত্রার আনন্দ সত্যই দেখার মত ছিল। ... তিনি যেন সাখ্যাত তাঁর প্রভুর দর্শন পেয়ে গেছেন, এমন ভাবেই আনন্দ লাভ করলেন।

কিন্তু ঋষিগণ এরপর যা দেখলেন, তাতে হতবম্ব হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, সেই যুবা মহেশ্বরের রূপ ধারণ করলেন, আর সেই স্ত্রী দেবী কামধেনু হয়ে উঠলেন। আর তাঁরা উভয়েই দেবী সুচিত্রার মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন।... সেই দৃশ্য দেখার পর, ঋষিগণের যেন পদতল থেকে ভূমি সরে গেল। ... ঋষি লোমশ আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "স্বয়ং প্রভু আমাদের পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। ... আর আমরা!"

ঋষি বাল্কিল্য বললেন, "না লোমশ, পরীক্ষা প্রভু করার পূর্বে, আমাদেরকে মাতা শিক্ষা প্রদান করতে এসেছিলেন, যাতে আমরা সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে পারি। ... কিন্তু আমরা আমাদের অহংকারের বশে তাঁর শিক্ষাকেই তাচ্ছিল্য করে এসেছি। ... আমরা বলা ভুল, তোমাদের উভয়ের থেকে অধিক অপমান তো আমি করেছি তাঁকে"। ... ঋষি মুচকুন্দ বললেন, "সেই বুড়িমার কথা বলছেন ঋষিবর!"

ঋষি বাল্কিল্য বললেন, "কেবল সেই বুড়িমা নন, স্বয়ং সুচিত্রাও"। ... ঋষি লোমশ বললেন, "সুচিত্রা! ... সে তো এক সামান্য ভক্ত!" ... ঋষি বাল্কিল্য নিজের উপর হতাশ হয়ে বললেন, "সুচিত্রার রূপের সারল্য আমার মনকে একবারের জন্য বলেছিল, ইনি মাতা; কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই কি যে আমার ভ্রম হলো!" ... ঋষি মুচকুন্দ প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু তাঁরা কি শিক্ষা প্রদান করলেন আমাদের, আমি তো সেটিই বুঝতে পারছি না!" ...

ঋষি বাল্খিল্য বললেন, "ঋষিবর, একবার স্মরণ করে দেখুন, সেই বুড়িমা আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছিলেন! ... তিনি আমাদের বলেছিলেন না! পাপ পুণ্য উভয়ের থেকে মুক্ত হতে হয়। আর পাপপুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হবার অভিজ্ঞতাকে অবলোকন করার জন্যই এই স্নান। ... যেমন ঋষিবর, আমরা ধ্যানেতে কি আমাদের 'আমি'র থেকে মুক্ত হতে পারি! ... না তো। ... কিন্তু একমুহূর্তের জন্য আমরা আমাদের 'আমি'র থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের মুক্ত অবস্থাকে অবলোকন করতে পারি। ...

ঠিক তেমনই হলো এই কুণ্ডে স্নান। ... এক মুহূর্তের জন্য আমরা পাপপুণ্য, উভয় থেকেই মুক্ত হয়ে, নিজকে মুক্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিন্তু সত্য অর্থে মুক্ত হতে পারিনা । ... আর স্মরণ করুন, সুচিত্রাও আমাদেরকে ঠিক এই কথাগুলিই বলে। ... সেও আমাদের বলে যে, সে বহু তীর্থযাত্রীকে মানসসরবরের কুণ্ডে স্নানের এই উপযোগিতা বলে বহু পুণ্য অর্জন করে ফেলেছে বলেই মহেশ্বরের দর্শন লাভ করছে না। ...

বুঝলেন ঋষিবর, সুচিত্রাই সেই বুড়িমা। আর বুড়িমাই সকলকে সেই সত্য বলে ফেরেন। ... আর সুচিত্রা আমাদেরকে সতর্ক করেছিল, আমরা যেন পুণ্যের অহংকার না করি, কারণ এই পুণ্য থাকলে, আমরা প্রভুর দর্শন লাভ করতে পারব না । ... প্রভুর দর্শন পাপপুণ্যের বোধ থেকে মুক্ত হলে, তবেই লাভ করা সম্ভব। ... কিন্তু আমরা তা বুঝেও বুঝিনি। ...

আর বুঝিনি বলেই, মাতা তাঁর লীলার শেষ অংশটুকু করলেন। ... তিনি পরাচেতনা। তাঁর চেতনায় সকলেই স্থিত। তাই তাঁর প্রেরণাতেই, প্রভু সেই যুবা হয়ে আসেন, এবং দেবী সুচিত্রার থেকে সমস্ত পুণ্যকে অপসারিত করে, তাঁকে শূন্য করে দিলে, তিনি প্রভু হয়ে সম্মুখে উপিস্থিত হন। ... আসলে ঋষিগণ, মাতা হলেন মহাশূন্য, আর তাই শূন্যের দর্শন লাভ করতে গেলে, শূন্যই হতে হয়। ...

পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, ন্যায় অন্যায়, সমস্ত অহংকারের অলঙ্কার থেকে অহংকারকে মুক্ত করে , শেষে অহংকারকেও ত্যাগ করে শূন্য হতে হয়। তবেই শূন্য হওয়া যায়, আর তবেই মাতার দর্শন লাভ সম্ভব । ... ঋষিগণ, আমরা এই সহজ সত্য কিছুতেই বুঝছিলাম না বলে, মাতা ও প্রভু আমাদের সাথে এই লীলা করে আমাদেরকে এই পরম শিক্ষা প্রদান করেন। ... হ্যাঁ প্রভুর দর্শন লাভ আমরা করতে পারিনি, তবে আমাদের মনের জিজ্ঞাসা শান্ত হয়েছে।

আমাদের কর্তব্য কি, এই ছিল আমাদের প্রশ্ন। আর আমরা তার উত্তর পেয়ে গেছি। মানুষকে পাপপুণ্যের বিচার থেকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাঁদেরকে শূন্যের পথে পারি দেওয়াতে হবে। সম্পূর্ণ বিচারশূন্য করে তুলতে হবে। এই আমাদের কর্ম" । ... ঋষি লোমশ ও ঋষি মুচকুন্দ বললেন, "কিন্তু ঋষিবর, আমরা কি তবে প্রভু ও মাতার দর্শন পাবো না! ... তাঁদের দর্শন পাবো না আমরা!" ...

ঋষি বাল্খিল্য বললেন, "আমরা এক্ষণে তো তাঁদের দর্শন লাভ করার যোগ্যই নই । ... আগে আমরা তাঁদের দেখানো মার্গে চলে, আমাদের পরমার্থকে সম্পন্ন করি। হয়তো এই পরমার্থের সম্পন্নতাই আমাদেরকে তাঁদের দর্শন লাভের যোগ্য করে তুলবে। ... এই

বলে প্রস্থান করতে উদ্যত তিন ঋষি তাঁদের পশ্চাৎ থেকে একটি নারী কণ্ঠস্বর পেলেন, "সন্তান মাতার ক্রোড় একমাত্র তখনই লাভ করেন না, যখন সন্তান মাতার ক্রোরের থেকে নিজের ক্রীড়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে"।

এক মুহূর্তের মধ্যে ঋষিগণ নিজেদের ঋষিত্বকে যেন ভ্রম মনে করলেন। তাঁরা ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, মাতা সর্বাম্বা তাঁদের পশ্চাতে স্থিতা। ... শিশুর ন্যায়, সকল ঋষিগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন লম্ফঝম্প করে । মাতার বক্ষে যেন তাঁরা নিজদেরকে দিগ্বিদিক শূন্য করে অর্পণ করে দেবেন। ... কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন । ... ঋষি বাল্খিল্য বললেন, "তোমার সুচিত্রা অবতারকে কম অপমান তো করলাম না মা! ... তোমার অবতার আর তোমার মধ্যে ভেদ কি! ... এরপরেও তুমি! ..."

মাতা হেসে বললেন, "এই ঋষি হয়ে জ্ঞান অর্জন করেছ বাছা! ... সন্তান মাতার ক্রোরে শুয়ে শুয়ে কতই না পদাঘাত করে মাতাকে। কিন্তু সেই পদাঘাত দ্বারা কি মাকে অপমান করে!... কিন্তু হ্যাঁ, এইক্ষণে অপমান করছো বটে তোমরা তোমাদের মাকে । ... সে তোমাদের ক্রোরে নিতে এসেছে, আর তোমরা তাঁকে এমন ভাবে ক্রোড়শূন্য করে দণ্ডায়মান রেখেছ!" ...

মাতা আবার হেসে বললেন, "পুত্ররা, ক্রীড়ায় মত্ত যতক্ষণ ছিলে, দেখো, আমি তোমাদের সম্মুখেই ছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে চিনতে পারো নি। ... আর এখন দেখো, ক্রীড়া ছেড়ে দিয়েছ, আর তোমরা আমাকে ঠিক চিনে নিয়েছ। ... এসো বাছারা, মায়ের কোলে এসো। তোমাদেরকে কোলে নেব বলে যে আমি কতদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তোমরা যে পুণ্য সঞ্চয় করার ক্রীড়াতেই মন রেখে আমাকে ভুলে ছিলে!"

তিন ঋষি নিজেদের ঋষিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন এক্ষণে। ... তাঁরা এবার শিশুর মত, মাতার ক্রোরে আছড়ে পরলেন। মাতা তাঁর সন্তানদের তাঁদের মায়ের উপর দাপাদাপিকে নষ্ট হতে দেবেন না। তাই তিনিও নিজের আকৃতি সামান্য বাড়িয়ে নিলেন। ... ঋষিগণ কিছুক্ষণ গোবৎসের ন্যায় মাতার শ্রীঅঙ্গে নিজদের অঙ্গ ঘর্ষণ করে তৃপ্ত হয়ে মাতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মা, আমরা এক্ষণে মুক্তি নেবনা। ... মুক্তির পথ তো আমরা এতকালে জানলাম, তাই মুক্তি নিয়ে তোমার সাথে একাত্ম হয়ে যেতে খুব ইচ্ছা করছে। ...

কিন্তু মা, মুক্তি এখনই নিলে, আমরা যে অনেককে বলে এসেছি, পুণ্যসঞ্চয় করো, তাঁরা ভাববেন পুণ্য সঞ্চয় করেই বুঝি আমরা তোমাকে পেয়েছি। ... তাই তাঁদেরকে বলে আসতে হবে আগে যে, পুণ্য সঞ্চয় নয়, তীর্থযাত্রায় নয়। পাপপুণ্যের বিচার ত্যাগ করলে, তবেই পরমার্থ লাভ হয় । সুখ নয়, স্বর্গ নয়, আমাদের মাতাই যে আমাদের পরমার্থ; আমাদের মাতার মধ্যে চিরতরে অবগাহনই যে আমাদের পরমার্থ, সকলের পরমার্থ"।

মাতা হেসে বললেন, "বেশী দেরী করবে না তো ফিরে আসতে!" ... ঋষি মুচকুন্দ এবার মাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "মা, ভুলে তো আমরা যাবোই, তাই দেরিও করে ফেলবো। ... একবার এই মায়ার জগতে প্রবেশ করলে, আর কি কনো কিছুর কনো হুঁশ থাকে! ...

কিন্তু মা, তুমি আমাদেরকে ডেকে নেবে না!" ... মাতা হেসে বললেন, "কেন ভুলবে কেন! ... তোমরা কি কর্তা! ... কনোকালে তোমরা কনো কর্ম করেছ নাকি!"

ঋষি লোমশ বললেন, "না মা, আমরা তো ভোক্তা! ... তবে! ..." মাতা হেসে বললেন, "তবে আবার কি! ... তোমরা কেবল যাও তাঁদের কাছে। বাকি তোমাদেরকে আমিই সদাকাল চালিয়ে এসেছি, আর আমি এখনও চালাবো। ... নিজেদের কর্তা ভাববে, তবে না ভ্রমে পতিত হবে! ... নিজকে কর্তা ভাবাই যে আদিভ্রম, নিজকে ব্রহ্ম ছেড়ে শিব, শিব ছেড়ে জীব ভাবাই তো আদিভ্রম। ... তাই না!... তাই পুত্ররা, বৈরাগ্যের অভ্যাস করো ফিরে গিয়ে। ... কাজ হয়ে গেলে, আমাকে তোমাদের সম্মুখে দেখতে পাবে"।

ঋষিগণ বললেন, "যেই শকট সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে, সেই শকটেই উঠে বস, আর যেই শকট সম্মুখে আসে নি, তার দিকে ফিরেও তাকিও না। ... নির্বিচারে শকটে বস, আর নির্বিচারে শকট থেকে নামো। ... আমরা শীঘ্রই আসবো মা"। ... এই বলে ঋষিগণ চলে গেলে, মাতার উর্জ্জাপ্রকাশ সেই স্থান থেকে অবলুপ্ত হয়ে মাতার সুচিত্রা অবতারলীলার সমাপ্তি করে"।

দেবী দিব্যশ্রী উল্লাসের সাথে বললেন, "নির্বিচারে থাকো, নির্বিচারে ভ্রম, আর যা তোমার সাথে হচ্ছে, তা সমস্ত কিছু মাতাপ্রভুর ক্রীড়া রূপে উপলব্ধি করতে থাকো। ... আহা, কি সুন্দর! ... জীবন স্বয়ং এক শ্রেষ্ঠ বিনোদন। ... পিতা, এইরূপে জীবনকে দর্শন করলে, জীবন যে স্বয়ংই বিলাসিতা। এতে অন্য কিছু বিলাসিতা করার প্রয়োজন কি! ...

কিন্তু আমরা তো সেই স্বরূপজ্ঞান ছেড়েই দিয়েছি। ব্রহ্মস্বরূপ ছেড়ে, আমরা জীবাণু হয়েই অহংকারে মজে থাকি। ... কিন্তু আমাদের স্বরূপের বিলাস প্রিয়তা যাবে কোথায়! ... সেই বিলাস প্রিয়তার কারণেই ইন্দ্রিয়বিশ্বাসী জীবেরা বিনোদন, তীর্থ, অধিক খাদ্য, সুরাপান, দেহকাম এইসমস্ত রূপে অনুভব করতে যায়।

পুনরায় দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, মাতার পরবর্তী লীলা সম্বন্ধে বলুন না। বড় আনন্দ লাগছে এই কথা শুনতে, বড় উদ্দীপনা লাগছে"। ... প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "কিন্তু এই কথার থেকে মূল সার তো তুমি গ্রহণই করলে না এখনো পুত্রী! ... এর সার তো ব্যক্ত করো"।

দিব্যশ্রী সেই আদেশ লাভ করে বললেন, "এই কথার মূল তত্ত্ব হলো, অধিক থেকে অধিক সাধক, তীর্থভ্রমণ, পুণ্যকর্ম করে পুণ্যসঞ্চয়, ইত্যাদির মধ্যেই নিজদেরকে আবদ্ধ করে ফেলে, নিজদের সাধনকেই নষ্ট করে দেন। ... আসলে পাপ বা পুণ্য সম্বন্ধে মাতা দেবী সুচিত্রার বেশে যেমনটা বলেছেন, ঠিক তেমনটাই । ... একই কর্ম একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তা পাপকর্ম তো অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সেই কর্মই পুণ্য কর্ম। ...

যেমনটা মাতা বললেন, "একটি তস্কর যার থেকে লুণ্ঠন করলেন, তিনি কিছু ব্যক্তিকে দরিদ্র করে, সেই ধন উপার্জন করে বৃত্তবান হয়েছেন। তাই তাঁর তস্করবৃত্তিকে যদি দেখা হয়, তবে সেই তস্কর অবশ্যই পাপী। আবার যদি সেই তস্কর যে সেই অন্যকে দরিদ্র করে বৃত্তবান হওয়া ব্যক্তির ধনকে লুণ্ঠন করে নিচ্ছেন, সেই কর্মকে যদি দেখা হয়, তবে সেই কর্মের মধ্যে আবার পুণ্যেরও দর্শন মেলে। ... একই ভাবে, যেই ব্যক্তিরা সেই তস্করকে ধরছেন, এবং দণ্ড দিচ্ছেন, তাঁরা সমাজের থেকে তস্করবৃত্তিকে অপসারণ করছেন, তাই তা পুণ্যকর্ম। কিন্তু একই সাথে তাঁরা যে সমাজের সেই ব্যক্তিরা যারা কারুকে দরিদ্র করে বৃত্তবান হচ্ছেন, তাঁদেরকে কিছু বলছেন না, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, সেই দণ্ডপ্রদান করেও পাপকর্ম করছেন।

একই সাথে, সেই দণ্ডপ্রদত্তারা যখন তস্করটিকে দণ্ড দিচ্ছেন, সেই তস্করের পত্নী যে নিজের সন্তানদের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে গিয়ে, বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন, বা সেই তস্করের সন্তানরা অনাহারে থাকছেন, সেই কর্মের বিচার যদি করা হয়, তাহলে সেই দণ্ডপ্রদত্তারা অনাবিল পাপকর্ম করছেন। ...

অর্থাৎ মোটকথা এই যে, সমস্ত কর্মের মধ্যেই পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম, উভয়ই বিদ্যমান থাকে। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সেই কর্মকে দেখছি, তার উপর নির্ভর করে, আমি সেই ব্যক্তিকে পাপী বলবো না পুণ্যবাণ বলবো। ... কিন্তু যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সেই কর্মকে দেখি, তবে দেখবো, সেই কর্মের মধ্যে অজস্র পাপধারা ও পুণ্যধারা একত্রে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সঞ্চিত রয়েছে। ... আর এমন সমস্ত কর্মের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।

এক ব্যক্তি যখন সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন, সেই কর্মের মধ্যেও তিনি কারুকে ত্যাগ দিয়ে তাঁকে জীবনযুদ্ধে স্থাপন করে দিচ্ছেন, তাই পাপকর্ম, আবার ঈশ্বরের কর্মের জন্য নিজকে সজ্জ করছেন, তাই পুণ্যকর্ম। ... এমনকি এক সঙ্গম ক্রিয়ার মধ্যেও মোহ, কাম, ইত্যাদি রিপুর সঞ্চার থাকে, তাই পাপকর্ম, আবার সেই কর্মই এক অশরীরী স্বয়ম্ভুকে দেহদান করে, তাঁর নিজের স্বরূপে যাত্রা করার সুযোগ প্রদান করছেন, তাই তা পুণ্যকর্ম। ... অর্থাৎ প্রতিটি কর্মের মধ্যেই, একই সাথে পাপ ও পুণ্য, উভয় ভাবই বিদ্যমান থাকে। ...

তাই আমার কৃতকর্ম পাপ না পুণ্য, এই বিচার অমূলক, অবান্তর, এবং অযৌক্তিক। যেই কর্মই তুমি করো না কেন, কারুকে না কারুকে তুমি সেই কর্ম করে আনন্দদান করছো, তাঁর কাছে তোমার কর্ম পুণ্যকর্ম; আর সেই একই কর্ম করে তুমি কারুকে না কারুকে বেদনা প্রদান করছোই, তাঁর কাছে সেই কর্ম পাপকর্ম। ... কিন্তু বহু বহু সাধক, বহু বহু তপস্বী, এবং বহু বহু আধ্যাত্মিক পথের স্নাতকরা এই পাপপুণ্যের বিচারে বহুসময়, এমনকি বহু জন্মও নষ্ট করে দেন।

আর সর্বাধিক কথা এই যে, এই পাপ বা পুণ্যের সঞ্চয় দ্বারা সত্যলাভ, বা লক্ষ্যপূর্তি কখনোই হয়না। ... কেন হয়না? কারণ তাঁর কাছে যেতে গেলে, তাঁর কাছে মিশতে হলে, সম্পূর্ণ ভাবে খালি হতে হয়; সম্পূর্ণ ভাবে আমাদেরকে মুক্ত হতে হয় সমস্ত বিচারের থেকে; সমস্ত সাদাকালো চিন্তা, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, বিদ্যান-মূর্খ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে খালি হতে হয়। ...

শ্যামাপর্ব আমাদেরকে কি শেখালো? ... আমাদেরকে এই শেখালো যে আমাদেরকে সমস্ত লজ্জাবস্ত্র ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ নির্লজ্জ হতে হয়। ... এক ব্রহ্মই সম্পূর্ণ নির্লজ্জ, আর এক সেই নির্লজ্জ ব্রহ্ম হতে পারলে, তবেই আমরা সত্যে স্থিত হতে পারি, আমরা মাতার সাথে মিলিত হতে পারি। ... যতক্ষণ না আমরা নির্লজ্জ হতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের সত্যলাভ সম্ভব নয়। ... আর এই সমস্ত পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ, সত্যমিথ্যা, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক বিচার তো আমাদেরকে সেই নির্লজ্জটিই হতে দেয়না। আমরা সেই ভ্রমের আস্তরণ অঙ্গে রেখে দিই। ...

আমরা সেই মনে করতে থাকি যে আমরা কিছু না কিছু। হয় আমরা পাপী, নয় পুণ্যবান; হয় আমারা সুখী, নয় দুঃখী; হয় আমরা ন্যায়নিষ্ঠ, নয় আমরা দুরাচারী; হয় আমরা পুরুষ, নয় আমরা প্রকৃতি; হয় আমরা ঠিক, নয় আমরা ভুল। ... আর যতক্ষণ সেই সকলকিছুতে মন থাকবে, ততক্ষণ আমরা নির্লজ্জ হতে পারলাম কোথায়? সত্য অর্থে, আমরা সকলেই একই সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ এবং দুরাচারী; একই সঙ্গে পাপী এবং পুণ্যবান; একই সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতি। যদি নির্লজ্জ হতেই না পারি, তবে আমরা ব্রহ্মের সাথে একাত্ম হবে কি করে? মিলন আমাদের হবে কি করে? আমাদের জীবন সার্থক হবে কি করে?

আর তীর্থ কি? তীর্থ তাই, যা আমাদের কাছে এই তত্ত্বকেই স্পষ্ট করে দেয়। তীর্থ কনো মোক্ষধাম নয় যে, সেখানে কষ্ট করে বা কোন না কোন ভাবে পৌঁছাবো আর আমরা মোক্ষ লাভ করে যাবো। ... তীর্থ তাই, যা আমাদের মোক্ষের ধারণা প্রদান করে। আমরা কেন মোক্ষলাভ করছি না, সেই তত্ত্বকে আমাদের সম্মুখে যা রাখে, তাই তীর্থ। ... আর তাই তীর্থ আমাদের কাছে এই বোধই স্পষ্ট করে যে, সমস্ত কর্মের মধ্যেই যেমন পাপ আছে, তেমন পুণ্যও আছে। ...

কিন্তু একই সাথে তীর্থ আমাদের কাছে এটিও স্পষ্ট করে দেয় যে, আমরা কি পাপ, কি পুণ্য, উভয়ের সঞ্চয়ের জন্যই মোক্ষ লাভ করতে না। আর সত্য তো এই যে, যার হৃদয়ের মধ্যে এই ভাব থাকে যে, তিনি পুণ্যবাণ, তিনি তো মোক্ষলাভ করতেই পারেন না, কারণ সর্বক্ষণ তাঁর মধ্যে নিজকে পুণ্যবাণ, এবং অন্যকে পাপী ভাবার প্রয়াস বর্তমান থাকে। ...

এক কথায়, যতক্ষণ আমরা এই মনে করবো যে আমিই একমাত্র সঠিক, আর অন্য কেউ সঠিক নয়; বা যতক্ষণ আমরা এমন ভাববো যে আমার মত যারা ভাবেন, তারাই ঠিক, অন্য সকলে ভুল, সকলে ভ্রান্ত, ততক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের অধিকারীই আমরা নই।

আর কেন সেই অধিকার আমরা ধারণ করিনা, তা তো দেবী সুচিত্রা, মাতা সর্বাত্মা বেশে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। ... তিনি কি বললেন, সন্তান যতক্ষণ কনো না কনো খেলা নিয়ে মত্ত, ততক্ষণ তিনি মাতার ক্রোর লাভ করেন না। ... কিন্তু যখন সন্তানের সমস্ত বোধই তাঁর মাতা হয়ে ওঠে, তখনই তিনি মাতার ক্রোর লাভের অধিকারী হয়ে ওঠেন। ... অর্থাৎ, আমরা যতক্ষণ কনো না কনো ভেদভাবের খেলা নিয়ে মত্ত থাকি, আর সেই খেলায় মত্ত থেকে মনে করি যে, অমুক ঠিক, অমুক ভুল; অমুক সঠিক, আর অমুক ভ্রান্ত; অমুক জ্ঞানী আর অমুক মূর্খ, ততক্ষণ আমরা মাতার ক্রোর লাভের অধিকারী নই।

তিনি মাতা, আর তাই তিনি কিছুতেই এটি সহ্য করেন না যে, তাঁর কোন একটি সন্তান অন্য একটি সন্তানকে ঘৃণা করুন, বা হেয় করুন, বা নিন্দা করুন। ... যখন আমরা সকলের সকল অবস্থানকে তাঁর নিরিখে সঠিক অবস্থান মনে করে নিতে পারি, তখনই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে উঠি, কারণ তখনই আমরা এটি অনুভব করি যে, সকলেই ব্রহ্ম, আর সকলেই তাই সঠিক, কিন্তু সকলেই ভ্রমিত, তাই যে যার নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে সঠিক। ...

এই সাম্যভাব আমাদেরকে পাপ-পুণ্য, জ্ঞানী-মূর্খ, ইত্যাদি সকল ভেদের থেকে মুক্ত করে দেয়, আর যতক্ষণ না আমরা সেই ভেদভাব থেকে মুক্ত হই, ততক্ষণ আমরা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসরও হতে পারিনা। ... হ্যাঁ যিনি আমার সাধনাকে নষ্ট করতে আসছেন, আমাকে অবশ্যই তাঁর থেকে দূরে থাকতে হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি দুরাচারী বলেই আমার সাধনাকে নষ্ট করতে আসছেন। তিনি যেই অবস্থায় রয়েছেন, তাঁর ভ্রমের মধ্যে, সেই নিরিখে, তাঁর এটাই বোধ হওয়া স্বাভাবিক যে সাধনা অমূলক বা অহেতুক, আর সেই কারণেই তিনি সাধনার বিরোধ করছেন।

তাই এক সাধককে সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর সাধনাকে নষ্ট করে দিতে উদ্যত, তাঁর থেকে দূরে স্থিত থাকতে হয় সাধককে। একই সাথে সাধককে সেই দূরত্বকে এমন ভাবেই কৌশলদ্বারা স্থির করতে হয়, যাতে সেই সাধনকে নষ্টকারী ব্যক্তি তাঁর সন্নিকটে না আসতে পারেন । কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরেও, সাধক যেন ঘুণাক্ষরেও এমন না মনে করেন যে, সেই ব্যক্তি দুরাচারী বা তিনি জাতির জন্য বিপজ্জনক। ... প্রতিটি জীবই কনো না কনো ভাবে জাতির জন্য বিপজ্জনক, আর সেই জীবই অন্য কনো ভাবে জাতির জন্য শুভ। ...

অর্থাৎ, দেবী সুচিত্রার এই কথা আমাদেরকে সমস্ত প্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে বেড়িয়ে এসে, নিজকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিতে বলছে, যেখানে আমরা আমাদের সম্মুখে যা আসবে, তা ঈশ্বরের প্রেরণাতেই আমাদের সম্মুখে এসেছে, এমন অনুভব করে, অনায়সেই তা গ্রহণ করি; আর যা আমাদের কাছে আসেনি, তাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করি। ...

এমন আমরা প্রায়শই করতে থাকি। একটি ঘটনা ঘটেছে, আর সেই ঘটনার থেকে অন্য কি সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে, সেই চিন্তায় আমরা অনেক কিছু কর্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই, আবার কখনো কখনো সেই সমস্ত কর্ম করেও নি, যাতে যা ঘটতে পারে, তা যাতে না ঘটে। ... আর এই ক্রিয়া করতে গিয়েই আমরা হাজারো কর্মের বন্ধন নির্মাণ করে ফেলি আমাদের, যার জাল কাটতে কাটতে আমাদের সহস্র দেহ নিয়ে নিতে হয়।

ঈশ্বরের কাছে যাবার একটিই সর্ত, আর তা হল সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। ... বন্ধন তা নয়, যা অন্যরা আমাদের উপর স্থাপন করার চেষ্টা করছেন। বন্ধন তা যাকে আমি বন্ধন মনে করছি । ... যিনি মনপ্রাণ দিয়ে সংসার করছেন, বা যিনি সংসার করতে চাইছেননা, এই দুইজনের কাছেই সংসার একটি বন্ধন। ... যিনি মনপ্রাণ দিয়ে সংসার করতে চাইছেন, তাঁর কাছে সেই বন্ধন প্রিয়, আর যিনি সংসার করতে চাইছেন না, তাঁর কাছে সেই বন্ধন অপ্রিয়। ... কিন্তু এই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত তিনিই, যিনি সেই

সংসারের বন্ধনের মধ্যে থেকেও, সেই বন্ধনকে বন্ধন বলে অনুভব করেন না, আহার নিদ্রার জন্য সংসারে মন রাখছেন, আর আহারনিদ্রা হয়ে গেলেই সংসার থেকে মন অন্যত্র অপসরণ করছেন।

বিষ্ঠার দুর্গন্ধের কাছে আমরা সকলেই বন্দি, কেউই তা সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এক মেথরের কাছে সেই গন্ধ তাঁর মধ্যে কনো প্রতিক্রিয়া ফেলেনা, তাই তিনি সেই বন্ধন থেকে মুক্ত। ... অর্থাৎ, মধ্যা কথা এই যে আমাদের মন, বুদ্ধি বা আত্মার উপর যা কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাই আমাদের বন্ধন। কিন্তু যা কিছু আমাদের মন, বুদ্ধি বা আত্মার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা, আমরা সেই বন্ধনের থেকেই মুক্ত।

অর্থাৎ সুচিত্রা কথা আমাদের এই বলছে যে, আমাদেরকে বন্ধনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। ... বন্ধন সমস্ত কিছুই। স্বয়ং ব্রহ্মময়ী মাতার কাছেও আমরা বন্দি; যতক্ষণ আমরা স্বয়ম্ভু হয়ে থাকবো, যতদিন আমরা ভ্রমিত হয়ে থাকবো, ততদিন তাঁর বন্দি হয়ে থাকবো। কিন্তু তাঁর বন্ধন কি শ্যামার কাছে বন্ধন মনে হয়? না তো, কিন্তু তাঁর বন্ধন আমাদের কাছে বন্ধন, মহাবন্ধন। ... কত কিছু করার ইচ্ছা আমাদের থাকে, কিন্তু তাঁর সেই বন্ধনের কারণে আমরা করতে পারিনা। ... কত চমৎকার করার, বা চমৎকার দেখার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তাঁর বন্ধনের কারণে আমরা তা করতে পারি না। ...

অর্থাৎ বন্ধন সমস্তকিছুই। ... কিন্তু কোনকিছুই বন্ধন নয়, যদি সেই বন্ধন আমাদের মন, বুদ্ধি ও আত্মাকে প্রভাবিত করতে না পারে। শ্যামাকে যেমন মাতার বন্ধন প্রভাবিত করতো না, আবার ভয়ানক ভাবে প্রভাবিত করতো, কারণ তিনি সেই বন্ধনের প্রতিই আসক্ত ছিলেন। ... আর সেই বন্ধনের প্রতি আসক্তিকেই তিনি বলতেন তাঁর লজ্জাবস্ত্র। ... আর এই বলতেন যে যেদিন তিনি তাঁর সেই লজ্জাবস্ত্রকে ত্যাগ করতে পারবেন, সেদিন তিনি স্বতঃই মাতার সাথে মিলনে আবদ্ধ হবেন, কারণ মাতাও তখন সমস্ত বন্ধনমুক্ত ব্রহ্ম, আর তিনিও অনুরূপ ভাবে তখন ব্রহ্ম। ... আর সেই বন্ধনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, সদামুক্ত ব্রহ্ম হয়ে ওঠারই আহ্বান ছিল, দেবী সুচিত্রার এই কথা"।

একটি কথা আমার অদ্ভুত সুন্দরও লেগেছে, আর একই সঙ্গে, সেই কথাকে আমার বড় রহস্যময়ও লেগেছে। আসলে আমার যেন মনে হলো, এই কথাটির মধ্যে অনেক কথাকে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, আর সেই কথা হলো মাতা সর্বাম্বার মুখের সেই বাণী - মাতার ক্রোর থেকে সেই শিশুই বঞ্চিত, যে কনো না কনো ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে রয়েছেন। ... এর অর্থ কি পিতা? এর ব্যাখ্যা কি? যদি এক সদ্যজন্মা শিশুর কথাও বলি, তবে তো সেই শিশু মাতার ক্রোরেই থাকেন, যতই তিনি ক্রীড়ায় মত্ত থাকুন না কেন। ... তবে, এর অর্থ কি?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন সেই প্রশ্ন শুনে তৃপ্ত হয়ে বললেন, "পুত্রী, সকল স্বয়ম্ভু মাতারই গর্ভে স্থিত, সেই কথা তো পূর্বেই জেনেছ তোমরা । অর্থাৎ আমরা কেউ, কখনোই মাতার ক্রোর থেকে কনোসময়েই চ্যুত ছিলাম না। একটি সদ্যজন্মা শিশুকে দেখ পুত্রী, সে সর্বদা

মাতারই ক্রোরে স্থিত থাকে। ... মাতা তাঁকে ক্রোর থেকে নামিয়ে দেবার প্রয়াস করলেই, সে ক্রন্দন করে ওঠে। ... তাই মাতাকেও অপেক্ষা করতে হয়, কবে তাঁর শিশু নিদ্রা যাবেন। তখনই তিনি তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখে, নিজের নিত্য কর্ম করেন।

আবার সেই কালেও শিশুকে দেখ। সেই শিশু নিদ্রা অবস্থাতেও, যখন মাতার ক্রোর থেকে বিছানায় শায়িত হন, তখন তাঁর মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা যায়, যদিও সেই চাঞ্চল্য অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয়না। ... কিন্তু আবার লক্ষ্য করো, এক শিশুর নিদ্রা খুব অল্প সময়ের হয়, কিন্তু সেই সকল সময়ে, অর্থাৎ নিদ্রার বাইরে থাকা সকল সময়ে, তাঁর মাতার ক্রোর লাগলেও, তিনি কিন্তু মাতার ক্রোরে থেকে, মাতার দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না। ...

অনেক সময়ে তাঁর মাতার দিকে কনো বোধও থাকে না; সে তাঁর নিজের হাতের কনো এক বস্তুকে নিয়ে ক্রীড়া করতে থাকেন, আর সেই ক্রীড়াতেই মত্ত থাকেন। কিন্তু মাতা কি করেন সেই সময়ে? মাতা সেই সময়ে নিজের সমস্ত আনুষঙ্গিক কর্ম করে নেন। ... শিশুর আহার প্রস্তুত করে নেন। শিশুর বস্ত্র, যা ধৌত করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়েছেন, সেই সকলকে ভাঁজ করে পরিপাট করে নেন, ইত্যাদি বহু কর্ম সম্পন্ন করে নেন। ... অর্থাৎ সেইকালে মাতা শিশুর দিকে তাকানও না, কেবলই তাঁকে ক্রোরে রেখে, সমস্ত কর্ম করতে থাকেন, আর শিশুটিও নিজের মত খেলায় মত্ত থাকেন।

কিছু কিছু সময়ে এমনও হয় দেখবে, সেই শিশুটি বেশ কিছুক্ষণ ক্রীড়া করার পর, অকস্মাৎই ক্রন্দন করে ওঠেন, নিজের ক্রীড়া ছেড়ে। ... তখন মাতা, নিজের ক্রোরকে সামান্য নাচিয়ে নেন, আর শিশুটি মাতার ক্রোরের সেই নাচন অনুভব করে, ক্রন্দন থামিয়ে, মাতার মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসেন। ... বলতে পারো পুত্রী, কেনই বা শিশুটি এই ক্ষেত্রে ক্রন্দন করলেন, আর কেনই বা মাতা নিজের ক্রোরটি খানিক নাচিয়ে নিলেন, আর কেনই বা শিশুটি তারপর হেসে উঠলেন?"

দেবী দিব্যশ্রী উত্তর দেবার প্রয়াস করে বললেন, "আসলে পিতা, শিশুটি ক্রীড়া করতে উন্মত্ত হয়ে ওঠার পর, সে ভুলেই গেছিল, সে মাতার ক্রোরেই রয়েছে। মাতার ক্রোরের বোধ হারিয়ে ফেলার জন্যই তিনি এমন ক্রন্দন করে উঠলেন। মাতাও শিশুর ভাব বুঝে যান, তাই তিনি সামান্য নিজের ক্রোরকে নাচিয়ে নিয়ে শিশুকে বুঝিয়ে দেন যে, সে তাঁরই ক্রোরে শায়িত রয়েছে। ... আর শিশুটিও মাতার সেই বার্তাকে অনুভব করে, মাতার প্রতি হাস্য প্রদান করেন"।

ব্রহ্মসনাতন সেই কথাতে হাস্য প্রদান করে সম্মতি প্রদান করে বললেন, "দেখলে তুমি সমস্ত কিছুই জানো পুত্রী। সহস্র যোনি হয়ে আমরা মানব হয়েছি। অজস্রবার আমরা শিশুর মাতা হয়েছি, শিশুর পিতা হয়েছি, কারুর ভ্রাতা বা ভগিনী হয়েছি; অজস্রবার আমরা কারুর সন্তান হয়েছি; অজস্রবার আমরা কারুর পতি বা পত্নী হয়েছি, কারুর সতিন হয়েছি, তো কারুর শত্রু হয়েছি। আর সেই সমস্ত কিছুর স্মৃতি আমাদের চেতনার কাছেই সঞ্চিত থাকে। ... প্রয়োজন কেবলই সেই স্মৃতিকে উত্তোলনের। ...

যাই হোক, তবে দেখলে তো পুত্রী, শিশু মাতার ক্রোরেই থাকেন, কিন্তু মাতার ক্রোরে শায়িত থাকা অবস্থাতেও, যখন ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে ওঠেন, তখন এটি ভুলে যান যে, তিনি মাতারই ক্রোরে শায়িত রয়েছেন। ... ঠিক একই ভাবে, আমরাও সর্বক্ষণ জগন্মাতার ক্রোরেই বর্তমান থাকি। কিন্তু কনো এক ক্রীড়ায় আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠলে, আমরা মাতাকে ভুলেই যাই। যখন মাতাকে ভুলে, খেলতে মত্ত থাকি, তখন মাতা নিজের সমস্ত কর্ম করে নেন। ...

আবার যখন আমাদের ক্রীড়ার সমাপ্তি হয়, তখন শিশু কি করেন? ... না তিনি ভুলেই যান যে তিনি মাতারই ক্রোরে শায়িত, আর তা ভুলে গিয়ে, ক্রন্দন করেন, আর তখন মাতা কি করেন? মাতা নিজের ক্রোরকে নাচিয়ে শিশুকে বলে দেন যে, তিনি তাঁর মাতারই ক্রোরেই শায়িত রয়েছেন, আর তা বোঝামাত্রই শিশুর ক্রন্দন থেমে যায়, আর তাঁর হাস্য বেড়িয়ে আসে। ... এই ক্রীড়ার কথাই মাতা সর্বাত্মা বলেছেন ঋষিদেরকে"।

দিব্যশ্রীর মনের জিজ্ঞাসা তখনও শান্ত হয়নি। তিনি বললেন, "কিন্তু পিতা, কি সেই ক্রীড়া, যাতে শিশুটি মত্ত থাকেন?... শিশু সাধারণত এমন কিছু ক্রীড়াতে মত্ত থাকেন, যা কনো শব্দ করে। অধিক ক্ষেত্রেই তা কনো বিচিত্র শব্দ করা বস্তু বা ব্যক্তি হন। ... শিশু যখন মাতার ক্রোরে শুইয়ে থাকেন, তখন কেহ যদি তাঁর নিকটে এসে কোন বিচিত্র আওয়াজ করেন, তখন শিশু প্রথমে মাতার দিকে তাকান, দেখার জন্য যে যেই উৎপত্তি থেকে শব্দটি আসছে, মাতার কি সায় আছে সেই উৎপত্তির দিকে । ... যদি মাতার নেত্রে হাস্য দেখেন, তখনই সেই শব্দের উৎসের দিকে শিশু মন দেন। ... আর একবার সেই শব্দের উপর মন গেলে, তবেই শিশু ক্রমশ সেই শব্দের মধ্যে হারিয়ে যান। ... কিন্তু এই শব্দ কিসের ইঙ্গিত দেয়?"

প্রপভু ব্রহ্মসনাতন তৃপ্ত হয়ে বললেন, "সঠিক পুত্রী, কিন্তু সেই শব্দ শিশুকে কেন আকর্ষণ করে জানো? ... আসলে সেই শব্দ শুনে, শিশুর মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, আর তার এমন মনে হয় যে, সেই শব্দকে যেন নিজের সাথে মেলাতে পারছেন, যেন তার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে পাচ্ছেন। ... আর সেই ভাবনার কারণেই, তাঁর মন, ভাবনা সকলকিছু সেই শব্দের দিকে যায়"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এর অর্থ সেই ক্রীড়া অন্য কিছুই নয়, নিজেকে নিয়ে ভাবনা? ... বা বলা যেতে পারে যে, 'আমি', 'আমার' এর ভাবনা?" ... ব্রহ্মসনাতন হাস্যবশে বললেন, "হ্যাঁ পুত্রী, সঠিক বলেছ, 'আমি'... অর্থাৎ আত্মপরিচয়। ... এই আত্মপরিচয়কে খুঁজে পাওয়া নিয়েই তো যত ভ্রমের সূত্রপাত। ... যখন পরব্রহ্মের মধ্যে বিলীন থেকে, এই 'আমি'কেই সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করতে পারছিলেন না কনো বিদ্রোহী ভ্রমঅণু, তখনই তো তিনি স্বয়ংকে প্রকাশ করে হন স্বয়ম্ভু। ... আর তখন থেকেই সেই স্বয়ম্ভুঅণু এই একই প্রশ্ন করে আসছেন, 'আমি কে?' ...

লক্ষ লক্ষ শরীর ধারণ করেন তিনি, লক্ষ লক্ষ যোনিতে স্থিত হন, সেই একটিই প্রশ্নের উত্তরকে লাভ করার জন্য, অর্থাৎ 'আমি কে?' ... কখনো সে মনে করে যে, সে ব্যঘ্রটি, গরুটি, গাধাটি, বা ইত্যাদিটি, তো এমন লক্ষ লক্ষ যোনির দেহ ধারণ করে তাঁর মনে হয় যে,

তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ শরীরটি। ... আবার কখনো তিনি সেই ইন্দ্রিয়ের পারে স্থিত হয়ে গেলে, তাঁর ধারণা হয় যে তিনি হলেন সমস্ত পঞ্চভূতদ্বারা নির্মিত শরীরটি, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, উর্জ্জা, প্রাণ, এবং দেহদ্বারা নির্মিত 'আমি'টি।

আবার কখনও তিনি জ্ঞান অর্জন করে, ধ্যানের দ্বারা, এবং ইত্যাদি দ্বারা অনুভব করেন যে, তিনি হলেন স্বয়ম্ভুটি বা পুরুষটি, অর্থাৎ আত্মাটি। ... আর এইভাবেই সমানে তিনি নিজের আত্মকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। ... কিন্তু পুত্রী, মজার কথা এই যে, যতক্ষণ এই 'আমি' নামক ক্রীড়ায় উন্মত্ত থাকি আমরা, এই শিশুগুলি, ততক্ষণ মাতা আমাদের দিকে তাকানও না, আর তিনি নিজের কর্মসকলকে সম্পন্ন করে ফেরেন। ... অন্তে যখন আমাদের এই ক্রীড়ারূপ ভ্রমের সমাপ্তি হয়, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, এই 'আমি কে' প্রশ্নের কনোভাবেই আমরা উত্তর পাচ্ছি না, তখনই আমরা মাতার দিকে তাকাই, আর তখনই আমরা অনুভব করি যে, আমরা তো সেই মাতার অভিন্ন অঙ্গ, অর্থাৎ ব্রহ্মই, আর তখন আমরা অন্তিম উত্তর প্রদান করি যে, 'অহম ব্রহ্মাস্মি', অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মই।

অর্থাৎ পুত্রী, আমাদের সেই ক্রীড়ার নাম হলো 'আমি কে?' ... এই প্রশ্ন আর তার উত্তর অনুসন্ধানই আমাদের ক্রীড়া, আর আমরা সেই ক্রীড়াতেই মত্ত থাকি। ... যাকিছু আমাদের ধারণা করা 'আমি'কেই আকর্ষণ করে, সেই সমস্ত কিছুতেই আমরা আকৃষ্ট হই । ... শিশু যেমন ঝুমঝুমির শব্দে, নিজের ইন্দ্রিয়দের অস্তিত্বকে অনুভব করে, নিজের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ আমিকেই স্পষ্ট করে জানেন যে তিনি, আর সেই ভাবে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে যান, তেমন আমরাও আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু শুনি, যা কিছু দেখি আর যাকিছু অনুভব করি, যখন দেখি তা আমার পঞ্চভূত নির্মিত শরীরের সাথে বন্ধনে যুক্ত হতে চাইছে, তখনই আমরা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি।

আমাদের দেহের কাছে এগিয়ে আসা বস্তুই আমাদের আকর্ষণ, জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহলের বিষয় হয়। আমাদের নেত্রের সম্মুখে আসা বস্তুই আমাদের একই ভাবে কৌতূহলের বিষয় হয়, কর্ণ দ্বারা শোনা কথাই আমাদের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়, ঘ্রাণ লাভ করা বস্তুই, স্বাদে মধুর বা উত্তেজনাকর বস্তুই আমাদের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়। ... আর সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমরা কৌতূহলী হই কেন? কারণ তারা সকলে আমাদের পঞ্চভূতকে সত্য বলে মনে করায়, আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে সত্য বলে মনে করায়, আর আমাদের আত্মা বা স্বয়ম্ভুকে সত্য বলে মনে করায়।

কিন্তু মজার কথা এই পুত্রী যে, সেই সমস্ত অনুভূতি আমাদেরকে এক দ্বন্দ্বের সাগরে পতিত করে দেয়। ... আমরা মনে করতে থাকি যে এই ইন্দ্রিয়রাই আমার অস্ত্র, এই পঞ্চভূত নির্মিত দেহই আমি, এই আত্মাই আমি... কিন্তু সেই সমস্ত কিছুকে 'আমি' ও 'আমার' মেনেও, আমরা তৃপ্ত হইনা, উল্টে, আমরা আরো অধিক চঞ্চল হয়ে গিয়ে, আমাদের সমস্ত শান্তিকেই নষ্ট করে দিই। ... আর সেই সকল চাঞ্চল্যের কারণে, সকল অশান্তির কারণে, আমরা আমাদের সত্য, অর্থাৎ মাতাকেই বা চেতনাকেই ভুলে যাই। ... ভুলেই যাই যে, আমরা তাঁর ক্রোরেই শায়িত, আর আমরা তাঁরই অভিন্ন অঙ্গ, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই, যার কোন আদি নেই, কোন অন্ত নেই।

ভুলে যাই যে, ইন্দ্রিয় আমাদের সীমা নয়। যা আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, শুনতে পাচ্ছিনা, আমরা তাও জানতে পারি, কারণ আমরা কখনোই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ ছিলাম না। ... ভুলে যাই যে, আমরা পঞ্চভূতের দ্বারা আবদ্ধ নই। যা আমাদের বুদ্ধি স্থির করতে পারছে না, তাও ঘটছে; যা আমাদের মন ভাবতেও পারছে না, তাও ঘটে চলেছে; যেই ঘটনা পর্যন্ত আমার উর্জ্জা চালিত হতে পারছে না, সেই ঘটনাও আমি অনুভব করতে পারছি; যেই স্থানে আমার সাথে প্রাণ ছিলনা, সেই মৃত্যুর পরের সময়কালেরও ব্যাখ্যা আমি পাচ্ছি। ...

ভুলে যাই যে, আমরা কেবলই এই আত্মাতেই সীমিত নই। যদি এই আত্মাতেই সীমিত থাকতাম, তবে যেই স্মৃতি আমাদের আত্মার কাছে নেই, যেমন তুমি শিশুর ব্যাপারে এতোকিছু জানো, তা তো তোমার স্মৃতিতে নেই, তবে তা জানছো কি করে! ... অর্থাৎ পুত্রী, এই 'আমি'র ভাবনার কারণেই আমাদের এই আত্মারূপী, পঞ্চভূতরূপী, পঞ্চইন্দ্রিয়রূপী ভ্রমভ্রান্তির সূত্রপাত, আর এই 'আমি'র ভাবনার কারণেই আমাদের ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রম। ... আর সত্য এই যে, যতক্ষণ আমরা এই 'আমি কে?' ভাবনার জন্য পুষ্টির সন্ধান করি, ততক্ষণ, আমরা সত্য অর্থে, এই 'আমি কে?' প্রশ্নের উত্তরও লাভ করিনা। ...

কেবলই 'আমি এটা' , 'আমি ওটা', এই সমস্ত করতে থাকি, আর তার কারণে আমরা এই ভাবনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকি যে, 'আমার সাথে এমন হচ্ছে', 'আমার এমন মনে হচ্ছে', 'আমি এমনটা ভেবেছি', 'আমার সাথেই কেন এমন হয়', ইত্যাদি ইত্যাদি। ... আর তাই আমাদেরকে এই 'আমি কে?' প্রশ্ন থেকে প্রথম সরে যেতে হয়।

পুত্রী, সাধনা যখন আমার শুরু হয়নি, তখন আমার মনেও এই প্রশ্ন ওঠে যে, 'আমি কেন বাঁচছি? কি হবে আমি না বাঁচলে?' ... যখন সেই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে আমি এদিক সেদিক যাচ্ছিলাম, আর প্রগলের মত সমস্ত কিছুকে নিজের সাথে সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম, আর ধারণা প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করছিলাম যে, 'নিশ্চয়ই আমি এই কারণে বাঁচছি' ... তখন তখন আমার মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হত, আর আমি বুঝতে পারতাম যে, 'আমি কেন বাঁচছি' প্রশ্নের উত্তর আমি লাভ করি নি।

এমনই সন্ধান ও অনুসন্ধান দীর্ঘকাল চলার পর, দেবদূতের ন্যায়, আমার সম্মুখে একজন উপস্থিত হন, আর তিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর ঠিক পূর্বের দিন, আমাকে বলে যান, 'যতক্ষণ তুমি আমির সন্ধান করবে, ততক্ষণ তুমি আমিকে খুঁজে পাবেনা । ... আমির সন্ধান ছেড়ে, সত্যের সন্ধান করো। ... সত্যকে জেনে গেল, তুমি এটাও জেনে যাবে যে তুমি কে'। ... এরপরেই পুত্রী, আমি জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা করি, আর ক্রমশ সমস্ত গ্রন্থের নির্যাশ থেকে, সত্যের ধারণা সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবকে লাভ করি । ... কখন সেই সত্যের ভান করতে করতে, 'আমি কে?' প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম, তা বুঝতেই পারলাম না'। ...

অর্থাৎ পুত্রী, এই 'আমি'ই হলো সেই ক্রীড়া, যাতে মজে থাকলে, জগন্মাতা আমাদের দিকে না তাকিয়ে নিজের কর্মে মনযোগী হন। ... আর যতক্ষণ আমরা সেই 'আমি' নামক ক্রীড়াতেই মত্ত থাকি, ততক্ষণ আমরা আমাদের সত্যকে, আর আমাদের মাতাকে, যারই অভিন্ন অঙ্গ আমরা, তার থেকে বিচ্যুত থেকে, অশেষ দুর্গতি লাভ করতে থাকি। ... এই 'আমি' নামক ক্রীড়ার অন্ত হলেই, আমরা

মাতার সন্ধান করি, আর মাতা তখন নিজের ক্রোর নাচিয়ে আমাদেকে বলে দেন, আমরা তাঁরই ক্রোরে ছিলাম, আছি আর সদাই থাকবো।

পুত্রী, এই 'আমি' নামক ক্রীড়ার থেকে মুক্ত হবার জন্যই সমস্ত কৌশল, সমস্ত যোগকৌশল। ... আমরা যখনই কিছু ভাবি, যখনই কিছু বলি, সমস্ত সময়ে, আমাদের আমিটাকে নিয়েই ভাবি। ... আমার কি হবে, আমার কি হলো, আমার সাথে এসব কি হচ্ছ, ইত্যাদি প্রশ্নের মধ্যেই আমরা স্থিত থাকি। ... তাই যাতে বুদ্ধি এই সমস্ত প্রশ্ন ভাবতেও না পারে, আর বলতেও না পারে, আর যাতে অন্তে বুদ্ধি কেবল সত্যের কথা বলতে পারে, যেখানে 'আমি' বা 'আমার' উল্লেখ বা এদের ভাবনাও নেই, সেই কারণেই মৌনতা ধারণ।

এই মৌনতা ধারণের কালে, বুদ্ধিকে না তো কিছু ভাবতে দেওয়া হয়, আর না কিছু বলতে। ... যখন দীর্ঘকাল এমন করার ফলে , বুদ্ধি কিছু বলার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলতে দেওয়া হয়, আর তখন তিনি এতাবৎকাল মৌনধারণ করা অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে কি দেখলেন, তা বলতে শুরু করেন, যেখানে 'আমি' থাকেনা। ... আর এই ভাবে বুদ্ধিকে সত্যের ধারণা করতে বাধ্য করা এক যোগকৌশল, যাকে কি বলি আমারা? মৌনধারণ।

আবার দেখ পুত্রী, প্রানায়ম কি? সেও এক যোগকৌশল। কিন্তু এখানে কি করা হয়, বা কি করতে হয়? ... প্রানায়ম হলো অন্তর্বর্তী মনঃসংযোগ। ... যেমন বাহারি মনঃসংযোগে, কি করো? যেকোনো একটি ইন্দ্রিয়ে মনকে স্থাপিত করে রেখে, বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের থেকে মনকে অপসারিত করে নাও । তেমনই প্রানায়মের ক্ষেত্রে, দেহ, উর্জ্জা, বুদ্ধি, ইত্যাদি সকল ভূতের থেকে মন অপসারিত করে নিয়ে, কেবল পবন আমাদের অন্তরে কি ভাবে প্রবেশ করছে, কোথায় কোথায় যাত্রা করছে, এবং কি ভাবে নিঃসৃত হচ্ছে সমস্ত দেহের মলকে সঙ্গে নিয়ে, তার উপর মনঃসংযোগের ক্রিয়া হলো প্রানায়ম । ... অর্থাৎ সেই কৌশলকেও দেখ, যাতে আমরা পঞ্চভূতের শরীর, এই ভাবনার থেকে মুক্ত হতে পারি, সেই কারণেই এই কৌশলের উৎপত্তি করেছেন সনাতন বৌদ্ধগণ।

একই ভাবে আসনের ক্ষেত্রেও দেখ। বৃক্ষাসন, ভুজাঙ্গাসন, ধনুরাসন, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত আসন। কি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে? ... নিজের 'আমি' কে ভুলে যেতে হয়, আর বৃক্ষাসনের ক্ষেত্রে বৃক্ষের সত্ত্বাকে ভান করতে হয়, অর্থাৎ নিজকে বৃক্ষ অনুভব করতে হয়; ভুজাঙ্গাসনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিজের 'আমি'কে ত্যাগ করে, নিজকে ভুজঙ্গ অনুভব করতে হয়; ... অর্থাৎ এই কৌশলও তেমনই এক কৌশল, যা বৌদ্ধরা নির্মাণ করেছিলেন, নিজের এই 'আমি' নামক ক্রীড়া থেকে নিজকে মুক্ত করার জন্য।

আবার কর্মযোগকে দেখ। ... অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার কথা বলে তা। অনাসক্ত হয়ে কর্মের অর্থ কি? আমরা কনো কর্মের ফলকে নিয়ে কেন আসক্ত হই? কারণ সেই কর্মের ফল আমাদের 'আমি'কে পুষ্টি প্রদান করে । ... আর তাই যখনই আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি, তখনই এই 'আমি'র সাথে সেই কর্মের সমস্ত সম্পর্ককেই আমরা নস্যাৎ করে দিই। ... অর্থাৎ এও আরো এক কৌশল, আমাদের 'আমি' ক্রীড়ার থেকে আমাদের নিজদেরকে মুক্ত করার জন্য।

একই ভাবে ভক্তিকেও দেখ। ... ভক্তির পরাকাষ্ঠা তখনই সিদ্ধ হয়, যখন আমরা ভক্তির সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়ে, নিজকে হারিয়ে, নিজ আরাধ্যকেই কেবল দেখতে পাই। ... অর্থাৎ এও এক 'আমি'র থেকে মুক্তির কৌশল। ... একই ভাবে ধ্যানযোগও কি? সেখানেও তো সমস্ত বোধ থেকে নিজকে মুক্ত করে, বোধশূন্য হতে হয়। বোধ, এই বোধই তো আমাদের 'আমি'কে ঘিরে স্থাপিত থাকে, তাই না? ... এই বোধ কে ত্যাগ করার অর্থ কি? (হেসে) সেই 'আমি'র থেকে মুক্ত হওয়া। ...অর্থাৎ পুত্রী, সমস্ত বৌদ্ধযোগকৌশল, যার থেকে শারীরিক উপকার লাভ করার ফলে পরবর্তীতে ব্রাহ্মণরা যারা বরাবর শরীরসর্বস্ব, তাঁরাও গ্রহণ করেন, তা কি জন্যে স্থাপিত? একটিই উদ্দেশ্যে, যাতে আমরা 'আমি'র চিন্তা থেকে মুক্ত হই।

পুত্রী, এই 'আমি'র চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলে, কি অবশিষ্ট থাকে জানো? অবশিষ্ট থাকে কেবলই সত্য ... কেবলই মাতা... কেবলই ব্রহ্ম। ... যতক্ষণ এই 'আমি আর আমার' ভাব, ততক্ষণ ভ্রমের অস্তিত্ব, আর ততক্ষণ আমরা সেই ভ্রমেই উন্মত্ত থাকি। ...ভ্রমকেই সত্য মনে করি। ... বিশ্বসংসারের খবর নিই, আর সেই খবর নেবার কালে, আমরা কি করি? মানবজাতিকে, জীবের প্রগতিকে, প্রকৃতির ক্রীড়াকে প্রত্যক্ষ করিনা। কি করি? (বক্র হাস্য) কেবলই সেই খবর আগামীদিনে আমাদের আমিকে কতটা প্রশস্ত করবে, আর কতটা সঙ্কীর্ণ করবে, সেই ভাবনায় স্থাপিত থাকি।

আমরা সংসারের কথা বলি। কিন্তু সেই সংসারের কথা বলার কালে কি করি, কার কোন কথা আমার মনের ভাবকে ব্যক্ত করে, তা বলি; কার কোন কথা আমার আমাকে সম্মান দিল, বা অপমান করলো, বা সন্তুষ্ট করলো, বা অসন্তোষের সঞ্চার করলো, সেই ভাবনার মধ্যে স্থিত থাকি। ... যখন সেই সমস্ত স্থানের থেকে 'আমি' ও 'আমার' ভাবনাকে মুক্ত করে দেব, তখন কি পরে থাকবে?

এই পরে থাকবে যে, সংসারে আবদ্ধ মানুষ এমনটা ভাবেন; সমস্ত জীবজগত এমনটা ভাবেন; সমস্ত মানবজাতি এমনটা বিচার করেন। ... আর সেই সমস্ত কিছুর থেকে আমরা কি লাভ করবো? আমরা লাভ করবো, প্রকৃতির ধারাকে, সময়ের ধারাকে, সত্যের ধারাকে, আর অন্তে, সেই সমস্ত কিছু যখন একাকার হয়ে উঠবে, আমরা কি জানবো? আমরা জানবো, সত্য কি? আমরা জানবো, জীবনের প্রকৃত চক্র কি। ...

তুমি বলবে, জীবনের চক্রকে জানলে কি সত্যকে জানা হয়ে যায়? ... না জানা যায়না, জীবনের চক্র একাকী সত্য নয়; জীবনের চক্র, সৃষ্টির চক্র, এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ তত্ত্ব যেখানে একত্রিত হয়, সেটিই হলো সত্য। ... কিন্তু এইক্ষেত্রে টিকটিকিকে দেখতে হয় পুত্রী । ... সেই টিকটিকি কক্ষে প্রবেশ করে, দেওয়ালের বাতায়ন দিয়ে, কিন্তু একবার প্রবেশ করে গেলে, সেই কক্ষের ছাদেও স্থাপিত হতে পারে।

পুত্রী, সত্য যদি একটি কক্ষ হয়, তবে সেই কক্ষের ছাদ হলো ঈশ্বরতত্ত্ব, আর সেই কক্ষের দুই দেওয়াল হলো জীবনচক্র এবং সৃষ্টিচক্র । ... যখন এই দুই দেওয়ালের কোন একটি ধরে, সেই কক্ষে প্রবেশ করে যাবে টিকটিকির মত করে, তখন সম্পূর্ণ কক্ষের সমগ্রটাই তোমার বিচরণক্ষেত্র হয়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত সত্যই তোমার জ্ঞাত হয়ে যাবে । ... (হেসে) তাই পুত্রী, 'আমি'র চিন্তা থেকে মুক্ত হও,

দেখবে, তুমি মাতারই ক্রোরে শায়িত হয়ে ছিলে এতক্ষণ, কারণ তুমি তো তাঁর অভিন্ন অঙ্গ; কারণ তুমিই তো তিনি । ... তিনিও যা, তুমিও তাই। ... তিনিও ব্রহ্ম, আর সেই অখণ্ড ব্রহ্ম তুমিও"।

বিদ্যাপীঠ অধ্যায়

সকল কথা শুনে, দেবী দিব্যশ্রীর মধ্যে, মাতার পরবর্তী কথা শোনার ব্যকুলতা জন্মালে, প্রভু ব্রহ্মসনাতন পুনরায় বলতে থাকলেন, "পুত্রী, মাতার এর পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় লীলার উপস্থাপনা ছিল এক অনবদ্য উপায়ে। সেই কথা এবার তোমায় বলি শোনো। জম্বুদ্বীপেই একটি রাজ্য ছিল, নাম বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যাপীঠে সর্বাধিক পরিমাণ ঋষি উপস্থিত ছিলেন, আর তার থেকেও বড় কথা, সেখানের রাজা ছিলেন এক রাজর্ষি। ... দেবী গঙ্গার দ্বারা জম্বুদ্বীপে প্রচারিত শাসকস্মৃতিকে সেখানে সর্বোত্তম ভাবে অভ্যাস করা হতো।

অর্থাৎ, এই বিদ্যাপীঠে, ইচ্ছামুক্তিকেই সর্বোত্তম মান প্রদান করা হত। ঋষিগণ এবং রাজর্ষি অবিনাশ দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন যাতে সমস্ত প্রজাকে ইচ্ছামুক্ত করা যেতে পারে। আর এই প্রয়াস একসময়ে এমন এক জেদের সঞ্চার করে সমস্ত রাজ্যে যে, সেই সমস্ত প্রজা, যারা ইচ্ছার পাশে বদ্ধ, এবং তাঁদেরকে ইচ্ছার পাশ থেকে মুক্ত করা যাচ্ছেনা, তাঁদের সকলকে রাজ্যের থেকে নিষ্কাসন করা শুরু করে দেন রাজর্ষি ও ঋষিগণ।

সকল জ্ঞানী, মহান ও মহীয়সীকে সেই রাজ্যে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা হত । কিন্তু সকল অজ্ঞানী, এবং সকল ইচ্ছাদাসদের রাজ্যে কেবল অসম্মানই করা হতো না, রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে তাঁদেরকে স্থিত হতেও দেওয়া হতো না। ... এমন অবস্থায়, রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে, ভিনরাজ্যের এক বিদ্যানের আবির্ভাব হয়, এবং তিনি সমস্ত বিদ্যাপীঠের থেকে নিষ্কাসিত প্রজাদের আশ্রয়দান করতে শুরু করেন। ...

ক্রমশ সেই মহান বিদ্যানের নাম প্রচারিত হতে থাকে, এবং তাঁর নাম রাজর্ষির কর্ণেও উত্তলিত হয় । বিদ্যাধর সেই যুবার নাম, আর রাজর্ষি সেই যুবার সম্বন্ধে এই জানেন যে তিনি মহান বিদ্যান, এবং তিনি সকল নিজরাজ্য থেকে নিষ্কাসিত প্রজাকে নিজের ছোট্ট আশ্রমে স্থান দিয়েছেন। ... বিদ্যাধরের বিদ্যার সামর্থ্যের বাখান শুনে, তাঁকে দেখার ইচ্ছাও প্রকাশিত হয় রাজার মধ্যে। আবার সেই বিদ্যাধরের নিষ্কাসিত প্রজাসকলকে পালন করার কথা শুনে ক্ষিপ্তও হন।

ঋষিগণের উদ্দেশ্যে রাজর্ষি অবিনাশ বললেন, "ঋষিগণ, এই বিদ্যাধরের বিদ্যার বাহারকে যে আমাদের দেখতেই হচ্ছে। ... আমাদের রাজ্যে স্থিত হয়ে, তিনি বিদ্যাদান করছেন, এ তো খুব ভালো কথা। কিন্তু তিনি ইচ্ছার দাশ যেই প্রজাগণ, যাদেরকে আমরা

নিষ্কাশন করে দিয়েছি, তাঁদের নিয়ে কাজ করছেন। ... কি এমন তাঁর বিদ্যা, যার জন্য তিনি তাঁদেরকে বিদ্যা প্রদান করছেন, যাদেরকে আমরা বিদ্যা প্রদান করতে অসমর্থ, সেটি তো পরখ করে দেখে নেওয়া উচিত, তাই না ঋষিবর!"

ঋষিগণ রাজার বাক্যে সমর্থন করলে, তাঁরা সকলে বিদ্যাধরের আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশের সাক্ষী হন তাঁরা। ... তাঁরা দেখেন, সমস্ত আশ্রম জুরে কেবল সবুজ ঘাসের মাঠ, এবং সেই মাঠকে বেষ্টন করে সমস্ত প্রকার ফল ও ফুলের বৃক্ষ। ... সমস্তকিছুই অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত, তাই স্পষ্ট বোঝা গেল যে সমস্ত কিছুর নিত্য পরিচর্যা হয়।

আর সেই পরিচর্যা যে রাজার নিষ্কাশন করা প্রজারাই করেন, তাও তাঁরা সনেত্রেই দেখলেন। রাজা দেখলেন, রাজার নিষ্কাশন করা সকল প্রজা, তাঁকে ও ঋষিগণদের দর্শন মাত্র, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। সেই দেখে রাজা ভাবলেন, এমন তো হবার কথা ছিলনা! যেই প্রজাদের তিনি নিষ্কাশন করেছেন, তাঁরা তাঁদের প্রতি সম্মান কেন প্রদর্শন করছেন! ... সেই সমস্ত কিছু দেখে উদ্বেগ এলেও, সেই উদ্বেগ তিনি প্রকাশ না করে বিদ্যাধরের নিকট উপস্থিত হলেন।

বিদ্যাধর রাজা ও ঋষিদের দেখে, নিজের স্থান ত্যাগ করে উঠে এসে, তাঁদের সকলকে করজোড়ে সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, "ধন্য হলাম আমি, আর ধন্য হলো এই সকল মানুষ, যারা আপনাদেরই প্রজা"। ... রাজর্ষি অবিনাশ বললেন, "এরা সকলে আমার প্রজা এককালে ছিলেন, এখন আর নেই। ... আমি এদেরকে নিষ্কাসিত করেছি"। ... সেই কথা শুনে বিদ্যাধর হেসে বললেন, "আসুন মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন। ... ঋষিগণ, আপনারাও আসুন। আপনাদের সকলের দর্শন লাভ করে, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। আসুন"।

আসন গ্রহণ করানোর জন্য বিদ্যাধর নিজের বিদ্যাদানের বেদির সম্মুখে সকলকে স্থিত করলে, ঋষিগণ নিজনিজ আসনে বসে পরলেন, কিন্তু রাজা মনে মনে অক্ষুণ্ন হলেন। বিদ্যাধর কি তাঁকে অপমান করছেন। নিজে একটি উচ্চবেদীতে স্থাপিত হয়ে, তাঁর ন্যায় রাজর্ষি, ও মহান ঋষিদের ভূমিতে উপনীত হতে দিলেন। ... কিন্তু ঋষিগণ সেই আচরণে প্রতিবাদী না হবার কারণে, রাজর্ষিও কনো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না।

অন্যদিকে বিদ্যাধর বললেন, "মহারাজ, আপনার তো তিন পুত্র, তাই না!" ... রাজর্ষি গম্ভীর হয়েই বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক জানেন"। ... বিদ্যাধর রাজর্ষির কথার মধ্যে মদমত্ততার গন্ধ পেয়ে হেসে বললেন, "তাঁদের শিক্ষাগ্রহণ হয়ে গেছে বোধ করি । ... তো কে আপনার সিংহাসনের জন্য যোগ্য স্থির হলেন! ... কারুকে কি যোগ্য বলে স্থির করেছেন, নাকি ... এখনো স্থির করেন নি!"

রাজর্ষি যেন সেই কথার উত্তর না দিতে চাইলেও, একপ্রকার বিরক্ত হয়েই বললেন, "আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ঋষিত্ব অর্জনের জন্য তপে লীন, আর কনিষ্ঠপুত্র রাজ্যের সিংহাসনে বসার যোগ্যব্যক্তি নয়"। ... বিদ্যাধর লীলাময় হাস্য প্রদান করে বললেন, "কনিষ্ঠ পুত্র

অর্থাৎ কনিস্ক তো ইচ্ছাদমন করেন নি। ... তাই না! ... সেই কারণেই রাজসিংহাসনে বসার যোগ্য নন তিনি। ... খুব ভালো, রাজা, খুব ভালো। ... এক যোগ্য রাজা সিদ্ধান্ত এমনই হওয়া উচিত। ...

আচ্ছা মহারাজ, আপনার সেই কনিষ্ঠ পুত্র আমার আশ্রমে নেই কেন বলতে পারেন! ... না মানে... আপনার রাজ্যের সমস্ত প্রজা, যারা ইচ্ছাদমনের জন্য ইচ্ছাশীল নন, তাঁদেরকে আপনি নিষ্কাশন করেছেন তো... আর আমি তো তাঁদেরকেই আশ্রয় প্রদান করেছি । ... কিন্তু আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রকে আমার আশ্রমে আমি দেখতে পাচ্ছিনা। ... কেন বলতে পারেন!" ... রাজা এবার বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন, "আমার পুত্র সে। ... হ্যাঁ ইচ্ছাদমন করতে সে পয়ত্নশীল হয়নি, তাই রাজার আসনের জন্য যোগ্য নয় সে। ... কিন্তু নিষ্কাশন কেন?"

বিদ্যাধর এবার হেসে বললেন, "রাজা কি কেবল ঔরসদ্বারাই সন্তান লাভ করেন! ... প্রজারা তাঁর সন্তান নন! ... আপনার ঔরসজাত সন্তান ইচ্ছাদমন করতে প্রয়ত্ন নন, তাই আপনি তাঁকে রাজকর্মে নিযুক্ত হতে দিলেন না, কিন্তু তাঁকে নিষ্কাশনও করলেন না। ... আর আপনার এই প্রজারা, এই সন্তানদের ক্ষেত্রে এই অবিচার কেন মহারাজ! ... এঁদেরকেও তো আপনি রাজকর্মে নিযুক্ত না করলেও, নিষ্কাশন না করে রাখতে পারতেন। কি পারতেন না!"

রাজা সেই কথা শুনে উগ্রমূর্তি হয়ে বললেন, "বিদ্যাধর! শুনেছিলাম তুমি পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী। ... তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। ... কিন্তু তুমি তো এক মহামূর্খ! ... রাজাকে নির্দেশ দেবার অধিকার কেবল ঋষির আছে। ... এক বিদ্যানের নেই, এই সত্য সম্বন্ধে তুমি অবগত নও!" ... বিদ্যাধর হেসে বললেন, "আর রাজা রাজর্ষি হয়ে উঠলে, ঋষিদেরও সেই সামর্থ্য থাকেনা । ... তাই তো রাজা!...

সঠিক বলেছ। ... আমি সম্পূর্ণ সম্মত তোমার কথার সাথে। ... তাই তো তোমাকে এখানে টেনে আনলাম। ... যাও আমার আশ্রমটা একটু ঘুরে দেখে এসো। যদি একজনকেও ইচ্ছার দাশ রূপে দেখতে পাও, তবে আমি তোমার দণ্ডের পাত্র । ... যাও রাজন, যাও"। ... রাজা ক্রুদ্ধ আবেশে সমস্ত আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলেন ঋষিদের সঙ্গে। ... কিন্তু যা দেখলেন, তা দেখে তাঁর ক্রোধ শান্ত হতে শুরু করে। ... তিনি দেখলেন, প্রতিটি আশ্রমনিবাসী যা যা কর্ম করছেন, তাই নিয়ে তাঁদের কনো প্রকার মতভেদ নেই। ...

কেউ বৃক্ষের পরিচর্যা করছেন, তো কেউ বৃক্ষের থেকে ফল ও ফুল সংগ্রহ করছেন । কেউ তন্তু নির্মাণ করছেন, তো কেউ দুগ্ধ নিষ্কাশন করছেন, আবার কেউ সেই দুগ্ধ দিয়ে ঘৃত, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নির্মাণ করছেন। আর সকলেই নিজের নিজের কর্মে তুষ্ট, এবং সকলের মুখের মধ্যে এক ভাব যে তাঁদের হাতের কর্ম সম্পন্ন করে, তাঁরা সকলে বিদ্যাধরের বাণী শুনবেন। ... এই কর্মনিষ্ঠা, এই একাগ্রতা, এই বিদ্যামুখরতা দেখে রাজা স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

অন্তে, তাঁর মনপরিবর্তন হয়। ... তিনি এবার স্থির করেন যে ছদ্মবেশে বিধ্যাধর কি শিক্ষা প্রদান করেন, তা দেখবেন। ... তাই তিনি ঋষিগণকে আশ্রম পরিদর্শনের ভার অর্পণ করে নিজে ছদ্মবেশ ধারণ করে বিদ্যাধরের শিক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাধর সকল উপস্থিত বৃন্দদের উদ্দেশ্যে তাঁর শিক্ষা প্রদান করতে থাকলেন। তিনি বললেন, "আমার প্রিয়জনেরা, প্রভুর নিজকে নিজে ভ্রমিত হয়ে যাবার কারণে, ব্রহ্মকে ব্রহ্মময়ী মহামায়ার রূপ ধারণ করতে হয়, আর তাঁর প্রভাবে ভ্রমিত স্বয়ম্ভু উপস্থিত হতেই, তাঁর মধ্যে বিদ্যা, সম্পদা এবং শক্তির প্রভাব বিস্তার পেতে থাকে, আর তার কারণেই, তাঁর ভ্রমবিস্তাররূপে এই বিশ্বচরাচরের সৃজন হয়"। ...

তিনি বলতে থাকেন, "পুত্রপুত্রী, যেমন করে নিরীহ, শান্ত মাতা, যখন দেখেন যে তাঁর সন্তানরা সমস্ত সত্যবোধ হারিয়ে ফেলে, নিজের পিতাকেই আক্রমণ করছেন, তখন আর তিনি শান্ত, নিরীহ থাকেন না। তখন তিনি উগ্রমূর্তি ধারণ করে, অশান্ত হয়ে ওঠেন, এবং সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ... সেই একই মাতা যখন দেখেন যে সন্তান এমন কিছু কর্ম করতে চলেছেন, যা করার কালে, তাঁর সন্তান ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তখনও আর তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন না। সক্রিয় হয়ে উঠে, সন্তানকে সত্যের বোধ করাতে উঠেপড়ে লাগেন।

পুত্রপুত্রী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাতা এমনও কিছু ক্রিয়া করেন, যা সন্তানকে এমন ধারণা দেয় যে মাতা তাঁর সঙ্গ দিচ্ছেন। ... কিন্তু মাতাও সেই সঙ্গ ইচ্ছা করেই দেন যাতে, সন্তান যেই কথা তাঁর থেকে গোপন করছিলেন, সেই সমস্ত কথা আর গোপন করে রাখার প্রয়োজনই মনে না করেন, এবং সন্তান তাঁকে সেই সমস্ত গোপনকথা এসে বলেন। ... যত সেই গোপন কথা বলতে থাকেন, ততই মাতা এমন কিছু কীর্তি করতে থাকেন যাতে, সন্তান কর্মের ধারায় অগ্রসর তো হতে পারেন, কিন্তু অন্তে গিয়ে সেই কর্মে সাফল্য লাভ না করেন। ...

হ্যাঁ পুত্রপুত্রী, এমন খুব অল্পসংখ্যক মাতাকেই পাবেন আপনারা, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা সকলে সেই মাতার সন্ধান, আপনাদের রাজ্যেই লাভ করেছেন। ... জগন্মাতাও ঠিক সেই রূপ মাতা। ... তিনি স্বয়ম্ভু অণুর সাথে এমন ভাবেই মিশে যান, এমন ভাবেই তাঁর কর্মে সহযোগ প্রদান করে, ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চার করতে দেন তাঁকে, যেন মনে হয় যে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে স্বয়ম্ভুকে ভ্রমিত হতে সহযোগ প্রদান করছেন। ...

কিন্তু তিনি এমন করেন কারণ, তিনি জানেন, এই অবস্থায় স্বয়ম্ভুকে সত্য-অসত্যের বোধ প্রদান করতে গেলে, স্বয়ম্ভু তাঁর সঙ্গই ছেড়ে দেবার প্রয়াস করবেন। তাই তিনি স্বয়ম্ভুর সাথে সর্বক্ষণ যুক্ত থেকে, তাঁকে এই বিশ্বাস করান যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সঙ্গেই আছেন। ... কিন্তু অন্তে যখন স্বয়ম্ভু সর্বভাবে সাফল্যহীন হয়ে পরেন, তখন তিনি স্বয়ম্ভুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তিনি কেন চেতনা হয়ে, নিয়তি হয়ে, ব্রহ্মময়ী হয়ে স্বয়ম্ভুর সাথে যুক্ত ছিলেন, সেই সত্যকে প্রকাশ করেন।

অর্থাৎ পুত্রপুত্রী, যেই ইচ্ছার দাস হয়ে আমরা সকলে অবস্থান করি, সেই সকল ইচ্ছা আমাদেরকে ক্রমশ এই কল্পব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা থেকে বাস্তবে পরিণত করতে থাকে, আর তা সমানে আমাদেরকে অধিক থেকে অধিক ভাবে ভ্রমিত করতে থাকে। ... আর সেই সকল ইচ্ছার থেকে আমরা যদি মুক্ত হতে না পারি, তবে আমরা আমাদের সত্যকে কোনদিনও জানতে পারবো না । আর তা না

জানতে পারার ফল কি? তা জানতে না পারার ফল এই যে, আমরা ক্রমশ ভ্রমের মধ্যে নিজদেরকে আবদ্ধ করে ফেলে, আমরা মনে করতে থাকবো যে, এই ইন্দ্রিয়রাই আমার সর্বোত্তম অস্ত্র । এই ইন্দ্রিয়দের মাধ্যমেই আমি সমস্ত জগত, যা এক ভ্রমিতের কাছে সত্য, তার তথ্য জানতে পারবো, আর ক্রমশ সেই তথ্য সকল জেনে, সঠিক ভাবে এই জগতের অধিপতি হয়ে উঠবো আমি, আর সকল সুখকে আমরা ধারণ করে অবস্থান করবো।

কিন্তু আমরা সেই ভাবনার মধ্যে এটিই ভুলে যাই যে যেই জগতের অধিপতি হবার চিন্তা করছি আমি, সেই জগতই যে এক কল্পনা মাত্র, যা কেবল ইন্দ্রিয়দের কাছেই উপলব্ধ, বা ইন্দ্রিয়দেরই বানানো কল্পরাজ্য, যার সেই মুহূর্ত হতেই কোন অস্তিত্ব নেই, যেই মুহূর্তে আমরা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়দের নিষ্ক্রিয় করে দেব। আর সেই ভ্রমের পঙ্কিলে আমরা একের পর এক ইচ্ছা প্রকাশ করে, সমানে নিজদেরকে, নিজসত্যকে অধিক থেকে অধিক ভাবে ভুলে গিয়ে, কেবলই ইচ্ছার দাস হয়ে থাকি, উন্মত্তের মত নিজের ইচ্ছাদের পুড়ন করতে সচেষ্ট হই, ব্যর্থ হই এবং বেদনা লাভ করি, বা সফল হই এবং দম্ভ করে, অধিক ইচ্ছার অবতারণা করি।

অর্থাৎ পুত্রপুত্রী, যতই আমরা এমন ইচ্ছার অবতারণা করতে থাকবো, ততই আমরা ভ্রমের পঙ্কিল খাঁদে নিমজ্জিত হতে থাকবো, এবং ততই আমরা বেদনার সাগরে হারিয়ে যাবো। ... তাই ইচ্ছার থেকে মুক্ত হতে হয়। ইচ্ছার থেকে মুক্ত হতে হতে, একসময়ে আমরা এই পঙ্কিল কল্পজগতের কালকূটন্যায় জাল থেকে মুক্ত হয়ে উঠবো। ... আর যতই মুক্ত হতে থাকবো তার থেকে, ততই আমরা উপলব্ধি করবো যে, ইন্দ্রিয়রা আমার কনো বাস্তবিক অস্ত্র নয়, বরং তা হলো আমাদের ভ্রমের অস্ত্র, যার মাধ্যমে আমরা ভ্রমের দাশ হয়ে বিরাজ করি।

যতই আমরা ইচ্ছামুক্ত হতে থাকবো, ততই আমরা উপলব্ধি করতে থাকবো যে, এই বুদ্ধি, এই মন কনোকালেই আমাদের সত্যতার সাথে পরিচয় করায়নি; তারা কেবলই আমাদের মিথ্যা আশ্বাসবাণী প্রদান করে গেছে যে, এমন করলে আমরা সুখ পাবো, অমন করলে আমরা সুখ পাব । ... যেই সুখের প্রকৃত স্বরূপই দুঃখ, যেই সুখ দুঃখেরই মুখোস মাত্র, সেই সুখের পিছনে আমাদের মনবুদ্ধি সদাই ছুটিয়ে বেরিয়েছে, আর তাই যখনই সুখকে হাতে করে ধরি, সেই মুহূর্তেই তার মুখোস খুলে যায়, আর আমরা দুঃখের সম্মুখীন হয়ে উঠি।

যেমন ইন্দ্রিয়রা আমাদেরকে সহস্র লক্ষ ইচ্ছার মধ্যে ডুবিয়ে, আমাদের ভ্রমের সাগরে আবদ্ধ করে দিচ্ছিল, তেমনই আমাদের মনবুদ্ধিও আমাদের সহস্র লক্ষ ইচ্ছার মধ্যে আবদ্ধ করে দিতে ব্যস্ত ছিল। ... আর সেই ইচ্ছার দাসত্ব থেকে তখনও আমরা মুক্ত হইনা। সেই ইচ্ছা আমাদের আত্মা বা স্বয়ম্ভুঅণুদেরকেও আবদ্ধ করে রেখে, তাঁকেও সহস্র বিচারের মাধ্যমে এই মিথ্যা ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করার জন্য উৎসাহী করে। ... তাই সেই অন্তিম ইচ্ছা, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার, ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের পালনের ইচ্ছার থেকেও যখন আমরা মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণ ভাবে আমরা আমাদের আমিকেই ত্যাগ করে দিই, তখন কি দেখি আমরা?

আমরা তখন উপলব্ধি করি যে আমরা তো সেই ব্রহ্মই, যা অনন্ত, যা অনাদি, যা সদানন্দ। ... কেন আমরা নূতন করে আনন্দের সন্ধান করছিলাম? যেই অণুকে আমি, নিজের আমি ভেবে সমস্ত সুখের সন্ধান করতে ইচ্ছার অবতারণা করছিলাম, সেই আমিটি তো আমার আমিই নয়, সেই তো এক ভ্রম মাত্র, কারণ ব্রহ্মের অর্থাৎ প্রকৃত আমার তো কোন অণুই সম্ভব নয়! আমি তো প্রকৃত অর্থে অভেদ্য; তাহলে আমার আবার অণু কি করে সম্ভব? ... আমার কি প্রয়োজন এই সমস্ত ইচ্ছার অবতারণা করার। এই সমস্ত ইচ্ছার অবতারণা করার কারণেই আমি বেদনায় আবদ্ধ হয়েছি, আর সমানে মনে করে গেছি যে আমার পরবর্তী ইচ্ছা আমাকে আমায় সেই বেদনা থেকে মুক্ত করবে।... আসল সত্য তো এই যে, প্রতিটি ইচ্ছাই আমার মধ্যে ক্রমশ অধিক ভাবে ভ্রমের বিস্তার করে, আর সেই ইচ্ছাগুলির কারণেই, আমরা এতদিন ভ্রমিত হয়ে, নিজের আসল পরিচয় থেকেই দূরে অবস্থান করে বেদনার শিকার হয়ে ছিলাম।

তাই পুত্রপুত্রী, তোমরা যেই ইচ্ছার দমন করে, আজ এই অবস্থায় স্থিত হয়েছ, এমন ভেবো না যে তোমাদের সকলের ইচ্ছার নাশ হয়ে গেছে, আর তোমরা স্বরূপ লাভ করে ফেলেছ। ... যেদিন সত্য সত্যই স্বরূপ লাভ করবে, সেইদিন দেখবে, তোমরা সর্বদা আনন্দে স্থিত রয়েছ। ... তোমাদের কনো প্রশ্ন নেই, কনো উত্তরের প্রয়োজনও নেই; তোমাদের মধ্যে কনো উচাটনতাও নেই, আর কনো উদগ্রীবভাবের প্রয়োজনও নেই। ... কিন্তু যতক্ষণ না, সেই অবস্থায় যাত্রা করছো, ততক্ষণ অধিক থেকে অধিক ভাবে নিজদের ইচ্ছাসমূহকে জ্বালিয়ে দেবার জন্য প্রয়াসশীল হও।

পুত্ররাপুত্রী, অগ্নি প্রজ্বলিত থাকা অবস্থাতেই তাতে কাঠের যোগান দিতে হয়, তবেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে বিরাজ করে। ... পুত্রপুত্রী, এই প্রজ্বলিত অগ্নি হলো ইচ্ছাদমনের অদম্য প্রয়াসের প্রতীক । আর কাঠ যোগান দেওয়া হলো, সেই উদ্যমের কালে করে যাওয়া সমস্ত কর্ম। ... তাই, যদি কাঠ যোগান দেওয়ার কর্ম বন্ধ করে দাও, তবে অগ্নি প্রজ্বলনরূপী ইচ্ছাদমন প্রক্রিয়াও স্থগিত হয়ে যাবে । ... সেহেতু যেমন ইচ্ছাদমন প্রক্রিয়া চলবে, তেমন কর্মকেও চালিয়ে যেতে হয়।

তোমাদের রাজন তাঁর সিদ্ধান্তে একদমই সঠিক যে রাজকর্মে তাঁদেরকে কখনোই নিয়োগ করা উচিত নয়, যারা তাঁদের ইচ্ছার থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক নন বা প্রয়ত্নশীল নন, কারণ তাঁদেরকে রাজকর্মে নিযুক্ত করার অর্থ হলো, সমস্ত রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ইচ্ছার দাসত্ব করার ভাবের বিস্তার করা হবে। তবে হ্যাঁ, সন্তান যথাযথ না হলে, তাঁকে যেমন পিতামাতা গৃহ থেকে নির্বাসনে পাঠান না, তেমনই তোমাদেরকেও নির্বাসনে প্রেরণ করার সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করিনা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সন্তান যথাযথ না হওয়া সত্ত্বেও, কেবল মাত্র সন্তান বলে তাঁকে প্রশ্রয় দিয়ে যেতে হবে। ...

তাই প্রয়োজন সেই আবাসনের, যেখানে সন্তানকে যথাযথ হয়ে ওঠার প্রেরণা প্রদান করা হবে । তোমাদের রাজা কেবল মাত্র এই একটি কর্মই করেন নি। তাই, আমি এই স্থানে এসে তোমাদেরকে একত্রিত করেছি, এবং সেই সকল কর্মে নিযুক্ত করেছি, যা তোমাদেরকে সমানে ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হতে প্রেরণা প্রদান করবে"। ... এক প্রজা বিদ্যাধরের কথার প্রত্যুত্তরে বললেন, "তবে কি

আমাদের দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী রাজার কাছে প্রেরণ করা উচিত হচ্ছে মান্যবর! ... কারণ আমাদেরকে তো তিনি নির্বাসনে প্রেরণ করেছেন!"

বিদ্যাধর হেসে বললেন, "রাজা প্রজার জন্য, আর প্রজাও তাই রাজার জন্য । ... রাজা ও প্রজার মধ্যে পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক । পিতা সন্তানের আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁকে বহিষ্কার করে ফেলেছেন, তা বলে সন্তানও পিতার প্রতি অভিমানী হয়ে থাকবে! এ কেমন ধারার মনোভাব! ... ইচ্ছা দমিত না হলে, এই সমস্ত প্রতিস্পর্ধা, প্রতিহিংসা, এবং প্রতিকারের চিন্তা অব্যহত ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ... যতই তোমরা এই সকল প্রতিভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে উঠবে, ততই ইচ্ছার কবল থেকে স্বতঃই মুক্ত হতে থাকবে। ...

পুত্রপুত্রী, ইচ্ছামুক্তির অভ্যাস এই কারণে কক্ষনো করোনা যে, তোমরা তোমাদের পিতাতুল্য রাজাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবে। এই কারণে ইচ্ছামুক্ত হও যাতে তোমাদের পিতার সম্মুখে তোমরা পুনরায় দাঁড়িয়ে, তাঁর আলিঙ্গনের পাত্র হয়ে উঠতে পারো । ... পুত্ররা, পুত্রী, স্নেহের থেকে বড় কনো অস্ত্র হয়না। স্নেহ করো। তোমাদের অভিযোগ যে, তোমাদের পিতাতুল্য রাজা নিজপ্রজাকে ইচ্ছামুক্ত করার উদ্দেশ্যে, স্নেহ করতেই ভুলে গেছেন। ...

কিন্তু আমার স্নেহস্নেহারা, যদি সেই স্নেহের বীজ তোমরাও তোমাদের মন থেকে মুছে ফেল, তবে তোমাদের পিতার মধ্যে সেই স্নেহ পুনরায় কি করে জাগ্রত হবে?" ... অন্য এক স্ত্রী প্রজা বললেন, "আমরা তো এমনিও রাজার স্নেহের অধিকারী । ... তা তিনি আমাদেরকে সেই স্নেহ করলেন না কেন! ... অর্থাৎ, সন্তান যোগ্য হবেন, বা সন্তান যোগ্যতা অর্জনের জন্য অগ্রসর হবেন, তবেই কি সন্তান স্নেহের অধিকারী হন!"

বিদ্যাধর হেসে বললেন, "সঠিক বলেছ পুত্রী। সন্তান সদাই পিতামাতার কাছে স্নেহের পাত্র হন, তাই তিনি যোগ্য হন বা না হন; তা তিনি যোগ্যতা অর্জনের প্রতি আগ্রহী হন বা না হন। ... কিন্তু পিতামাতাকেও নিজদের স্নেহ থেকে মোহকে অপসারিত করতে হয়। ... তোমাদের রাজনকেই দেখ। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান কনিস্ককে স্নেহ করেন। কিন্তু স্নেহ করেন বলে, তিনি তাঁর প্রতি মোহ অর্পণ করে, তাঁকে রাজকর্মে নিযুক্ত হতে দিলেন কি? ...

আবার তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বলিষ্ঠকেও স্নেহ করেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর স্নেহকে মোহে পরিবর্তিত হতে দেননি। তাই তিনি তাঁকে ঋষিত্বের পথে যাত্রা করা থেকে কনোরূপ বাঁধা প্রদান করেননি। ... সন্তান বোলে স্নেহের পাত্র তো অবশ্যই সে, কিন্তু তাই বোলে মোহের পাত্র কেউই নন। তাই পিতামাতা যদি দেখেন যে তাঁদের সন্তান যোগ্যতার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ইচ্ছাদমনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে অপ্রস্তুত, ইচ্ছা বা বিলাসে তাঁর মন রঙিন হয়ে রয়েছে, তবে মাতাপিতাকে অবশ্যই সেই মনোভাবের প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এটিই তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য।

পুত্রপুত্রী, সন্তান পিতামাতার সৃজন নন, পিতামাতা কেবলই তাঁদের দেহকে সৃজন করেন মাত্র। ... সন্তান পিতামাতার কাছে প্রকৃতির দান। প্রতিটি সন্তানই স্বয়ম্ভু অণু, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই ভ্রমিত প্রকাশ । যার কাছে সেই সন্তান অর্পণ করেন প্রকৃতি সেই মাতাপিতাও সেই একই সমসত্ত্ব ব্রহ্মাণু। কিন্তু তাঁরা সেই ব্রহ্ম স্বরূপকে ভুলে আছেন বলেই, প্রকৃতি তাঁদের কাছে অন্য এক স্বয়ম্ভুঅণুকে অবস্থান করান, যাতে এই স্বয়ম্ভুঅণুর প্রতি কর্তব্য করার কালে, পিতামাতা রূপী স্বয়ম্ভুঅণু ক্রমশ নিজদের স্বরূপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হন।

পুত্রী, এক পুরুষের বা এক স্ত্রীর সদা মলমুত্রাদির প্রতি ঘৃণা থাকে, মুখনিঃসৃত বমনের প্রতি অনীহা থাকে। ... কিন্তু মাতা স্বয়ম্ভুঅণুকে শিশু রূপে তাঁদের কাছে অর্পণ করে, তাঁদেরকে সেই মলমুত্রাদি ও বমনের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন করে তোলেন, এবং তাঁদের মনের সঙ্কীর্ণতাকে অপসারণ করেন। এক পুরুষ বা এক স্ত্রী সদাই সম্মুখে স্থিত কনো অবুঝকে দেখে বিরক্ত হন। ... তাই তো মাতা এক স্বয়ম্ভুঅণুকে তাঁদের সন্তানরূপে অবতরণ করেন, যাতে সেই পুরুষ ও স্ত্রী উপলব্ধি করেন যে অবুঝকে সহন করে তাঁকে বোঝানোই তাঁদের কর্তব্য। ...

আর এই করতে করতে একসময়ে সেই নারীপুরুষ সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে উঠে, নিজের অন্তরের অবুঝভাবকেও বোঝাতে শুরু করেন। ... এই তো এই সৃষ্টির অনন্ত ধারার অমৃত ফল ।... কিন্তু, যখন পিতামাতা নিজের ইচ্ছার দাশ হয়ে থাকেন, তখনও এই সমস্ত কর্ম করেন, কিন্তু ইচ্ছার দাশ হয়ে থাকার কারণে মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পরেন, এবং যেই সন্তান কেবলই তাঁদেরকে সঠিক পথে উত্তোলন করার জন্য মাতার দান, সেই সন্তানকেই নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করে, সন্তানের জীবনেও বাঁধা প্রদান করেন, আবার নিজের অগ্রতির পথকেও বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

তাই পুত্রী, সকল প্রজার জনক, এক রাজার কর্তব্য তাঁর প্রজাদের প্রতি না তো মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠা, আর না তাঁদের প্রতি স্নেহবিহীন হয়ে ওঠা। ... স্নেহবিহীন হয়ে উঠলে, তোমাদের রাজন যেমন তোমাদের সাথে করেছেন, তেমন করে ফেলেন। আবার মোহগ্রস্ত হয়ে উঠলে, প্রজা উচ্ছন্যে যাচ্ছে দেখেও, কর্তব্য করতে পিছিয়ে যান । ... একজন আদর্শ রাজন তিনিই, যিনি তাঁর প্রজাকে অপার স্নেহ করবেন, তবে সেই স্নেহ সকল সময়ে তাঁর প্রজাকে অগ্রগতিপূর্ণ করে তুলতে পারে, সেই দিকেও নজর রাখবেন।

বিদ্যাধর দেখলেন তাঁর সমস্ত শিক্ষার্থীর অন্তে একজন নিজকে এক আচ্ছাদনে আবদ্ধ করে, তাঁর পার্শ্বে স্থিত ব্যক্তিকে কি কিছু বলছেন, আবার কখনো সম্মুখে স্থিত ব্যক্তিকে কিছু বলছেন, আর সেই ব্যক্তিরাই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করছেন। সেই দেখে বিধ্যাধর নিজের মনে মনে ঈষৎ হাসলেন। তিনি বেশ বুঝলেন, সেই আচ্ছাদনের আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তি অন্যকেউ নন, ছদ্মবেশী রাজা অবিনাশ। আর তিনি তাঁর মনের প্রশ্নসমূহ অন্যপ্রজাদের মাধ্যমে বলাচ্ছেন।

এবার রাজনের বামপার্শে স্থিত ব্যক্তি বললেন, "আচ্ছা গুরুদেব, আমরা সকলে তো ইচ্ছার দাসত্ব না করার কর্মে অপারগ ছিলাম। কিন্তু আজকে আমরা সকলেই ইচ্ছা ত্যাগ করতে উদ্যত। এই পরিবর্তন আমাদের মধ্যে আপনি আনলেন কি উপায়ে!" ... বিদ্যাধর

এবার হেসে উত্তরে বললেন, "পুত্র, ওই যে পূর্বে বললাম, অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখতে গেলে কাঠের যোগান দিয়ে যেতে হয় । ... অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখতে তোমাদের রাজনও চিন্তাশীল ছিলেন, কিন্তু তিনি কাষ্ঠযোগান বন্ধ করে দিয়েছিলেন তোমাদের প্রতি। ...

আমি অন্য কিছুই করিনি, কাষ্ঠ প্রদান করতে থেকেছি মাত্র। ... কাষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম। তোমাদেরকে কর্ম প্রদান করেছি, আর তার সাথে সমানে শিক্ষা প্রদান করতে থেকেছি, যাতে কাষ্ঠরা সিক্ত না হয়ে ওঠে, শুষ্ক থাকে। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, অর্থাৎ মনের বিলাসই সত্যকে আচ্ছাদিত করে দেয় আমাদের কাছে, ইচ্ছাদমনের ইচ্ছাকেই ভ্রম বলে প্রতিপন্ন করে দেয় আমাদের কাছে। ...

তাই, প্রয়োজনীয় আহারের সদব্যবস্থা প্রদান, এবং অতি আহারের সুযোগ না প্রদান করা; দেহকে সুরক্ষিত করার সমস্ত ব্যবস্থা প্রদান এবং এই দেহের প্রতি অতি যত্নশীল হবার উপায়কে সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করা; এবং অন্তে যৌনতা মানবসমাজকে অগ্রগতিপূর্ণ রাখার কারণে অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দেবার জন্য, তা যাতে দেহসুখের বিষয় না হয়ে উঠতে পারে; এই তিন বিষয়ে রাজাকে যত্নশীল হতে হয়।

কিন্তু তোমাদের রাজা, এই তিন বিষয়ের উপর কর্ম করেন নি। তিনি অতি আহারের পথকে অবরুদ্ধ করেন নি, বরং নিজের সেনাদের অতিভোজন প্রদান করেছেন, তাঁদেরকে শক্তিশালী করার জন্য । রাজর্ষি হয়েও তিনি ভুলে গেছেন যে দেহবল বলশালী নয়, মনকে মদাচ্ছন্ন করে দুর্বল করে তোলে। আর তাঁর এই অতিআহারের সুবিধা প্রদানের কারণে তোমরাও সেই অতিআহারের প্রতি আকর্ষিত হতে পেরেছিলে। ...

দেহসুরক্ষার জন্য আবাসনের প্রয়োজন, অট্টালিকার নয়। কিন্তু তোমাদের রাজন নিজের সেনাকে সুখপ্রদান করতে উদ্যত ছিলেন, যাতে তারা তাঁর প্রতি অনুগত থাকেন । আর সেই সুযোগ সেনাকে প্রদান করার কারণে তোমাদেরকেও সেই পথে যাত্রা করা থেকে তিনি রোধ করতে পারেননি, ফলে তোমরা দেহসুরক্ষা নয়, দেহবিলাসে লিপ্ত হয়েছিলে। ...

বিলাসপূর্ণ সেনা যৌনতাকে দেহসুখের বিষয় করে নিলে, রাজন তাঁদেরকে নিজের প্রতি অনুগত রাখার কারণে বাঁধা দেন না । আবার তিনি ঋষি হয়েও যৌনশিক্ষা প্রদান করাতে কুণ্ঠাবোধ করেন। ফলে, তোমাদের মধ্যেও যৌনতাপ্রিয়ভাব আগত হতে থাকে, এবং তোমরা ইচ্ছাদমন করার নয়, ইচ্ছাপূর্তি করার জন্যই জীবনযাপন করতে থাকো। ...

রাজা কখনোই তা তোমাদের থেকে আশা করেন নি, তাই তিনি আশাহত হন তোমাদের এহেন আচরণ দেখে, কিন্তু তিনি আত্মমন্থন করেন না। তিনি তোমাদের মধ্যেই দোষ খুঁজতে থাকেন, কিন্তু নিজের দোষকে অদেখাই রেখে দেন। রাজা অবিনাশ কেবল একজন রাজা নন, তিনি একজন ঋষিও। তাই ঋষিগণ কিছুতেই তাঁর দোষ তাঁকে দেখাতে পারছিলেন না। ... তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রাজা একদিন নিজের দোষকে দেখতে পাবেনই।

কিন্তু যেদিন রাজা তোমাদের অগ্নি প্রজ্বলনকে স্তব্ধ করে, তোমাদের কর্মকে অর্থাৎ কাষ্ঠকেই অপসারিত করলেন, সেদিন আর ঋষিগণ অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁরা আমাকে আবাহন করেন। (হেসে) তাই আমার এইস্থানে আগমন। ... আর আমি কিচ্ছুই করিনি, কেবল তোমাদেরকে পুনরায় কাষ্ঠ প্রদান করেছি, আর সেই কাষ্ঠ যাতে সকল বাসনা থেকে মুক্ত থাকে, তাই চেষ্টা করেছি"।

সকল শিক্ষার্থী এবার বিদ্যা অধ্যায়নের সমাপ্তিতে নিজনিজ কর্মে প্রত্যাবর্তন করলে, রাজা অবিনাশ নিজস্থানেই স্থিত হয়ে নেত্রের জল মুছতে থাকেন। ... সেই দেখে বিদ্যাধর রাজার সম্মুখে গেলে, রাজা দেখলেন, তাঁর সম্মুখে যুগল স্ত্রীচরণ স্থাপিত। ... তিনি নেত্র উঠিয়ে দেখলেন, মাতা সর্বাম্বা সেখানে উপস্থিত। ... রাজা এবার আর নিজের অশ্রুকে নিস্তব্ধতা প্রদান করতে পারলেন না। ... তিনি মাতার চরণে নিজকে অর্পণ করে দিলেন।

ক্রন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে রাজা বললেন, "ঋষি নই, মূর্খ আমি মাতা। ... আর মূর্খ বলেই তো তুমি সাখ্যাত আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলে, তখনও নারীপুরুষের লিঙ্গভেদে আমার মন উদ্বেলিত ছিল। ... মাতা আমার কি করে পুরুষ হতে পারেন, এই ভাবছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের যে কনো লিঙ্গভেদ সম্ভবই নয়! ... স্বয়ং পরাচেতনা! তাঁর কি কনো লিঙ্গ হয়!... তিনি স্নেহশিলা, তাই আমরা তাঁকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করি। ...

কিন্তু মা, আমাকে তোমার চরণ কেন প্রদান করলে! ... সেনাকে বলশালী করে, নিজের প্রতি অনুরক্ত রাখার প্রয়াস করে, আমি কেবল রাজার নয়, কেবল ঋষিত্বের নয়, কেবল শাসকস্মৃতির নয়, স্বয়ং কৃতান্তের অপমান করে, সাখ্যাত পরব্রহ্মের অপমান করেছি। ... এরপরেও আমার তোমার চরণে কি করে স্থান হয় মা!" ... মাতা হেসে বললেন, "পুত্র অবিনাশ, সন্তান ভুল করবে, তাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু যখন সন্তান নিজের ভুলকে সনাক্ত করে, মায়ের বক্ষে নিজকে অর্পণ করে মাতার দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা বোধ করে, মাতা যে তখন তাঁর সন্তানকে নিজবক্ষে আগলে ধরে রাখেন। ...

আমি তোমার উপর কখনই রুষ্ট ছিলাম না, আমি তোমার প্রতি করুণা অনুভব করছিলাম, আর অধীর আগ্রহে ছিলাম কখন সেই করুণাকে স্নেহের ধারায় রূপান্তরিত করে তোমার উপর বর্ষণ করবো" । ... রাজর্ষি বললেন, "কিন্তু আমার মদাচ্ছন্নতা তোমাকে সেই স্নেহধারা বর্ষণ থেকে সমানে অবরুদ্ধ করছিল। ... মা, আমি আজ সত্যই নিজকে অপরাধী বোধ করছি। ...

সমস্ত অপরাধবোধ থেকে আমি নিজকে মুক্ত করতে পারছি, কিন্তু মাতা তাঁর সন্তানকে স্নেহ করতে চেয়েও করতে পারছিলেন না, এই অপরাধ বোধ বড় পীড়া প্রদান করছে অন্তরে। নিজকে বড় ধিক্কার প্রদান করতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার। ... কিন্তু একজনের প্রতি আমার রাগও হচ্ছে মা!" ... মাতা হেসে বললেন, "মহারানীর প্রতি নিশ্চয়ই!" ... রাজা বললেন, "হ্যাঁ, ঋষিগণ রাজর্ষির কাছে এসে সাখ্যাতে বলতে পারছিলেন না, মানলাম সেই কথা। ... কিন্তু রানী!"

মাতা হেসে বললেন, "স্মরণ করে দেখ অবিনাশ, তোমার পত্নী তোমাকে কতবার বলেছিলেন, সেনাদের অত সুযোগ না প্রদান করার জন্য। ... তিনি এমনও বলেছিলেন তোমাকে যে, সেনাকে প্রদান করা সুযোগকে সাধারণ প্রজাও নিজজীবনে ধারণ করে নেবে । তুমি সেই সমস্ত কথাকে অগ্রাহ্য করেছিলে" । ... রাজর্ষি মস্তক নত করে বললেন, "হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ মদাচ্ছন্ন ছিলাম । যা আমি করছি, সমস্তই ঠিক করছি, এমন মনোভাব ছিল আমার। ...

বিশেষ করে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে যখন আমি রাজকর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিই, তখন আমার মদভাব সর্বচ্চ হয়ে ওঠে। ... আমিই শ্রেষ্ঠ রাজা, এমন ভাবও আমার মধ্যে আসে মাতা। ... কিন্তু ... রানী তো আমাকে প্রজাদের নিষ্কাশন করা থেকে প্রতিহত করতে পারতো! ... সে কেবল একটিবারই বলেছিল, আমি কাজটা ঠিক করছি না । ... কিন্তু, এর অধিক বাঁধা সে দিতে পারতো তো! ... তা করলো না কেন সে!... আমি যে ঘোর অন্যায় করে ফেললাম মা! ... আমার সন্তানদের আমি অনাথ করে দিয়েছিলাম মা!"

মাতা হেসে বললেন, "পুত্র, মদাচ্ছন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বিনা, অন্য কনো কথাই প্রতিফলিত হয়না। তা রানী অবিনাশী সঠিক ভাবেই জানতেন। তাই তিনি তোমাকে বাঁধা প্রদান করার কর্মে লিপ্ত না হয়ে, তোমার সন্তানরা যাতে অনাথ না হয়ে যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেন তিনি"।... রাজন বললেন, "এর অর্থ কি মাতা!" ... মাতা হেসে বললেন, "রানী অবিনাশীই এই স্থানটি নির্মাণ করেন, এবং সমস্ত সেই প্রজাদের, যাদের তুমি নির্বাসনে প্রেরণ করেছিলে, তাদের এইস্থানে রাখেন। ...

কেবল তাই নয় পুত্র, রানী নিয়মিত এখানে আসেন, এবং সকল প্রজাদের দেখভাল করেন, আর আমি একটু পূর্বে যেই মাতার কথা বলছিলাম, যা প্রজা বুঝে গেছিলেন, কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি, তিনি অন্য কেউ নন, তোমার স্ত্রীই । ... অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তিনি, যাতে নিজের পতিকেও তিনি অপমান না করে ফেলেন, আবার নিজের সন্তানতুল্য প্রজাদেরকেও অনাথ না করে দেন। ... তিনি তো একজন প্রকৃত ঋষিপত্নী পুত্র!" ... দেবী অবিনাশী সেই স্থান এবার উপস্থিত হলে, রাজা দেখলেন সকল প্রজা রানীকে প্রণাম করেন, আর রানীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। ...

রাজা অবিনাশ এবার পত্নীর কাছে উঠে গিয়ে বললেন, "রানী, আজ আমি সত্যই গর্বিত । ... আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে লাভ করে, সত্যই অতিশয় আনন্দিত" । ... রানী হেসে বললেন, "আমি যা কিছু করেছি, সে তো আপনিই শিখিয়েছিলেন। ... মনে আছে রাজন, বিবাহের বাসররাত্রে আপনি আমাকে বলেছিলেন, 'এই প্রজারা আমার সন্তান, তাই তোমারও সন্তান। ... ওদেরকে মায়ের মত বুকে করে আগলে রেখো' । ... মহারাজ, আমি তো কেবলই আপনার আদেশের পালন করছিলাম। ...

আর সদাসর্বদা মাতার মার্গদর্শনে, আমি আমার এই সন্তানদের মানকে, জীবনকে অক্ষত করে রাখতে পেরে, আমি মাতার কাছে অব্যাক্ত ভাবে কৃতজ্ঞ। ... আমি তাঁর পর নই, তাঁর নিজের সন্তান। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ, তাঁকে অপমান করা আর তাঁকে দূরে ঠেলে দেওয়া; আবার আমাকে আমার ধর্মের স্মরণ করিয়ে আমাকে ধর্মনিষ্ঠ করিয়ে রাখার কারিগর তিনিই। তাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ না করতে পেরে আমার হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। ...

আবার আমার পতি, যিনি সকল প্রজার পিতা, তাঁকে তাঁর পিতার ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়ে দিলেন আমার মাতা । ... সমস্ত মিলিয়ে আমি মাতাকে কি বলবো, বুঝে পারছি না মহারাজ । ... ইচ্ছা হচ্ছে, সারাজীবন তাঁর দাসীবাদী হয়ে থাকি। ... কিন্তু সেই কথাও মুখে আনতে পারছি না, সন্তান দাসীবাঁদী হয়ে থাকবেন শুনে তিনি যদি মনে ব্যাথা পান । ... তাই মহারাজ, আমি আজ বাক্যহীন। আমি আমার মনের ভাবকে ব্যক্তই করতে পারছি না, কারণ সেই ভাব যে কেমন, তা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না"।

এই বলে রানী মাতার চরণে নিজকে স্থিত করতে গেলে, মাতা তাঁর স্কন্ধকে নিজহস্তে ধারণ করে তাঁকে আলিঙ্গন প্রদান করে বললেন, "তোমার আনন্দ আমার আনন্দের থেকেও বৃহৎ, কিন্তু আমার আনন্দও কম নয় পুত্রী। ... এক মাতার সর্বাধিক আনন্দ তখন হয়, যখন তার পুত্রী একজন সতী হয়ে ওঠে, যখন তার পুত্রী একজন সন্তানপ্রিয় মাতা হয়ে ওঠে। ... আজ আমার এই পুত্রী যেমন ভাবে তাঁর স্বামীর প্রতি অনুগত এক সতী, তেমনই তাঁর প্রজারূপ সন্তানদের হৃদয়ে স্থিতা মাতা। ... তাই আজ এই মাতার হৃদয় আনন্দ উৎফুল্ল পুত্রী।... তবে পুত্রী...

এবারে আমকে প্রত্যাগমন করতে হবে যে । ... রাজা নিজের কর্মে ও ধর্মে স্বমহিমায় ততক্ষণ স্থিত থাকতে পারেন না, যতক্ষণ তাঁর সম্মুখে ঈশ্বরী স্থিত থাকবেন। ... তাই তাঁর কর্মে তাঁকে স্বতন্ত্রতা প্রদানের জন্য আমাকে যে এখন প্রত্যাগমন করতেই হবে পুত্রী"। ... মাতার এই কথাতে রানীর দুই নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলে, মাতা রানীর সুন্দরমুখবদনে নিজের দুই স্নেহহস্ত রেখে বললেন, "কি হলো পুত্রী! ... তোমার নেত্র ভরে এলো কেন!"

রানী আবেগতাড়িত বদনে বললেন, "তুমিও তো স্ত্রীবেশেই অবতরণ করেছ মা... তুমি তো জানো ভালো করেই, শ্বশুরগৃহে কিছুদিনের জন্য মাতা এসে চলে যাবার সময়ে, পুত্রীর মনটাও যেন তাঁর মাতা নিয়ে চলে যান। ... এক স্ত্রীর ধর্মই হলো, তাঁর পতির ধর্মকে নিজের ধর্ম বোধ করে তা পালন করা । তাই সহ্য তো করে নিতে হয় মনের পীড়াকে, কিন্তু তা বলে মায়ের প্রতি আসক্তি পুত্রীর কি করে না থাকে!" ... মাতা সেই কথায় রানীকে নিজবক্ষে স্থাপন করে স্নেহ প্রদান করে বললেন, "কি চাও পুত্রী বলো"।

রানী বললেন, "কি চাইবো মা! ... যদি তোমার সঙ্গ চাই, তবে পতির ধর্ম ত্যাগ করতে হয়, আর তাতে তোমার যে গর্ব আমাকে নিয়ে, তাই স্খলিত হবে। ... কিন্তু তোমার সঙ্গ বিনা আর কিছুই যে চাইবার মত খুঁজে পাচ্ছিনা! ... মা, মাঝে মাঝে এই মেয়ের কাছে একটু সময়ের জন্য আসবে! ... কষ্ট দিচ্ছি তোমায় । ... কিন্তু আর তো কনো উপায় নেই মা... নিজধর্ম ত্যাগ না করে, তোমার সান্নিধ্য কি করে আর পেতে পারি!"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "পাগলি মেয়ে! ... আমি কবে তোর থেকে দূরে ছিলাম রে! ... আমি তো তোর অন্তরে, তোর চেতনা হয়ে স্থিতা। ... নেত্র বন্ধ কর"। ... রানী নেত্র বন্ধ করে পুলকিত হয়ে উঠে বললেন, "মা, তুমি অন্তরে!" ... মাতা হেসে বললেন, "হ্যাঁ রে পাগল মেয়ে। ... আমি সদাই তোর অন্তরেই ছিলাম, আর সদাই থাকবো। যখন আমাকে দেখতে ইচ্ছা করবে, পেতে ইচ্ছা করবে, একবার নেত্র বন্ধ করে নিবি। ... আমি তো তোর কাছেই থাকি। ...

তুই আমার প্রতি আসক্ত! হ্যাঁ রে, এই মা তোর প্রতি আসক্ত নয়!" ... রানী মাতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করে এমনই ভাবে আঁকরে ধরলেন যে রাজর্ষি অবিনাশ বলতে বাধ্য হলেন, "রানী, মাতাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ এবার" । ... রানী ক্রন্দনস্বরে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ দিচ্ছি। ... সন্তান মাতাকে কষ্ট দেবে না তো কে দেবে! ... সন্তানের যে মাতা ছাড়া কেউ নেই । ... কিচ্ছু নেই। ... সে নিজেও নেই"। ... মহাদেবী হেসে বললেন, "আর সন্তান এই বোধ নিয়ে মাতাকে যখন যখন কষ্ট দেয়, তখন তখন মাতা সন্তানকে আঁকরে ধরে থাকে নিজের কোলে"।

সকল প্রজা মাতাপুত্রীর এই অদ্ভুত মিলন দেখলেন। আর রানীর ভগবতীর প্রতি অপার প্রেম দেখলেন । সকলে দেখলেন ও শিখলেন, ঈশ্বরীকে ঈশ্বরী নয়, নিজের আপন আত্মীয়ের স্থান প্রদান করতে পারলে, তবেই জীবের মুক্তি হয় । ... আর তার প্রমাণও পেয়ে যান, যখন সেই দিনের পরে মাত্র দুইবছর পরে, রানী প্রেমআলিঙ্গনের মুদ্রায় দেহত্যাগ করলেন। ...

সকলে সেইদিন বলেছিলেন, "মাতার সাথে প্রেমের আলিঙ্গনে, রানী মোক্ষ লাভ করে গেলেন"। ... আর রাজর্ষি অবিনাশ বলেছিলেন, "আমি ঋষি হতে পারি, কিন্তু রানী, তুমি প্রেমী হয়ে এই ঋষিকে চোখে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলে, জ্ঞান নয়, প্রেমই একমাত্র ঈশ্বরের প্রিয়। ... প্রেমই একমাত্র জীবকে মোক্ষ প্রদান করতে সক্ষম" । ... সকল প্রজার কাছে রানী অবিনাশী চিরনমশ্য হয়ে রয়ে গেলেন।

মাতার দর্শন লাভের পূর্ব থেকেও, রানীকে সকলে ভগবতী প্রেমী বলে জানতেন । কিন্তু সেই দর্শনপ্রাপ্তির পর থেকে তিনি সদাপ্রজাসেবা করতেন, এবং সর্বদা মাতার প্রেমে মত্ত থাকতেন। আপন মনে তিনি নৃত্য করতেন, সঙ্গীত সাধতেন । আর মনের মধ্যে তাঁর এই ভাব থাকতো যে সকল সঙ্গীত তিনি মাতাকে শোনাচ্ছেন, সকল নৃত্য তিনি মাতাকে দেখাচ্ছেন, এবং তাঁর বিলাস করছেন তিনি। ...

সকলে তাই বলতে থাকলেন, "রানী মাতাকে এমনই বিলাস প্রদান করলেন যে মাতা রানীকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেই পারলেন না। ... মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে মাতা তাঁর কন্যাকে সদাসদার জন্য নিজের মধ্যে বিলীন করে নিলেন" । এই মাতার তৃতীয় অর্থাৎ বিদ্যাধর রূপের কথা পুত্রী। ... শুনলে তো পুত্রী, মাতা আমাদের নিজের মাতা; মাতা আমাদের আসল মাতা; মাতা আমাদের একমাত্র সত্য; মাতাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা; মাতাই আমাদের একমাত্র একমাত্র প্রাপ্তি...

এই মহাবোধই প্রেম; এই মহাবোধে সদাসর্বদা লীন থাকাই প্রেম । ... সমস্ত কর্মের মধ্যে মাতার সম্মানই নিজের সম্মান এই বোধই প্রেম; মাতার ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছা, এই বোধই প্রেম; মাতার কর্ম করার জন্যই দেহধারণ করে আছি, এই বোধই তাঁর প্রতি প্রেম । তিনি যেই কর্মই প্রদান করেছেন, সেই কর্মই করবো, এটিই প্রেম । ... তিনি যতদিন দেহধারণ করিয়ে কর্ম করাবেন, ততদিন মনের আনন্দে

তাঁর সেবা করবো, এই বোধই তাঁর প্রতি প্রেম। আর এই কামনাশূন্য, আসক্তি বিরক্তি শূন্য প্রেমই একদিন মাতাতে আমাদেরকে বিলীন করে দেন"।

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "সত্য পিতা, প্রেমের উর্ধ্বে না তো কনোদিন কিছু ছিল, আর না কনোদিন কিছু থাকবে। ... প্রেম জীবকে স্বতঃই আত্মপৃথক অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করে পরাশূন্যে বিলীন করে মোক্ষ প্রদান করে। ... কিন্তু মানুষ মাঝে মধ্যেই নিজদের মোহগ্রস্ত, এবং কামনাপূর্ণ আসক্তিকে প্রেম নামে অবিহিত করে প্রেম শব্দকে কলুষিত করে দেয়। ... যেদিন মানুষ সত্য সত্য প্রেম করতে শিখবে, সেদিন তাঁকে আর পৃথক করে তপ, আচার বিচার, কীর্তন, যোগোভ্যাস, কিছুই করতে হবে না। ...

এই প্রেমই মানুষের মধ্যে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। এই প্রেম মানুষকে স্বতঃই তপ করিয়ে নেয়, এই প্রেম মানুষকে স্বতঃই ইন্দ্রজিৎ করে দেয়; স্বতঃই মানুষকে সমস্ত ভেদভাব এবং সমস্ত ত্রিগুণের অতীতে গমন করিয়ে দেয়। ... কিন্তু পিতা, প্রেম যে অনুকরণীয় নয় । প্রেমকে যে অনুকরণ করাই সম্ভব নয়। ... তবে যার প্রেম জন্ম নেয়নি, তিনি কি করে কি করবেন!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, প্রেম জন্ম নেয় ভক্তি থেকে, আর ভক্তি জন্ম নেয় বৈরাগ্য থেকে, আর বৈরাগ্য জন্ম নেয় প্রগার বিশ্বাস থেকে, এই প্রগার বিশ্বাস জন্ম নেয় কর্মের বিজ্ঞানকে অনুভব করে । কর্মের বিজ্ঞান অর্থাৎ যেই কর্ম করছি, সেই কর্মের মধ্যে থাকা গভীর বিজ্ঞানকে অনুভব করার থেকে । আর সেই বিজ্ঞানের অনুভব জন্মায় জ্ঞান অর্জন থেকে । ... তাই পুত্রী, আত্মচিন্তাবিমুখ হয়ে সত্যজ্ঞান অর্জন করতে হয়। সত্যজ্ঞান অর্জন করে, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে কর্মের বিজ্ঞানকে জেনে কর্ম করতে হয়। সেই কর্মের থেকেই জন্ম নেয় বিশ্বাস, আর সেই বিশ্বাস কালে কালে গভীর, আরো গভীর হতে হতে, পরিণত হয়ে যায় ভক্তিভাবে। আর সেই ভক্তিভাব, একসময়ে আত্মচিন্তা নয়, আত্মকেই ভুলিয়ে, পরাচেতনার প্রতি আমাদেরকে প্রেমময় করে দেয়"।

দিব্যশ্রী চিন্তিত হয়ে বললেন, "এর অর্থ পিতা, প্রেম ছাড়া গতি নাই। ... মোক্ষলাভের উপায় রূপে, প্রেম ব্যতীত কোন অন্য মার্গ নেই, কিন্তু এই প্রেম লাভের জন্য যতপ্রকার মত, ততপ্রকারই পথ থাকে। ... কিন্তু, এই কর্মের বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে কর্ম করে ভক্তি ও প্রেমকে অনুভব করার পদ্ধতিকে ঠিক বুঝলাম না"। ...

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "এখানে আলাদা করে আমার কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ... মাতার চতুর্থ কথা শুনলে, তুমি সেই পথের কথা সহজেই জেনে যাবে। ... শোন তবে, সেই চতুর্থ কথার বিবরণ প্রদান করি তোমাকে"।

নটনটি অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "মাতা যখন পূর্ণরূপ সর্বাত্মা রূপে স্থিতা, তখন সমৃধের মধ্য অঞ্চলে এক অদ্ভুত কর্মগুণ বিচারের তরঙ্গ বর্তমান ছিল। ঋষির কর্ম, ব্রাহ্মণের কর্ম ও রাজার কর্মকেই শ্রেষ্ঠত্বের মান প্রদান করা হতো । এবং তাতে রাজ্যবাসী স্বতঃই বিলাসিতাত্যাগ ও ইচ্ছাদমনের পথে চলতেন । কিন্তু পুত্রী, গাছ থেকে পরে যাওয়া ফলের স্বাভাবিক স্বভাবই হয়ে থাকে পচনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। ...

সেই প্রকারেরই এক আচারবিচারের ঘন অন্ধকার মেঘ জম্বুদ্বীপের মধ্যগগনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। সেই স্থানে ব্রাহ্মণের কর্মকে, ঋষির কর্মকে ও রাজার কর্মকেই সর্বোত্তম মান দেওয়া হতো, এবং বাকি সকল প্রজার কর্মকাণ্ডকে নীচ চোখে দেখা হতো । ঋষিগণ সেই দৃশ্য দেখে বিচলিত হন, এবং রাজ্যে নিজদের অবস্থানকে অসুরক্ষিত মনে করেন। তাঁরা একদিন রাত্রের অন্ধকারে রাজ্যত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে একত্রিত হলে, মাতা স্বয়ং তাঁদের সম্মুখে নিজ নিরাকার উর্জ্জাস্বরূপে উপস্থিত হন।

মাতা বলেন, "কি ব্যাপার ঋষিগণ, আপনারা এখানের সমস্ত মানুষকে অনাথ করে চলে যাচ্ছেন কেন? এই মানুষজন কি দোষ করেছে!" ... ঋষিগণ বলেন, "মাতা, যেই রাজ্যে কর্মের প্রতি নিষ্ঠা নয়, কর্মের ধারার উপর নির্ভর করে মানুষকে মান দেওয়া হয়, সেই রাজ্যে আমরা যদি উপস্থিত থাকি, তবে রাজার সেই কৃত্যকে সমর্থন করা হবে, যা সম্যক ভাবে অন্যায়" । ...

মাতা হেসে বললেন, "ঋষিগণ, এই রাজ্যে তো গণতন্ত্র স্থাপিত নয় যে, রাজ্যের সমস্ত কর্মের দায় প্রজার। তাই প্রজাকে এই কর্মের দণ্ড প্রদান করছেন কেন? যদি কিছু সমস্যা হয়, তবে তার প্রতিকার করুন ঋষিগণ। প্রজাকে পরিত্যাগ করা তো প্রতিকার হতে পারেনা। ... এতো তাঁদেরকে জলে ফেলে দেওয়া হয়ে গেল। ... আজ আপনারা যদি এইভাবে সমস্যার দিকে পিঠ দেখিয়ে চলে যান, তবে তো কাল সমস্ত ঋষিই আপনাদের অনুসরণ করবে। তখন যে মনুষ্যমনে কলিযুগীয় গণতন্ত্র প্রবেশ কেবলই সময়ের অপেক্ষা হয়ে থাকবে, তাই না!"

ঋষিগণ বললেন, "মাতা, তবে আমাদের কি করণীয় এক্ষণে! কি করে আমরা এই মানুষদের সাহায্য করতে পারি? আমাদের মার্গ বলে দিন মাতা" । ... মাতা হেসে বললেন, "ঋষিগণ, আপনারা তো সকলের শিক্ষক, সকলের চরিত্রগঠন করেন আপনারা। ... তো আপনারা একজন যোগ্য ক্ষত্রিয়কে নির্মাণ করতে পারছেন না, যিনি রাজা অখিলেশের প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠবেন! ... জানি, রাজা অখিলেশ সেই কর্মে বাঁধা দেবেন। কিন্তু ঋষি যদি কারুকে লুকিয়ে রাখতে চান, রাজার কি সামর্থ্য তাঁকে খুঁজে বার করে?"

ঋষিগণ বললেন, "কিন্তু মা, প্রজার মধ্যেও যে এই চেতনার বিস্তার করা হয়েছে! তারা এখন এই বিশ্বাস করেন যে একমাত্র রাজা ও ঋষিদের কাজই কাজ, বাকি সমস্তই অকাজ। তবে কি, আমাদেরকে এক কন্যাকেও প্রস্তুত করতে হবে এইরূপে! নাহলে সেই রাজার পত্নী কে হবেন? রাজার পত্নী না হলে যে তিনি রাজসিংহাসনে আঢ়ুর হবার জন্য অযোগ্যই থেকে যাবেন মাতা!" ...

মাতা হেসে বললেন, "আনন্দ নামে তোমাদের আশ্রমে এক যুবক আছেন । তিনিই ভাবিকালের এই রাজ্যের মহান রাজা হবেন । ... আর তাঁর পত্নী! ... তাঁর পত্নীকে খুঁজে আনার ভার আমাকে দাও পুত্ররা" । ... মাতার সেই কথা শুনে ঋষিগণ বললেন, "বুঝে গেছি মাতা। রানীর ভার আপনি নিলেন, এর অর্থ রানী যিনি হবেন, তাঁর মাধ্যমে প্রচুর প্রজা শিক্ষিত হবেন। ... মাতা, যেমন আপনি বললেন, আমরা নির্দ্বিধায় তেমনই করবো। ... আজ্ঞা করুন মাতা"।

মাতা এবার সেখান থেকে অবলুপ্ত হলে, ঋষিগণ মাতার আদেশ মত আনন্দকে গোপনে ও যতনে পালন করতে শুরু করলেন। অন্যদিকে, সমস্ত সুন্দরী রমণীদের পরিচারিকার বেশে স্থাপিত করে রাখা অখিলেশ রাজ্যের সর্বাধিক সুন্দরী যুবতী, দেবী অনিমার দিকে দৃষ্টি স্থির থাকে। ... কিন্তু দেবী অনিমা রাজার মানসিকতা জানেন, এবং তাই রাজপুরে বারবার তাঁকে পরিচারিকা হতে বললেও, তিনি রাজি হননা।

কিন্তু রাজা অখিলেশ দেবী অনিমার রূপে এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁর ক্রুর দৃষ্টি অন্য সমস্ত পরিচারিকাদেরকে মুক্ত করে দেয়। ... দেবী অনিমা কনো ভাবেই রাজা অখিলেশের চক্রান্তে ধরা পরেন না । কনো না কনো ভাবে তিনি মুক্ত হয়ে যান। তাই, রাজা অখিলেশ এবার সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভীত করে, এই স্ত্রীর সমস্ত ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশকে বর্জিত করে দেয়, আর সমস্ত রাজ্যে দেবী অনিমাকে কলঙ্কিত ও দুশ্চরিত্র বলে প্রচার করেন।

এই প্রচারের পরে, দেবী অনিমা যেখানেই যেতেন, সেখানেই পুরুষেরা তাঁকে লোভী দৃষ্টিদ্বারা দেখতেন। অসম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনধারণ, সেই বুঝে দেবী অনিমা একটি রাত্রে গোপনে ঋষি আশ্রমে প্রবেশ করে ঋষিগণের উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত কথা বলেন। দেবী অনিমার এই দুর্দশা দেখে, রাজ্যের প্রধান ঋষি বলেন, "পুত্রী, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। ... আমি তোমাকে এক নটি করে দেবো।...

পুত্রী, এই রাজ্যে নট ও নটিকে অতি হীননেত্রে দেখা হয়। আর সেই কারণে, রাজা ও রাজপরিবারের নটনটির মুখদর্শনও বর্জিত। তাই তুমি সুরক্ষিত থাকবে । ... আর এই নটিদের হীন দৃষ্টে দেখা হবার কারণে, তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রণের ভার ঋষিদের সঁপেছিলেন অখিলেশ। এই কৃত্যের অন্তরালে একটি কারণ আছে পুত্রী । রাজা অখিলেশ এক নটীর কারণে দুশ্চরিত্র বলে চিহ্নিত হন। এবং ঋষিদের থেকে অভিশাপ লাভ করার মুহূর্তে উন্নীত হন। ...

সেই কালে, তাঁর পিতার আবেদনে তো ঋষিদের তৎক্ষণাৎ ফলিভুত হতে পারা অভিশাপ থেকে ক্ষান্ত করা যায়, কিন্তু ঋষি সমাজ রাজা অখিলেশকে অভিশাপ দেওয়া থেকে পিছুপা হননা। ... তাঁরা রাজকে অভিশাপ দেন যে কনোদিন কনো নটির নিকটে গেলেও, তাঁর সমস্ত শরীর এমনই গরলে লিপ্ত হয়ে যাবে যে যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন সেই গরলকে সঙ্গে নিয়েই তাঁকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। ... তার পরে পরেই রাজা অখিলেশ নটিদেরকে দুশ্চরিত্র বলে রাজ্যে রটনা করেন, এবং রাজপরিবারের নটীসংঘ করাকে আইনগত ভাবে বর্জিত করেন।

তাই পুত্রী, নটিরূপে তোমাকে স্থাপন করা হলে, রাজা অখিলেশ তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। কিন্তু, এই ক্ষেত্রে রাজ্যবাসী তোমাকে দুশ্চরিত্র বলেই আখ্যা দান করবেন । ... এই একটিই লাঞ্ছনা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। ... তুমি কি প্রস্তুত পুত্রী, সেই লাঞ্ছন স্বীকার করার জন্য?" ... দেবী অনিমা ম্লান হাস্য প্রদান করে বললেন, "প্রভু, এ আমারই কর্মের ফল । ... রাজা অখিলেশ অন্যস্ত্রীদের মত আমাকেও শিক্ষা প্রদান করতে দেননি, যাতে আমি পরিচারিকা হয়েই থাকি। ... কিন্তু আমার শিক্ষালাভের অভিপ্রায়ের কারণে, মাতার সম্বন্ধে জানার ব্যকুলতার কারণে, আমি গোপনে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের শিক্ষাদানকে নেপথ্যে থেকে শুনেছিলাম। ...

ব্রাহ্মণের শিক্ষাদানও একই ভাবে আয়ত্ত করতে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমাকে কেউ কেউ এমন অবস্থায় দেখে ফেলেন। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে আমার মাতাকে জানার এই উপায়কে বর্জন করতে হয় । ... প্রভু, আমার এই তস্করবৃত্তির জন্য তো আমাকে কর্মফল ভোগ করতেই হতো। আজ আমি সেই কর্মের ফল ভোগ করার অবস্থায় উন্নীত হয়েছি। ... তবে ঋষিবর, আপনাদের কন্যার প্রতি আপনাদের এই কৃপাময় দৃষ্টির মান যথাযথ ভাবে রাখার প্রচেষ্টা করবো আমি। ...

নটিদের দুশ্চরিত্র আখ্যা দেবার পর থেকেই, রাজ্যের নটিদের চরিত্রের প্রতি আঁট নষ্ট হতে শুরু হয়েছে। ঋষিগণ, চরিত্র, কি নরের, কি নারীর, সকলেরই শ্রেষ্ঠ চিত্তাভূষণ। ... তাই আমার প্রয়াস থাকবে, নটি হয়েই চরিত্রের আঁটকে স্থির রেখে, সকল নটিদের পুনরায় চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিশীল করে তোলা"। ... একজন ঋষি বললেন, "কিন্তু পুত্রী, নটিরা তো আর নিজ থেকে চরিত্রহীনা হননি। ... তাঁরা চরিত্রহীনা না হওয়া সত্ত্বেও, মানুষ রাজা অখিলেশের ছলনার কারণে নটিদেরকে চরিত্রহীনা বলেছিলেন। ...

নটিরাও তো সেই কারণেই, যেই কর্ম না করেও সেই অপবাদের ভার সহ্য করতে হচ্ছে দেখে, চরিত্রের আঁটকে খণ্ডন করে দেন। অর্থাৎ পুত্রী, তুমি চরিত্রবাণ হলেও যে মানুষের মুখ থেকে তোমাদের অর্থাৎ নটিদের চরিত্রবাণ বলাতে পারবে না!" ... দেবী অনিমা হেসে বললেন, "ঋষিবর, চরিত্র মানুষকে দেখানোর বস্তু নয় যে! ... চরিত্র যে মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মাতাকে নিষ্কলঙ্ক রেখে দেওয়ার প্রয়াস। ... মাতার কনো লিঙ্গ নেই, কিন্তু তবুও মাতা বার বার নারীরূপ ধারণ করেন। ...

তাই নারী হয়ে জন্মলাভ করা যে অত্যন্ত গর্বের। ... কিন্তু সেই নারী চরিত্রকেই যদি নাশ করে দেওয়া হয়, তবে যে কলঙ্ক কেবল সেই নারীর মনেই লাগে না, সেই কলঙ্ক যে স্বয়ং মাতার মনে লাগে। ... তাই ঋষিবর, নিজের নাম খ্যাতি নয়; যেই আমিই একটি ভ্রম,

তার আবার কিসের মান, কিসের অপমান! মাতা আমার কনো ভ্রম নন । ... তাঁর মান সম্মানকে এইভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারিনা। ... আমাদের চরিত্রবতী হতে হবে, মাতার যোগ্য সখীরূপে নিজদের স্থিত করার জন্য। ...

আমাদের অন্তরমন থেকে নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠতে হবে, যাতে আমাদের মাতা, আমাদের সখী প্রাণভরে আমাদের কাছে মিলিত হতে পারেন। ... প্রভু, তিনি নারী বেশে অবতীর্ণ। তাঁরও তো সখী লাভের ইচ্ছা হয় নিশ্চয়ই । কিন্তু যদি তাঁর সখীরা সকলে চরিত্রহীনা হন, তবে মাতা কাদের সম্মুখে এসে সামান্য সুখদুঃখের কথা বলবেন! ... না প্রভু, মানুষের চোখে শ্রেষ্ঠ হতে নয়, মাতার চোখেও শ্রেষ্ঠ হতে নয়, তবে মাতার মনের তৃপ্তির জন্য আমি নটিদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিশীল করতে আগ্রহী। ...

প্রভু, মাতার নাম কনো প্রকার পেশার সাথে যুক্ত থাকে না, কেবল মাত্র নাট্য ছাড়া। তিনি হলেন নটেশ্বরী। অর্থাৎ নাট্যের সাথে যুক্ত সকল স্ত্রীর তাঁর প্রতি কর্তব্য আছে। ... নাট্য জগতে উপস্থিত সকল নারী মাতার প্রতিবিম্ব। তাই তাঁরা যদি চরিত্রহীনা হন, তবে সেই লাঞ্ছন কেবল তাঁদের নয়, মাতারও। তাই যে প্রভু প্রতি নটিকে সুচরিত্রের অধিকারী হতেই হয়। ... আমার কর্মেরফল রূপে আমি মানুষের কাছ থেকে লাঞ্ছনের দণ্ড ভোগ করবো। কিন্তু ঋষিবর, আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন, আমি নটিদের মধ্যে পুনরায় চরিত্রের প্রতি নিষ্ঠাকে জাগ্রত করতে পারি"।

ঋষিগণ দেবী অনিমার মাতার প্রতি অসীম প্রেম দেখে আপ্লুত হয়ে দেবী অনিমাকে আশীর্বাদ প্রদান করলেন, এবং তাঁকে নটীর কর্মে নিযুক্ত করলেন। রাজা অখিলেশের কাছে দেবী অনিমার নটিরূপে নিযুক্তির সংবাদ গেলে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত রাজ্যবাসীকে নির্দেশ দেন, এই নটিকে বর্জন করার জন্য। কিন্তু দেবী অনিমার অদ্ভুত সৌন্দর্য যেমন একদিকে সকলকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করে, তেমন তাঁর নাট্যসামর্থ্য ক্রমশ সকল মানুষকে তাঁর প্রতি আকর্ষিত করতে থাকে।

কিন্তু যতই আকর্ষিত করুক মানুষকে, এক নটির সেই মধ্যতিমির রাজ্যে কনো মর্যাদা ছিলনা। নটীর চরিত্রের কনো ঠিক নেই। সেই অপবাদ যখন নটিদের অঙ্গের ভূষণ হয়ে গেছে, তখন নটিরাও নিজদের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বহুবৈভবশালী পুরুষসঙ্গ লাভ করে, বহুধনের স্বামিনী হয়ে উঠতে থাকেন । ... দেবী অনিমা তেমন না করলেও, অপবাদ তাঁকে সেই একই সহ্য করতে হয়।

মন্দিরে নটিদের প্রবেশ বর্জিত, আর সমস্ত পথে তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের টিপ্পনী শুনতে হয়। ধনবান বৈশ্যদের তাঁদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ও তাঁদের উদ্দেশ্যে ধন প্রদান করে , তাঁদের সাথে সহবাসের ইচ্ছা একদিকে যেমন নটিদের জীবন যৌবনের অঙ্গ, তেমন ধনহীন মানুষদের সেই নটিদের ধনবানদের ন্যায় সম্ভোগ না করতে পারার কারণে জমে থাকা বিদ্বেষের কারণে কুৎসিত মন্তব্য লাভ, এও নটিদের জীবনের এক আবশ্যক অঙ্গ হয়ে গেছে।

ধনীদের ধন, দেবী অনিমাকে স্পর্শ করতে পারেনা, তাই ধনীরাও তাঁর অঙ্গস্পর্শ করতে পারতেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের নেত্রে সমস্ত নটি যেমন, দেবী অনিমাও তেমন। তাই সাধারণ মানুষের কুৎসিত মন্তব্য তাঁকে সহ্য করতেই হয়। কিন্তু তারপরেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। সদা তিনি নিজের চরিত্রকে শুদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে রেখে দেন। ... তাঁর এই আচরণের কারণে, তাঁর কাছে ধন এসেও আসতে পারেনা, কারণ বৃত্তবাণদের ধন তাঁর কাছে আসতো না।

সুন্দরীর দর্শনে যারা লোলুপ থাকেন, তাঁরাও এই সুন্দরীকে স্পর্শও করতে পারবেন না জেনে, তাঁর থেকে দূরে পতিত হয়েছিলেন। সাধারণ মানব তাঁর রূপ দেখতে বারবার তাঁর নাট্যে ভিড় জমাতেন, কিন্তু তা বলে নাট্যের বাহিরে দেবী অনিমাকে দুশ্চরিত্র বলতে ছাড়তেন না। ... আর তাঁর নিকট নাট্যপ্রেমীরা আসতেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে নাট্য শিখতেও আসেন, আর তিনি সকলকে স্নেহের সাথে নাট্য শেখান।

অন্য নটিদের কাছে দেবী অনিমা এক বিস্ময়। তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন, এই নটি কি কারণে নিজের চরিত্রের প্রতি যত্নবাণ। তিনি ধন লাভ করছেন না, মানুষের কাছে দুশ্চরিত্রের বদনাম কুড়চ্ছেন, তারপরেও চরিত্রের আরাধনা করে চলেছেন, এমন করে কি লাভ করছেন তিনি। ... দেবী অনিমাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, "কিছু প্রাপ্তির কারণে তো আমি এমন কিছু করিনা। আমার মনে হয়, আমাকে ঈশ্বরী সৌন্দর্য এবং চরিত্র দুইই প্রদান করেছেন, তাঁর গরিমাকে স্থাপন করার জন্য। ...

আমি যদি আমার এই সৌন্দর্য এবং চরিত্রকে জাগতিক সুখভোগের জন্য ব্যবহার করি, তাহলে তা আমার পরমসখীর অপমান। সকল সৌন্দর্য তাঁরই, সকল চরিত্র তাঁরই। সেই সৌন্দর্যকে বা সেই চরিত্রকে নিজের সুখভোগের জন্য ব্যবহার করার কনো অধিকার আমাদের নেই। ... তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে, সেই অধিকার দিলেও সেই অধিকার আমাদের জন্মাবে না। ... কি মুখ দেখাবো তাঁর কাছে! ... নিজের বদনাম করেছি বলবো, নাকি তাঁর! ...

মানুষ যা করছেন, তা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিরুচি, তাই নিয়ে কনো কথা বলার অধিকার আমাদের থাকতে পারেনা। কিন্তু আমরা আমাদেরকে কি বলছি, তা নিয়ে কথা বলার অধিকার আমাদের ছাড়া কারুর থাকেনা। আমি আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার, আমার সখীর সম্মুখে স্থিত হবার জন্য আমি সদাসজ্জ। তিনি যদি সম্মুখে এসে উপস্থিত হন, অবশ্যই তাঁর প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠায়, আমাদের মাথা নত হবে, কিন্তু তাঁর বদনাম ছড়ানোর কাণ্ডারি আমি, সেই অপরাধে মাথা নত হবেনা। ...

পত্নীও পতির কাছে মাথা নত করেন, কিন্তু তা প্রেম ও নিষ্ঠার কারণে। তাই পতি সেই মাথাকে উন্নত করে দেন, নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির সাহায্যে। কিন্তু যখন আমাদের মস্তক নিজকৃত্যের কারণে নত হয়, তখন কেউ আমাদের মস্তককে উন্নীত করেন না। ... আমার কাছে মানুষ আমাকে কি বললেন না বললেন, তাতে কিচ্ছু এসে যায়না। কিন্তু আমার সখী যেন আমাকে প্রেমেই আলিঙ্গন করেন, আমাকে তিনি যেন সখী মানতে কুণ্ঠা বোধ না করেন।...

জানি তিনি পতিতাকেও আলিঙ্গন করেন, কিন্তু সেই আলিঙ্গন যে পতিতাকে এই বোঝাতে যে তাঁর সঙ্গ সকলে ত্যাগ করলেও, তিনি করেননি, কারণ তিনি সকলের মাতা। ... কিন্তু আমি সেই পতিতার আলিঙ্গনের জন্য অরাজি। ... আমি নাট্য করি, তাঁর বিনোদনের জন্য; আমাকে সুন্দরী তিনি করেছেন, তাই আমি সৌন্দর্যকে ধরে রাখি তাঁর মনের হরষের জন্য; আমাকে যেই সুচরিত্র তিনি দান করেছেন, তা ধরে রাখি তাঁর কাছে সেই চরিত্রকে অর্পণ করার জন্য। ...

আমি চাইনা কেবলই সহমর্মিতার কারণে আমাকে আমার সখী আলিঙ্গন করুন। আমার একটিই বাসনা, আমার সখী আমাকে কেবল ও কেবল আমাকে তাঁর সখী বলে বিশ্বাস করে আলিঙ্গন করুন। ... আমি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখাকেই আমার জীবনের আদর্শ ও একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করি" । ... দেবী অনিমার এমন আচরণ সকল নটিদেরকেও তাঁর থেকে দূরে প্রেরণ করে দেয় । ... কিন্তু এই সকলের মধ্যে একটি নবাগত সুন্দরী নটি, অঙ্গিনী, দেবী অনিমার সঙ্গিনী হয়ে ওঠেন।

নবাগতা তিনি; নাট্য ভালবাসেন তাই নাট্যের জগতে এসেছেন । তাই এই নাট্যজগতেও চরিত্রকে ধারণ করে থাকা যায়, এই ভাবনায় প্রেরণা লাভ করে তিনি ধীরে ধীরে পরমাসুন্দরী দেবী অনিমার একসময়ে ছায়া হয়ে ওঠেন । ক্রমে, তাঁদের সখ্যতা এক আলোচ্য বিষয়ও হয়ে উঠতে শুরু করেন সকলের কাছে। দেবী অনিমা ধীরে ধীরে দেবী অঙ্গিনীর যেন শিক্ষিকা হয়ে ওঠেন। অনেক অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন দেবী অঙ্গিনী।

নাট্যের শিক্ষা, সৌন্দর্যের শিক্ষা, চরিত্রের শিক্ষা তো লাভ করেনেই, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির শিক্ষাও লাভ করেন। দেবী অঙ্গিনী প্রশ্ন করেন, আর দেবী অনিমা সেই প্রশ্নের উত্তর দেন। দেবী অঙ্গিনীর প্রশ্ন সহজই হতো, কিন্তু দেবী অনিমার উত্তর হতো গুহ্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তিরসমিশ্রিত। ... এমনই একবার অঙ্গিনী প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা সই, তুমি নাট্য কেন করতে এলে বলো দেখি!" ...

দেবী অনিমা হেসে উত্তর দিলেন, "অহংকার থেকে মুক্ত হবার কারণে" । ... বিস্ময়ের সাথে দেবী অঙ্গিনী প্রশ্ন করেন, "অহংকারের থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ তপস্যা করেন, তুমি নাট্য করো!" ... দেবী অনিমা হেসে উত্তর দেন, "ওরে পাগলী, যোগীরও যে অভিমান থাকে, তিনি যোগী এই ভাবের কারণে। ... কিন্তু এক নটির কিসের অভিমান, বলতে পারিস! ... সে কে? ... কেউ না সে। ... কনো নাট্যে সে বেশ্যা, তো কনো নাট্যে সে রানী, আবার কনো নাট্যে সে ভিখারিনী। ...

এই সমস্ত চরিত্রতে অভিনয় করতে করতে, নটির একসময়ে কি মনে হয় জানিস! ... মনে হয়, আমি কে! ... কোনটা আমি! ... বেশ্যাটি, রানীটি, নাকি ভিখারিনীটি! ... সে মনের গভীর কন্দর থেকে কি উত্তর লাভ করে জানিস! ... উত্তর লাভ করে, তুই কেউ নয়। ... মন বলে তুই কিচ্ছু নয় বলেই, তুই সমস্ত কিছু হতে পারছিস। ... যদি কিছু হয়ে যেতিস, তবে আর সমস্ত কিছু হতে পারতিস না, সেই একটি হয়েই থাকতিস, যা হয়ে আছিস। ...

মন বলে দেয়, শূন্যই একমাত্র সত্য; মন বলে দেয় আমার সখী হলেন শূন্য, সেই কারণেই তিনি সমস্ত কিছু হয়ে আছেন । মন বলে দেয়, সমস্ত জগতই একটি নাট্য, আসলে কিচ্ছু নেই, কেবল শূন্য আর শূন্য। আর শূন্য বলেই এতো কিছু হয়ে থাকা সম্ভব হয়েছে। ... সখী, শূন্য না হতে পারলে, আমার সইয়ের সাথে আমি মিলবো কি সর্তে! ... কি বল্‌তো সখী, তিনি ধূমাবতী রূপ চেতনাও, মাতঙ্গীরূপ চেতনাও, আবার ভুবনেশ্বরী রূপ চেতনাও। ...

কিন্তু তিনি স্বয়ং যে কালীরূপী চেতনা। ... তাই সখী, যদি আমি আমার এই মিথ্যা 'আমি' কে ছেড়ে শূন্য হতে না পারি, তবে তাঁর সাথে মিলবো কি সর্তে!" দেবী অঙ্গিনী বললেন, "এই কারণে তুমি তোমার চরিত্রকে এমন ভাবে ধরে থাকো সখী!"

দেবী অনিমা হাস্যমুখে বললেন, "চরিত্র কিসে নষ্ট হয় জানিস! ... বিলাসিতায়। ... বিলাসিতার কারণে মনে হরেক রকমের বিলাস উপস্থিত হয়, আর সেই বিলাসকে পূর্ণ করতে গেলেই শুরু হয় চরিত্রের বিনাশ। তুই কি ভাবিস, চরিত্র মানে কেবল দেহকাম থেকে মুক্ত হওয়া!... না রে, সমস্ত প্রকার বিলাসই চরিত্রকে নাশ করে দেয়। (নিজমনে হেসে) কোথাও ভ্রমণ করার ইচ্ছায় মন হয়ে ওঠে বহির্মুখী ও এই নেত্ররূপ ইন্দ্রিয়ের দাস; অতিখাদ্য গ্রহণের ইচ্ছায় মন হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়সুখী, এই জিহ্বারূপী ইন্দ্রিয়ের দাস; বিভিন্ন ঝঙ্কার শ্রবণের ইচ্ছাতেও আমরা কর্ণরূপ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে উঠি। ...

রমণসুখ তো ত্বক রূপী ইন্দ্রিয়, আর তার সাথে সাথে সমস্ত বিকারকে উদ্দীপ্ত করে, আমাদেরকে সেই সকলের দাস করে তোলে । আবার সুগন্ধির প্রতি আকর্ষণ আমাদেরকে ঘ্রাণরূপ ইন্দ্রিয়ের দাস করে দেয়। আর শেষে! সংসারজীবনে অতিরিক্ত সুখ ও সুখসামগ্রীর সঞ্চয় আমাদেরকে কল্পনাপ্রবণ মনেন্দ্রিয়ের দাস করে তোলে। ... তা হ্যাঁ রে, এই সকল ইন্দ্রিয়ের আর বিকারের দাস হয়ে থাকলে, আমার এই মিথ্যা 'আমি'র থেকে কি করে মুক্ত হবো রে! ...

আর তা যদি হতে না পারি, তবে শূন্য কেমন করে হবো! ... আর যদি শূন্য না হতে পারি, তবে আমার সখীর সান্নিধ্য কি করে পাবো! ... সখীকে পেতে গেলে যে সখীই হয়ে যেতে হয় রে। ... সর্ব্বা না হয়ে উঠলে সর্ব্বার সাথে কখনোই মিলন সম্ভব নয়; ব্রহ্ম না হয়ে উঠতে পারলে, ব্রহ্মের সাথে মিলন অসম্ভব । ... দেখিসন না, ধূমাবতী থেকে তারা সকলেই চেতনার একাক স্তর, কিন্তু তাদের কেউ কালী হয়ে উঠতে পারেনা; সকলের সাথে শিব থাকেন, কিন্তু একমাত্র কালীরূপে প্রভু মাতার চরণে স্থাপিত হয়ে, নিজকে মাতার কাছে লীন করে দিয়ে, মাতাকে তাঁর শূন্যস্তরে যাত্রা করতে দেন"।

দেবী অঙ্গিনী হেসে বললেন, "তোমার ইচ্ছা করেনা, তোমার সখীর থেকে সামান্য নিচে স্থিত হয়ে, তার সাথে বিলাস করতে?" ... দেবী অনিমা হেসে বললেন, "ইচ্ছা তো হয়, কিন্তু কি বলতো, আমার সখীই এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, বিলাসের ইচ্ছা তোমার নয়, তোমার আরাধ্যের থাকতে হবে, তবেই আনন্দ, তবেই পরমানন্দ। ... তাই তো, আমি বিলাসের ইচ্ছা নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে যাই না। ... কিন্তু যদি তিনি আমাকে বলেন বিলাসে জন্য সামান্য দূরে স্থিত হয়ে থাকতে, তবে আমি মহানন্দে তা হয়ে থাকবো"।

দেবী অঙ্গিনী বিস্মিত নয়নে বললেন, "তোমার সখী তোমাকে শিখিয়েছে! কি শিখিয়েছেন তোমার সখী? ... আমাকেও বলো সই। কি শিখিয়েছেন তিনি?" ... দেবী অনিমা বললেন, "সই, আমি তো তেমন শিক্ষিত নই । চুরি করে বৈশ্যের আর ক্ষত্রিয়ের শিক্ষার অধ্যায়ন করেছি। ব্রাহ্মণের অধ্যায়ন করতে পারিনি। ... তাই, পুঁথির বিদ্যা আমার কাছে তেমন নেই। ... তবে যা উপলব্ধি করেছি, নিজের ধ্যাননেত্রে, তাই তোকে বলি, শোন তবে। ...

মাতা সকলকে স্নেহ করেন, আবার কারুকেই স্নেহ করেন না জানিস। ... আসলে মাতা কেবলই সেই স্বয়ম্ভুকে প্রেম করেন, যিনি নিজের ব্রহ্মস্বরূপকে জেনে মাতার কাছে নিজকে সমর্পণ করেন । এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণু, যেই ব্রহ্মের অণু সম্ভব নয়, সেই ব্রহ্মেরই ভ্রমভাবে অণু। কিন্তু তাঁরা সেই পরিচয় থেকেও ভ্রান্ত হয়ে জীবাণু। কিন্তু ভ্রান্ত থেকে জীবাণু হন তিনি, বা ভ্রান্তিমুক্ত হয়ে স্বয়ম্ভু হন তিনি, চেতনা, মানে আমার সখী, তাঁর কনো সময়েই সঙ্গ ত্যাগ করেন না। ...

যখন জীবাণু নিজের অন্তরে ব্রহ্মভাব এবং স্বয়ম্ভুভাবকে ভুলে যান, তখনও চেতনা নিজের দশমপ্রকাশ অর্থাৎ ধূমাবতী রূপে সেই অণুর সাথে বিরাজ করেন। আবার যখন সেই জীবাণু নিজের অন্তরের স্বয়ম্ভুকে অনুভব করতে থাকেন, তখন আমার সখীও, নিজের চেতনাস্তরকে ধূমাবতী থেকে কমলা, বগলা, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা, হয়ে তারা ও কালী করে তুলতে থাকেন। ... যতই সেই চেতনা কালী অর্থাৎ শূন্যরূপ হতে থাকে, ততই মাতার প্রেমকে অধিক থেকে অধিক অনুভব করতে শুরু করে জীবাণু। ...

কিন্তু এই চেতনার পরিবর্তন কেন? ... এমন ভাবিস না যে, মাতা পরিবর্তিত হন; বাস্তবে মাতা যেমন তেমনই থাকেন। কেবল আমরাই আমাদের একটি একটি করে ভ্রমের আবরণকে সরিয়ে সরিয়ে, মাতার প্রেমকে, মাতার শূন্যতাকে অধিক থেকে অধিক ভাবে অনুভব করতে থাকি। আর যখন সেই ভাবেই আমরা মাতাকে তারা রূপে অনুভব করি, তখন মাতার প্রেমকে আমরা এমনই প্রগাঢ় ভাবে অনুভব করি যে, মাতার প্রেমে প্রগল হয়ে তাঁকেই সর্বস্বরূপে দেখি অর্থাৎ তাঁকেই কালীরূপ চেতনাধারণ করতে দেখি, অর্থাৎ মাতা তখন শূন্যস্বরূপা হয়ে যান। সই, সমস্ত জীব, স্বয়ম্ভুই, অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্মের একাকটি ভ্রমঅণু মাত্র। ... ব্রহ্ম সমসত্ত্ব, তাই তাঁর প্রতিটি অণুরও সেই সামর্থ্য, যা ব্রহ্মের স্বয়ং। কিন্তু তা হলেও একটা ভেদ থেকেই যায়।

আর আমার সখী, স্বয়ং চেতনা স্বয়ং কালীরূপ হয়েও সেই অবস্থায় স্থিত থাকতে পারেন না, কারণ আমরা যে আমাদেরকে ব্রহ্ম জেনেও, এতকাল নিজকে অণু মনে করার কারণে, নিম্নে গমন করে, মাতাকেও আমরা তারা অবস্থাতেই অর্থাৎ চেতনার দ্বিতীয় অবস্থাতেই স্থিত করে রাখি । ... কিন্তু মাতাকে যখনই সেই শূন্যরূপে স্থাপিত হতে না দিয়ে, আমরা মাতাকে একস্তর নামিয়ে এনে রাখি, তখনই আবার আমাদের মধ্যে স্বয়ম্ভু হবার, পুরুষ হবার অহংকার চলে আসে, আর আমরা পুনরায় মাতাকে প্রকৃতি ভেবে বসি।

তাই এবারে মাতা, সর্বাত্মা বেশে স্থিতা হয়ে তিনি পরব্রহ্মের সক্রিয় অবস্থা, অর্থাৎ পরব্রহ্মময়ী হয়ে স্থিতা, যা একই সাথে শূন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, আবার সক্রিয়। ... আর তাই যার হৃদয়ে তিনি স্থিতা হয়ে, নিজের এমন বিশাল অবস্থাকে প্রকাশ করেন, তিনি অর্থাৎ প্রভু

ব্রহ্মসনাতন তাঁর বাহন হয়ে স্থিত হয়ে রইলেন, আর এই ভাবে মাতাকে সর্বোত্তম ব্রহ্মময়ী অবস্থায় তিনি স্থিতা করে, তাঁকে একমপূজিতা করে দিলেন।

সই, প্রভু ব্রহ্মসনাতন সেই বোধ ও মাতাকে এই পরমারূপে স্থাপনের প্রয়োজন বহুদিনই বুঝেছেন, কিন্তু মাতার অনুমতি বিনা, তিনি কিচ্ছু করেননি। অর্থাৎ সই, বিলাস, আমরা আমাদের ইচ্ছামত করিনা, কারণ আমরা সামান্য এক স্বয়ম্ভু, সম্পূর্ণ জগতের অধীশ্বর নই। হ্যাঁ আমরা আমাদের নিজেদের কল্পব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হয়ে অবস্থান করি, কিন্তু তাও আমাদের সকল স্বয়ম্ভুঅণুর ব্রহ্মাণ্ডের উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার ধারণ করি না। কিন্তু মাতা তা করেন, কারণ তিনি কেবল আমার চেতনা নন, কেবল তোর চেতনা নন; তিনি সমস্ত স্বয়ম্ভুর চেতনা। তাই বিলাস তাঁর ইচ্ছামতই করতে হয়; একেই সমর্পণ বলে।

প্রেমের ইচ্ছাতেই সমর্পণ, প্রেমের ইচ্ছাতেই বিলাস; প্রেমীর ইচ্ছাতে বিলাস, তা বাচালতা ভিন্ন অন্য কিচ্ছুই নয়। স্ত্রী যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা পুড়নের জন্য স্বামীকে প্রেরিত করেন, ততক্ষণ তিনি অসতী। যখন তিনি স্বামীর প্রেমের কাছে সমর্পণ করে, স্বামীর ইচ্ছাকে সত্যময় বা শূন্যময় করে দেন, তখনই তিনি সতী হন। ... তাই সই, আমি আমার বিলাস ইচ্ছার পূর্তি করতে আগ্রহী নই। আমি আমার সখীর বিলাস ইচ্ছাকে পুড়ন করতে ব্যকুল। ...

অর্থাৎ সই, আমার সখী যদি আমার সাথে বিলাসের রুচি রাখেন, তবে তিনিই সেই উপায় করবেন যাতে আমি মুক্তও থাকি, আবার তাঁর প্রেমে ব্যাকুলও হয়ে থাকি" । ... বিচিত্র চরিত্রবিশিষ্ট দেবী অনিমার কীর্তিকে ঋষিদের দ্বারা শিক্ষিত আনন্দ অনেকদিন ধরেই লক্ষ করতেন। কিন্তু দেবী অনিমার কণ্ঠে এমন অদ্ভুত ভগবৎ কথা, এবং তাঁর অন্তরে থাকা প্রবল ভগবৎ প্রেম দেখে, আনন্দ ক্রমশ দেবী অনিমার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন।

অন্যদিকে, দেবী অনিমার এবং দেবী অঙ্গিনীর এই পবিত্রসখ্যতা সকলের নজর কাড়তে আরম্ভ করে। বিশেষত স্ত্রীরা এই সম্পর্ককে দেখে আপ্লুত হতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত সাবলীলতা যেন সকলকে এই বোধ করাতেন যে তাঁরা জন্ম জন্মের সখী। ... একজনকে অন্যের থেকে পৃথক করা অসম্ভব প্রায় লাগতো। আর এই সখ্যতা, যেখানে দুইজনেই দুইজনকে শিক্ষিত ও উন্নীত হয়ে ওঠার জন্য প্রেরণা প্রদান করতেন, যেখানে একের অপরের প্রতি অগাধ প্রেম, স্নেহ ও সম্মান, তা দেখে, নটিদের চরিত্র সম্বন্ধে যে কুৎসা রাজা অখিলেশ ছড়িয়েছিলেন, তা হ্রাস পেতে আরম্ভ করে।

সেই পরিবর্তন দেখে, দেবী অনিমার সাথে যেই নটিরা একত্রে নাট্য করতেন, তাঁরাও নিজের চরিত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে উঠতে শুরু করেন, এবং সকলে দেবী অনিমাকেই নিজেদের আদর্শ বলে চিহ্নিত করেন । ... এই প্রভাব পুরুষমহলেও খুব শীঘ্রই প্রভাব বিস্তার করে। পুরুষরাও দেবী অনিমাকে এবং দেবী অঙ্গিনীকে একসময়ে দেবীর মান দিতে শুরু করতে থাকলেন। ...

ক্রমশ দেবী অনিমার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং প্রজাকল্যাণের বিচক্ষণতা সকলের নজর কাড়তে থাকে। এবং একসময়ে সমস্ত রাজ্যের প্রজা তাঁর অনুগত হতে শুরু করে দেন। ঋষিগণ এই বিষয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পরলেন । মাতা যে বলে গেছিলেন আনন্দকে রাজশিক্ষায় শিক্ষিত করতে! দেবী অনিমাকে প্রজারা যেই পরিমাণ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, এতে তো তিনি রানী হতে পারেন, কিন্তু মানুষ আনন্দকে রাজা বলে স্বীকার করবেন কি করে!

অন্যদিকে অখিলেশ দেবী অনিমার এই স্ফীতিকে সহ্য করতে না পেরে, একদিন দেবী অনিমা যখন একাকী তপোবনে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তাঁর উপর আক্রমণ করলেন। ... দেবী অনিমা সামান্য অস্ত্রশিক্ষা জানতেন, তাই প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টা করলেন, কিন্তু অখিলেশের প্রবল প্রতাপের সম্মুখে তিনি পেরে উঠলেন না। যখন দেবী অনিমাকে এইরূপে ধরাশায়ী করে, অখিলেশ তাঁর প্রাণ নিতে আগ্রহী হন, তখন আনন্দ তাঁকে প্রতিঘাতের জন্য আক্রমণ করেন।

কিন্তু অখিলেশ অসামান্য শক্তিধর। তাই তাঁর শক্তির কাছে আনন্দও পরাজিত হয়, বহু প্রচেষ্টার পরেও। অখিলেশ নিজের সেনাকে আনন্দের হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করে, দেবী অনিমার চরিত্রকে বিনষ্ট করে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, দেবী অনিমার উদ্দেশ্যে উদ্যত হলেন। দেবী অনিমা পুনরায় আক্রমণের উত্তর প্রদান করতে গেলেন, কিন্তু অখিলেশের বাহুবলের সম্মুখে পেরে উঠলেন না। ... নিরস্ত্র দেবী অনিমাকে, এবার অখিলেশ নির্বস্ত্র করে তুলতে উদ্যত হলেন।

ঋষিগণও সেই হট্টগোল শুনে তপোবন ত্যাগ করে বাহিরে এগিয়ে আসেন। অন্যদিকে সেই কোলাহল শুনে বেশ কিছু প্রজাও সেইদিকে অগ্রসর হন। কিন্তু অখিলেশের সেনা সকলকে ঘিরে রেখে দিলেন। ... হুঙ্কার ছেড়ে বললেন অখিলেশ, "নারীত্বের মর্যাদাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন না এই সুন্দরী! ... আজ এই সুন্দরী নিজের এই কৃত্যের পুরস্কার পেয়ে যাবে সকলের সম্মুখে । তার চরিত্র এমন ভাবেই ভঙ্গ হবে, যা কারুকে কানে শুনতে হবেনা, সকলে সচক্ষে দেখবে"।...

সেই কথা বলে অট্টহাস্য প্রদান করলে, এক প্রবল আঘাত অখিলেশকে দশহাত দূরে ফেলে দেয়। রাজা অখিলেশ পরাজিত হবার ব্যক্তি নন। তিনি উঠে এসে দেখার চেষ্টা করলেন কে তাঁকে এই আঘাত করলো । ... দেবী অনিমার কথাতে অখিলেশের নজর ঘুরে যায়। দেবী অনিমা বলতে থাকলেন, "সই, তুই এখানে এলি কেন! ... যা হবে হোক আমার সাথে। ... তুই সুরক্ষিত থাক... এখান থেকে যা সই... লক্ষ্মী মেয়ে আমার, সোনা বোন আমার, ... কথা শোন আমার। ... তুই এখান থেকে যা!"

দেবি অঙ্গিনী মুখে একটিও কথা বললেন না, কেবল হস্ত প্রসারিত করে দেবী অনিমাকে নিজস্থানে স্থির হতে বললেন। ... অখিলেশ অট্টহাস্য প্রদান করে বললেন, "ও ... তো এক নয়, আজ অখিলেশ তোর ভাগ্যে তো রাজ্যের শ্রেষ্ঠ দুই সুন্দরী অপেক্ষা করছে" । ... এই বলে নিজের আঘাতের প্রতিকার করতে উদ্যম গতিতে অঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে ধাবমান হয়ে পদাঘাত করতে সচেষ্ট হলেন অখিলেশ। ...

কিন্তু যতটা গতিতে অখিলেশ নিজের স্থান থেকে উঠে এলেন, ঠিক তার ১০গুণ গতিতে সেই একই স্থানে গিয়ে পতিত হলেন। অখিলেশ তো সেই স্ত্রীর শক্তি দেখে স্তম্ভিত হলেনই, সাথে সাথে সমস্ত উপস্থিত ঋষি, সেনা ও সাধারণ মানুষ দেবী অঙ্গিনীর এই প্রবল শক্তি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেন । ... এবার রাজা অখিলেশের নির্দেশ অনুসারে তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাগণ একত্রে দেবী অঙ্গিনীকে আক্রমণ করেন।

দেবী অঙ্গিনী ক্রুদ্ধ আবেশে, ভূমিতে একটি পদাঘাত করলে, যেই স্থান সেই সেনারা দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানের ধরণী বিভক্ত করলে, সকল সেনা ভূমির কন্দরে পতিত হয়ে যান । ... আর সমস্ত স্থান সেই পদাঘাতের শক্তিতে কম্পিত হয়ে উঠতে থাকলো। ... এবার অখিলেশ ভীত হয়ে পরেছিলেন। ... শ্রেষ্ঠ সেনা হারিয়ে তিনি এবার একাকী। ... কিন্তু মদের প্রভাব কোথায় যাবে! ... পুনরায় আক্রমণ করলেন তিনি দেবী অঙ্গিনীকে।

এবার দেবী অঙ্গিনী পদাঘাত ভূমিতে নয়, করলেন অখিলেশের জানুতে। এবং সেই আঘাতে এমন ভাবেই অখিলেশ ভূপতিত হলেন যে তাঁর আর উঠে দাঁড়ানোর সামর্থ্যই থাকলো না। ... দেবী অনিমা এবার তাঁর সইয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন । তাঁর নেত্র অশ্রুসিক্ত, তাঁর শরীর কম্পমান। ... দেবী অঙ্গিনীর দক্ষিণ পার্শে এসে দাঁড়িয়ে, একবার দেবী অনিমা তাঁর সইকে ছুঁতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কুণ্ঠিত হয়ে হাত গুটিয়ে নেন। ... পরমুহূর্তে আর কিছু করার জন্য হস্ত প্রসারিত করেন, কিন্তু আবার তা কুণ্ঠিত করে নেন।

এইরূপ অনেকবার করার পরেও অঙ্গিনীকে স্পর্শ করতে যখন ব্যর্থ অনিমা, সেই সময়ে অখিলেশ নিজের শরীরকে কোনপ্রকারে উত্তোলন করলে, দেবী অঙ্গিনী ক্রুর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দুশ্চরিত্র অখিলেশ, তোকে তো আমি অনেক দিন আগেই দমন করে দিতাম, কেবল আনন্দের বেড়ে ওঠার অপেক্ষায় ছিলাম তাই হত্যা করিনি। ... কিন্তু আজ আমি নয়, যেই নারীদের তুই সারাজীবন অপমান করে এসেছিস, যেই নটিদের তুই দুশ্চরিত্র হয়ে ওঠার পথে অপসারিত করেছিলিস, আজ তাদের হাতে তুই প্রহৃত হবি"।

এই বলে, একটি পদাঘাতে দেবী অঙ্গিনী অখিলেশকে সকল নটীরা যেখানে স্থির ছিলেন, সেই দিশায় প্রেরণ করলেন। এবং নটিগণ প্রবল ভাবে অখিলেশকে প্রহার করতে থাকলে, মাত্র কিছুক্ষণ পরেই, অখিলেশের শব দেহ ভূমিতে প্রবল আর্তনাদ করে পতিত হয়। ... সকল প্রজার মধ্যে এক আনন্দের হিল্লোল ভরে ওঠে এই ঘটনার শেষে । ... আর এবার দেবী অঙ্গিনী দেবী অনিমার দিকে এই সময়ের অধ্যায়ে প্রথমবার সঠিক ভাবে তাকালেন।

দেবী অনিমার কপোল অশ্রুজলে সিক্ত, তিনি তখনও কাঁপছেন। ... তাঁর সই এবার তাঁর দিকে তাকাতে, দেবী অনিমা যেন নিজের শরীরটিকে সইয়ের শরীরের উপর সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ক্রন্দন করে তিনি অঙ্গিনীর স্কন্ধ থেকে নিজের মস্তক উত্তোলন করে বললেন, "সখী! ... আমাকে কি মূর্খ বলবে, না কি বলবে! ... আমার প্রাণপ্রিয় সখী, আমার কাছে সুদীর্ঘকাল ধরে রয়েছে, আর আমি তাঁকে একটিবারের জন্যও চিন্তে পারলাম না!"

দেবী অঙ্গিনী বললেন, "বা রে! ... যে নিজের সমস্ত প্রতিকুল অবস্থায়, নিজের কনো ভূমিকা বা ইচ্ছা স্থাপিত না রেখে, সেই সমস্ত কিছুকে আমার তাঁর প্রতি প্রেম অর্পণ বলে চিহ্নিত করে নিয়েছে, তার কাছে আমি আসবো না! ... আমি তো তাঁর কাছে ভিক্ষুক! তাঁর প্রেমের ভিখারি আমি। ... যেখানে কনো রূপ চাওয়াপাওয়া নেই, কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু চাওয়া নেই, না নিজের জন্য না নিজের পরিবার, বা তথা কথিত প্রিয়জনের জন্য কনো চাওয়া থাকে, সেখানে আমি যে না এসে থাকতেই পারিনা সখী!"

দেবী অনিমা বললেন, "তা বলে নটি হয়ে! ... তা বলে এমন অপমান সহ্য করে!" ... দেবী অঙ্গিনী বললেন, "তোমার অন্তরে নিবাস করে আমি কি তোমার অপমানগুলিকে সহ্য করিনি সখী? ... আর তাছাড়া অপমান তখন স্মরণ হয়, যখন প্রেমের ঘাটতি থাকে। যেখানে একজন সমস্ত নটিজাতিকে চরিত্রের পূজা করতে শিক্ষা প্রদান করছেন, যেখানে একজন সমস্ত নারীজাতিকে নারীত্বের মর্যাদা স্মরণ করাতে নিজের জীবনকেই অর্পণ করে দিয়েছে, সেখানে আমি তাঁর সঙ্গী হবো না!

সখী, একবারের জন্যও ভেবো না যে আমি তোমাকে তোমার প্রেমের ফল দিতে এসেছি । ... আমি এখানে এসেছি তোমার প্রেম আস্বাদন করতে। এতদিন তোমার সঙ্গে সর্বক্ষণ থেকে, সমস্ত ক্ষণ তোমার প্রেমে ডুবে থাকতাম । ... কৃপা আমি তোমায় করিনি, কৃপা তুমি আমায় করেছ সখী। হ্যাঁ সখী, তোমার নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ প্রেমকে তুমি প্রদান করে আমার উপর কৃপা করেছ। ... বিবিধ ভাবে আমি তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি, যাতে তুমি তোমার প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাও, অন্তত মুক্তি বা বিলাসও চাও। ...

কিন্তু না, তোমার প্রেম যে কেবলই দিতে চায়। ... সখী, এই প্রেমের কায়া হতে আমি পারিনি, আমি ছায়ার মত অনুসরণ করেছি তোমার, আর সদা সদা আমি তোমার হৃদয়ে স্থিত হয়ে তোমায় অনুসরণ করতে থাকবো"। ... দেবী অনিমার নেত্রে সেই কথায় এক সাবলীল ক্রন্দন এসে যায়। ... দেবী অঙ্গিনী এবার মাতা সর্বাত্মারূপ ধারণ করে বললেন, "কি হয়েছে সখী, তোমার চোখে জল কেন । ... এতো আনন্দের জল নয়, এতো বেদনার জল! আমি কি তোমাকে বেদনা দিয়ে ফেললাম!"

দেবী অনিমা বললেন, "জানিনা সখী । কিছু তো চাইবার নেই। সঙ্গ চেয়েছিলাম তোমার। ... এই কিছু বছর ধরে তুমি আমাকে অবিরাম সঙ্গ প্রদান করে, আমার আর চাইবার মত কিছুই রাখো নি। কিন্তু তাও তুমি যখন চলে যাবে বললে, তখন অন্তর কেঁদে উঠলো। ... না তোমার এই কায়া সত্য নয়, তোমার কনো সাকাররূপই সত্য নয়। তুমি তো নিরাকার। তাই তোমার এই শরীরকে স্পর্শ করতে পারবো না, সেই কারণে ক্রন্দন তো করার কথা নয়। কিন্তু তাও কেন যেন ..."।

দেবী অঙ্গিনী বললেন, "যেই সখ্যতার নেশা প্রদান করেছ তুমি সখী, সেই সখ্যতা থেকে আমি কি করে মুক্ত থাকতে পারি! ... সখী, আমি কথা দিচ্ছি তোমায়, যেই অবস্থায়, যখন ও যতক্ষণ তুমি অন্তরে তাকাবে, তুমি সদাই আমাকেই পাবে। ... সখী, এবার যে তোমাকে বিবাহে লিপ্ত হতে হবে। ... আনন্দ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন । ... বিবাহ করে, তাঁকে সম্পূর্ণ করে, রাজসিংহাসনের রিক্ততা তাঁকে দূর করতে দাও সখী" । ... দেবী অনিমা মাতার কথাকে আদেশরূপে একবাক্যে স্বীকার করে নিলে, আনন্দ মাতাকে বাঁধা দিলেন।

আনন্দ বললেন, "মাতা, সকলে কাছে প্রিয় অনিমা । তাই রাজসিংহাসনে তাঁরই আঢ়ুর হওয়া উচিত নয় কি!" ... দেবী অনিমা উত্তরে বললেন, "মাতা যদি ধন উপার্জন, শিক্ষা ব্যবস্থা, এই সব দেখেন, সন্তানের চরিত্রগঠন কখন করবেন! সন্তানের চরিত্রগঠন যে মাতারই কর্তব্য। কখনো শাসন, কখনো স্নেহ, কখনো সেবা, আবার কখনো দণ্ড প্রদান করেই মা সন্তানের চরিত্র গঠন করেন । ... রাজন, ঋষিগণ আপনাকে প্রজার পিতা হবার শিক্ষা প্রদান করলেন, আর আপনি সেই শিক্ষার গুরুদক্ষিণা প্রদান করবেন না!" ... দেবী অনিমার উচ্চবিচার দেখে ঋষিগণ পুনরায় বলে উঠলেন, "প্রেমই পরম ধর্ম" এবং দেবী অনিমার ও আনন্দের বিবাহ দিলে, আনন্দ রাজসিংহাসনে আঢ়ুর হন"।

দিব্যশ্রী বললেন, "পেশা নয়, কর্মের প্রতি প্রেমই মানুষকে প্রেমী গড়ে তোলে। ... দেবী অনিমা সেই কথার এক অসামান্য উদাহরণ। সকলের চক্ষে ঘৃণ্য এক পেশায় লিপ্ত হয়েও, সেই পেশার উদারতাকে সম্মুখে রেখে, সেই পেশাকেই অহংকারমুক্তির উপায় করে নিলেন তিনি। সত্যই অবিচল প্রেমই জীবকে মোক্ষ প্রদান করে। অবিচল প্রেমই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ সাধনা। আচ্ছা মা, আর কি শিক্ষা এখান থেকে লাভ হয়?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে দেবী দিব্যশ্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, "পুত্রী, আর কি শিখলে এই অধ্যায় থেকে, সেই বিষয়ে বলো" । ... দিব্যশ্রী বিচারকরার জন্য সামান্য থেমে বলতে আরম্ভ করলেন, "প্রথমেই শিখলাম এখান থেকে যে কনো কর্মই অন্য কর্মের থেকে শ্রেয় নয়। প্রতিটি কর্মকেই যদি শ্রেয় ভাবে করা যায়, তবে সেই কর্মই আমাদের মোক্ষের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। তবে, পূর্বে যেমন ধর্মপ্রজ্ঞার কথা বলেছিলে, সেই কথার এখানে পুনরায় প্রমাণ পেলাম।

আপনি যেই ধর্মপ্রজ্ঞার বিবরণ প্রদান করেছিলেন, তাতে একটি কথা ছিল যে, চাকরবৃত্তি শূদ্রের কর্ম, কিন্তু সেই কর্মতেও নিষ্ঠা রাখলে, সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হয় যে, যার চাকর হয়ে আমরা চাকুরী করছি, তাঁর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে, আমরা সত্যের পথে যাত্রা করবো না অসত্যের পথে। ... দেবী অনিমা যখন কিছুতেই রাজা অখিলেশের চাকুরী করতে চাইলেন না, সেই কথা পুনরায় ধর্মপ্রজ্ঞার সেই কথাকেই পুষ্টি প্রদান করলো। ... অর্থাৎ, অনাহারে স্থিত থাকাও শ্রেয়, অধর্মীর চাকুরী করার থেকে। ...

আরো অনেক শিক্ষা পেলাম এই অধ্যায় থেকে। তাদের মধ্যে প্রেমের শিক্ষা তো আছেই, তবে তার পূর্বে এটাও বলতে হয় যে, অন্য কেউ আমাকে কি বললেন, সেটি আমার উপার্জন নয়। তাই অন্য কারুর নিন্দা বা কটুকথা গুরুত্বপূর্ণ কখনোই নয় আমার কর্মকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। আবার অন্য কেউ আমার কর্মকে সাধুবাদ দিলেন বা না দিলেন, তার উপরও নির্ভর করেনা আমার কর্ম। ... তবে যা বিচার করার প্রয়োজন, তা এই যে আমি যেই কর্ম করছি, যেই উপায়ে কর্ম করছি, তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা, সেই বিচার।

অর্থাৎ আমি আমার ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করছি। তাই অন্য ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী কোন স্বয়ম্ভু আমার কর্মের নিন্দা করলেন না প্রশংসা করলেন, সেগুলি চিন্তা করার বিষয়ই নয়। তবে যা চিন্তা করার বিষয়, তা হলো এই যে, আমার কর্ম মাতাকে অর্থাৎ আমাদের চেতনাকে কতটা প্রভাবিত করছে। ... আমাদের চেতনাকে যদি সেই কর্ম তৃপ্তি প্রদান না করে, কেবলই আমাদের পঞ্চভূতকে তৃপ্ত করে সেই কর্ম, তবে সেই কর্ম চরম ভাবেই আমাদেরকে অসত্যের পথে চালনা করছে।

আর শুধু কর্মই নয়, কর্ম করার ধারাও এইক্ষেত্রে সমান ভাবে বিচারণীয় । ... অর্থাৎ আমি কোন কর্ম করছি, আর কি ভাবে সেই কর্ম করছি, এই দুই আমাদের চেতনাকে যেন আহত না করে। চেতনাকে সেই কর্ম আহত করছে না করছে না, তা কি করে বুঝবো? যদি সেই কর্ম আমাদের মনবুদ্ধিকে তৃপ্ত করে, তবে অবশ্যই বুঝতে হবে, সেই কর্ম আমাদের চেতনাকে আহত করছে; আবার আমাদের মনবুদ্ধিকে সেই কর্ম যদি আহত করে, তবে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সেই কর্ম আমাদের চেতনাকে তৃপ্ত করছে।

যেমন দেবী অনিমার ক্ষেত্রে, তিনি এমন একটি পেশায় গেলেন, যেই পেশাকে সমাজ নিন্দনীয় নেত্রে দেখে। তাই সেই পেশাতে তাঁর মনবুদ্ধি কখনোই সায় দেয়নি, কিন্তু তিনি সেই কর্মই করেছেন, বা একপ্রকার করতে বাধ্য হয়েছেন অখিলেসের থেকে বাঁচতে। তবে তিনি অস্বীকারও করতে পারতেন সেই পেশা, যখন ঋষিরা তাঁকে যেই লাঞ্ছনকে স্বীকার করতে হবে, তা তিনি স্বীকার করতে পারবেন কিনা, সেই প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি নিজের কর্মের ফল মনে করে, সেই কর্মফলকে সহর্ষ স্বীকার করেন।

কিন্তু সেই কর্ম করার কালে, যেমন অন্য নটনটিদের মনবুদ্ধি বলেছিল, অর্থাৎ যখন লাঞ্ছনকে লাভ করতেই হবে, আর সেই লাঞ্ছনের পরিবর্তে, কামনাবাসনা, ধনবৈভব ইত্যাদি ভৌতিক সুখ লাভ হবে, তখন দেবী অনিমা সেই ভৌতিকসুখ, যার প্রতি মনবুদ্ধি আসক্ত হয়, তা ত্যাগ করে, তিনি তাঁর চেতনার কাছে নিজকে সমর্পিত রাখলেন । অর্থাৎ, তিনি নিজের রূপের অহংকার না করে, সেই রূপ মাতার দান এমন মনে করে, সেই রূপকে মাতার আরাধনার বস্তু করলেন; আর যেই চরিত্র তিনি লাভ করেছেন, সেই চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক রেখে, মাতার কাছে নিজকে নিবেদন করলেন । অর্থাৎ তিনি মনবুদ্ধি যাতে সুখলাভ করে, সেই পথে না গিয়ে, সহস্র লাঞ্ছন ঘরেবাইরে শুনেও, সেই চরিত্রের পূজাই করতে থাকলেন। সেই কারণে সুখ তাঁর ঘরের দ্বারে এসেও ফিরে যায়, তবুও তিনি সুখের থেকে মাতার বিশ্বাস অর্থাৎ চেতনার তৃপ্তিকেই শ্রেষ্ঠতা প্রদান করলেন।

আর এই ভাবে তিনি কর্ম কি করে করতে হয়, তার বিজ্ঞানকে এককথায় স্থাপন করে দিলেন। যখন আমরা নিজদের চেতনাকে তৃপ্তি প্রদানের জন্য কোন কর্ম করি, সেই কর্ম অবশ্যই ধর্মকর্ম হয়। কিন্তু এখানে দুঃখের ব্যাপার এই যে চেতনার তৃপ্তি কিসে, সেই কথা তো বহু ঋষিমুনিও উপলব্ধি করতে পারেন না, আর তাই পূর্বের অধ্যায়গুলিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। ... তাই চেতনার তৃপ্তির জন্য কি করে কর্ম করতে হয়, তা নির্ধারণ করা কঠিন নয়, সাধারণ মানুষের জন্য তা অসম্ভব প্রায়। ... তবে তা করা সম্ভব তখনই হয়, যখন আমরা আমাদের মনবুদ্ধিকে তৃপ্ত করার জন্য কর্ম না করি। ...

যেই কর্ম আমাদের মনবুদ্ধিকে তৃপ্ত করার জন্য করা হয়, তা অবশ্যই অধর্ম হয়, আর তা দেবী অনিমার নটি হবার পূর্বে, সকল নটিদের আচরণই স্পষ্ট করে দেয়। ... অন্যদিকে প্রেমের শিক্ষাও এই অধ্যায় অতি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে। প্রেম কিছু পেতে চায়না, সমস্ত সময়েই কিছু দেবার জন্য ব্যস্ত থাকে। কি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে প্রেম? নিজকে অর্পণ করার জন্য সেই ব্যস্ততা। ... এই সমস্ত ভৌতিক জগতই যখন কল্পনা, তখন কোন বস্তুটি বাস্তবে বস্তু? সমস্তই তো অবস্তু। ... তাই কোন বস্তু আমি দেব প্রেমের কারণে?

না তো কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দানের উপযোগী, আর না আমাদের মনবুদ্ধি দানের যোগ্য। যদি সত্য অর্থে বলতে হয়, তবে আমাদের আত্মাই কেবল দানের যোগ্য, কারণ তা ভ্রমিত হলেও, তা সত্যই। ... তাই দান আত্মাকে করতে হয়, আর তা দান করতে হয়, তার নির্মিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সমেত। অর্থাৎ নিজের সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকেই দান করতে হয় । সমস্ত কর্ম করার সিদ্ধান্তকে দান করতে হয়, অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তেই কর্ম করবো; সমস্ত আবেগকেই দান করতে হয়, অর্থাৎ সমস্ত আবেগ কেবল নিজের প্রেমের জন্যই হবে, আর যদি সেই প্রেম স্বয়ং মাতা হন, তবে তিনি সেই আবেগকেই ভাবে পরিণত করে নেবেন; সমস্ত মন বুদ্ধিকেই প্রেমের কাছে দান করতে হয়, অর্থাৎ প্রেমের ইচ্ছা মতই মনবুদ্ধি চলবে, আমার ইচ্ছা অনুসারে নয়।

এক কথায় সমস্ত জীবনকেই অর্পণ করে দিতে হয় প্রেমের কাছে, তবেই তা প্রেম। ... আর সেই শিক্ষাই দিয়েছেন কৃতান্ত এই অধ্যায়ের মাধ্যমে। ... প্রেম কেবল দিতে জানে, কিচ্ছু পাবার চিন্তাই সে করতে পারেনা। ... আর যখনই কিছু পাবার ইচ্ছা নেই, তখন দান সকল ভ্রমকেই করা যায়, কারণ দান করার মত আমাদের কাছে ভ্রম ব্যতীত কিছুই থাকেনা, আর যা লাভ হয়, তা হলো সত্য আর সত্যের সাথে যুক্ত সদানন্দ"।

অচিন্ত্য অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন নিজের হাস্যময় বদনে বললেন, "অতি উত্তম পুত্রী। এবার তোমাকে আমি মাতার চতুর্থঅবতারের কথা বলি শোনো। এই কথা এক অতীব সাধারণ অথচ অনুপম কথা। ... উত্তররাজ্যে, ঋষি বশিষ্ঠ তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতীকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য বহুঋষির সাথে তপোবন গঠন করে নিবাস করছিলেন। ... বহু অপেক্ষার পর তাঁদের একটি সন্তান হয়, নাম অচিন্ত্য । অচিন্ত্য বড়ই বিচিত্র এক বালক। সমস্ত কিছুর প্রতি সে উদাসীন, অথচ সমস্ত কিছুর প্রতি তিনি যেন আসক্ত। ...

না তো তিনি কনো ক্রীড়ায় যোগদান করেন, আর না কনো কর্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু সর্বদাই সমস্ত কিছুকে নিরীক্ষণ করতেন। তাঁর বাল্যসখারা ক্রীড়া করলে, তিনি একদৃষ্টে তা দেখতেন; ঝিলের জলে মৎস্যচাষ হতো তিনি দেখতেন; কেউ আঘাত পেলেও দেখতেন, আবার কেউ হর্ষোল্লাস করলেও দেখতেন। কনো কিছুকেই দেখার কালে, তাঁর মুখভঙ্গিতে কনোরূপ আবেগ থাকতো না, কিন্তু যেই জিনিসই দেখতেন, সেই জিনিস দেখার কালে অন্যসমস্ত কিছুকে তিনি ভুলে থাকতেন।

অতিরিক্ত কম কথা বলতেন, এবং মাতাপিতার সমস্ত কথাকে আজ্ঞারূপে পালন করতেন । ... অনেকেই তাঁকে দেখে মনে করতেন তিনি মনমরা, এমনকি স্বয়ং মহর্ষি বশিষ্ঠও একই মতামত রাখতেন । তাই যুবাবয়সে পদার্পণ করলেই, তাঁর বিবাহ স্থির করলেন দেবী অরুন্ধতী ও মহর্ষি। ঋষি ও ঋষিপত্নী স্থির করেন যে, একজন চঞ্চলা রমণীকেই অচিন্ত্যের স্ত্রী করে আনতে হবে । তবে যদি অচিন্ত্যের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য আসে।

সেই সমস্তই ঠিক করে, উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে থাকলেন। কিন্তু তেমন কনো পাত্রী খুঁজে পেলেন না তাঁরা। যিনি চঞ্চলা, তিনি সুন্দরী নন; আবার যিনি সুন্দরী, তিনি চঞ্চলা নন। ... অনেক অনুসন্ধানের পর ঋষি ও ঋষিপত্নী ক্লান্ত হয়ে গেলে, তপোবনেরই এক ঋষির ভাগ্নির আগমন ঘটে । ভাগ্নি নিজের এক সখীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, আর এই কন্যা যেমন সুন্দরী, তেমন চঞ্চলা। ... দেবী অরুন্ধতীর একদেখাতে এই কন্যাকে ভালো লেগে যায়, কিন্তু সেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করার পূর্বেই এই কন্যা অচিন্ত্য কে চোখে হারাতে শুরু করেন।

এই দৃশ্যদেখে, দেবী অরুন্ধতী দৃঢ়নিশ্চয় করেন, এই কন্যাই হবে তাঁদের পুত্রবধূ । তাই এই কন্যার পিতৃপরিচয় ইত্যাদির অনুসন্ধান শুরু করেন। জানতে পারেন, এই কন্যার পিতা নেই, কেবল মাতা আছেন । আর তাঁর মাতা একজন ব্রাহ্মণী। অর্থাৎ এই কন্যা একজন ব্রাহ্মণকন্যা। সেই কথা জানতে পেরে, আনন্দিত দেবী অরুন্ধতী এই কন্যা, ঈশানীর সাথেই নিজের পুত্র অচিন্ত্যের বিবাহ স্থির করেন।

বিবাহের পর, অচিন্ত্য একটি যজমানের কাজ পেলে, প্রায় সমস্তদিনই সেই কর্মে লিপ্ত থাকেন। ঈশানী ক্রমশ স্বামীর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করাতেই মনযোগী হতে শুরু করেন, এবং সাথে সাথে ঋষি ও ঋষিপত্নীর সেবাও করতেন। এবং ধীরে ধীরে ঈশানীর চঞ্চল ভাব মুছে গিয়ে, সেও তাঁর পতির মতই শান্ত হয়ে ওঠেন। সেই দেখে দেবী অরুন্ধতীর দুশ্চিন্তা হতে থাকে। তিনি এই পাত্রীকে অচিন্ত্যের স্ত্রীরূপে স্থির করেছিলেন যাতে অচিন্ত্য এই কন্যার কারণে নিজের শান্ত স্বভাবকে বর্জন করে, কিন্তু এতো হিতে বিপরীত হয়ে চলেছে।

অচিন্ত্য তাঁর পিতামাতার প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ, এবং পত্নীর প্রতিও সমান ভাবেই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ। কিন্তু দেবী অরুন্ধতীর মনে অশান্তির বেশে অলক্ষ্মী নিবাস করতে শুরু করেন। ক্রমশই সেই অস্থিরতা তাঁকে এক বিচিত্র আচরণের মধ্যেও লিপ্ত করে, আর তিনি সমানে দেবী ঈশানীকে অস্থিরতার দিকে প্রেরণ করার চেষ্টা করতে থাকেন। কেন ঈশানী তাঁর পতির অধিক চিন্তা করেন না, কেন তিনি তাঁর স্বামীর নিকট এটা সেটা আবদার করে তাঁকে অস্থির করে তোলেন না, ইত্যাদি।

এরই মধ্যে একটি নিকটবর্তী গৃহে যজমানীর কাজ পেলে, অচিন্ত্য সেই কাজ করতে আগ্রহী হননা, কারণ এই কাজ করলে, দুরের যজমানী ত্যাগ করতে হবে, যা তিনি করবেন না। ... দেবী অরুন্ধতী এবার সমস্ত সময়ে ঈশানীকে প্রথমে মন্ত্রণা দিতে থাকেন, এবং সেই মন্ত্রণাতে কাজ না হলে, ক্রমশ ধিক্কার দেওয়া শুরু করেন । দেবী ঈশানী কেন অচিন্ত্য কে নিকটবর্তী স্থানের যজমানী করার জন্য

জোরাজোরি করছেন না! ... তাঁর স্বামী নিকটে এসে গেলে, তাঁর স্বামীসঙ্গ অধিক লাভ হবে, তাও কেন তিনি বলছেন না, এমন অভিযোগ আসে দেবী অরুন্ধতীর নিকট হতে।

দেবী ঈশানী এই কথার প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর দিলে, শ্বশ্রূমাতাকে অপমান করা হয়ে যাবে, তাই একটি কথাও বলেন না, কিন্তু দেবী অরুন্ধতীর বাক্ আক্রমণ এবার ক্রমশ শিখরে উঠতে শুরু করে। এমনই একদিন, অচিন্ত্য গৃহ থেকে প্রস্থান করার পরে, তিনি সেদিন একটি আসন পৃথক করে রেখেছিলেন, গৃহস্বামীর পুত্রকে শিক্ষাদান করবেন বলে, তা নিতে ভুলে যান। ... তাই তিনি গৃহে সামান্য সময়ের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রত্যাবর্তন করার কালে তিনি দেখেন, দেবী অরুন্ধতী তাঁর পত্নী, ঈশানীকে অকথা কুকথা শ্রবণ করিয়ে বলছেন, "ওরে মুখপুরী, তোর কি স্বামীসঙ্গ পেতে ভালো লাগেনা! ... যদি তা না হয়, তবে স্বামীকে নিকটের এই যজমানী করতে বলছিস না কেন! ... এতোটুকু প্রেম নেই তোর স্বামীর প্রতি! ... একটুও চিন্তা হয়না যে মানুষটা ওত দূরে যাচ্ছে রোজ! ... আরে, অন্য কিছু না হোক, যৌবনসুহাগ তো থাকবে রে তোর! ... তাও তো নেই! ... স্বামী অতদূর থেকে রোজ অত ক্রোশ পথ পদচারণ করে আসার পর, তাঁর কি আর যৌবনলিপ্সা অবশিষ্ট থাকে!"

অচিন্ত্য সেই কথা শুনে ব্যথিত হয়ে গৃহকক্ষান্তরে প্রবেশ করে দেবী ঈশানীর কাছে গিয়ে বললেন, "মা যা বললেন, সেগুলিই কি তোমার মনের কথা ঈশানী?" ... ঈশানী সেই কথা শুনে হতচকিত হয়ে গিয়ে বললেন, "না স্বামী। ... আমি জানি, আপনি যেই গৃহে যজমানী করতে যান, সেই গৃহের সকলে জ্ঞানপিপাসু, তাঁরা ভক্তি অনুভব করতে আগ্রহী । ... আর তাই, আপনি সেই গৃহে যজমানীকে ঈশ্বরপ্রদত্ত কর্তব্য মনে করেন। ...

স্বামী, আমার পতি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরণাপ্রদত্ত কর্ম করছেন, এতো এক পত্নীর কাছে অতি গর্বের। স্বামী, সহস্র জীবন ব্যাতিত হলে, তবে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত একটি কর্মলাভ হয়। ... যৌবনসঙ্গম তো জন্মে জন্মে লাভ হয়, এমন কি ভাগ্য এতে যুক্ত! সৌভাগ্য তো আমার স্বামী ঈশ্বরের কর্ম করছেন, এতে। ... তাই স্বামী, আমার এই অভিপ্রায় কি করে হতে পারে!"

অচিন্ত্য মৃদু হেসে বললেন, "আমি তোমাকে একটুও প্রেম করিনা, তাই না!" দেবী অরুন্ধতী পতিপত্নীর কথা শুনে কক্ষ থেকে নির্গত হতে গেলে, অচিন্ত্য মাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "দাঁড়াও মা, একটু কথা আছে তোমার সাথে"। এবার দেবী ঈশানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলো ঈশানী, আমি তোমাকে বিন্দুমাত্র প্রেম করিনা তাই না। ... তোমাকে একটুও সময়ই দিই না!"

ঈশানীর নেত্র অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো সেই কথা শুনে । তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নেই বললেন, "নাথ, সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকাকেই কি প্রেম বলে! ... যদি তাই হতো, তবে তো প্রতিটি মন্ত্রী তাঁর রাজাকে প্রেম করতেন! ... নাথ, প্রেম তো বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতাকে বলে। ...

আপনি একটিবারও আমাকে আপনার যাচকের গৃহের সংবাদ বলেন নি, আপনি এও বলেননি যে তাঁরা জ্ঞানপিপাসু, এবং ভক্তিপিপাসু। ... কেন নাথ!...

আপনি তো সেই কথা যেমন আমাকে বলেনও নি, তেমন লুকানও নি। ... আসলে আপনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, আপনার এই ঘরণী নিশ্চয় সমস্তটাই বুঝে যাবে, তাই একটি কথাও বলেন নি । ... প্রভু, আমি তো এই অগাধ বিশ্বাসকেই প্রেম বলে জানি। ... আপনি এতটাই বিশ্বাস করেন আমাকে যে আপনি কনো কিচ্ছু মুখ ফুটে বলেন না। আবার আপনি মুখ ফুটে বলেন না বলে যদি আমি তা বুঝতে না পারি, তখনও আপনি কিছু বলেন না। ...

প্রভু, আপনার থেকে আমি মানবীয় নয়, দিব্য প্রেম লাভ করেছি। তাই খুব ইচ্ছা হয়, আমিও যদি ঠিক এই প্রকার দিব্য প্রেম দিতে পারতাম! ... চেষ্টা করি, কিন্তু পারি কই!" ... অচিন্ত্য হেসে বললেন, "আমি তোমার প্রেম পেয়ে আপ্লুত ঈশানী। ... আমাকে কনোদিন মুখ ফুটে কিচ্ছু বলতে হয়না। তুমি সমস্ত কিছু বুঝে যাও। ... আমার ক্ষুধা লাগলে, আমার চরণে যন্ত্রণা হলে, আমার সমস্ত মনের কথাও তুমি বুঝে যাও। ... আর সব থেকে অবাক কি লাগে জানো! ...

তুমি নিস্তব্ধ হয়ে সমস্ত কিছু করে যাও। ... তুমি জানো নিশ্চয়ই... আচ্ছা আমি নিদ্রা কখন ত্যাগ করি?" ... দেবী ঈশানী ঈষৎ হেসে বললেন, "আমার নিদ্রা ত্যাগ করার পূর্বেই আপনি নিদ্রা ত্যাগ করেন। আর আপনি বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকেন আর আমাকে কাজ করতে দেখেন"। ... অচিন্ত্য হেসে বললেন, "দেখলে ঈশানী, তুমি সমস্তটা জানো, কিন্তু একটিবারও আমার এই কৃত্যে বাঁধাও দিলে না, আর আমার কাছে প্রমাণ করারও চেষ্টা করলে না, যে তুমি সমস্তটাই জানো। ... কেন ঈশানী!"

ঈশানী লজ্জা পেয়ে বললেন, "আমাকে দেখতে আপনার ভালো লাগে । যদি বলে দিই, আমি জানি আপনি আমাকে দেখছেন, তবে যদি আপনি কুণ্ঠিত বোধ করেন। তাই বলিনা । আপনার আনন্দে ভরা মুখখানা দেখতে খুব আনন্দ হয়" । ... দেবী অরুন্ধতী এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "কি রে অচিন্ত্য , কি বলবি বললি, বল... দাঁড় করিয়ে রাখলি যে বড়!" ...

অচিন্ত্য হেসে বললেন, "এতক্ষণ ধরে আমি ও তোমার পুত্রবধূ তোমাকেই সমস্ত কথা বলছিলাম যে মা!" ... দেবী অরুন্ধতী সেই কথা শুনে ঈশানীর দিকে তাকালে, ঈশানী লজ্জা পেয়ে হাস্যমুখকে নিচু করে নিলেন । অচিন্ত্য বললেন, "তোমার পুত্রবধূকে একটিবারও আমি কিচ্ছু বলিনি, কিন্তু সে খুব ভালো করেই জানে, আমি তোমাকেই সমস্ত কথা বলছি" । ... দেবী অরুন্ধতী আবারও বিস্মিত নেত্রে পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে ফিরে ফিরে তাকালেন।

অচিন্ত্য এবার হেসে বললেন, "মা, মোহ আর প্রেমের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। ... মোহ সকল সময়ে প্রমাণ করতে চায় যে সে প্রেম করে, সে খেয়াল রাখে, সে খুব চিন্তিত তাঁর কল্যাণের জন্য । ... কিন্তু প্রেম এইসমস্ত কিচ্ছু করেনা। ... প্রেম নিস্তব্ধ। প্রেম

প্রকাশের জন্য কনো ভাষার প্রয়োজন নেই, কনো ভাবেরও প্রয়োজন নেই, কারণ প্রেম স্বয়ং একটি ভাষা । ... মোহ! (হেসে) সকল সময়ে নিজের চিন্তা করায়। ...

আমাকে চঞ্চল কন্যার সাথে বিবাহ দেবার ইচ্ছা কেন হয়েছিল তোমার! ... আমার শান্ত ভাব তোমাকে ভীত করতো যে আমি কোনদিন গৃহত্যাগী হয়ে যাব, তুমি কিচ্ছু জানতেই পারবে না। তাই তো!" ... দেবী অরুন্ধতী মাথা নাড়িয়ে "না" বলতে সচেষ্ট হলে, অচিন্ত্য বললেন, "মা, ঈশানীর সাথে বিবাহ স্থির করার পরামর্শ যখন তুমি পিতার সাথে করছিলে, তখন আমি সমস্ত কথা শুনেছি"। ...

দেবী অরুন্ধতী এবার লজ্জিত হয়ে গেলে, অচিন্ত্য হেসে বললেন, "আমি গৃহত্যাগী হলে তোমার কি হবে? (হেসে)দেখলে তো মা, মোহ সর্বদা নিজের চিন্তা করায়। ... আর সেই মোহতেই আবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা তুমি তোমার পুত্রবধূর মনে মন্ত্রণার আকারে প্রদান করছিলে। তাঁকে তাঁর স্বার্থ দেখাচ্ছিলে, তাঁকে যৌবনসুখপ্রাপ্তির চেতনা প্রদান করছিলে। ... কিন্তু প্রেমকে দেখ মা, প্রেম কেবলই সম্মুখের ব্যক্তির আনন্দকে দেখায়, নিজের ভালোলাগা খারাপলাগা, দুশ্চিন্তা, ইচ্ছা, প্রাপ্তি, এইসব কিছু ভাবতেও দেয়না। ...

দ্যাখো তোমার পুত্রবধূকে। আমি একটিবারও তাঁকে বলিনি আমার যজমান একজন ভক্ত হয়ে উঠতে আগ্রহী, জ্ঞানলাভের জন্য সদাতৎপর। ... কিন্তু সে ঠিক আমার একাগ্রতা দেখে তা বুঝে নিয়েছে। ... তাঁর নিজসুখ চিন্তা কখনোই আমার পথের বাঁধা হয়ে উঠতেই পারলো না, কারণ সে তো আমাকে প্রেম করে, আমার প্রতি মোহগ্রস্ত নয়। আমার আনন্দ, আমার ধর্ম, আমার কর্তব্যের ঊর্ধ্বে নিজের সুখকে সে দেখতেও পায়নি। ... তোমার এতবার বলার পরেও দেখতে পায়নি। ...

মা, মোহ সম্মুখের ব্যক্তিকে পরাধীন করতে সদাতৎপর থাকে, কিন্তু প্রেম সম্মুখের ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রতা প্রদানকেই নিজকর্তব্য মনে করে। মোহে থাকে চূড়ান্ত অবিশ্বাস, সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবার চিন্তা, সমস্ত কিছুর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবার চিন্তা । ... (হেসে) প্রেমে থাকে চূড়ান্ত বিশ্বাস, প্রেমে কিচ্ছু হারানোর চিন্তা থাকেনা, কারণ প্রেম যে কিছু চায়ই না । ... তোমরা কি ভাবলে, আমি কিছু নিতে ভুলে গেছি বলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছি। ... না, আমি এই আসন ইচ্ছা করেই ছেড়ে গেছিলাম, পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো বলে। ...

তোমার পুত্রবধূ একটি কথাও বলবে না আমাকে নিজের মাতাতুল্য শ্বাসের সম্বন্ধে, কিন্তু কি চলছে এইগৃহে, তা আমি বেশই বুঝতে পেরেছিলাম। ... তোমার পুত্রবধূ আমার আগমনকে অনেক আগেই দেখে নিয়েছে, আর দেখে নিয়ে সে তোমাদের দুইজনের কথার মধ্যে আমার প্রবেশের সময়েই বুঝে নিয়েছে যে আমি আজ তোমাকে প্রেমের পাঠ পরাতে এসেছি। ... প্রেম মা! ... প্রেম এমনই হয় যে, কনো ভাষার প্রয়োজন পরেনা, কারণ প্রেম নিজেই একটি ভাষা। ...

তোমার পুত্রবধূ অত্যন্ত চঞ্চল ছিল বিবাহের পূর্বে। তাঁর শান্ত হয়ে যাওয়া দেখেও বুঝতে পারলে না যে সে আমাকে প্রেম করে, আর প্রেম করে বলেই, নিজের নিজস্বতাকে সে ত্যাগ করে আমার রঙে নিজকে রাঙিয়ে নিয়েছে! ... (হাস্যবসে মাথা নেড়ে) ... কি করে বুঝবে মা! ... মোহ যে জীবকে এটাই বোঝায় যে তিনিই প্রেম করেন, আর কেউ তাঁর প্রেমকে বুঝতেই পারেনা । ... প্রেম যে জীবকে এটা বুঝতেই দেননা যে তিনি প্রেম করেন, কারণ প্রেমী যে সম্মুখের ব্যক্তির প্রেমকেই কেবল দেখতে পান।

প্রেম যে স্বতঃই ব্যক্তির অহংকারকে নাশ করে দেয়; প্রেম যে স্বতঃই ব্যক্তির 'আমি' কে মুছে দেয়। আর মোহ! মোহ যে ব্যক্তিকে অহংকারের দাস করে দেয় । ব্যক্তি কেবলই নিজসুখকে, নিজস্বাচ্ছন্দকে, নিজস্বার্থসিদ্ধিকে দেখতে পায়। ... মা, মোহ একটি রিপু, আর প্রেম হলো সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ। প্রেম সাধনার সেই মার্গ, যা স্বতঃই ইন্দ্রিয়দমন করিয়ে দেয়, রিপুপাশ, ভেদভাব, এমনকি ত্রিগুণকে ত্যাগ করিয়ে, অহংকারকেও হেলায় হারিয়ে চলে যায়" ।

দেবী অরুন্ধতী এবার নিজের জানুতে ভর দিয়ে বসে বললেন, "ক্ষমা মাতা, ক্ষমা... আমি মোহে অন্ধ হয়ে গেছিলাম। তাই আপনাকে নিজের পুত্র ভাবতে ব্যকুল ছিলাম । কখনো ভেবেই দেখিনি, আপনি শান্ত, কারণ আপনার স্বভাবই শান্ত । আপনি ক্রিয়াহীন, কারণ তাও আপনার স্বাভাব। আপনি তো সমস্ত কিছুর নিরপেক্ষ দর্শক। কিন্তু আমি তো মোহগ্রস্ত, তাই আপনাকে চিনতেই পাইনি। ...

আর মাতা! ... আমার আরাধ্যা! ... আমি তাঁকেই কুমন্ত্রণা দিয়ে ফেললাম! ... আমি তাঁকে তিরস্কারও করে ফেললাম! ... মোহ মাতা, মোহ! ... নিজের আরাধ্যার একটিমুহূর্ত দর্শনের জন্য আমি কতই না ব্রত করেছি, কিন্তু যখন তিনি আমার কন্যাসম হয়ে বিরাজ করলেন, পুত্র হয়ে বিরাজ করলেন, তখন আমি সমস্ত ভুলে গেলাম!... মা, আমাকে তুমি তো সমস্ত কিছুর পরেও ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু আমি নিজেকে কি করে ক্ষমা করবো, বলতে পারো!"

দেবী ঈশানী এবং অচিন্ত্য এবার একাকার হয়ে গিয়ে মাতা সর্বাত্মারূপ ধারণ করে বললেন, "তোমার ন্যায় সাধ্বি কি করে মোহের গ্রাস হতে পারে অরুন্ধতী! ... এতো কেবলই এক লীলা আমার প্রিয়া। ... আমার প্রিয়া, মোহ ও প্রেমের পার্থক্যকে সকলের সম্মুখে রাখাই তো এই লীলার উদ্দেশ্য ছিল। ... আর প্রিয়া, প্রেম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সাধনার, আর সেই ভাবের অভাব থাকলে, যতই জ্ঞান অর্জিত থাকুক, মোক্ষ অসম্ভব হয়ে যায়।

তাই প্রিয়া, প্রেমের অভ্যাস করো, নিজেও এগিয়ে যাও, এবং অন্যদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাও। অরুন্ধতী, তুমি আমার প্রাচীন কাল থেকে একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই তোমার থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি কারুকে পাইনি, এই শিক্ষা প্রদানের জন্য" । ... দেবী অরুন্ধতী বললেন, "আমি ধন্য হলাম মা । ... আমি ধন্য হলাম। ... আশীর্বাদ করো মা, যাতে আমি তোমার এখান থেকে বিদায় নেওয়ার পরে, তোমার বিরহ প্রেমে ব্যকুল হয়ে উঠতে পারি"।

মাতা তথাস্তু বললে, মাতার উর্জ্জা অবলুপ্ত হয়। আর দেবী অরুন্ধতী ও মহর্ষি বশিষ্ঠের মাধ্যমে প্রেমের নূতন হিল্লোল সর্বদিকে প্রসারিত হয়"। ... অতি সামান্য, কিন্তু পুত্রী, এক অনবদ্য মাতার লীলা এটি। ... এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সমস্ত প্রেম ইত্যাদিকে ঈশ্বরের প্রতি দেখেছ, আর এও জেনেছিলে যে সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান, তাও সেই প্রেমকে সর্বভূতে করার কথা দেখনি। ... এই কথাতে, পতিপত্নির প্রেমকথাকে জানলে। ... এবার পুত্রী, সেই বিষয়ে কিছু বলো আমাকে"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পতিপত্নির প্রেম এমনই হওয়া উচিত, তবে যেখানেই প্রেম, সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ আবশ্যক। পতি বা পত্নী, মাতা বা সন্তান, ভ্রাতা বা ভগিনী, সকলের উদ্দেশ্যেই প্রেম করা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রেম তখনই করা সম্ভব, যখন দুইজনেই ঈশ্বরের অনুগামী। ... ভক্ততেই ভগবানের প্রকাশ। ... তাই ভক্তের মধ্যেই ভগবানকে সাখ্যাতকার করা সম্ভব। আর তা সম্ভব হলে, তবেই প্রেমের আগমন সম্ভব হয়, তৎপূর্বক্ষণ পর্যন্ত কেবলই মোহই উপস্থিত থাকে, সকলের মধ্যে। ...

অর্থাৎ পিতা, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতিই প্রেম জন্ম নেয়; যেখানে ঈশ্বরীয় ভাব উপস্থিত নেই, সেখানে কেবলই মোহ বিরাজ করে । ... এর অর্থ এই নয় যে সকলের ঈশ্বরীয় ভাবের প্রতি প্রেম জন্ম নেয়, কিন্তু হ্যাঁ, যার আত্মা ঈশ্বরের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তাঁর পক্ষেই প্রেম করা সম্ভব হয়। যেমন এই কথাতে, দেবী অরুন্ধতী একজন মহীয়সী। কিন্তু মাতার লীলার কারণে, তিনি মহীয়সী হয়েও মাতাকে সনাক্ত করতে পারেন নি; তাঁদের রঙে রঙিন হয়ে উঠতে পারেন নি; আর তাই তিনি প্রেমকে ধারণ করতে পারলেন না।

অর্থাৎ, প্রতিটি জীব স্বরূপে ব্রহ্ম হলেও, সেই ব্যক্তির বিকারাদি তাঁর সেই ব্রহ্মস্বরূপকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে রেখে, তাঁকে 'আত্ম' সর্বস্ব করে তোলে, আর সেই আত্মসর্বস্ব হয়ে ওঠার কারণে, তাঁর কনো কিছুই ঈশ্বরীয় হয়ে ওঠে না। ... যিনি ঈশ্বরীর রঙে রঙিন হয়ে উঠেছেন, তিনি যেই কর্মই করুন, তা যতই ভগবৎ কর্ম হোকনা কেন, তিনি কখনোই সেই কর্মের কারণে কারুর উপর কনো বল প্রয়োগ করেন না, আর কারুর উচাটনতার কারণ হননা।

অর্থাৎ, যিনি ভক্তিতে লীন, এবং সর্বক্ষণ নিজের আরাধ্যাকে সঙ্গীতদ্বারা আরাধনা করে ফিরছেন, কীর্তনাদি করে ফিরছেন, তিনি কখনোই নিজের কীর্তনাদিকে সেই ব্যক্তির কর্ণকুহরে উঠতে দেননা, যিনি সেই ভক্তিআরধনা শ্রবণ করার জন্য ইচ্ছুক নন। কেন করেন না এমন তিনি? কারণ তিনি সর্বভূতে ঈশ্বর দেখছেন, আর সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখার কারণে, তিনি সকলের ইচ্ছাকেই মনে করেন তাঁর ঈশ্বরীরই ইচ্ছা। ... আর তাই, তিনি গোপনে সাধন করেন, গোপনে সঙ্গীত করে আত্মভোলা হয়ে যান, কিন্তু সেই সঙ্গীতকে কনো একটি ব্যক্তি, যিনি সেই সঙ্গীত শ্রবণে অনিচ্ছুক, তাঁর কর্ণে চোঙ ইত্যাদি ব্যবহার করে উঠতে দেননা।

কিন্তু হ্যাঁ, যিনি ধর্মের বেশভূষা পরেও অধর্মী, তিনি অবশ্যই অন্যকে নিজের আয়োজন, নিজের ভজন শ্রবণ করানোর জন্য চোঙ ইত্যাদি ব্যবহার করেন, কারণ তিনি তো তাঁর ঈশ্বরীর কাছে নিবেদিত নন, তিনি তো নিজের 'আত্ম'এর লোকপ্রচার করে খ্যাতি-নাম-যশ উপার্জন করাতেই ব্যকুল। ... এতো গেল ঈশ্বর-ভজনার কথা। কিন্তু ঈশ্বরীয় ভাব কেবল ঈশ্বরভজনার মধ্যেই সীমিত কোথায়? ... সমস্ত জীব স্বরূপে ঈশ্বর, তাঁদের সমস্ত কর্মই ঈশ্বরীয়। ... তাই সমস্ত কর্মের মধ্যেই ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ বিদ্যমান।

যিনি ভোর রাত্রিতে ভারি বস্তু নিয়ে আসছেন লোকালয়ে, এবং সেই ভারি বস্তুকে নামিয়ে রাখছেন, তা লোহা, পাথর, বা যা কিছু হতে পারে, তিনিও নিজের কর্মের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব রাখতে পারেন । ... কিন্তু ঈশ্বরীয় ভাব তাঁর মধ্যে না থাকার কারণে, তিনি কেবল নিজের কর্মকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করছেন, আর তা মনে করার জন্য, তিনি অন্যরা যে সেই সময়ে নিদ্রাতে রয়েছেন, আর তাঁর করা শব্দের কারণে, তাঁদের নিদ্রার নাশ হবে, সেই বিচার তাঁর মধ্যে আসেনা। ... কি করে আসবে? যিনি সর্বক্ষণ ভজনাদি করছেন, তাঁর মধ্যে যদি ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ না হয়, তিনি যদি সর্বভূতে ঈশ্বরকে না উপলব্ধি করে, সকলের কাছে নিজের ঈশ্বর-ভজনাকে জোর করে চাপিয়ে দেন, তবে ইনি তো সামান্য একজন শ্রমিক!

আমার কথার অর্থ এই যে পিতা, ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, যিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তিনি সমস্ত প্রকার লোকদেখানি জিনিসের থেকে দূরে থাকেন, আর তিনি কখনোই এমন মনে করেন না যে, যা আমি করছি, তাই সঠিক। ... তাঁর কাছে সকলের সকল অবস্থানই সঠিক, আর তিনি তাই সকলের সকল অবস্থানকে হৃদয় থেকে সম্মান করেন । ... এক আদর্শপতি, যদি ধর্মকথা বলার কালে দেখেন তাঁর পত্নী নিদ্রাতে রয়েছেন, তিনি গলা নামিয়ে কথা বলেন। ... কেন? ... কারণ তিনি জানেন ও মানেন যে, তাঁর স্ত্রী সারাদিন গৃহকর্ম করে ক্লান্ত, এবং তাঁর এখন নিদ্রা প্রয়োজন।

অর্থাৎ এক প্রকৃত ধার্মিক তিনিই, যিনি কেবল নিজের কর্মকেই, কেবল নিজের অবস্থানকেই, মান্যতা প্রদান করেন না; যিনি সকলের মনবস্থা, সকলের অবস্থান, যিনি সকলের মান্যতাকেই সম্মান করেন। ... সেই মান্যতা প্রদানের কালে, তিনি এমনও জানেন যে, যার মান্যতাকে তিনি মান্যতা প্রদান করছেন, সেই মান্যতাই অযৌক্তিক, কিন্তু তা জেনেও তিনি মান্যতা প্রদান করেন। কেন? (হেসে) কারণ সর্বভূতে ঈশ্বর - তাই সেই অবুঝের মান্যতাও, সেই ব্যক্তির মনবস্থা, তাও ঈশ্বরীরই সিদ্ধান্ত। ...

আর তা বুঝে, তিনি সেই মনবস্থার মধ্যে কনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন না, উপরন্তু তা মেনে চলেন । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সেই মনবস্থার মান্যতা প্রদান করার কালে নিজের মধ্যে যেই ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ হচ্ছে, তাকে প্রতিরোধ করেন। তিনি জানেন ঈশ্বরী যেমন সকলের অন্তরে বিরাজ করে সেই সেই ব্যক্তির ভাব প্রকাশের কারণ, তেমন তাঁর নিজের অন্তরেও বিরাজ করে তাঁর ভাব প্রসারের কারণ। আর তাই তিনি সকলের মনবস্থাকে মান্যতা তো প্রদান করেন, কিন্তু নিজ কর্মও করে চলেন, অর্থাৎ নিজের কর্মকে লুক্কায়িত করে রেখে চলেন তিনি।

অর্থাৎ, একটি কথা এখানে স্পষ্ট যে, ঈশ্বরীয় ভাব হৃদয়ে স্থাপিত হলে, তবেই প্রেমের বিকাশ ঘটে । ঈশ্বরীয় ভাব আর ঈশ্বরের নাম নেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। অধিকাংশ ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম নেনই এক লোকাচারের মত করে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের কারণে নয়; আর তাই তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশ ঘটেনা। ঈশ্বর তাঁদেরকে বহন করেন না, তাঁরা ঈশ্বরকে নিজের সাথে বহন করে বেড়ান, কিন্তু তাঁর তো ঈশ্বরীয় ভাবই নেই, তাই তিনি ঈশ্বরের ভার ওঠাতে অক্ষম। আর তাই লক্ষ্মীকে বহন করার পরিবর্তে, তাঁরা অলক্ষ্মীকে

বহন করে ফেরেন, অর্থাৎ লক্ষ্মীর ছায়াকে বহন করে ফেরেন; বিদ্যার স্থানে, তিনি বিদ্যার ছায়া, অর্থাৎ অবিদ্যাকে বহন করে ফেরেন; শক্তির স্থানে তিনি অপস্মারকে বহন করে ফেরেন ; কৃষ্ণের স্থানে তিন কংসকে বহন করে ফেরেন।

অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টে দেখতে তিনি লক্ষ্মীর আরাধনা করছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সমস্ত অলক্ষ্মীর ভাব প্রস্ফুটিত হয়, যেমন তিনি ধন-যশ- খ্যাতি ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়ে, কূটবুদ্ধি ধারণ করেন, কূট মন্ত্রণা করেন, এবং কুপরামর্শ প্রদান করেন। আবার মূর্তি সরস্বতী মাতার স্থাপন করেন, কিন্তু আচরণ অবিদ্যার হয়, অর্থাৎ তিনি বিদ্যা আহরণ করেন না, কিছু পুঁথিকে কণ্ঠস্থ করে নিজকে মহাপণ্ডিত বলে ফিরে, নিজের দম্ভ করে ফেরেন, এবং যখন সেই বিদ্যার ব্যবহারও করতে যান, তখন সেই বিদ্যাকে ভৌতিক কল্পনার জগতকে আরো কাল্পনিক আরো যান্ত্রিক করে দিতে উন্নত হন।

আবার মূর্তি মাতা আদিশক্তির হয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে অন্যকে নিজের অধীনে রাখার প্রয়াস, দুর্বলের উপর, বয়োকনিষ্ঠের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার, এই সকল ভাব বিদ্যমান হয়। আবার মূর্তি কৃষ্ণের হয়, কিন্তু আচরণ তাঁর পাশবিক হয়, অর্থাৎ বেসুরে সঙ্গীত, সকলকে নিজের সঙ্গীত শুনতে বাধ্য করা, সকলের ঈশ্বরভাবকে তাচ্ছিল্য করে, নিজের ভাবকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া, এই ভাব প্রত্যক্ষ হয়।

কিন্তু যার মধ্যে ঈশ্বরীয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তিনি লক্ষ্মীমূর্তি রাখুন বা না রাখুন, তাঁর স্বভাব হয় শান্ত; তিনি সকল কিছুকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন; কনো কিছুর ব্যাপারে কনো সিদ্ধান্ত তিনি অকস্মাৎ নেননা, উপরন্তু সেই সিদ্ধান্ত তিনি নিজের আরাধ্যের উপর অর্পণ করে দেন। যিনি ঈশ্বরীয়ভাবে মত্ত হয়েছেন, তিনি সরস্বতী মূর্তি রাখুন বা না রাখুন, তিনি বিদ্যার নির্যাশ গ্রহণ করতে সদাই মত্ত; সমস্ত পুঁথির থেকে, তিনি কেবল সারটি গ্রহণ করেন, এবং অসারটি ত্যাগ করেন; আর সকল সময়ে সেই বিদ্যাকে ভ্রমজগত অর্থাৎ ভৌতিক জগতের থেকে নিজকে উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করেন।

যিনি ভগবৎপ্রেমে মত্ত হয়েছেন, তিনি না তো কনো প্রকার চমৎকার করেন, না পছন্দ করেন; তিনি জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কেই চমৎকার মনে করেন, আর প্রতিটি অধ্যায়কেই ভগবতীর আশীর্বাদরূপে দর্শন করে, আদিশক্তির বিস্তারকে জগতব্যাপী অনুভব করতে ব্যস্ত থাকেন। ... তিনি কৃষ্ণমূর্তি রাখুন বা না রাখুন, সদাই চেতনার দ্বারস্থ থাকেন, এবং সর্বভূতে ঈশ্বরকে অনুভব করে, ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে, সকলের সহজাবস্থানকে তাঁর কৃষ্ণেরই ইচ্ছা বলে ধ্যান করেন, এবং তাই নিজের সাধনকে, নিজের সঙ্গীতকে, নিজের কর্মকে তিনি গোপনে করেন, এবং একই সাথে সকলের কর্মধারাকে সম্মান করতে থাকেন।

পিতা, এই ভাব কেবলই যে গুরুশিষ্যের কথা, বা ভক্তভগবানের কথা, এমন নয়; এই কথা পতিপত্নির প্রেমেরও, এমনকি মাসন্তানের প্রেমেরও। ... যখন একজন অন্যজনের মধ্যে ঈশ্বরীয়ভাবের প্রকাশকে অনুভব করেন, তখন তাঁর মধ্যে আসে সমর্পণ ভাব। সত্যই প্রেম নিজেই একটি ভাষা, আর তা হলো শ্রেষ্ঠ ভাষা। যিনি প্রেমে স্থাপিত হন, না তাঁকে কিছু বলতে হয়, আর না তিনি যাকে প্রেম করছেন তাঁকে কিছু বলতে হয় । ... প্রেম ও প্রেমী, উভয়ই সমস্ত কিছুই বুঝে যান, কারণ তাঁরা এক অপরকে বিশ্বাস করেন। ... তাঁরা

একে অপরের সমস্ত ক্রিয়াকে সমর্থন করেন; উভয়ই বিশ্বাস করেন যে, অন্যজন যা কিছু করছেন, তা উচিত, তা ন্যায়, তা ধর্ম বলেই তিনি তা করছেন। ...

কিন্তু যখনই এই প্রেমের অভাব থাকে, তখনই চলে আসে অবিশ্বাস। তখনই সর্বক্ষণ অন্যজনের ক্রিয়ার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ পাওয়ার ভান চলে আসে। আর তারও এক স্পষ্ট কারণ আছে, আর তা হলো যিনি প্রেম করেননি, তিনি মোহগ্রস্ত; আর যিনি মোহগ্রস্ত, তিনি তো কেবল নিজকেই সঠিক মনে করেন, অন্যকারুকে নয়। ... তাই তাঁর কাছে নিজের সমস্ত কর্ম, তা সে যতই অযৌক্তিক হোক, তা হয়ে ওঠে যৌক্তিক, আর অন্যের সমস্ত ক্রিয়া, তা যৌক্তিক হোলেও, তা হয়ে ওঠে অযৌক্তিক।

অর্থাৎ প্রেম আমাদেরকে নিজের চিন্তা করা থেকে দূরে রাখে। ... প্রেমে, আমরা অন্যের ভালোলাগা, অন্যের ভালোথাকা, এই সমস্তই চিন্তা করি, কারণ প্রেমে আমরা নিজকেই নিজে হারিয়ে ফেলি । ... আর যখন প্রেম জন্মায় না, তখন আমরা সর্বক্ষণ কিসে আমার হিত, আমার কি ভালোলাগে, আমার কি খারাপলাগে, কিসে আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এই সমস্তই চিন্তা থাকে। এককথাতে, যিনি প্রেম করেন নি, তিনিই মোহগ্রস্ত, আর তাই তিনি হলেন আত্মকেন্দ্রিক, ভ্রমরূপ আমিকে নিয়েই তিনি থাকেন উলমালা। আর তাই সর্বক্ষণ নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে বেড়ান।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরেও, একটি কথা বলতেই হয়, যেখানে ঈশ্বরীয় ভাব নেই, সেখানে প্রেম বিরাজ করতে পারেনা। ... কারণ আমরা প্রেমের ভাবকে অনুভবই করি ঈশ্বরীয় ভাবের কারণে। ... মানবীয়গুণ আমাদেরকে প্রেমের স্বাদ প্রদান করতে অক্ষম, কারণ তাতে মানবীয় বিকারের আধিক্য সর্বদা থাকে, তাতে চাওয়াপাওয়ার আঁশটে গন্ধ সর্বক্ষণ থাকে। ... একমাত্র ঈশ্বরীয় ভাবের রঙে যিনি রঙিন হয়ে উঠেছেন, তাঁর কাছেই বৈরাগ্যের বিকাশ দেখা যায়। ...

একমাত্র তিনিই সমস্ত চাওয়াপাওয়ার ঊর্ধ্বে স্থিত; একমাত্র তিনিই কেবল নিজকে দিতে ব্যস্ত হন ... একমাত্র তিনিই নিজকে বিলিয়ে দিতে ব্যস্ত থাকেন। ... কিন্তু আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে। ... পিতা, বৈরাগ্য কি?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন এবার বৈরাগ্যের সুত্রে বলেন, "জগতবাসী কেবলই লীলা করেন। জীব বেশে থাকে সমস্ত স্বয়ম্ভু, তাই এই বোধ থাকেনা তাদের যে, সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, বেদনা-উল্লাস, ন্যায় অন্যায়, এই সমস্ত একই। জীব বেশে থাকে স্বয়ম্ভু সকল, তাই ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে এসে তিনি ভাবেন এই সমস্ত কিছু আলাদা। ...

কিন্তু এই ভেদের অস্তিত্ব যে নেই, তা অত্যন্ত ভাবেই সহজবোধ্য । যেই অশ্রু যন্ত্রণায় উপস্থিত হয়, যেই অশ্রু বেদনায় বা দুঃখেও প্রকট হয়, যেই অশ্রু নিজের সাথে অন্যায় হলেও প্রকট হয়, সেই অশ্রুই আনন্দের কালেও প্রবাহিত হয়। তবুও জীব এই ভেদ বুঝতে পারেন না যে, সমস্ত বেদনা, যন্ত্রণা, পীড়া, কষ্ট, সকলকিছু সেই আনন্দেরই একাক তরঙ্গ মাত্র। প্রেমের প্রকাশিত বা প্রত্যক্ষ ধারাই বেদনা, পীড়া ও যন্ত্রণা, এবং প্রেমের অপ্রকাশিত বা পরোক্ষ ধারাই আনন্দ। ...

সমস্ত জীব মাতাকেই প্রেম করে, আর তাই চেতনার থেকে দূরত্বতে তারা দুঃখী, পীড়ার শিকার, এবং বেদনার দ্বারা আবদ্ধ। ... কিন্তু এই সমস্ত ভাবের মধ্যে যা অন্তর্নিহিত তা হলো প্রেম, অর্থাৎ প্রেমের সুপ্ত ধারা, বা আনন্দধারা। সকল জীব, ব্রহ্মময়ী, পরাচেতনার প্রতি প্রেমের বিলাস করার কারণেই এই দুঃখ, বেদনা, কষ্টকে বিভিন্ন রূপে স্বীকার করেন, এবং মাতার প্রতি তাঁদের প্রেমকে অনুধাবন করেন। ...

একের পর এক অনিত্য বস্তু উঠিয়ে নেন জীব, এবং কিছুদিন তাতে মেতে থেকে নিজেরা যে মাতার প্রতি প্রেম থেকে দূরে থাকার বেদনাকে ভুলতে চেষ্টা করতে রত, তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। এবং কিছুদিন পরে সেই চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণও করেন, এবং মাতার থেকে বিচ্যুত, এই ভাবের অভিব্যক্তি করেন। আর এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে মাতার প্রতি তাঁদের প্রেমের বিলাসকে ব্যক্ত করেন জীব । মাতা কেবলই সেই বিলাসের অন্তরালে থাকা তাঁদেরই আনন্দধারাকে আস্বাদন করেন। ...

তাই তিনি সদানন্দ। কেউ তাঁকে অপমান করে আনন্দ পান, তো কেউ তাঁকে ভোলার চেষ্টা করে আনন্দ পান । কেউ তাঁর থেকে দূরে থাকার কারণে নিজকে পীড়া দিয়ে আনন্দ পান, আবার কেউ তাঁর থেকে দূরে থাকার বেদনাকে ভোলার জন্য জাগতিক প্রেমকে স্বীকার করেও না করতে পেরে বেদনার বেশে আনন্দ পান। তিনি সেই সমস্ত আনন্দকে ধারণ করে সদানন্দ । সকলের প্রেমকে আস্বাদন করে মাতা সদানন্দ, সকলের প্রেমবিলাসকে আস্বাদন করে মাতা পরমানন্দ।

কিন্তু মাতা তাও এক বেদনার মধ্যে থাকেন কারণ সকলেই নিজ নিজ মায়াবন্ধনে আবদ্ধ। যেই জীবাণু সত্য চেতনা লাভ করে, জীবাণু থেকে স্বয়ম্ভু হয়ে উঠে মাতার দিকে দৃষ্টি অর্পণ করেন, তিনিই তাঁকে আর সদানন্দ রূপে দেখেন না। তিনি মাতাকে সচ্চিদানন্দ রূপে দেখেন, অর্থাৎ সত্যের ও চেতনার আলোকে লব্ধ আনন্দমূর্তি রূপে মাতাকে দেখেন । ... আর এই সচ্চিদানন্দ মূর্তিই মাতার সম্পূর্ণ আনন্দরূপ, সদানন্দ রূপ নয়।

দেবী দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন,"পিতা, আপনি কেন সকলকে সেই সচ্চিদানন্দমূর্তির সম্মুখে স্থির করেন না"।

সেই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসনাতন বললেন, "সকল জীব প্রকৃত অর্থে ব্রহ্ম। তাই তাঁদের উপর আমি কি করে জোর খাঁটাতে পারি! ... সকলেই আমার প্রেমের বিলাসে আবদ্ধ, আমি আমার প্রেমীসকলকে কি করে বলতে পারি আমাকে প্রেম করো না! ... হ্যাঁ সকলকে বলি, সকলকে আবাহন করি, আমার কাছে আসতে, আমার থেকে দূরে স্থিত হয়ে প্রেমবিলাস না করে, আমার সাথে একাত্ম হয়ে যেতে, আমার সাখ্যাতকার করতে। ...

কিন্তু জীব আমার সেই আবাহনে সায় দেন না সচারচর। সকলের সকল দৈহিক জীবনে, কনো না কনো সময়ে, আমি তাঁদের দিকে অগ্রসর হই। যখন আমি তাঁদের দিকে অগ্রসর হই, তখন তাঁরা হতাশার সম্মুখীন হন। এই হতাশা তাঁদেরকে এক ভয়াবহ যাত্রার

সম্মুখীন করেন। শূন্যতার যাত্রা। আমি যে শূন্য, আর আমাকে সম্মুখ লাভ যিনিই করেন, তিনি ভয়ার্ততার শিকার হন। আর সেই শূন্যতার আভাস প্রতিটি জীব, তাঁদের প্রতি দেহাবতারে স্থিত থাকাকালীন, অন্তত একটিবার হতাশা রূপে লাভ করেন।

যিনি এই হতাশায় স্থাপিত হয়ে, এই হতাশা থেকে উদ্ধারের মার্গ খোঁজেন, তিনি রাবণ হয়ে যান। আর যিনি এই হতাশাকেই ঈশ্বরের দান বলে স্বীকার করে নেন, তিনি রাম হয়ে ওঠেন, এবং আমার সন্ধান করেন। এই হতাশা জীবাণুকে তাঁর স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন, এবং সেই পরমশূন্যকে সাখ্যাতকার করার জন্য প্রস্তুত করেন।

যিনি সেই সাখ্যাতকারের জন্য প্রস্তুত হন, তিনিই বৈরাগ্যের অভ্যাস করেন। অর্থাৎ, না তো তাঁর কনো জিনিসে বিরক্তি থাকে, আর না কনো কিছুতে আসক্তি। তিনি কনো কিছুর জন্যই প্রয়াসরত থাকেন না; না কনো কিছু প্রাপ্তির জন্য, আবার না কনো কিছুর থেকে মুক্ত হবার জন্য। অর্থাৎ তিনি সমস্ত অবস্থাতেই সমভাবে স্থাপিত থাকেন, যন্ত্রণাতেও, আবার আনন্দমুহূর্তেও। সেই সাম্যাবস্থা এমনই যে, তাঁর কনো বচনের কনো আঁট থাকেনা, বা তিনি কনো বচনই প্রদান করেন না। ...

অর্থাৎ, তিনি এই বলবেন কনোস্থানে যাবেন না, কিন্তু যেই মুহূর্তে সেই স্থানে যাবার জন্য সমস্ত সুযোগ তাঁর সম্মুখে একত্রিত হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত হয়ে যাবেন। আবার, তিনি কনো কিছুকে নিজের সেই কর্ম করার সুযোগ রূপে পরিবর্তিত করার জন্যও প্রয়াসশীল হবেন না। অর্থাৎ, তা স্বাভাবিক ভাবে সুযোগে পরিবর্তন হলে, তবেই তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত হবেন, আর না হলে, তিনি সেই কর্মের থেকে মুক্তই থাকবেন। ...

কেবল এই নয়, তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত হয়ে থাকার কালেও, নিজকে সেই কর্মে যুক্ত করেন না। অর্থাৎ, তাঁর শরীর তো সেই কর্মে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু তাঁর চেতনা সেই কর্মে নিযুক্ত হয়না। তাঁর চেতনা কেবলই পরমসত্যে যুক্ত থাকে, ব্রহ্মে যুক্ত থাকে । ... সমস্ত কর্মে, সমস্ত বাক্যে, সমস্ত বচনে, সমস্ত আলাপে, সমস্ত ক্রিয়ায়, তাঁর চেতনা কেবলই পরমসত্য, অর্থাৎ শূন্যতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করে; তাঁর চেতনা সর্বক্ষণ আশেপাশের সমস্ত কিছুর মধ্যে, কেবল ও কেবল সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, অর্থাৎ কেবলই অনিত্যতারই অনুসন্ধান করেন।

প্রচণ্ড পীড়ার মধ্যে থাকলেও, তিনি তখন শান্ত হয়ে এই বিচার করেন যে যেই স্থানে পীড়া, সেই স্থান বাহারি ভাবে একটি ক্ষত হয়ে অবস্থান করছে, কিন্তু বাস্তবে তো সেই স্থান বিকারশূন্য হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ মানুষ পীড়াতে কাতর হননা, পীড়ার আতঙ্কে কাতর হন, পীড়ার পরিণতি চিন্তা করে কাতর হন। ... এইভাবে, তিনি সর্বক্ষণ, সমস্ত পরিস্থিতিতেই শান্ত থেকে, নিজের চেতনাকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে, সমস্ত ভেদভাব থেকে, এবং সমস্ত ত্রিগুণের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে থাকেন। ...

আর তা তিনি তখনই করতে সক্ষম হন, যখন তিনি সেই ঘটনাবলির মধ্যে বিরাজ করা সমস্ত কিছুর থেকে আসক্তি ও বিরক্তি, উভয়কেই বর্জন করে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্থানে নিজকে অর্পণ করতে পারেন । ... অর্থাৎ, বৈরাগ্যের অর্থ এই যে, আসক্তি ও বিরক্তি

উভয়ের প্রতি উদাসীন থেকে, সম্মুখে যেই কর্মই উপস্থিত হয়ে, কেবল তাঁর অংশগ্রহণের কামনা করবে, সেই কর্মে নিজের দেহকে নিযুক্ত রেখে, নিজের সম্পূর্ণ চেতনাকে কালের থেকে সত্যশিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা । আসলে পুত্রী, প্রেম থেকেই বৈরাগ্য, বৈরাগ্য থেকেই প্রেম। ... প্রেমকে স্বেচ্ছায় ধারণ করা অসম্ভব, কিন্তু অভ্যাসের বলে বৈরাগ্য অর্জন সম্ভব" ।...

দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু, প্রেম তো অনুকরণীয় নয়। তাই, প্রেমকে আত্মা ব্যতীত কেউ ধারণ করতে পারেন না?" ... ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক বলেছ পুত্রী, প্রেমকে পুরুধ ব্যতীত কেউ ধারণ করতে পারেন না । ... তাই ঋষিরা দেখিয়েছেন, প্রেমরূপী পিনাক ও বৈরাগ্যরূপী পাশুপত কেবলই শিবের কাছে বিদ্যমান । ... অর্থাৎ, এর অর্থ এই যে, যতক্ষণ না আমারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, পঞ্চভূতের থেকে মুক্ত হয়ে স্বয়ম্ভু হয়ে উঠছি, আত্মা হয়ে উঠছি, ততক্ষণ আমরা না লাভ করবো প্রেমবৈরাগ্য, আর না আমরা চেতনাকে, মাতাকে ধারণা করতে পারবো, আর না ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করে মোক্ষলাভ করতে পারবো"।

দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু প্রেম ধারণ করার পূর্বে, বৈরাগ্য ধারণ কেন আবশ্যক পিতা?" ... ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "অলক্ষ্মী বিরক্তির রচনা করে, আর অবিদ্যা আসক্তির। আর বৈরাগ্য এই দুইকেই ভস্ম করে দেয়। তাই যিনি বৈরাগী, তাঁর কাছে যেতে অলক্ষ্মী ও অবিদ্যা ভীত ও সন্ত্রস্ত বোধ করেন, কারণ তাঁরা জানেন, তাঁর কাছে যাওয়া মাত্রই, অলক্ষ্মী এবং অবিদ্যা তত্ত্বের সম্যক বিনাশ কেবল সময়ের অপেক্ষা। ...

আর পুত্রী, যতক্ষণ অলক্ষ্মী, অবিদ্যার প্রভাব বিদ্যমান, ততক্ষণ প্রেম জাগরণ অসম্ভব, কারণ অলক্ষ্মী ও অবিদ্যার প্রভাব মানেই আসক্তি ও বিরক্তির বিস্তার, আর তাদের বিস্তার থাকার অর্থ কি? তাদের বিস্তার থাকার অর্থ, ব্যক্তি নিজভ্রমকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। আর যিনি নিজের ভ্রম নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর আত্মায় প্রেম স্থান পাওয়া অসম্ভব, অর্থাৎ তাঁর স্বয়ম্ভু, চেতনার দিকে তাকানও না, সত্যের দিকে দৃষ্টিও দেন না। ... তাই বৈরাগ্য ধারণ করে অলক্ষ্মী ও অবিদ্যার নাশ করেই প্রেমের জাগরণ সম্ভব"।

দিব্যশ্রী বললেন, "আর প্রেম?" ... ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "প্রেম অপস্মারকেই ভস্ম করে দেয়, আর প্রেম ধারণ করে স্বয়ম্ভু স্বয়ংকেও হারিয়ে ফেলে, কেবলই ব্রহ্মময় হয়ে ওঠেন; আর সেটিই মাতার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য; নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ ত্যাগ করে, তিনি সক্রিয় ব্রহ্মময়ী হয়ে ওঠেন, এই কর্মের জন্যই । তাই, মাতাও নিজের চেতনাস্বরূপ ত্যাগ করে, ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতা হয়ে যান, অর্থাৎ কেবল আর কেবলই ব্রহ্ম, কেবল আর কেবলই শূন্য বিরাজ করে তখন, অনন্ত আনন্দ বিরাজ করে তখন"।

বগুলা অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন, তাঁর কন্যার মন শান্ত হয়েছে দেখে, মাতার পঞ্চমঅবতারের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, "ঋষি অত্রি, পরাসর, অষ্টাবক্র এবং ঋষি নর, অন্য আরো শিষ্যদের সাথে একটি আশ্রমে স্থিত হয়ে অধ্যায়ন করছিলেন, হৃদয়ে এই বাসনা নিয়ে

যে মাতার সঙ্গ লাভ করবেন । পুঁথির সমস্ত বিদ্যাই তাঁরা অতিশীঘ্র অর্জন করে নেন, এবং শীঘ্রই তাঁরা মহাবিদ্যান হয়ে ওঠেন। আর সেই বিদ্যার অহংকার, তাঁদের মধ্যে ঝলক প্রদর্শন করতে শুরু করে। ... সেই অহংকারের কারণে প্রায়শই আশ্রমের অন্য শিষ্য ও শিষ্যাদেরকে তাঁরা অহেতুক অপমান করতেন, এবং সেই কৃত্য করে তাঁরা সকলে অত্যন্ত হরষ অনুভব করতেন।

এমনই একদিন, আশ্রমের এক শিষ্যার কাছে তাঁরা উপস্থিত হয়ে হরষ লাভের আশায় বিরক্ত করতে যান। সেই শিষ্যাটির নাম ছিল বগুলা। দরিদ্রব্রাহ্মণ পিতার একমাত্র কন্যা তিনি । ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন নি, নর্মদানদীতটে একদিন এক তিনবৎসরের কন্যাকে একাকী বসে ক্রীড়া করতে দেখেন। ... প্রায় তিনদিন ওই একই স্থানে শিশুটিকে দিবারাত্রি ক্রীড়া করতে দেখে, কৌতূহল বশত, সেই কন্যার কাছে গিয়ে, তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় জানতে চান।

শিশুটি কিছুই বলতে পারেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ বুঝে যান যে সেই সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুকন্যাটি পরিত্যক্ত। তাই তাঁকে নিয়ে এসে মানুষ করেন। বগুলার রূপও বগুলার ন্যায়ই। স্পষ্ট নাসিকা ও আঁখি, এবং তাঁর সাথে বগুলার ন্যায়ই তাঁর গাত্রবর্ণ। দেখলে মনে হয়, কনো রাজকন্যা তিনি। অদ্ভুত ভাবে শান্ত এই কন্যাকে কেউ বিরক্ত করতে পারে না। তাই কিশোর ঋষিগণ এই কন্যাকে বিরক্ত করবেন এমন নিশ্চয় করেন। বিভিন্ন কথাপ্রসঙ্গে বগুলার শান্ত স্বাভাব বিঘ্নিত না হলে, ক্রমশ কিশোরঋষিদের আচরণ উগ্র হয়ে ওঠে। ...

তাঁরা বগুলার ন্যায় অঙ্গভঙ্গি করে বগুলাকে এবার অপমানের চেষ্টা করেন । কিন্তু বগুলার কাছে, সেটি অপমানের ন্যায়, আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে। এমনই বিভিন্নভাবে বিভিন্নদিন তাঁকে বিরক্ত করতে চেষ্টা করতেন কিশোরঋষিগণ, কিন্তু ব্যর্থ হতেন, কারণ বগুলা অন্তে তাঁদের কৃত্য দেখে অপরিসীম হরষ লাভ করে শিশুর ন্যায় হাস্য করতেন। আর এতে কিশোরঋষিগণ অন্তরে অন্তরে কুপিতই হতেন, কারণ তা তাঁদের অন্তরে নিজদের অপমান বলে মনে হতো।

এমনই দিন চলতে থাকলে, ঋষিকিশোরদের অন্তরে এক প্রতিশোধস্পৃহা জাগে, এই বগুলাকে নিয়ে। তাই তাঁরা গুরুদেবের নিকটে বগুলাকে তিরস্কৃত করানোর পরিকল্পনা করেন । বিদ্যাধর হয়ে উঠেছেন, তাই গুরুদেবের উপর ঋষিকিশোরদের অধিকার অন্যদের থেকে সামান্য অধিকই থাকে। সেই সুযোগ নিয়ে রাত্রির অন্ত, এবং দিবস শুরুর সন্ধিক্ষণে পাঠপ্রদানের জন্য গুরদেবকে রাজি করান তাঁরা। ... অত্যন্ত প্রভাতে নিদ্রাত্যাগ করে পাঠগ্রহণ করতে হবে, তাই সকলেই শীঘ্র নৈশভোজন করে নিদ্রা যেতে থাকলেন। ...

এরই মধ্যে, কিশোরঋষিরা গুরুমাতার কর্ণকুহরে মন্ত্রণা প্রদান করেছেন, বগুলার থেকে অধিকসুন্দর পদসেবা আর কেউ করতে পারেনা আশ্রমে। গুরুমাতার পদসেবা নয়, তাঁর পৃষ্ঠদেশে বহুকালের পুরাতন একটি ব্যাথা ছিল, তাই সেই পৃষ্ঠসেবার জন্য উপযুক্ত হবেন বগুলা, এমন মনে করে তিনি বগুলাকে নিজের পৃষ্ঠসেবা করতে নির্দেশ দেন । ... বগুলা গুরুমাতার সেবা করতে পারার আনন্দে, তাঁর কাছে গিয়ে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত গুরুমাতার সেবা করেন।

গুরুমাতার বোধ হয় যেন, বগুলার হস্তে জাদু আছে। তাঁর পৃষ্ঠদেশের ব্যাথাও ক্রমশ সেরে আসতে শুরু করে। আর বগুলা ক্রমশ গুরুমাতার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। গুরুমাতা তাই আর বগুলাকে অন্যশিষ্যাদের সাথে নয়, নিজের সাথেই সর্বক্ষণ রাখেন। গুরুমাতার হাতে হাতে সারাদিন বিভিন্ন আশ্রমকর্ম করে দেয় বগুলা, আর তার সাথে বগুলা লাভ করে গুরুমাতার অশেষ স্নেহ । ... নিঃসন্তান গুরুমাতার সন্তানসম হয়ে ওঠে বগুলা, এবং ক্রমশ গুরুমাতা বগুলাকে চোখে হারাতে থাকেন।

বগুলাকে আহার না করিয়ে, তিনি আহার করতেননা, বগুলার কেশব্যাঞ্জন না করে, নিজের কেশ ব্যঞ্জন করতেন না, বগুলাকে পুরাণগাঁথা শুনিয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন না করে, তিনি নিদ্রা যেতেন না । ... অন্যদিকে, গুরুমাতার সাথে থাকার কারণে বগুলা নিদ্রা যায় গভীর রাত্রে, কারণ গুরুমায়ের সাথে আশ্রমের নৈশক্রিয়াসকল সম্পন্ন করতো সে। তবুও একটিদিনের জন্যও অতিপ্রভাতের গুরুর পাঠগ্রহণে বগুলা একটিবারের জন্যও দেরী করেনা। ...

সেই দেখে ঋষিকিশোররা বিরক্ত হলেও হার মানেন না। তাঁরা গুরুদেবের কাছে বলেন, বগুলা ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই তাঁকে একাকী রেখে, স্বল্প আহার প্রদান করে তপাগ্নিতে তপ্ত করা উচিত, তাঁর মধ্যের খাটি স্বর্ণকে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে । ... গুরুদেব সেই কথায় সম্মত হয়ে সেই দায়িত্ব প্রদান করেন ঋষিকিশোরদেরই। ... বয়সে সামান্য বড় তাঁরা বগুলার থেকে, তাই ভ্রাতাতুল্য। তাঁদের হাতেই তাঁদের ভগিনীর তপাগ্নি সজ্জিত করতে নির্দেশ দেন গুরুদেব। ... ঋষিকিশোররাও ঠিক এটিই চাইছিলেন।

তাই তাঁরা এবার বগুলাকে একাকী একটি কুটিরে স্থাপন করে রাখলেন। গুরুমাতা বগুলাকে দেখতে না পেলে খুব ব্যাথিত হতেন। তাই গুরুমাতা দিনে দুইবার করে আসতেন। কিন্তু গুরুদেবের আদেশের নাম করে আহার প্রদানের দায়িত্ব গুরুমাতার থেকে ঋষিকুমাররাই নিয়ে নেন, এবং যা আহার প্রদান করতেন গুরুমাতা বগুলার জন্য, সেই আহারের মাত্র অর্ধেক বগুলাকে প্রদান করতেন, এবং বাকি অর্ধেক তাঁরা নিজেরা ভক্ষণ করতেন।

বগুলাকে অন্য শিষ্যাদের সাথে স্নান করতে যেতে দিতো না ঋষিকুমাররা, আর সর্বক্ষণ তাঁকে একা একাই রাখতেন । কিন্তু স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা, একাকী বাস আর তার সাথে বগুলার স্বভাবগতই অহেতুক বিষয়ে না কথা বলার ধারা, সমস্ত কিছুই তাঁকে এক তপস্বিনী করে তোলে। আর সেই দেখে ঋষিকুমারগণ হতবাক হতে থাকেন।

দেখতে দেখতে, সকলেই যুবক ও যুবতী হয়ে উঠেছিলেন আশ্রমের, এবং বগুলা যখন যুবতী হলেন, তখন তাঁর রূপতেজ অত্যন্ত দৃষ্টিমধুর হয়ে ওঠে। ... এমত অবস্থায়, একদিন গুরুদেব ঋষিকুমারদের আদেশ দিলেন, বগুলার সাধনকে সমাপ্ত করতে । ... সেই আদেশমত নিজদের কাছে পরাজিত ঋষিকুমারগণ বগুলাকে গুরুদেবের সম্মুখে আনলে, বগুলা প্রথম গুরুদেবকে প্রণাম করলেন, অতঃপরে গুরুমাতাকে প্রণাম করলে, গুরুমাতা তাঁকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করেন।

কিন্তু বগুলার পরবর্তী কৃত্য সত্যই অনির্বচনীয় ছিল । তিনি এবার ঋষিকুমারদের চরণছুঁয়ে প্রণাম করলেন, এবং বললেন, "আপনাদের ন্যায় ভ্রাতা লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি । ... আমার নিদ্রা, আহার সমস্ত কিছুকে আপনারা সীমিত করে দিয়েছিলেন । আমাকে সম্পূর্ণ একাকী করে রেখে, আমাকে প্রতিমুহূর্তে সময় ও প্রকৃতির থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণা প্রদান করেছেন । আমাকে আপনারা সকলেই সম্পূর্ণা করে তুলেছেন ভ্রাতারা"।

সেই কথা শুনে সকল ঋষিকুমার একে অপরের মুখ দেখলে, বগুলা আবার বললেন, "ভ্রাতারা, আমি যখন আমার সইদের সাথে থাকতাম, তখন তাঁদের অহেতুক সমলচনায় অংশ নিতাম। সকল জাগতিক লাভ লোকসানের কথা ব্যতীত আমার কর্ণকুহরে আর কিছু আসতো না, তাই আমার মনেও সে সকল কথাই চলতো। ... তাই নিজের রিপুপাশ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারতাম না। ...

অধিক নিদ্রা, অধিক আহার, সর্বক্ষণ সঙ্গলাভ, আমাকে আমার অন্তরের চেতনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই করতে দেয়নি ভ্রাতারা। কিন্তু আপনাদের অদ্ভুত কৃপা, আপনাদের এই ভগিনীকে জাগতিক মানুষের প্রভাবে, আত্মসুখের, ন্যায়-অন্যায়ের আর কর্মফলের চিন্তা থেকে মুক্ত করে, আমার জীবনকে পরমার্থমুখি করে তুলেছেন আপনারা। ... আজ আপনাদের প্রদত্ত একাকীত্ব, স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রার কারণেই আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি, আহার নিদ্রা কেবলই দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আর সাথে সাথে এও উপলব্ধি করেছি যে আমি কখনোই কর্তা নই। ... আমি যতক্ষণ কর্তা, ততক্ষণই সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, ন্যায় অন্যায়ের ফাঁদে পরে থাকবো। আর ততক্ষণ জাগতিক সম্পত্তির লাভ-লোকসান, সঞ্চয়; অহেতুক সম্মান লাভ-লোকসান ও সঞ্চয়, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো। ... ভ্রাতারা, আমি যে কি বলে ধন্যবাদ দেব তোমাদের! ... আমার কাছে তো সম্পত্তি বলে কিছু নেই, তবে এই ভগিনীর তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি অশেষ প্রেম আছে। ...

তাই আমি হৃদয় থেকে এই কামনা করছি যেন সকল ভগিনী আপনাদের ন্যায় ভ্রাতা লাভ করুন। ... জাগতিক বস্তু প্রদান তো সকল ভ্রাতারাই তাঁদের ভগিনীদের দিয়ে থাকেন। কিন্তু আপনারা আপনাদের ভগিনীকে সেই পরম অনুভূতি উপহার দিয়েছেন, যেই অনুভূতিকে আত্মচেতনাবোধ বলে। ... আমি ধন্য, আর তোমাদের অপার ভগিনীপ্রেমের কাছে আমি সত্যই নতমস্তক"।

গুরুদেব ও গুরুমাতাও ঋষিকুমারদের বগুলার কথা অনুসারে প্রশংসা করলেন, এবং বগুলার পঞ্চগুণ, অর্থাৎ অহেতুক জাগতিক কথনশূন্যতা, স্বল্প আহার গ্রহণ, স্বল্প নিদ্রা, একাকীত্ব উপবেশন, এবং সর্বক্ষণ প্রকৃতি ও সময়ের থেকে শিক্ষালাভ, এই সকলগুণসমূহকে এক শিক্ষার্থীর আদর্শ গুণ বলে চিহ্নিত করলেন, এবং যেহেতু বগুলার দ্বারা এই সমস্ত গুণের প্রসার হয়, তাই এই ধারাকে বগুলাসাধন নামে চিহ্নিত করলেন।

গুরুমাতা তাঁর প্রিয় কন্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, "বগুলা সদাই জলকে পরিত্যাগ করে, কেবলই দুধের পান করে। আজ আমার বগুলাও সেই অনুরূপ কৃত্য করে, নিজের বগুলা নামকে সার্থক করেছে। ... আমার কন্যার এমন কৃত্যে আজ আমার মনে

হচ্ছে যেন, আমার জন্ম মৃত্যু জীবন, তিনই সার্থক হয়ে গেল"। ... এই সমস্ত প্রশংসা একদিকে চললে, ঋষিকুমারগণ মনে মনে ব্যাথিত হলেন। ...

তাঁরা নর্মদানদীতিরে উপনীত হয়ে বলাবলি করতে থাকলেন, "আমরা ভ্রাতা রূপে শ্রেষ্ঠ নই, আমরা ভ্রাতাদের কলঙ্ক। ... আমাদের যেই ভগিনী আমাদের উপর এতো বিশ্বাস অর্পণ করলো, আমরা তাঁকেই ঈর্ষা করলাম। ... যেই ভগিনীর জন্য আমাদের গর্ব হওয়া উচিত, তার গুণগান শুনে আমরা লজ্জিত হলাম! ... কি কি ভাবে না তাঁকে বিরক্ত করেছি! ... এখন তো ক্ষমা চাইতেও লজ্জা লাগছে! ... ক্ষমা চাইলে আমাদের তো জ্বালা মিটবে, কিন্তু ভ্রাতা জাতির চূড়ান্ত অবমাননা করবো আমরা। ...

ক্ষমা চাইলে, আর কেউ কনোদিন ভ্রাতা লাভ করার জন্য আনন্দিত হবেনা, সকলেই ভ্রাতার থেকে কুণ্ঠিত থাকবে! ... কি যে করি আমরা!" ... এই সকল কথা যখন ঋষিকুমারগণ নদীতটে বসে আলোচনা করে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, সেই সময়ে বগুলার কণ্ঠস্বর তাঁদেরকে হন্তদন্ত ভাবপ্রদান করে। ... নিজদের প্রতি তিরস্কারের ভাব থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারছিলেন না। কিন্তু চেষ্টা করছিলেন, যাতে সেই ভাব থেকে নিজদের মুক্ত করতে পারেন।

কিন্তু বগুলার আনন্দদীপ্ত নয়ন ও হাস্য দেখে তাঁরা আর নিজদের ভাবকে লুক্কায়িত করে রাখতে পারলেন না । ... তাঁরা এবার তাঁদের ভগিনীকে বেষ্টন করে বললেন, "অনেক যাতনা প্রদান করেছি না বগুলা তোকে!... কিন্তু তুই কি সত্যই আমাদের এইভাবে বিশ্বাস করে আসতিস, যেমন তুই গুরুদেবকে বললি? নাকি আমরা যে তোর উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে এইসব করেছি তোর সাথে, তা জেনেও উনাদের কাছে আমাদের ভালো সাজালি!"

দেবী বগুলা হেসে বললেন, "ঈর্ষা! ... কি বলছো ভ্রাতারা! ... কেউ কি ঈর্ষা করে কারুর কল্যাণ করতে পারে! ... না না, আমি বিশ্বাস করিনা, তোমরা ঈর্ষা করে এইসব করেছ। ... এখন আমার কাছে নিজেদেরকে ছোট করে, নিজেদের ভগিনীকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করছো তাই না!" ... ঋষিকুমারগণ এবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন বগুলাকে বোঝাতে যে তাঁরা ঈর্ষাপ্রবণ হয়েই এই সমস্ত কৃত্য করেছেন।

তাঁরা এই প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে বগুলা অত্যন্ত সরল এবং উদার মনের, তাই নিজের অদ্ভুত কৃত্যকে দেখতে না পেয়ে, ভ্রাতাদের অবদান দেখতে পাচ্ছে। ... কিন্তু বগুলাকে তাঁরা কিছুতেই সেই কথা বিশ্বাস করাতে পারলেন না। ... অন্তে বগুলা আদুরে ভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "এবার কিন্তু আমি ভীষণ রেগে যাচ্ছি! ... আমি আমার ভ্রাতাদের জন্য গর্বিত, ব্যাস, এটাই আমার শেষ কথা"।

ঋষিকুমারগণ এবার নিজদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। তাঁরা সর্বক্ষণ নিজদের চোখের জল ফেলতে থাকলেন, তাঁরা কি অবিচার করেছেন বগুলার প্রতি সেই ভেবে। আর সাথে সাথে বগুলা তাঁদের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। ... সর্বক্ষণ ঋষিকুমারগণ বগুলার দেখভাল করতে থাকলেন, আর সেই করতে করতে নিজদেরকেই ভুলে গেলেন। ...

নিজদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য, তপতেজ, সিদ্ধি, সমস্ত কিছু ভুলে বগুলার সর্বক্ষণ সেবা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন, তাও পূর্ণ বাৎসল্য সহ। ... এমন বহুদিন যাপন হবার পর, একদিন বগুলা নদী থেকে স্নান করে, নদীতটে বসে ধ্যানজপ করে যখন উঠলেন, তখন দেখলেন, তাঁর ঋষিভ্রাতাগণ তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছেন। বগুলা তাঁদের দেখে আনন্দিত হলে, তাঁরা বললেন, "বগুলা, তুই এখন পূর্ণযুবতী। অপরিসীম রূপ তোর এইরূপ নদীজলে সিক্ত হয়ে খোলাস্থানে উপবেশনের জন্য সঠিক নয়। ... তাই আমরা..."।

বগুলা হেসে বললেন, "তাই আমার ভ্রাতারা, তাঁদের প্রিয় ভগিনীকে আগলে রেখেছিলেন"। ... ঋষিগণ এবার হেসে বললেন, "ভগিনী বগুলা, আমাদের ক্ষমা করে দে ... আমরা সত্য বলছি, তোর উপর ঈর্ষা প্রকাশ করেই আমরা তোকে স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা, একাকীত্ব, এই সমস্ত কিছুতে বাধ্য করেছিলাম"। ... দেবী বগুলা এবার হেসে বললেন, "সঠিক, কিন্তু তোমরা যে আমার সান্নিধ্য লাভের জন্যও এইসমস্ত করেছ, তাও তো বেঠিক নয়"।

বগুলার কথায় ঋষিকুমারগন হতবাক হয়ে গেলে, বগুলা এবার মাতা সর্বাম্বার রূপ ধারণ করলেন। ... ঋষিগণ তাঁকে দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁর চরণে পতিত হয়ে বললেন, "মা! ... এতকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে, ... ভগিনী হয়ে আমাদের প্রতি ... তোমার এতো করুণা মা!" ... দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, "পুত্ররা, দর্শন তোমাদের পূর্বেই প্রদান করতাম, কিন্তু তোমাদেরকে প্রেমস্তরে উন্নীত করবো বলে, এই লীলা করতে হলো"।

পুনরায় হাস্য প্রদান করে মাতা বললেন, "তোমাদের কৃত্য তোমাদেরকে উদাসীন ও একনিষ্ঠ বৈরাগী করে তোলে, আর তোমরা তাই ক্রমশ প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকো। আর প্রেমের পরিণতি তো সদাই সত্যলাভ"। ... এতো বলার পরে, মাতা তাঁর পূর্ণ ষড়ভুজা পরানিয়তিরূপ ধারণ করলেন।

তিনি বললেন, "আমি পরাচেতনা, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সক্রিয় ব্রহ্মময়ী প্রকাশ। ... স্বরূপে আমিই সেই পরব্রহ্ম, অর্থাৎ নিরাকার, নির্বিকার, অচিন্ত্য, অনন্ত, অনাদি, অসীম এবং অব্যক্ত। ... কিন্তু আমার সকল স্বয়ম্ভু অণুদের উদ্ধার করার জন্য, তাঁদেরকে গর্ভদান করে, আমি তাঁদের সকলের একমাত্র প্রেয়সী ও একমাত্র জননী, যাকে তোমরা বলো ব্রহ্মময়ী। কিন্তু যতই আমি ব্রহ্মস্বরূপা হই, যতক্ষণ তোমরা ভ্রমবশে নিজকে শিব মনে করো, ততক্ষণই আমার এই সক্রিয় প্রকাশ তোমাদের কাছে বিদ্যমান। ... কিন্তু যেমন তোমরাও স্বরূপে সেই শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম, কেবলই ভ্রম ত্যাগের অপেক্ষা, তেমন আমিও সেই ব্রহ্মেরই পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ আমি হলাম সেই অনন্তশূন্য।

আর এই শূন্যই একমাত্র সত্য। এই অখণ্ড, অসীম, অচিন্ত্য, অব্যাক্ত শূন্যই একমাত্র সত্য, আর এই সত্য যখন স্বমহিমায় স্থিত, তখন আমিই বা কোথায়, আর তোমরাই বা কোথায়! কারণ আমরা সকলেই তখন সেই শূন্য, অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ... তোমরা এই সমসত্ত্ব ব্রহ্মেরই একাক ভ্রমিত অণু, বা স্বয়ম্ভুঅণু, কিন্তু সমসত্ত্বের কি বা আর অণু, আর কিই বা পরমাণু। ... স্বয়ম্ভুঅণুসকল নিজদের উপস্থিতি তখন অনুভব করেন, যখন তাঁরা আমার প্রতি প্রেম ব্যক্ত করতে, বিলাসে মত্ত হন। ...

হ্যাঁ পুত্ররা, প্রেমবিলাস বা প্রেমের কারণেই এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা, যেখানে সমস্ত ব্রহ্মের ভ্রান্ত অণুরা সমসত্ত্বতা ত্যাগ করে অসমসত্ত্বতায় লিপ্ত হয়ে স্বয়ম্ভুঅণু হয়ে ওঠেন, এবং আমার প্রতি তাঁরা প্রেম জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ... এই সেই আদিম কারণ, যেই কারণে কিছু ব্রহ্মের অণু নিজদেরকে ভ্রান্ত ভাবে অণু জ্ঞান করে, নিজকে নিজরা প্রকট করে স্বয়ম্ভুর রচনা করেন, যেই ভ্রম ক্রমশ কারণ থেকে সূক্ষ্ম হয়ে পঞ্চভূতের ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে, আবার ইন্দ্রিয়ের অবতারণা করে, নিজ স্বয়ম্ভু ভাবকেও ভুলে, নিজদের বস্তুজ্ঞানে স্থূল ধারণা করে এই কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে। ... যখন তোমরা নিজদেরকে দেখ, তখন তোমরা ভ্রমে ভ্রমিত হবার কারণে, অসমসত্ত্ব দৃষ্টিদ্বারাই দেখো; তাই সত্য তোমাদের কাছে ইন্দ্রিয়ের আস্তরণে জীববেশে এবং পঞ্চভূতের আস্তরণে শিববেশে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়।

আর যখন তোমরা আমাকে দেখ, তখন সমসত্ত্বদৃষ্টিতে দেখ, আর তাই তোমরা সকলে জানো চেতনা এক, যেই স্বয়ম্ভুঅণু যতই নিজের ভ্রম থেকে মুক্ত, সে ততটাই চেতনা সম্পন্ন। ... তাই সেই দৃষ্টির কারণে আমাকে তোমরা মহামায়া রূপে দেখ। ... পুত্ররা, না তো আমি অসমসত্ত্ব, আর না তোমরা, আর আমার অস্তিত্ব! তোমাদেরকে এই ভ্রমের থেকে মুক্ত করার জন্যই এই চেতনারূপের অস্তিত্ব। নয়তো, না স্বয়ম্ভুর অস্তিত্ব সম্ভব আর না আমার। ... কিন্তু তোমরা যখন যখন নিজদের স্বরূপকে জেনে, আমার সাথে মিলিত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাও, তখন তখন তোমাদের এই ভ্রম অস্তিত্ব থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাও । কিন্তু আমাকে থেকে যেতে হয় আমার এই চেতনা বেশে, যাও এক ভ্রমই, তবে হ্যাঁ, আমি ভ্রমিত না হয়েও ভ্রমের আবেশে স্থিত হই, তোমাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে; আর আমাকে এই চেতনাবেশে ততদিন থেকে যেতে হবে, যতদিন একটিও ব্রহ্মাণু নিজকে স্বয়ম্ভু বেশে ভ্রমিত করে রাখবেন।

যার কোন অণুই সম্ভব নয়, সেই পরব্রহ্মই নিজের মধ্যে ভ্রমের রচনা করেন, এবং সহস্রসহস্রলক্ষ ভ্রমাণুর নির্মাণ করেন, যারাই স্বয়ম্ভু, যারাই তোমরা, যারাই ভ্রমকে কারণ থেকে স্থূলে প্রগার করে সকল জীব, যারাই সকল যোনি, সেই ৮৪ লক্ষ যোনি, যাদের শুরু হয় প্রস্তর থেকে আর সম্পন্ন হয় মানব বেশে। আর এই ভ্রমের রচনা করেন কেন? আমাকে তিনি বাধ্য করেন, যাতে আমি চেতনা বেশে আবির্ভূতা হয়ে সেই সমস্ত স্বয়ম্ভুঅণুদের গর্ভ দান করি, আর তিনি আমার প্রেমকে লাভ করতে পারেন।

তাই পুত্ররা, প্রেম জ্ঞাপন করার অভিলাষের কারণেই এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা, আর সেই প্রেমই একমাত্র উপায় এই ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করার। ... সেই প্রেমকেই তোমাদের হৃদয়ে স্থাপন করার জন্য, তোমাদের মধ্যে ঈর্ষার উদ্বেগ প্রকাশ, আর সেই ঈর্ষার কারণে তোমাদের হতাশা, এবং সেই হতাশার থেকে তোমাদের প্রেমবৈরাগ্যের সূচনা"।

ঋষিকুমার গণ এবার আনন্দের সাথে সজল নয়নে বললেন, "বুঝে গেছি মা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, সমস্ত কিছু প্রেমের উদ্বেগের কারণেই স্থিত আর প্রকৃষ্ট, আর প্রেম ছাড়া কনো গতিই নেই । ... বুঝে গেছি মা, বহু পথ সম্ভব মোক্ষের দ্বার পর্যন্ত যাবার জন্য, কিন্তু মোক্ষের দ্বারই যে প্রেম । তাই প্রেম না জন্মালে মোক্ষ অসম্ভব। ... বৈরাগ্যই সেই প্রেমদ্বার উন্মোচনের একমাত্র উপায়। আর তাই প্রেমবৈরাগ্যই একমাত্র উপায় সত্যলাভের, মোক্ষ লাভের। ...

এই বাণী সর্বদিশায় প্রচার করে দিই মাতা! ... যোগের বাণী, তপের বাণী, আচারবিচারের বাণী অনেক প্রচার করেছি আমরা। ... এবার সত্যের বাণী প্রচার করে, তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাই । ... অনুমতি দাও মা, তোমার মধ্যে বিলীন হবার পূর্বে, একটিবার প্রকৃত জগতসেবা করে আসি। ... আর আমাদের মনে মায়ায় বাঁধা পরে যাবার ভয় নেই । ... তোমার থেকে আপন আর কে আছে? তোমার থেকে কেমন ভয়! ... প্রেম হৃদয়ে থাকতে, আমরা যে নিজেদেরকে ভুলেই গেছি। ... অহংকারমুক্ত ছাড়া পাখি আমরা...

তাই বড় ইচ্ছা করছে মাতা, আমাদের মাতার গুণগান একবার প্রাণভরে গাইতে... নিজেদের গুণগান না করে, কেবল তোমার গীত গাইতে... হয়তো এই প্রথমবার নিজেদের গুণগান করার ইচ্ছাও জাগছে না আমাদের। আর হয়তো, সেই কারণেই আজ আমাদের প্রচারের এতো উৎসাহ, এতো আনন্দ মা!" ... মাতা সেখান থেকে নিজের উর্জ্জাপ্রকাশকে অবলুপ্ত করার পূর্বে, হাস্যরসে সিক্ত হয়ে বললেন, "তথাস্তু"।... এই হলো মাতার পঞ্চম অবতার, মাতার বগুলা রূপের কথার ইতি"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এখানে আর কি বলার আছে পিতা? ... আর কিছুই বলার নেই । ... মাতা স্বয়ং যে সমস্ত কথারই সার টেনে দিলেন এখানেই। ... ব্রহ্ম নিজরই প্রেমকে আস্বাদন করতে চান, আর সেই কারণেই তিনি সহস্র সহস্র স্বয়ম্ভুতে নিজকে ভ্রমিত করে দেন। ... এতক্ষণ মাতার বিশ্বাসের কথা বলছিলাম, কিন্তু এবার যেন পাশা উল্টে গেল মা! ... কি অদ্ভুত বিশ্বাস মাতার প্রতি, কি অদ্ভুত বিশ্বাস মাতার অনাবিল প্রেমের প্রতি! যেন নিশ্চিত ভাবে জানেন, মাতা সেই ভ্রমিতদের আশ্রয় দেবার জন্য, নিজের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপকে ত্যাগ করে, সক্রিয় ব্রহ্মময়ীরূপ ধারণ করবেনই, আর সকল স্বয়ম্ভুঅণুদের নিজের গর্ভে ধারণ করবেনই।

আর মাতার প্রেম? ভাষা নেই! ভাষাই নেই, প্রকাশ করার। ... একে একে সকল স্বয়ম্ভু অণুরা নিজদের ভ্রমকে বিস্তার করে, ক্রমশ নিজদের ব্রহ্মস্বরূপ তো ছেড়ে দিন, নিজদেরকে স্বয়ম্ভু বলেও সনাক্ত করতেও পারেন না - বস্তুসর্বস্ব মনে করেন। তাঁদের মধ্যে একে একে নিজকে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সূক্ষ্মে স্থিত হন, অতঃপরে পঞ্চভূতের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় স্বয়ম্ভু হন, আর অন্তে মাতাই সেই ব্রহ্মের সক্রিয়স্বরূপ, তা জেনে, তাঁর প্রতি নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করে, মাতার মধ্যে লীন হয়ে যান । ... কিন্তু মাতার প্রেম! ... যতক্ষণ একটিও এমন স্বয়ম্ভুঅণু ভ্রমে জর্জরিত থাকবেন, ততক্ষণ মাতা স্বেচ্ছায় সেই ভ্রমকে ধারণ করে, চেতনা হয়ে থাকবেন।

প্রেমদানের জন্যই স্বয়ম্ভুঅণুসকল হন তিনি, আর পরিবর্তে মাতার প্রেম লাভ করে যান। ... কি অদ্ভুত খেলা না! ... ভ্রমিত স্বয়ম্ভুও আর মাতাও, কিন্তু স্বয়ম্ভু মানে আমরা যে ভ্রমকে স্বীকার করেছি, তা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রমিত হয়ে গেলাম, কিন্তু মাতা আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ভ্রমে পদার্পণ করলেন। ... আমরা ভ্রমের মধ্যে থেকে, ভ্রমকে ভ্রম বলে না মেনে দিব্যি সুখদুঃখের খেলার মধ্যে মজে থাকি। ... কিন্তু মাতা! ... প্রতিনিয়ত তিনি ভ্রমকে অনুভব করেন, কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর এতই স্নেহ যে, তিনি কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না! ...

নিজের স্বরূপকে আমরা ভুলে থাকি, তাই আমাদের স্বরূপ ভুলে থাকার কোন বেদনা নেই। কেবলই স্বার্থপরের মত প্রেম লাভের কামনা করে, এটা ওটা সেটাকে হাতড়ে বেড়াই, একটু প্রেমপ্রাপ্তির লোভকে বুকে নিয়ে । ... আর মাতা! ... একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি

স্বরূপকে ভোলেন না। ... কিন্তু আমাদের প্রেমপ্রাপ্তির ব্যকুলতার কারণে তিনি সমানে আমাদেরকে প্রেম প্রদান করে যান। আর আমরা তাঁর গর্ভে স্থিত হয়ে দাপাদাপি করে ফিরি! ... বড্ড স্বার্থপর আমরা। ... বড্ড স্বার্থপর! ... বড্ড লোভী আমরা মা! ... বড্ড লোভী! ... নিজকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে পিতা!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন একটি কথাও বললেন না, কেবল খেয়াল করলেন, তাঁর কন্যার মধ্যে নিজকে নিয়ে ভাবনার নাশ হচ্ছে, আর মাতার প্রেম দেখতে পাওয়া শুরু হচ্ছে । সেই দৃশ্য দেখে মনে মনেই ঈষৎ হাসলেন, আর মনে মনেই ব্রহ্মময়ী মাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "ধন্য তুমি মাতা যে এই সরলশিশুর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করে গেলে"।

সন্ন্যাসী অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, মাতার ষষ্ঠমকাণ্ড অত্যন্ত মধুর, ও অত্যন্ত অদ্ভুতও। এই কথা পর্বতপাদদেশের কিছু সন্ন্যাসীর কাহিনী। সংসারজ্বালায় বিরক্ত কিছু যুবা সন্ন্যাস নিয়ে, মহান্ত নামক এক গুরুর আশ্রমে যাত্রা করেন। গুরু মহান্ত এই যুবাদের দেখে হতবাক হন। তিনি দ্বন্ধে পতিত হন, এই যুবারা সন্ন্যাস নিলে সমাজের কি হবে! ... এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে, গুরুমহান্ত যখন সেই পাঁচ যুবাকে সন্ন্যাস না নেবার কথা বলতে গেলেন, তখন মাতা তাঁর সম্মুখে উর্জ্জাবেশে প্রকট হলেন।

তিনি বললেন, "মহান্ত, তুমি জানো, যারা এসেছেন, তাঁরা কারা?... তাঁরা হলেন সনতকুমার । মহাবেদজ্ঞানী, মহাতপস্বী, ব্রহ্মা অভিশপ্ত সনতকুমার মুক্তির মার্গের অনুসন্ধান করছেন সেই কবে থেকে। ... কিন্তু আজপর্যন্ত তাঁরা মুক্তির মার্গ সন্ধান না করতে পেরে সর্বদিশায় ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন"। গুরুমহান্ত মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বললেন, "কিন্তু মা, এই যুবাবয়সে যদি সন্ন্যাস প্রদান করি এঁদেরকে তবে যে সমাজে ভ্রমের বিস্তার হবে!"

মাতা হেসে বললেন, "সঠিক মহান্ত। ... সংসারজীবনেই রিপুপাশের আধিক্য থাকে। রিপুপাশ সংসারক্ষেত্রকে রণাঙ্গন করে রাখে। তাই সাধক সংসারজীবনে স্থিতু হয়ে তবেই রিপুপাশ দমন করতে সক্ষম। কিন্তু সেই বয়সে সন্ন্যাস নেবার অর্থ এই যে তাঁরা সেই রণাঙ্গন থেকেই পলায়ন করলেন। এরফলে, উনাদের এই ভ্রম তো জন্মায় যে তাঁরা রিপুপাশ জয়ী, কিন্তু যখনই তাঁদের সম্মুখে রিপুপাশ নিজদের মায়াবী মূর্তি ধারণ করে উপস্থিত হবে, তখনই তাঁরা সেই অরিদের হাতে পরাভূত হবেন"।

মহান্ত বললেন, "তাহলে আমার করণীয় কি মাতা?" ... মাতার উত্তর আসে মহান্তের নিকট, "মহান্ত, তুমি এই সনতকুমারকে তোমার আশ্রম থেকে ঈষৎ দক্ষিণে, অসি নামক আমার এক ভক্ত আছে, সেখানে প্রেরণ কর । আর বলো অসিকে যদি সন্ন্যাসিনী বেশে আনতে পারেন তাঁরা, তবে নিশ্চয়ই তাঁদেরকে তুমি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা প্রদান করবে"। ... মহান্ত বললেন, "মা, তোমার লীলা অপার।

... আমি কি সেই লীলা সচক্ষে দেখতে পাবো না! ... আমি স্বয়ং যদি দেবী অসির কাছে এঁদেরকে নিয়ে যাই! ... তবে যে তোমার লীলা সচক্ষে দেখতে পাবো!"

মাতা হেসে বললেন, "যেতে পারো, তবে ছদ্মবেশ ধারণ করে নেপথ্যে স্থাপিত থেকো। তোমার উপস্থিতি, সনতকুমারদের পরজীবী করে তুলবে মহান্ত" । ... মহান্ত আনন্দের সাথে বললেন, "যথাজ্ঞা মা" । ... এরপর, মাতা যেমন যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমন তেমন কথা বললেন মহান্ত, সেই যুবাদের উদ্দেশ্যে। ... গুরুর পরীক্ষা, তাই তা মাথা পেতে স্বীকার করে নিলেন যুবাপঞ্চ, এবং গুরুর কথা মত, দেবী অসির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মহান্তও ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবী অসির গৃহের সম্মুখ গৃহে, এক অসুস্থ ব্রাহ্মণ-তীর্থযাত্রী হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৃহস্বামীর সাথে মিথ্যাচার করতে নেই। তাই সেই গৃহের স্বামীকে, মহান্ত সমস্ত কিছুই বলেন নিজের শিষ্যদের সম্বন্ধে, এবং তাঁর এই স্থানে এই বেশে উপস্থিতির কারণও বলেন । গৃহস্বামী মহান্তের উদারমন, ও সমাজকল্যাণ চিন্তা দেখে, আনন্দে তাঁকে নিজগৃহে স্থান প্রদান করেন, এবং তাঁর সেবা করতে থাকলেন।

অন্যদিকে, যুবাপঞ্চ দেবী অসির গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখেন, দেবী অসি সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠ কন্যা। তবে জ্যেষ্ঠ কন্যা হলেও, তিনি একজন সদ্যপরিণত যুবতী। সেই গৃহে, তাঁর তিন অনুজ ভ্রাতা সস্ত্রীক থাকেন, এবং তাঁদের সকলের তিনটি তিনটি করে সন্তানও তাঁদের সাথেই থাকেন । সন্তানদের কারুর বয়স অষ্টম পর্যায় পৌছায়নি, তাই গুরুআশ্রমেও তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়নি। বড় পরিবার, বহু কক্ষ রয়েছে সেই গৃহে। তাই থাকার স্থানের অভাব হবে না।

কিন্তু থাকার স্থানের অভাব না হলেও, কি বলে তাঁরা থাকবেন, এই চিন্তা করে, তাঁরা পথচারী অসুস্থ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন । ... তাঁদের উপস্থিতি দেখে, দেবী অসির এক ভ্রাতা, অগ্রণী, তাঁদের সম্মুখে এসে তাঁদের পরিচয় এবং এই গৃহে উপস্থিত হবার কারণ প্রশ্ন করেন। যুবাপঞ্চ যেমন মনস্থির করে রেখেছিলেন, তেমনই বললে, অগ্রণী বললেন, "সন্ন্যাসী যখন, কনো আশ্রমে যান। গৃহস্থের বাড়িতে কি চাই!" ... এমন উচ্চৈঃস্বরে কথা শুনে দেবী অসি সেই স্থানে এসে দেখেন পাঁচ সন্ন্যাসী উপস্থিত। তাই দেখে, তিনি নিজের বস্ত্রের অঞ্চলদেশ নিজের গলে স্থাপন করে, নতজানু ও নতশির হয়ে সন্ন্যাসীগণদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন।

এরপর তিনি অগ্রণীর উদ্দেশ্যে বললেন, "গৃহে আগত সমস্ত অতিথিই প্রভুর রূপ, মাতার চেতনাতেই তাঁদের আগমন হয়। ... আর ইনারা তো সন্ন্যাসী! ... জগতকল্যাণই ইনাদের ব্রত। ... অবশ্যই ইনারা কনো কল্যাণসাধন করতেই এসেছেন। ... তাঁদের সাথে এইরূপ ব্যবহার কেন অগ্রণী!" ... অগ্রণী দিদির সেইরূপ কথা শুনে প্রস্থান করলেন সেই স্থান থেকে। দেবী অসি এবার হাস্যমুখে বললেন, "অল্প বয়স, তাই রিপুর দাসত্বে রত আমার ভাই। ... ক্ষমা করে দেবেন তাঁকে সন্ন্যাসীগণ"।

যুবাপঞ্চ বললেন, "দেবী, আমরা বহুকাল ধরে পদব্রজে যাত্রা করে বড়ই ক্লান্ত । কিছুদিন বিশ্রাম না নিলে, আমাদের দেহ আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে না আর। ... এখানে দূর দূর পর্যন্ত কনো আশ্রম খুঁজে পেলাম না। ... তাই আশ্রয়ের সন্ধানে আমরা এখানে এসেছি"। ... পরমাসুন্দরী দেবী অসি, নিজের রক্তিম মুখবদনে এক মনোরম হাস্য নিয়ে বললেন, "হে মহারাজগণ, আপনারা ক্ষুদ্রসংসার ত্যাগ করে জগৎসংসারে স্থিত। ... তাই সমস্ত জগতই আপনাদের সংসার, আর সেই কারণে সমস্ত জগতই আপনার নিবাসস্থান। ...

হে সাধুগণ, আপনারা তাই, আপনাদেরই নিবাসস্থানে বিরাজ করুন, আর এমন মনেও আনবেন না যে আমার বা অন্য কারুর দয়ায় আপনারা স্থিত এই স্থানে। ... আসুন, আমি আপনাদের নিবাসের স্থানে নিয়ে যাই। ... আপনারা মুক্তবিহঙ্গম। তাই আপনাদের বদ্ধ স্থানে নয়, একটি খোলামেলা স্থানে নিয়ে যাই আসুন"। ... এই বলে, দেবী অসি, সন্ন্যাসীদের নিয়ে গেলেন নিজেদের গৃহের পশ্চাৎদেশে, যেইস্থান বিভিন্ন প্রকার ফলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

সেই ফলবাগানের মধ্যেই স্থিত একটি ছোট্ট কুটির দেখিয়ে, দেবী অসি বললেন, "মহারাজগণ, এই দেখুন এই ফলবাগানের সর্বত্র প্রকৃতির ক্রিয়া চলমান। আপনারা এই স্থানের এই কুটিরে নিবাস করবেন। আর এই ফল, আপনাদের যখন ইচ্ছা গ্রহণ করবেন, এবং পিছনের ঝিল আপনাদের সকল নিত্যকর্ম ও স্নানের জন্য উপযুক্ত। ... অর্থাৎ, আপনারা সর্বদা স্বতন্ত্র ভাবেই নিবাস করবেন এখানে। ... আমি স্বয়ং আপনাদের সেবায় নিয়জিত থাকবো। ...

আমিও এই স্থানে পরিবারের জন্য ফল নিতে আসি, আমার ভ্রাতার সন্তানদের সাথে। সেইকালেই আপনাদের জন্য দুগ্ধ, দহি, মিষ্টান্ন নিয়ে আসবো, আর তারসাথে আপনাদের ক্লান্ত চরণের গরম তৈলদ্বারা মর্দন করে সেবাও করে যাবো"। ... পঞ্চযুবা এই পরমাসুন্দরীর মিষ্টি, বিচক্ষণ এবং উদারমুক্ত মানসিকতা দেখে আপ্লুত হয়ে সেই স্থানে নিবাস করলেন। আর দেবী অসি, যেমন তিনি বলেছিলেন, সময়ে সময়ে এসে সন্ন্যাসীগণদের পদসেবা করে যান, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রদান করে যান।

মহানন্দেই পঞ্চযুবা দিন যাপন করেন সেই মালঞ্চে। কিন্তু এরই মধ্যে, তাঁদের সম্মুখে এসে জোটে এক অদ্ভুত বিপদ । ... দেবী অসির ভ্রাতাসন্তানরাও মাঝে মধ্যেই এই ফলবাগানে আসেন, এবং সন্ন্যাসীদের কাছে তাঁরা গমন করে, তাঁদের সাথে ক্রীড়া করেন। প্রথমকিছুদিন পঞ্চযুবাও তাঁদের সান্নিধ্য পছন্দ করেন, কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই, তাঁরা সেই শিশুদের হাজারো প্রশ্ন, অদ্ভুত শিশুসুলভ ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হতে শুরু করেন । এবং সেই বিরক্তি একসময়ে তাঁদেরকে ক্রুদ্ধও করে, কখনো বিদ্বেষী, আবার সর্বক্ষণ শঙ্কিতও করে রাখে।

একপ্রকার ভীত থাকতে আরম্ভ করেন তাঁরা এই শিশুদের থেকে । দেবী অসি যখন যখন শিশুদের এমন আচরণ করতে দেখেন, তখন তাঁদের শাসন করেন। ... কিন্তু শিশুহৃদয়, তাঁরা কি আর বিরক্ত করেন! তাঁরা তো ক্রীড়া করেন। ... কিন্তু যেটাই হোক, পঞ্চযুবা জ্ঞানী; তাঁরা বুঝে যান, তাঁদের রিপুপাশ কনো ভাবেই দমিত হয়নি। ... কিন্তু তাঁরা সেই স্থান পরিত্যাগ করেও যেতে পারেন না। ... তাঁদের গুরুদেব বলেছেন, এই দেবী অসিকে সন্ন্যাসিনী বেশে তাঁর সকাশে নিয়ে যেতে হবে। ... তাই তাঁরা সেই স্থানেই কষ্ট করে থেকে যান।

আহারের, নিদ্রার, বা অন্য কিছুর কনো অসুবিধা নেই। ... দেবী অসির সেবাতে তাঁরা কেবল তুষ্টই নন, আপ্লুত এবং ইদানীং কালে, তাঁরা আসক্তও উনার সেবার প্রতি। ... উনি যখন তাঁদের সম্মুখে এসে নিজের কোমল হস্তের স্পর্শ প্রদান করে চরণ সেবা করেন, তখন যেন পঞ্চযুবার মনে হয়, কনো দেবী তাঁদের এই সেবা প্রদান করছেন । দেবী অসির প্রতিটি কর্মে যেমন আন্তরিকতা, যেমন সুচাগ্র চেতনা, যেমন অটুট মনঃসংযোগ, সেই সেবাকাজেও সেই সকল গুণের কনো ব্যতিক্রম নেই।

আর তা ছারাও, দেবী অসির মিষ্ট কণ্ঠস্বর, সদামিষ্ট স্বভাব, এবং মিষ্ট মুখমণ্ডল, সত্যই পঞ্চযুবাকে আকর্ষিত করতে থাকে। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন, এবার তাঁরা আসক্ত হতে শুরু করেছেন দেবী অসির প্রতি । তাই তাঁরা স্থির করেন যে যত দ্রুত সম্ভব নিজদের কার্য সমাপ্ত করে এইস্থান থেকে বিদায় নিতে হবে। ... সেই উদ্দেশ্যেই একদিন দেবী অসি যখন তাঁদের সেবা করছিলেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা দেবী, আপনি বিবাহ করেন নি কেন?"

দেবী অসি হাস্যবেসে বললেন, "বিবাহ কি করা যায় নাকি। ... বিবাহ তো মাতা প্রদান করেন । বিবাহ এক পুরুষকে বা এক স্ত্রীকে সম্পূর্ণতার অর্থ বোঝায়, আর যে পুরুষ এক স্ত্রীকে, বা যেই স্ত্রী এক পুরুষকে সম্পূর্ণতার অর্থ প্রদান করবেন, সেই পাত্র বা পাত্রীকে আমরা সনাক্ত করি, আমাদের সামর্থ্য কি! ... যখন যার সম্পূর্ণতার স্বাদ পাবার সময় আসে, তখন ভগবতী স্বয়ং তাঁর সম্মুখে সেই পাত্র বা পাত্রীকে উপস্থিত করেন"।

পঞ্চযুবার এক যুবা প্রশ্ন করলেন, "এর অর্থ, সমস্ত সংসারে স্থিত বিবাহিত ব্যক্তি সম্পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন?" ... দেবী অসি চরণ সেবা করতে করতে হাস্যমুখে বললেন, "মহারাজ, এক মৌমাছি মধুতে সম্পূর্ণ হয়, তো এক ময়ূর সাপে সম্পূর্ণ হয়; এক মাতা সন্তানে সম্পূর্ণ হন, তো এক শিষ্য গুরুতে সম্পূর্ণ। ... (ঈষৎ হাস্যে) মহারাজ, যে যাতে সম্পূর্ণতা লাভ করেন, তা তো মাতার চেতনাতেই লাভ সম্ভব, কারণ পরাচেতনাই তো সম্পূর্ণতার কারক। ...

সকল স্বয়ম্ভুর হৃদয় তিনি, আর সকল স্বয়ম্ভু যে তাঁর চিন্তনই করেছেন, নিজের সম্পূর্ণতার বোধ লাভের জন্য । ... তাহলেই বলুন মহারাজ, আমি আমার বিবাহের পাত্রকে নিজ হতে কি করে লাভ করতে পারি! ... আমি কি জানি, আমি কি রূপে সম্পূর্ণ হবো! কতটাই বা চিনি আমি নিজকে। ... আমার মা, আমাকে আমি যতটা চিনি, তার চেয়ে ঢের ভালো করে চেনেন। ... আর তাঁর তো মহারাজ, স্বয়ং অবতার নিয়ে আসতে হবে না আমাকে বিবাহ দেবার উদ্দেশ্যে। ...

সকলের হৃদয়েই পরাচেতনার বাস । তাই যার দ্বারা আমি সম্পূর্ণ হবো বলে তিনি জানেন, সঠিক সময়ে হলে, স্বয়ং তিনিই তাঁকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করে, আমার পূর্ণতার জন্য তিনি আহ্বান করবেন । ... আর যতক্ষণ না তা হচ্ছে, ততক্ষণ! ...(হেসে) ততক্ষণ আমি কি কি ভাবে অসম্পূর্ণ, তা উপলব্ধি করতে থাকি। ... সেই উপলব্ধির কারণেই তো মাতা আমাকে এখনো ছেড়ে রেখেছেন"।

অন্য এক যুবা বললেন, "আপনার মনে হয়না, বিবাহ এক বন্ধন, এক মায়া বন্ধন?" ... দেবী অসি হেসে উত্তরে বললেন, "বন্ধন তো এই শরীর মহারাজ, বন্ধন তো এই বুদ্ধি মহারাজ। এই বুদ্ধিই তো আমাদেরকে সমস্ত বন্ধনের সাথে পরিচয় করায়। ... তা যদি না করাতো, তবে কি আর বন্ধন, কি আর মুক্তি! দেখুন না, আমরা হলাম সেই মুক্ত স্বয়ম্ভু, কিন্তু এই বুদ্ধির ফাঁদে পরে নিজকে বন্দি মনে করছি। ...

আপনারা বলবেন, এই আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতার পত্নীরা আমার বন্ধন! ... আপনারা বলবেন, আমার ভ্রাতার সন্তানরা আমার বন্ধন, এই বাগিচা আমার বন্ধন! ... না মহারাজ, এগুলি কনোটিই বন্ধন নয়; বন্ধন আমাদের বন্ধনের বোধটি। আমাদের বুদ্ধি এই বোধ আমাদের প্রদান করে যে আমি এর কারণে বন্দি, ওর কারণে বন্দি। ... কিন্তু মুক্ত স্বয়ম্ভুকে বন্দি করে কার সাধ্যি! ...

এই দেখুননা, এই দেখছেন, আমি এঁদের কাছে বন্দি হয়ে রয়েছি । আগামীকাল যদি কেউ এসে আমাকে সম্পূর্ণতার আবাহন করে, আমি সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে যাব। ... আবার দেখুন, তার পরের দিন, যদি আমার মৃত্যু আমাকে এসে আমার সম্পূর্ণতার আবাহন করে, আমি তাঁর কাছে চলে যাব। ... তাহলে বন্ধন কোথায়, মহারাজ? আমাদের এই বুদ্ধির বোধের কাছেই যত বন্ধন। ... যতক্ষণ এই বন্ধনের বোধ আমাদের সাথে আছে, ততক্ষণ আমি যেখানেই যাই না কেন, এই বন্ধনের বোধ আমার সাথে সাথেই সেখানে যাবে। ...

সাধু ভাবেন সংসারে বন্ধন, তাই পাহাড়ের গুম্ফে চলে যান, কিন্তু সেখানেও কিছুদিন থাকার পর তাঁর মনে হয়, এই গুহাই তাঁর কাছে বন্ধন। ... এই আপনাদের সন্ন্যাসীদেরই দেখুন মহারাজ, আপনারা একস্থানে অধিকদিন থাকতে পারেন না, থাকলে বন্ধন বলে পতিত হয় তা। কিন্তু তা কেন? সংসার আপনাদের বন্ধনের কারক, এই জ্ঞানে তো আপনারা সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছেন, তারপরেও বন্ধন কেন?... কারণ বন্ধন আপনাদের বুদ্ধিতে। আর সংসারে থাকুন, গুহায় থাকুন, আর যেখানেই থাকুন, এই বুদ্ধি তো আপনাদের সাথেসাথে সর্বত্রই যাত্রা করছে, তাই না!

তাই সর্বস্থানেই আপনারা বন্ধনের আভাস পান। ... এবার আপনারা বলবেন, তবে কি আপনাদের থেকে সংসারী মানুষরা উন্নত চেতনার? না মহারাজ, তা নয়। কারণ? কারণ এই যে সাধারণ সংসারী মানুষ, তাঁদের কাছে বন্ধনই মুক্তি । বন্ধনে না থাকতে পারলে, তাঁরা হাঁসফাঁস করেন। ... সেই কারণেই তো সংসারী মানুষ সমস্ত কিছুতে নিজদের বুদ্ধিকে কাজে লাগায়; সেই বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, যেই বুদ্ধি তাঁদের সর্বক্ষণ বন্ধনই প্রদান করে। ...

সেই কারণেই সংসারী বদ্ধজীব মৃত্যুকে ভয় পায়, গুরু আলয়ে নিবাসকে ভয় পায়, আধ্যাত্মকে ভয় পায়, সেই সমস্ত কিছুকে ভয় পান তাঁরা, যা তাঁদের সম্পূর্ণ করে তোলে; সেই সমস্ত কিছুকে তাঁরা ভয় পান, যা তাঁদেরকে এই বোধ করায় যে তাঁরা মুক্ত । ... অর্থাৎ মহারাজ, সংসারী বদ্ধ জীব বদ্ধ থাকাকেই মুক্তিদশা মনে করেন, বুদ্ধির প্রভাবে এসে। তাঁরা বন্দি থাকতে পছন্দ করেন, আর তাই কেউ যদি তাঁকে বন্দি বলে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এবং যিনি তা বললেন, তাঁকে মূর্খ প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হন।

আর আপনারা তাঁদের থেকে উন্নত চেতনার, কারণ আপনারা বন্দিদশা কি বোঝেন। বন্দি স্বভাব থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট । ... কিন্তু মহারাজ, আমার ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করবেন। না তো বদ্ধ সংসারী জীব মুক্তির আস্বাদন করেছেন, আর না সন্ন্যাসী সেই মুক্তির স্বাদের আস্বাদন করেন। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটিই, একজন বন্দিদশাকে নিজের বরদান মনে করেন, আর অন্যজন বন্দিদশাকে নিজের অভিশাপ। ... আসল মুক্ত তো তিনি, যিনি নিজের বুদ্ধির দাস নন। ...

সমস্ত কিছুর কারক স্বয়ং পরাচেতনা জেনে, যিনি সর্বক্ষণ নিজের বুদ্ধিকে তাঁর চরণে সমর্পিত রাখেন, তিনিই প্রকৃত মুক্তজীব । ... তিনি কনো কিছুই করবেন না বলে স্থির করেন না। ... তাঁর সম্মুখে এসে কনো সন্ন্যাসী যদি তাঁকে সন্ন্যাসিনী হবার আহ্বান করেন, তবে তিনি মনে করেন, পরাচেতনাই তাঁকে সেই আহ্বান করছেন, আর তাই নির্বিচারে তিনি সন্ন্যাসিনী হন, কিন্তু নিজের ইচ্ছার বশে তিনি কখনোই সন্ন্যাসিনী হননা। ... আবার কেউ যদি তাঁর সম্মুখে এসে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন, তখনও তিনি নির্বিচারে সেই বিবাহকেই স্বীকার করেন, পরাচেতনার আদেশ জেনে।

মহারাজ, এই ব্যক্তির সম্মুখে মৃত্যু আসলে, তিনি বেদনাগ্রস্ত নন, আনন্দিত হন, কারণ তিনি মনে করেন মাতা স্বয়ং সেই আহ্বান প্রদান করছেন। আবার তাঁর সম্মুখে যদি জীবনের আহ্বান প্রদান করা হয়, তবে তিনি সাগ্রহে তা স্বীকার করেন, মাতার আদেশ জেনে। ... অর্থাৎ মহারাজ, তাঁর কনো নিজস্ব বুদ্ধি বলে বস্তুটিই থাকেনা, আর যার এই বোধ থাকেনা, তিনিই মুক্ত। ... যিনি নিজের ক্ষুদ্রবোধকে হারিয়েছেন, তিনিই বোধি লাভ করেছেন। ...

যিনি নিজের 'আমি' কে হারিয়েছেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেছেন । তাই না মহারাজ! ... ছি ছি! দেখেছেন, কোথায় আপনাদের থেকে জ্ঞান অর্জন করার কথা, আর মাতা আমাকে দিয়েই জ্ঞান প্রদান করাচ্ছেন। ... আপনারা বিশ্রাম নিন, আমি গোমাতার বাঁটে বাছুরগুলোর মুখ লাগিয়ে আসি, সকাল থেকে তারা সামান্য খেয়ে বসে আছে"। ... পঞ্চযুবা হাস্যমুখে দেবী অসিকে বিদায় জানালে, দেবী অসি, তাঁর দৈবিক অনুপমা ভঙ্গিতে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

পঞ্চযুবার একজন, যুবা দেবী অসি চলে যাবার পর বললেন, "কি অদ্ভুত নারী! ... যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমন জ্ঞান। যেন সাখ্যাত দেবী রমা!" ... অন্যযুবা উত্তরে বললেন, "দুর্বল হয়ে যাচ্ছ তুমি ভাই, স্মরণ রেখো সন্ন্যাসী স্ত্রীর থেকে শতহস্ত দূরে থাকবেন, এটিই সঠিক"। ... অন্য এক যুবা হেসে বললেন, "এই নারীর প্রতি দুর্বল তো আমরা সকলেই হয়েছি, কেউ মানছি, আর কেউ মানছি না। ... আর দুর্বল হওয়াও তো স্বাভাবিক। ... এমন মহীয়সীর প্রতি আকর্ষণ না জন্মানোর অর্থ আমরা যে যন্ত্র হয়ে গেছি"।

অন্য এক যুবা স্থির হয়ে থাকলে, সকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ভায়া, তুমি যে কিছু বলছো না!" ... সেই যুবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমরা আমাদেরই বুদ্ধির কাছে বদ্ধ হয়ে গেছি ভাইসকল। ... আমি তো দেবী অসিকে স্নান করা অবস্থাতেও দেখেছি। তা দেখার পর, নিজের কামনার উদ্বেগকে সংযত রেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এমন অদ্ভুত জ্ঞান শোনার পর মনে কেমন যেন এক

হতাশা জন্ম নিলো! ... কেমন যেন মনে হলো, ইনি স্ত্রী নন, ইনি কামিনী নন, ইনি আমাকে পূর্ণতার স্বাদ প্রদান করার জন্যই যেন স্থিতা"।

অন্য যুবক বললেন, "সেই বিচারই করছিলাম। সময় আমাদেরকে বিপাকে ফেললেন, পরীক্ষা করছেন, না কি কনো মার্গ প্রদান করছেন, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না"। ... প্রথম যুবকটি বললেন, "না না ভায়া, এখন আমাদের ভাবার সময় নয়, গুরুদেব আমাদের যেই পরীক্ষা নির্ধারণ করেছেন, আমাদের সেই কর্মে মনোনিয়োগ করা উচিত । ... দেবী অসি আমাদেরকে নিজের সবলতা দেখিয়েছেন। আমরা যদি তাঁকে প্রমাণ করতে পারি যে তিনি সবল নন, নির্বল ও দুর্বল, তবে তাঁকে আমরা সন্ন্যাসিনী হবার আদেশ সহজেই দিতে পারবো। ... আর তবেই নিজরা সত্য সত্য সন্ন্যাস গ্রহণে সমর্থ হবো"।

অন্য ভ্রাতাগণ একত্রেই বললেন, "তবে কি করা উচিত আমাদের!" ... প্রথম যুবা বললেন, "একজন অতীব দুর্বল ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এসে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়াতে হবে দেবী অসিকে। ... তিনি বলেছিলেন না, মাতা যা কিছু তাঁর সম্মুখে আনবেন, তাই মাতার আদেশরূপে তিনি গ্রহণ করবেন। ... তার প্রমাণ আমরাও পেয়ে যাবো, আর উনি স্বয়ংও পেয়ে যাবেন" । ... সকলে সম্মত হলে, তেমন কনো এক পুরুষ, যিনি যেকোনো সুন্দরী স্ত্রীর জন্য বিবাহের অযোগ্য, তাঁর সন্ধান করতে উদ্যত হলেন পঞ্চযুবা।

বহু প্রচেষ্টার পরে, একটি বৃদ্ধ বিপত্নীক কুরূপ পুরুষকে শিখিয়ে পরিয়ে, দুইটি মুদ্রা প্রদান করে নিয়ে আসেন, যাতে তিনি দেবী অসির সম্মুখে গিয়ে নাটকীয় ভাবে তাঁকে বিবাহ করতে চান। ... যেমন পরিকল্পনা, তেমনই কাজ। কিন্তু যা ঘটলো, তাতে পঞ্চযুবার কনো নিয়ন্ত্রণ রইলোনা। ... সেই কুরূপ বৃদ্ধ, দেবী অসির কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে বিবাহপ্রস্তাব তো দিলেন, কিন্তু পঞ্চযুবা যা দেখে চমকিত হলেন, তা হলো দেবী অসির আচরণ। ... তিনি তৎপরতার সাথে সেই বৃদ্ধকে নিজকুটিরে নিয়ে এসে বসালেন।

তাঁর উদ্দেশ্যে দেবী অসি বললেন, "হে মান্যবর, আপনি এইরূপে কেন বলছেন যে আপনি আমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। মাতার দূত হয়ে আপনি উপস্থিত। আপনি আমাকে তাঁর হয়ে আদেশ প্রদান করুন। ... আপনি যদি বলেন, আমি এই একবস্ত্রে আপনার ঘরণী হয়ে প্রস্থান করতে প্রস্তুত"। ... বৃদ্ধ হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন, তাঁকে অপমানিত হতে হবে, তাই তাঁকে দুই মুদ্রা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তার বিরূপ আচরণ দেখে তিনি হতবম্ব হয়ে যান।

পরমাসুন্দরী, মিষ্টভাষী, মিষ্টস্বভাবের এই যুবতীকে দেখে এবং তাঁর বিবাহে সম্মতি দেখে লালায়িত হয়ে যান বৃদ্ধ, এবং তিনিও এই বিবাহ করতে সচেষ্ট হয়ে যান । ... কিন্তু তাঁর এই উল্লাস দেখে, তটস্থ হয়ে যান পঞ্চযুবা। তাঁদের বোধ জন্ম নেয় যে এটি দেবী অসির প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। ... তাই কনো প্রকারে তাঁরা সেই বৃদ্ধকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, এবং তাঁকে আরো দুটি মুদ্রা প্রদান করে, সেই পথে আসা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিবন্ধিত করেন।

অন্যদিকে পঞ্চযুবা ভাবেন, এতো অতি সুন্দর হলো, এবার নিশ্চয়ই সেই বৃদ্ধের আগমন হবে না বলে, দেবী অসি ব্যাথিত হবেন । কিন্তু সেখানেও তাঁরা ব্যর্থ হলেন। একদিন যখন দেবী অসি সেবা করছিলেন তাঁদের, তখন তাঁরা প্রশ্ন করেন, সেই বৃদ্ধ তো এলো না আর। ... তার উত্তরে দেবী অসি বলেন, "মায়ের ইচ্ছায় তিনি এসেছিলেন, আবার মায়ের ইচ্ছায় তিনি দ্বিতীয়বার এলেন না। ... এতে চিন্তার কি আছে মহারাজ! ... আমার জন্য কি সঠিক, তা আমি নই, মাতাই জানেন... তিনিই সকলের চেতনা ।... তাই তাঁর প্রতিই ভরসা রাখা উচিত নয়কি?"

পঞ্চযুবার একজন বললেন, "আচ্ছা, এবার আমরা যদি আপনাকে বলি সন্ন্যাস নিতে?" দেবী অসি বললেন, "আমি এখনই সজ্জ হয়ে আসি, স্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসি, আপনারা এখনই দীক্ষা দেবেন তো?" ... পঞ্চযুবা এবার এই কথাতে থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁরা যে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে আছেন, তাঁরা নিজেরাই এখন সন্ন্যাসী নন । ... আর তাছাড়া, দেবী অসি সন্ন্যাসিনী হবেন জেনে, সকলের হৃদয়ে এক বেদনার সুর বেজে উঠতে শুরু করে। ...

যেন এক অপূর্ণতার বিষাদ তাঁদের শরীর মন সর্বত্র ছেয়ে ফেলে। মন থেকে তাঁরা ঋষি, তাই চরিত্রের আঁট নেই । অযাচিত ভাবে তাঁরা কেঁদে ফেললেন। দেবী অসি, তাঁদের ক্রন্দন দেখে, ব্যাকুল হয়ে উঠে, তাঁদের সকলের কাছে হন্তদন্ত হয়ে পোঁছে তাঁদের নেত্রের জল মুছিয়ে দিতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, "আহা আপনারা ক্রন্দন করছেন কেন? আমি কি কিছু অপরাধ করে ফেলছি!"

শিশুর মত সকল পঞ্চযুবা দেবী অসির বক্ষে স্থাপিত হয়ে, ক্রন্দন করতে করতে বলতে থাকলেন, "আমরা সন্ন্যাসী নই দেবী। আমাদের গুরু আমাদের সর্ত দিয়েছিলেন, যদি আমরা আপনাকে সন্ন্যাসিনী করে আনতে পারি, তবে তিনি আমাদেরকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা প্রদান করবেন। ... কিন্তু আজ যখন আপনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন, তখন আমাদের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত বিসাদের সঞ্চার হলো। ... যেন আমরা আপনাকে খুব নিকট থেকে পেয়েও পেলাম না, এমন বোধ হলো!"

দেবী অসি হেসে বললেন, "এর অর্থ কি যুবাগণ! আপনারা কি কামনা করেন আমার থেকে?" ... যুবাপঞ্চ একত্রে বললেন, "আমরা একত্রে পাঁচজন আপনার পাণিগ্রহণ করতে চাই দেবী। ... আপনাকে আমরা আমাদের জীবনে লাভ করে ধন্য হয়ে যাব। ... এমন মহীয়সী নারীর সান্নিধ্য, কনো অংশেই মাতার সান্নিধ্যের থেকে কম নয়। ... আমরা আপনার দাশ হয়ে থাকবো, এমন বললে আপনার অপমান করে ফেলবো। ... তাই তেমন না বলে আমাদের আর্জি এই যে, আমরা আপনার চিরসখা হয়ে থাকবো"।

দেবী অসি সামান্য হেসে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি কারুকে আপনাদের সম্মুখে নিয়ে আসছি"। ... এই বলে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করে কিছুক্ষণ পরে পুনরায় পঞ্চযুবার গুরুকে নিয়ে এলেন দেবী অসি। গুরু মহান্ত নিজের পঞ্চশিষ্যকে দেখে আনন্দিত হয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। এবার সকলে দেবী অসির দিকে তাকালে, সকলে দেখলেন সেখানে মাতা সর্বাম্বা দণ্ডায়মান। ...

মাতাকে দেখে সকলে তাঁর চরণের সম্মুখে এসে স্থিত হলে, মাতা বললেন, "সনতকুমার! ... সন্ন্যাসব্রত যুবা অবস্থায় কেন, পুত্ররা? ... যেই সংসার রিপুপাশের পীঠস্থান, সেই সংসারে স্থিত হয়ে রিপুপাশের সাথে সংগ্রাম না করে, তাদেরকে পরাস্ত না করে, কি করে সন্ন্যাস নিতে পারো পুত্ররা! ... শত্রুর থেকে পলায়ন করে, আজ পর্যন্ত কে শত্রুনিধনে সখ্যম হয়েছে?"

সনতকুমার নতমস্তক হয়ে বললেন, "মাতা! ... আপনি দেবী অসি!... ছি ছি! ... আমরা আপনাকে সম্মান করেছি, কিন্তু আমরা আপনার প্রতি কুনজরও দিয়েছি!" ... মাতা হেসে বললেন, "পুত্ররা, মিলনকামনা কখনো কুনজর হয়না। ... আর তা ছাড়াও, আমার সন্তানদের সঠিক মার্গ প্রদর্শন করতে আমি নষ্টচরিত্র হতেও রাজি। আমার এতে কনো প্রকার আপত্তি, কখনোই থাকেনা। ...

তোমরা তো আমাকে মাতা রূপে না চিনে, আমার প্রতি মিলনভাব আরোপ করেছিলে। কিন্তু পূর্বে, আমার পুত্র, অন্ধক, আমাকে মাতা জেনেও, আমার উপর কুনজর প্রদান করেছিল। না আমি, আর না প্রভু, তাকে সেই কাজে বাঁধা প্রদান করেছি, কারণ আমরা আমাদের সন্তানের কল্যাণ কামনা করি। ... সন্তানকে সত্যের মার্গ প্রদর্শনের হেতু, তাঁকে অসত্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে হয়। ... যদি, সেই অসত্যের সাথে পরিচয় করাতে আমাদের নষ্ট চরিত্রও হতে হয়, তবে তাই সই"। ...

সনতকুমার অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, "এই অপার প্রেম মা! ... একবার আমরা জন্মদাতা পিতামাতার প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত ছিলাম, তখন নারায়ণ আমাদের বলেছিলেন, প্রভু ও মাতার প্রেমকে কবে উপলব্ধি করবে! ... তাঁরা জাগতিক পিতামাতার ন্যায়, বেদনার প্রকাশ করেন না সন্তানকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে দেবার হেতু; তাঁরা বিশ্বাস করেন সন্তানকে । ... তাঁরা এই বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের সন্তান তাঁদের কাছেই পৌঁছাবার জন্য সমস্ত কিছু করছে। ...

তাই, তাঁরা বেদনার প্রকাশ করেন না; তাঁর সন্তান তাঁদের থেকে পৃথক জেনেও, মুখে সুখময় ভাব রেখে দেন। ... তাঁরা বলেন, 'আমাদের চিন্তা করোনা পুত্র, আমরা ভালো আছি, তুমি কেবল ভালো থেকো' । ... প্রতিমুহূর্তে সন্তান তাঁদের থেকে পৃথক হয়ে আছেন, সেই কারণে বেদনাগ্রস্ত থাকেন, কিন্তু সন্তানের সম্মুখে সদানন্দ, সদানন্দময়ীর নাট্য করে যান। ... তাঁদের এই অপার প্রেমকে কবে বুঝবে সনতকুমার"। ...

সত্য বলছি মা, সেদিন নারায়ণের কথা বুঝিনি। ... আজ বুঝতে পারছি। ... এক মা, তাঁর সন্তানদের সত্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য, তাঁদের কামনার দৃষ্টিও সহ্য করে নেন অবলীলাক্রমে! ... তাও একটিবার বলেন না, আমার কাছে আয়! ... এমন বিশ্বাস তাঁর যে তাঁর সন্তান তাঁর কাছে আসবেই, যে একটি বারের জন্যও অবিশ্বাস করেন না, একটিবারের জন্যও নয়! ... মা, ... সন্ন্যাস নয়, সংসারে থেকেই সাধন; সন্ন্যাসের অর্থই যে নিজের বুদ্ধির শ্রাদ্ধ নিজহস্তে করা। ...

মা, এই সহজ সত্য আমরা বুঝতে পারিনি। ... আমরা ভেবে মরেছি যে সন্ন্যাসের অর্থ হলো জাগতিক সমস্তকিছু ত্যাগ করে দেওয়া। কিন্তু আমরা ভুলেই গেছিলাম যে জাগতিক বস্তুদের প্রতি যেই বুদ্ধি আমাদের আকর্ষিত করে, সেই বুদ্ধিই তো আমাদের সঙ্গে সদা

বিরাজমান, তা আমরা এই ক্ষুদ্র সংসারে থাকি, বা এই ক্ষুদ্রসংসার থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ জগতসংসারে বিরাজ করি । ... মূর্খ আমরা। কিন্তু মা, এই মূর্খতায় আমাদের বিস্ময় নেই। ...

আমাদের বিস্ময়, তোমার কৃত্যে। ... এ কেমন কৃত্য মা! ... মাতা রূপে তুমি প্রকট হয়ে এই কথা বললেও আমরা সেই কথা শুনতাম, কিন্তু আমরা কেবল আদেশ পালন করতাম, অন্তর থেকে অসত্যকেই প্রশ্রয় দিয়ে যেতাম। ... তাই তুমি আমাদের কামনার পাত্রী হয়ে গেলে! ... আমাদের অন্তরকে সত্যকামী করে দিলে! ... তোমার সন্তানরা তোমার প্রতি কামনার দৃষ্টি অর্পণ করলো, তাই নিয়ে তোমার একটিবারের জন্যও বেদনা হলো না!"

মাতা হেসে বললেন, "বেদনা তখন হতো পুত্ররা, যদি অন্তে আমার পুত্রদের আমি আমার নিকটে না পেতাম। ... যখন সমস্ত কিছুর অন্তে আমার সন্তানরা, আমার বক্ষেই নিজেদের জীবনকে খুঁজে পেয়ে যাবেন, তখন এতো চিন্তা কেন! ... দেখ পুত্র, অন্ধকও অন্তে শিবগণ হয়েই স্থান গ্রহণ করেছিল, করেনি! ... তাই দেখার পর, কোন পিতা, কোন মাতা সন্তানের মার্গ দর্শনের জন্য সমস্ত সীমান্ত পেরিয়ে যাবেন না!"

সনতকুমারগণ আর নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে পারলেন না, তাঁরা শিশুর ন্যায় মাতার বক্ষে নিজেদের শিরস্থাপন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকলেন। ... মাতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, হেসে বললেন, "এই সুখালিঙ্গনের জন্য, আমি সমস্ত কিছু করতে পারি পুত্ররা, সমস্ত কিছু। ... আর আমি সদা, তা-ই করে ফিরি। ... আমি স্বয়ং মহামায়া হয়ে সমস্তসময়ে সকল জীবকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাই, যে এই জগত অনিত্য, অসত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। ...

কিন্তু না! জীব নিজের মায়াতেই নিজকে আবদ্ধ রেখে দেন, মহামায়ার দিকে ফিরেও তাকায় না সে । ... মাঝে মাঝেই আমি অবতরণ করে, স্বয়ম্ভুসত্ত্বাকে অন্তরে ধারণ করে, কি রূপে ভ্রমের সাথে সংগ্রাম করে সত্যে উপনীত হতে হয় দেখিয়ে যাই । কিন্তু তোমরা, তাঁদের অনুসরণ না করে, তাঁদের পূজা করে, তাঁর থেকে এই মিথ্যা জগতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকার বরদান কামনা করতেই ব্যস্ত থাকো। ...

কিন্তু তাতেও কিচ্ছু হয়না, আমরা জানি, তোমরা আমাদের কাছে আসারই মার্গ খুঁজছো। তাই আমি স্বয়ং সময়ে সময়ে, কখনো অষ্টচন্দ্রকলা অবতার হয়ে, আবার কখনো দ্বাদশ চন্দ্রকলা হয়ে, আবার কখনও ষোড়শচন্দ্রকলা হয়ে, আবার কখনো ষোড়শকলা পূর্ণচন্দ্র হয়ে, আবার কখনো ৩২ কলা পূর্ণসূর্য অবতার হয়ে এসে তোমাদের জন্য মার্গ রচনা করে যাই । ... এবারে তো আমি পাশুপতরূপী বৈরাগ্যের ধারাকে সকলের জন্য রেখে, সকলকে পিনাক রূপী প্রেমকে ধারণ করার আহ্বান জানিয়ে গেছি। তবুও, তোমরা আসো না আমার কাছে! ...

পুত্ররা! ... শ্রেষ্ঠ তপই হলো প্রেম। ... প্রেমের কারণেই এই জগতের রচনা হয়েছে । ... সকল ব্রহ্মাণুর, ব্রহ্মময়ীকে প্রেম করার আদিম ও অদম্য ইচ্ছাতেই, এই ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা হয়েছে । তাই সেই প্রেম যতক্ষণ না একটি স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মাণু করতে সক্ষম হন, ততক্ষণ তিনি

আমাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হতে পারেন না । সেই প্রেম, (হেসে) অর্থাৎ সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার ভাব । সমস্ত বুদ্ধি, আবেগ, সমস্ত জীবন, সমস্ত বোধ আমাপ্রতি উৎসর্গ করাই একমাত্র উপায় এই কল্পনার জগত থেকে মুক্তির।

পুত্ররা, এই ব্রহ্মাণ্ড তোমাদের বুদ্ধির সকাশেই উপস্থিত, আর তোমাদের ইন্দ্রিয়রা এই ব্রহ্মাণ্ডকে সত্য বলে দাবি করে ফেরে। সেই ইন্দ্রিয়দের ইন্ধন প্রদান করে পঞ্চকোষ, যাদের রচনা করে ত্রিগুণ । আর ত্রিগুণ অন্য কিছুই নয়, আমার গর্ভকেই অর্থাৎ চেতনাকেই তোমরা ভ্রমদৃষ্টিতে দেখে সেই রূপে কল্পনা করো তাই। এই কল্পনা করেছিলেও তোমরা আমাকে প্রেম প্রদান করবে বলে, আর তাই সেই আত্মবিভূতি দেওয়া প্রেম যতক্ষণ না উপস্থিত হয়ে, বুদ্ধি, আবেগ ও বোধের বিনাশ হয়, ততক্ষণ তোমরা এই বুদ্ধির কাছেই বশ্যতা স্বীকার করে থাকো ।

সাধনার বহু মার্গ হয়, যতপ্রকার মত, তত প্রকার সাধনার পথ; কিন্তু মুক্তির পথ একটিই, আর তা হলো অহংকারবিসর্জনী প্রেম, নিজ পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জনী প্রেম। ... সেই বিসর্জনের আভাস তো ভিন্ন ভিন্ন মুনি, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে করেন; কেউ সমাধির মাধ্যমে প্রমাণ লাভ করেন তার, আবার কেউ বৈষ্ণবী ধারণ করে, তো কেউ কেউ ভৈরবী ধারণ করে। (হেসে) কিন্তু প্রমাণ লাভ করে কি হবে পুত্ররা! সর্বক্ষণ যদি সেই অহংকার নাশ সম্ভব না হয়, তবে কি উপায়ে মোক্ষ লাভ সম্ভব!

আর সর্বক্ষণ সেই অহংকারবিমুখতা একমাত্র সম্ভব প্রেমের দ্বারা। কিন্তু তোমরা যাকে প্রেম বলো, তা সর্বক্ষণ কামনামিশ্রিত থাকে। কখনো তা জাগতিক কামনায় পরিপূর্ণ, আবার কখনো তা কামনা না করার কামনা, অর্থাৎ যাকে তোমরা বলো নিষ্কামভাব, সেইরূপ হয়। ... কিন্তু এই কামনা না করার কামনার কারণেও যে অহংকার স্বমহিমাতেই স্থিত থাকে পুত্ররা! ... তবে উপায়! ...

মহর্ষি পিপলাদ বেশে, এক অবতাররূপী স্বয়ম্ভুঅণু, এই সম্পূর্ণ কামনামুক্ত প্রেমের উপস্থাপনা করেছিলেন, এবং তার মার্গ রূপে বৈরাগ্যকে দেখিয়েছিলেন। বৈরাগ্য, অর্থাৎ না কনো কিছুর প্রতি আসক্তি, আর না কনো কিছুর প্রতি বিরক্তি । যা সম্মুখে আসছে, তা নির্বিচারে গ্রহণ করা, এবং যা সম্মুখে আসছে না, তা নির্বিচারে বর্জন করা; সম্মান বা অপমান, যাই আসুক সম্মুখে, তা হাস্যমুখে গ্রহণ করা; আবার সম্মান বা অপমান, যা সম্মুখে উপস্থিত নয়, তাকে নির্বিচারে বর্জন করা, এই হলো বৈরাগ্য।

এক কথায়, বুদ্ধি ও আবেগকে গুরত্বহীন করে দেওয়াই বৈরাগ্য । বুদ্ধিহীন ভাবে কেবল নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবিত থাকাই বৈরাগ্য। আর যিনি তেমনটা করেন, তাঁকে জগত ভোলা বলেন । কিন্তু পিপলাদের সেই পাশুপত অস্ত্র অর্থাৎ বৈরাগ্যের কাণ্ডারী তিনিই একাই ছিলেন, আর এই বোধকে, বুদ্ধিকে, দমন করে, তিনি আমার কাছে নিজকে সঁপে দিয়েছিলেন, আর অপার প্রেমের রচনা করেছিলেন।

তিনিই প্রথম যিনি আমাকে জগন্মাতা রূপে সনাক্ত করেছিলেন, আর তা করেছিলেন জগতকে তাঁর এই প্রেম ও বৈরাগ্যের শিক্ষা প্রদান করে। তাই এবারে আমি সেই অবতাররূপী স্বয়ম্ভুর বেশ ধরি, যিনি প্রেমবৈরাগ্যের অর্থাৎ পিনাক পাশুপতের রহস্য সকল

ছদ্মবেশী ব্রহ্মাণুদের প্রদান করেন। ... প্রেম অনুকরণীয় নয়, প্রেমে সমস্ত অহংকার, নিজের অস্তিত্বও ত্যাগ হয়ে যায়, যা অনুকরণকারীর পক্ষে অনুকরণ করা অসম্ভব।

স্বল্পসময়ের জন্য তাঁকে যিনি দেখবেন, তাঁর কাছে তো এই অনুকরণ প্রদর্শন করা সম্ভব, কিন্তু সর্বক্ষণ যিনি এই অনুকরণকারীকে দেখবেন, তাঁর কাছে এই নাট্য স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে ।... কিন্তু বৈরাগ্য অনুকরণীয় । পুত্ররা, যতক্ষণ এই বুদ্ধি বা বোধের নাশ হয়না, ততক্ষণ জীব ভাবতে থাকেন, এই বুদ্ধির কারণেই তাঁরা সামর্থ্যবান, কিন্তু যখন এই বুদ্ধির নাশ হয়!

সেই অবস্থায় যখন ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে তিনি সার্বিক ভাবে শ্রেষ্ঠ ও প্রশান্তির জীবনযাপন করছেন, তখন তিনি আমাকে উপলব্ধি করেন, অর্থাৎ চেতনা বা শূন্যের পরিচিতি লাভ করেন । শূন্যের সাথে পরিচয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে আলাপ । আর সেই আলাপ থেকে সহজাত ভাবেই জন্মায় প্রেম, যা ব্রহ্মমধ্যে, তাঁকে একসময়ে বিলীন করে দেয়। ...

কিন্তু এই ভাব কি করে জন্মাতে পারে যেখানে বুদ্ধির প্রয়োগই নেই? এই ক্ষুদ্রসংসারেই বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, আর তাই এই স্থানে বর্তমান থাকা অবস্থাতেই বৈরাগ্যকে অভ্যাস করে সেই বুদ্ধির নাশ করতে হয়। কিন্তু তোমরা যেই সন্ন্যাস নেবার চেষ্টা করছিলে, সেই সন্ন্যাস যে এই বুদ্ধিকে শান্ত রেখে দেয় মাত্র, সুরক্ষিত রেখে দেয়, বিনাশ করেনা । ... আর বুদ্ধির বিনাশ না হলে, ভোলা না হলে, প্রেম জন্মাবে কেমন করে? ...

তাই পুত্র, সন্ন্যাস সাধনের মার্গ নয়; সন্ন্যাস প্রয়োজন, কিন্তু তা সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, সাধনের অন্তে ঈশ্বর নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার কালে সন্ন্যাসের প্রয়োজন, এবং শিক্ষা অর্জনের কালে সন্ন্যাস প্রয়োজন । সন্ন্যাস ধারণ করে শিক্ষা লাভ করে, তৎপশ্চাৎ এই সংসারে থেকে নিজের বুদ্ধিকে নাশ করতে হয়; সেই বুদ্ধিকে নাশ করতে হয়, যার কারণেই সকল রিপু, পাশ, ইন্দ্রিয় বিস্তার লাভ করে; সেই বুদ্ধিকে নাশ করতে হয়, যার কারণেই ব্রহ্ম নিজকে ব্রহ্মাণু এবং অতঃপরে জীবাণু মনে করে এই মিথ্যা ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেন।

হ্যাঁ স্ত্রী বা পতি, সাধনার অন্তিম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য আবশ্যক, কারণ তাঁরাই আমাদের অন্তরের লিঙ্গহীনতার ভাবকে জন্ম দেয়। তাই যিনিই সাধনার অন্তিম স্তরে উন্নীত হন, আমি তাঁকে বিবাহ দিই। লিঙ্গভেদেই আমাদের ব্রহ্মের অসীমতাকে লুক্কায়িত করে রেখে, জীবাণুর সসীমতাকে প্রকাশ্যে স্থাপন করে। ... আর একমাত্র বিবাহই সেই ভেদকে মুছে দিয়ে, আমাদের মধ্যে লিঙ্গভেদকেই মুছে দেয়, এবং আমরা অসীম ব্রহ্ম হয়ে উঠি। ... তবে ভেবো না পুত্ররা, পত্নী বা পতি সেই বিষয়ে কিছু করেন।

যা কিছু চেতনা প্রকাশ পায়, তা আমারই কারণে হয়। ... প্রথম যখন এক পুরুষ এক স্ত্রীর প্রতি, বা এক স্ত্রী এক পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন, তখন তাঁর অন্তরমনে বা কনো কনো নীচমনে যৌনতার ভাবনাই প্রসারিত থাকে। ... কিন্তু যখন তাঁর সাথে সংসার

রচনা করা হয়, তখন তখন পুরুষ নিজের অন্তরে সেই নারীর সমস্ত ভাবকে, এবং স্ত্রী নিজের অন্তরে সেই পুরুষের সমস্ত ভাবকে অনুভব করতে থাকেন।

সাধারণ মানুষ, যারা সত্যবোধের সন্ধান করেননা, যাদের সংখ্যা ঘোরকলিতে অধিক দেখা যায়, তাঁরা এই চেতনা লাভই করেন না, কারণ তাঁদের বুদ্ধি চেতনার প্রকাশকে রিপু, পাশ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখে দেয় । ... কিন্তু যারা সত্যের সন্ধানী, তাঁরা নিজদের অন্তরে সেই বোধকে উপলব্ধি করেন এবং সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হতে শুরু করেন।

পুত্ররা, এমন ভেবো না যে, এই বোধ তোমরা আমার থেকে লাভ করলে, তাই তোমাদের বিবাহের প্রয়োজন নেই। ... কারণ উপলব্ধি শব্দে উপলব্ধ হয়না, তা উপলব্ধ কেবল মাত্র উপলব্ধির মধ্যেই হয়। ... তাই পুত্ররা, আমি তোমাদের এই সমস্ত কথন বলার পরেও, তোমরা আমার বচনকে তো বিশ্বাস করলে, কিন্তু তোমরা সেই উপলব্ধিকে অনুভব করলে না, নিজদেরকে লিঙ্গহীন রূপে অনুভব করলে না। ...

আর তাই পুত্ররা, এক্ষণে আমি যা কিছু তোমাদের বললাম, তা সম্বন্ধে অপস্মার তোমাদের বিস্মৃত করে দেবে, এবং অসি তোমাদের পঞ্চভ্রাতার পত্নী হয়েই তোমাদের সাথে বিরাজ করবে। ... যখন তোমরা লিঙ্গহীনতার উপলব্ধি করে ফেলবে, তখন অপস্মার নিজের প্রভাব বিস্তারকে স্তব্ধ করে দেবে, এবং তোমাদের আমার এই সমস্ত বচনের স্মৃতি ফিরে আসবে" । ... এই বলে মাতা সেই স্থান থেকে নিজের উর্জ্জা সম্বরণ করলেন; দেবী অসিকে সম্মুখে লাভ করে পঞ্চযুবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং তাঁদের গুরুদেব দেবী অসির সাথে এই পঞ্চযুবার বিবাহ দান করলেন"।

দেবী দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "অদ্ভুত শিক্ষা ও অদ্ভুত পদ্ধতি শিক্ষা দানের । ... এমন শিক্ষাদান মাতার পক্ষেই সম্ভব। ... তবে হ্যাঁ, যারা মহাজ্ঞানী হয়েও ভ্রমিত, তাঁদেরকেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। আমাদের ন্যায় অজ্ঞানীদের শিক্ষা প্রদান করতে হলে, গুরুকে কঠোর হতেই হয়, না হলে আমাদের বুদ্ধির যা দৌরাত্ম্য, আমরা উচ্ছেন্যেই যাবো" । আমরা আমাদের বুদ্ধিকে সর্বত্র নাকগলাতে দিয়েই, সমস্ত গণ্ডগোল করে দিই । এই বুদ্ধি অত্যন্ত মাতব্বর সাজে সর্বসময়ে। সর্বসময়ে সে আমাদের কিভাবে ভোগ করা যাবে, কি ভাবে ভ্রমিত হওয়া যাবে, তাই বলে। সমস্ত কিছুতে তার মন্তব্য করা অভ্যাস। ... সময় ও প্রকৃতি সর্বসময়ে আমাদের মার্গদর্শন করছেন, তাতে হয়না। ...

সম্মুখে যেই কর্ম এসে উপস্থিত হয়েছে, তা করবে না সে। যেই কর্ম সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়নি, সেই কর্ম করতে মত্ত থাকবে। ... বুঝতে পারিনা আমরা, তাই পিতামাতার মুখ দিয়ে আমাদেরকে বলান মাতা, যেই বয়সে যেটা সেটা করে নে... কিন্তু আমরা করবো না, যেই বয়সে যেটা নয়, আমরা সেই দিকেই ছুটবো, এই বুদ্ধি-মাতব্বরটার পাল্লায় পরে। ... প্রকৃতির ভাষা আমরা বুঝতে পাইনা, তাই যেই কর্মে না যাওয়া উচিত, সেই কর্ম করতে গেলে, প্রকৃতি স্বয়ং তাতে বাঁধা প্রদান করেন; বুদ্ধি তখনও মাতব্বরি করতে থাকে।

সমস্ত কথা বুঝতে না পেরে, গুরুরূপে তিনি আমাদের সম্মুখে এসে নির্দেশ দেন, তখনও আমাদের বুদ্ধি মাতব্বরি করেন। ...

সর্বসময়ে আসক্তি আর বিরক্তি। এটা আমার ভালোলাগে, এটা আমার ভালোলাগেনা। ... পরিবারের প্রতি আসক্তি, শত্রুর প্রতিও আসক্তি! ... পরিবার দিনরাত্রি খোঁটা মারছে, সাধনা নষ্ট করে দিতে চাইছে, কিন্তু না, তাও আসক্তি পরিবারের প্রতি । ... শত্রু বলে কারুকে চিহ্নিত করে নিয়েছি; তার পরেও সর্বক্ষণ শত্রু কি করছে, কি ভাবছে, কি করতে চাইছে, এই সমস্ত আবর্জনাময় প্রশ্ন মনে তোলা, এই বুদ্ধির নিত্যকর্ম।

যখন আত্ম কোনপ্রকারে সাধনা করার জন্য স্থির হয়, অমনি বুদ্ধি চেষ্টা করে যাতে, শীঘ্রই সেই পথ থেকে আমরা সরে আসি, তাই কি বলে সন্ন্যাস নিয়ে নেয়ে। ... বুদ্ধি জানে, সন্ন্যাস নিলে, দুটি পথ খোলা থাকবে, একটি ভণ্ড হয়ে লোকদেখানি গানবাজনা আর বক্তৃতা দিয়ে উদম ভোগে মত্ত থাকা, আর দ্বিতীয়টা হলো বহু কষ্ট ভোগ করে সাধনা করা । ... বুদ্ধি জানে, ভণ্ডের পথে হাঁটলে, তার তো পোয়াবারো, আর যদি সাধনার পথে সন্ন্যাস নিয়ে হাঁটে, তবে কিছুদিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে ভোগসাম্রাজ্যে ফিরে আসবে। ...

আর ঠিক সেই কথাটিই এখানে অদ্ভুত ভাবে আপনি বললেন পিতা । মাতা আদেশও দেন নি, নির্দেশও দেন নি। ... স্পষ্ট ভাবে বলে দিলেন, যেই রিপুপাশদের পরাস্ত করতে হয়, তাদের ভিড় সংসারেই থাকে। তাই যদি সেই রিপুপাশদের দমন করতে হয়, তবে সংসারে থেকেই তা করা সম্ভব, সন্ন্যাস নিয়ে নয়। ... অদ্ভুত সুন্দর লাগলো পিতা, এই অধ্যায়টি। ... আর মাতার কথা কি আর বলবো। ... উনার প্রেম করার সামর্থ্য শুনে, একটিই জিনিস মনে হয়, কনো মানুষই, সহস্র প্রয়াসের সত্ত্বেও উনার ন্যায় প্রেম করতে পারবেনা"।

অনুসুইয়া অধ্যায়

প্রভু ব্রহ্মসনাতন এবার মাতার সপ্তম অবতারের কথা বলতে থাকলেন। তিনি বললেন, "এবার মাতার আরেক কাহিনীর শ্রবণ করো। কথাটি দেবী অনুসুইয়া যখন মাতার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে দেবী সর্বাম্বার অবতারকালে দেহধারণ করেছিলেন, তখনকার । মাতার একনিষ্ঠ ভক্ত দেবী অনুসুইয়া, কিন্তু মাতার সান্নিধ্য লাভ করেন নি বলে তাঁর ক্ষোভ । মোক্ষ লাভের সমস্ত গুণ তিনি অর্জন করেছেন, কিন্তু কেবল মাতার সান্নিধ্য লাভের অদম্য ইচ্ছাপূর্তি হয়নি বলেই, তাঁর মোক্ষ সম্ভব হয়নি, এমনই তাঁর বিশ্বাস।

তাই তিনি বহু আশা করে মানবজন্ম গ্রহণ করেন, এবং মাতার সান্নিধ্য লাভের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস যে তিনি যদি গুরুপদে আসীন হতে সক্ষম হন, তবে মাতা অবশ্যই তাঁর ইচ্ছাপুড়ন করবেন। তাই তিনি গুরুপদে আসীন হয়ে, এক ব্রহ্মচারিণীর বেশে স্থিতা থাকলেন। গুরুপদে আসীন হবার কারণেও, এবং তারই সাথে সাথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রহ্মচারিণী হবার কারণে, তাঁর কাছে বহু কন্যা ব্রহ্মচার্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন।

তিনি সকলকে দেহকাম ত্যাগের শিক্ষা প্রদান করতেন। পুরুষস্ত্রীর কনো ভেদ নেই, কনো ভেদ সম্ভব নয়, ইত্যাদি শিক্ষা প্রদান করে তিনি দেহকামভাব থেকে সমস্ত কন্যাদের বিরত রাখতেন। এরই মধ্যে তিন কন্যা তাঁর কাছে উপস্থিত হন, যাদের নাম মৃধা, মেধা ও মীনা। ... তাঁরা তিন ভগিনী, কিন্তু তাঁরা যখন দেবী অনুসুইয়ার কাছে উপস্থিত হন, তখন তাঁরা প্রায়যুবতী।

দেবী অনুসুইয়াও যে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উপস্থাপন করছিলেন, তেমনও নয় । যৌবনের মধ্যগগনে তিনিও স্থিতা, কিন্তু যৌবনভাব দেহে উপস্থিত হবার পূর্ব থেকেই, তিনি কামসংযমী, তাই মহা ব্রহ্মচারিণী। ... দীর্ঘ ১৫ সন হয়ে গেছে, তিনি ব্রহ্মচারিণীর অবস্থায় উন্নীতা, এবং সম্পূর্ণ জীবনব্যাপী তিনি কামসংযমী। ... সকল শিষ্যারা তাঁদের যৌবনে কেবলই চরণ রেখেছেন, এবং সেই অনুপাতে, মেধা, মৃধা এবং মীনার বয়স সমান হলেও, ব্রহ্মচার্যের কেবলই শুরু করতে চলেছেন তাঁরা।

কিন্তু তাঁদেরকে শিষ্যারূপে স্বীকার করবেন কি না, সেই ব্যাপারে দেবী অনুসুইয়া ইতস্তত করতে থাকলেন। যেই ভাবাবেগ তাঁকে এতাবৎকালে কনো পুরুষের কাছেও এমন ইতস্তত করে তোলেনি, সেই ভাবাবেগ তিনি প্রথমবার লক্ষ্য করলেন নিজের মধ্যে, এই তিন কন্যাকে দর্শন করে। পরমাসুন্দরী এই তিনব্রাহ্মণ কন্যার রূপ তাঁর মধ্যে দেহকাম ভাবনাকে একমুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল করে তোলে।

তাঁদের দেহগঠন, তাঁদের অদ্ভুত মসৃণ ত্বক, তাঁদের মুখমণ্ডলের অদ্ভুত শ্রী, তাঁদের গাত্রবর্ণ, এমনকি তাঁদের চলনভঙ্গি, সমস্ত কিছুই দেবী অনুসুইয়াকে বিব্রত করে তোলে। ... যেই ক্ষণে এই তিনকন্যা দেবী অনুসুইয়ার দিকে আশ্রমের দ্বারদেশ থেকে অগ্রসর হয়ে আসেন, এঁদের চলনভঙ্গিতেই দেবী অনুসুইয়া নিজের চরণতলের ভূমি যেন হারিয়ে ফেলেন । চলনভঙ্গি তাঁদের অত্যন্ত সাবলীল, মনোরম, এবং ধিস্থির, কিন্তু সেই ভঙ্গির প্রতিটি পদক্ষেপে উন্নত যৌবনভাব যেন দেবী অনুসুইয়াকে চঞ্চলমতির করে তোলে।

আর দেবী অনুসুইয়া যতক্ষণে নিজের মনের মধ্যে কামসংযমের চেতনাকে পুনরায় লাভ করলেন, ততক্ষণে তিনি নিজের নবমগুহ্যদ্বারে যা অনুভব করলেন, তাতে তিনি নিজেই নিজের ব্রহ্মচার্যের সার্থকতার প্রতি সন্দিহান হয়ে গেলেন । এবার তাঁর দৃষ্টি যায়, বাকি কন্যাশিষ্যাদের প্রতি। যেই শিষ্যারা শ্রেষ্ঠসুন্দর পুরুষের দিকেও ফিরে তাকাননা, তাঁদের নেত্র যেন একদৃষ্টে এই তিনকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়।

সেই দেখে দেবী অনুসুইয়া মনে মনে স্থির করলেন, এই তিন কন্যাকে আশ্রমে রাখা সঠিক নয় । এতে সকলের স্খলন স্বাভাবিক। ... মৃধা, মেধা ও মীনা সম্মুখে এসে দেবী অনুসুইয়াকে প্রণাম করে বললেন, "দেবী, আমরা যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছি। পতিসঙ্গ লাভ করার পূর্বে, আমরা ব্রহ্মচার্যের অভ্যাস করে নিজদেরকে পতির জীবনে মায়া নয়, তাঁর প্রেরণা রূপে স্থাপিত হতে আগ্রহী । ... আমাদেরকে, আপনি কি কৃপা করে সেই ব্রহ্মচার্যের শিক্ষা প্রদান করবেন?"

দ্বারে উপস্থিত শিক্ষালাভ অভিলাষীকে গ্রহণ না করা, সম্পূর্ণ গুরুজাতির জন্য কলঙ্কের। কিন্তু শিষ্যকে পরীক্ষণ না করে গ্রহণ করাও সমরূপ ভাবেই অর্বাচীন অভ্যাস । তাই, দেবী অনুসুইয়া হাস্যমুখে বললেন, "কন্যারা, তোমাদের যে আমার শিষ্য হবার পূর্বে পরীক্ষা দিতে হবে। তোমরা কি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত?" ... তিনকন্যা বললেন, "হ্যাঁ দেবী, আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই প্রস্তুত, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কারণে। ... আমাদের আদেশ করুন, আমরা কি করতে পারি"।

দেবী অনুসুইয়া এবার এক কঠিন পরীক্ষার নাম করে, এই তিন কন্যাকে শিষ্যা হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হন। তাই তিনি বলেন, "আমার এই তিন শিষ্যা তোমাদেরকে পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে নিয়ে যাবে। সেই স্থান হলো সদ্যবিবাহিত পতিপত্নির যৌনমিলনের স্থান, যা সমাজের থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন। সেখানে প্রতিটি পতিপত্নি একটি ফল ও ফুলের বাগিচায় কিছুদিন যাপন করে একে অপরের যৌনরস আস্বাদন করে, সন্তানলাভ করেন, এবং সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন।

তোমাদেরকে সেখানে আমার এই তিন শিষ্যা নিয়ে যাবে, এবং একটি গোপন স্থানে স্থাপন করবে। ... তোমরা, সেই স্থানে স্থির থাকবে, এবং তিনদিবস সমস্ত ক্রিয়া এবং নিত্যকর্ম যথা আহার, স্নান ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে। যদি তা সম্ভব করতে পারো, অর্থাৎ নিজনেত্র সম্মুখে যৌনক্রীড়া দেখার পরেও যদি কামসংযমী থাকতে পারো, তবেই আমি তোমাদের শিষ্যা রূপে গ্রহণ করবো"।

তিনকন্যা গুরুর আদেশকে শিরোধার্য করে, দেবী অনুসুইয়ার তিনকন্যার সাথে গমন করলেন, এবং তিন দিবস পরে তাঁদেরকে তিনকন্যা ফিরিয়ে আনলেন। দেবী অনুসুইয়া তিনশিষ্যার থেকে তিনকন্যার সমস্ত কথা জানতে চাইলে, তাঁরা বলেন, "গুরুমাতা, এই তিনকন্যা সমস্ত সময়ে অবিচল ছিলেন, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা অবিচল থাকতে পারিনি মাতা! ... আমরা এরপূর্বে এমন কামভাব অনুভব করিনি কনোদিন। ...

মাতা, স্বামীস্ত্রীর যৌনক্রীড়ায় নয়, আমরা এই তিনকন্যার প্রতি প্রবল ভাবে কামাসক্ত হয়ে যাই, এবং (মাথানত করে) আমরা বিনা কনো ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েই, নিজদের ব্রহ্মচার্য হারিয়ে ফেলেছি"। ... দেবী অনুসুইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হলেন, সমস্ত কিছু শুনে। তিনি এই তিনকন্যাকে প্রথমদর্শন করেই এই সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি কি করবেন! তিন কন্যা নিজদের কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়েছে, তাঁদেরকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করতেই হবে, কিন্তু বাকি শিষ্যাদের কি তবে স্খলন অনিবার্য!

এই সমস্ত কিছু ভেবেও নিরুপায় হয়ে তিনকন্যাকে নিজের শিষ্যা করে নেন, এবং সমস্ত শিষ্যাদের সাথে সাথে শিক্ষা প্রদান শুরু করেন। সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, ইত্যাদির যেমন শিক্ষা প্রদান করেন, তেমনই সদাচার, সদ্ভাবনা এবং যোগের শিক্ষা প্রদান করতে থাকেন, এবং সমস্ত কিছুর মূল শিক্ষাই হয়, কামসংযমের শিক্ষা।

তিনকন্যা, মৃধা, মেধা ও মীনা ক্রমশই একাক তপস্বিনী হয়ে ওঠেন, এবং তাঁদের কামভাবনা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁদের নিজদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ক্রমে তাঁদের প্রতি সমস্ত শিষ্যারাও আকর্ষিত হতে থাকেন, এবং তাঁদের এই তিনকন্যা কেবলই কামনা, ক্রোধ, লিপ্সা, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য ত্যাগের বিষয়ে বলতে থাকেন । তাঁদেরকে তাঁদের এই দ্রুত সংযমের রহস্যের ভেদ করতে বললে, তাঁরা কেবলই ভয়শূন্যতা, দ্বেষশূন্যতা, হিংসাহীনতা, কুল ও শীল ত্যাগের কথা বলেন।

দেবী অনুসুইয়ার কাছেও সেই কথা পৌছায়। আর তা শুনতে শুনতে একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন, এবং একদিন এই তিন কন্যার প্রতি ক্রোধিত হয়ে ওঠেন, এবং এঁদের দর্শন অভিলাষী হয়ে এঁদের শাসন করতে উদ্যত হন । ... যেই সময়ে তিনি এই তিনকন্যার কাছে গমন করেন, তাঁরা তখন ঝিলে অর্ধ-অবগাহন করে স্নান করছিলেন। ... দেবী অনুসুইয়া এঁদের সম্মুখে এঁদেরকে শাসন করতে গেলেও, কেমন যেন অপদস্থ হয়ে যান।

অপরূপ কামভাব তাঁর মনের মধ্যে এমনই আঘাত করে যে তিনি তাঁর দীর্ঘ ১৫ বৎসরের ব্রহ্মচার্যের তপস্যার থেকে চ্যুত হয়ে যান। ... দীর্ঘকালের সংযমের পর, সেই সংযম যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তিনি প্রগলন্যায় হয়ে ওঠেন, এবং অসুস্থ হয়ে ওঠেন। ... গুরুমাতাকে এমন অসুস্থ অবস্থায় দেখে, তিনকন্যা নিজদের স্নানকে অর্ধসমাপ্ত রেখেই গুরুমাতার কাছে উঠে যান। তাঁকে আশ্রমকক্ষে নিয়ে গিয়ে, প্রায় একটি বৎসরব্যাপী সেবা করেন। ...

দেবী অনুসুইয়া এই একটিবৎসরে সুস্থ তো হয়ে ওঠেন, কিন্তু এই তিনকন্যার প্রতি স্পর্শে তিনি প্রতিমুহূর্তে নিজের ব্রহ্মচার্যকে স্খলিত হতে প্রত্যক্ষ করেন, এবং মনব্যাথায় কাতর হয়ে ওঠেন। ... গুরুভগিনীগণ তাঁদের গুরুমাতার এমন অবস্থার জন্য স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে এই তিনকন্যাই দায়ী, আর তাই এই তিনকন্যাকে আশ্রম থেকে বহিষ্কার করে দেন। ...

দেবী অনুসুইয়া প্রথমে এই সিদ্ধান্তে তুষ্ট থাকলেও, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই তিনকন্যার অনুপস্থিতির বেদনা অনুভব করেন। ... তাঁদের সেবার মধ্যে কনো প্রকার কামনা ছিলনা; তাঁদের স্পর্শের মধ্যে কনো প্রকার কামনাও যেমন ছিলনা, তেমন কামনার আবাহনও ছিলনা। ... সম্পূর্ণ পবিত্র এই তিনকন্যা। ... অপবিত্রতা তো আমাদের মনে, তাই আমরা ওদের সংস্পর্শে আসতেই, আমাদেরকে অপবিত্রতার সম্মুখীন হয়ে আমরা আমাদের ব্রহ্মচার্যের স্খলন ঘটাতাম। ...

এমন বিচার করে, তিনি স্বয়ং এই তিনকন্যার কাছে গমন করেন। বহু অনুসন্ধান করে, এই তিনকন্যার আলয়ের সন্ধান লাভ করেন। এবং সেখানে প্রবেশ করামাত্রই, তিনকন্যা দেবী অনুসুইয়াকে সাগ্রহে, মহানন্দে নিজদের গৃহান্তরে এনে স্থাপন করলেন। ... তিনকন্যারই নেত্র সজল, তাঁদের গুরুমাতার এমন করুন অবস্থায় তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতে পারছেন না, তাই বেদনায় কাতর।

দেবী অনুসুইয়া সমস্ত কিছু দেখে বললেন, "কি মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত তোমরা মা! ... প্রথম দিবস থেকে আমি তোমাদের সন্দেহের নেত্রে দেখেছি। ... যেই পরীক্ষায় তোমাদের আমি প্রেরণ করেছিলাম, সেই পরীক্ষায় তো পূর্ণ এক যুগের ব্রহ্মচার্যই সহন করতে

পারে, কিন্তু তোমরা ব্রহ্মচার্যের চর্চা বিনাই তা সহন করে এলে। ... এরপরে, তোমাদের দর্শন মাত্র সমস্ত আশ্রমের শিষ্যাদের মধ্যে ব্রহ্মচার্যস্খলনের যেই ভাবের উদ্বেগ হত, সেই ভাবকে তোমরা নিজেরাই ত্যাগ করালে। ...

তোমাদের দর্শন মাত্র, আমার দীর্ঘ ১৫ সনের ব্রহ্মচার্য নিমেষে ত্যাগ হয়ে গেল। ... তারপরেও তোমরা আমার প্রাণপণ সেবা করলে, পূর্ণ স্নেহ দ্বারা সেবা করলে। ... তারপরেও তোমাদের আমার শিষ্যারা অপমান করে বহিষ্কার করলো, এবং আমিও সেই বহিষ্কারের নেপথ্যে রইলাম। ... এতোকিছুর পরেও, তোমাদের গুরুমাতার প্রতি এমন স্নেহ কি করে?...

আর তো আমি গুরুমাতাও নেই, আমার নিজের ব্রহ্মচার্যেরই স্খলন হয়ে গেছে। ... এরপরে কি আমি সেই স্নেহ লাভ করার উপযুক্ত পাত্রী!" ... তিনকন্যা বললেন, "মাতা, আপনি মহাতপস্বী। কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মচার্যের শিক্ষাই ভুল দিচ্ছিলেন! ... কামসংযমের শিক্ষা ব্রহ্মচার্যের শিক্ষাই যে নয় মাতা! ... ব্যক্তি যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এবং অষ্টপাশের অধীনে স্থিত, ততক্ষণই যে তাঁর কাম সংযমিত থাকেনা! ...

দেহকামকে সংযমিত করতে হয়না মাতা; দেহকামভাব স্বতঃই সংযমিত হয়ে যায়, যদি ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়, রিপু ও পাশের থেকে মুক্ত হয়ে যান। আসলে মাতা, দেহকাম সংযমের বিষয় নয়, আহার নিদ্রা মৈথুনের একটি অঙ্গ তা, আর তা সকলের জন্য আবশ্যক, কারণ এতেই বংশবৃদ্ধি পায়। ... কিন্তু দেহকাম প্রায়শই বংশবৃদ্ধির কারণে নয়, ভোগসামগ্রী ও ভোগসামর্থ্য রূপে প্রসারিত হয় । ... কিন্তু মাতা, কেবল কামভাবকে সংযমিত করলেই যে এই ভোগভাব থেকে মুক্ত হতে কেউ পারেন না। ...

ভোগ ভাব আমাদের ইন্দ্রিয়ের থেকে আগত হয়; আমাদের রিপু সকল সেই ভোগভাবকে সুরক্ষিত করতে আক্রমণাত্মক করে তোলে আমাদের বুদ্ধিকে; আর আমাদের পাশ সকল সেই ভোগভাবকে সুরক্ষিত করতে রক্ষণাত্মক করে তোলে আমাদের বুদ্ধিকে । ... যদি এই বুদ্ধির ভোগভাবই সুরক্ষিত থাকে, তাহলে কামসংযম কি করে সম্ভব মাতা! ... তাই মাতা, শিক্ষা তো ইন্দ্রিয় সংযমের হওয়া উচিত, শিক্ষা তো রিপু ও পাশ দমনের হওয়া উচিত। এই দুইয়ের শিক্ষাই যে ব্যক্তিকে ভোগচিন্তা থেকে বিরত রাখে। আর এর ফলে যে কাম সংযম সহজাত ভাবেই উপস্থিত হয় মাতা!"

দেবী অনুসুইয়া লজ্জিত হয়ে বললেন, "আজ আমি একটি নয়, দুটি শিক্ষা লাভ করলাম কন্যারা। ... আর তার থেকেও বড় এক প্রাপ্তি হলো আমার। ... আজ আমি যেমন প্রকৃত ব্রহ্মচার্যের শিক্ষা লাভ করলাম, তেমনই শিখলাম যে গুরুর জ্ঞানলাভ সমাপ্ত হয়না। ... বরং গুরু হয়ে ওঠার পর, তাঁর জ্ঞানলাভ প্রকৃত অর্থে শুরু হয়। ... হ্যাঁ পুত্রী, আমি গুরু হয়ে অহংকারী হয়ে উঠেছিলাম, তাই এই সহজ সত্য উপলব্ধিই করতে পারিনি।

আমি আজ বুঝে গেছি সমস্ত কিছু। ... বুঝেগেছি, একজন অর্ধেক শিক্ষা লাভ করেন গুরু হয়ে ওঠার কারণে। গুরু হয়ে গেলে, তিনি তাঁর শিক্ষার বাকি অর্ধেক লাভ করেন। গুরু হবার শিক্ষা হলো শিক্ষালাভের মাত্র অর্ধেক; এবং গুরু হবার পরের শিক্ষা তাঁর জীবনের বাকি অর্ধেক শিক্ষা। ... আর পুত্রী, আজ আমার সর্বাধিক প্রাপ্তি হলো। ...

আমি অবিবাহিতা, অভাগা; কিন্তু এই অভাগিনী আজ, মাতৃসুখকে স্পষ্ট অনুভব করছে । ... আজ তাঁর মনে হচ্ছে, সে এই প্রথম মাতা হয়ে উঠেছে। ... পুত্রী, আমি ধন্য হয়েছি, তোমাদের শিষ্যারূপে লাভ করে, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি গুরু নই, আমি তোমাদের মাতা হতে পেরে ধন্য হয়েছি। ... আমার নিজের কন্যা তোমরা, আমার বাৎসল্য পানের জন্য তোমরা লালায়িত, কিন্তু তার থেকেও অধিক লালায়িত আমি তোমাদের আমার বাৎসল্য পান করানোর জন্য"।

তিনকন্যার মুখে আনন্দের ভাব সঞ্চারিত হলে, দেবী অনুসুইয়া বললেন, "মা, আমি অহংকারের সাথে তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য লালায়িত ছিলাম। কিন্তু লেশ মাত্র অহংকার থাকলে যে, তুমি সম্মুখে অবস্থান করলেও, তোমাকে সনাক্ত করতে দেয় না, তা তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে দিলে আজ। ... আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গ লাভ করি । আমার পূর্বেও বহু তপ ছিল, আর সেই তপের তেজের পুরস্কারেই আমি এতাবৎ তোমার সান্নিধ্য লাভ করে এসেছি। ...

কিন্তু আমার অহংকার ছিল যে, আমার গুরুবিদ্যার ফলে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গলাভ করাবেই। ... অহংকার মিথ্যা বই সত্য হয়না। ... তাই তুমি আমার পূর্বের তপফলের কারণে আমাকে তোমার সান্নিধ্য প্রদান তো করলে, কিন্তু আমি তোমার প্রতি সন্দিহান থেকে, তোমার সান্নিধ্যের আনন্দকে উপভোগ করতেই পারলাম না। ... আজ আমার গুরু হবার অহংকারকে তুমি চুরচুর করে দিলে। ... আর দেখ মা, আজ তোমার সান্নিধ্যকে আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করছি। ...

অহংকার মা, একমাত্র অহংকার, অর্থাৎ নিজের পৃথক অস্তিত্বের সম্মানের জন্যই মানুষ তোমার সান্নিধ্য লাভ করেও করেন না, কারণ সেই সান্নিধ্যকে তিনি উপলব্ধি করতে অক্ষম। ... মা, আজ তোমাকে তোমার অবতাররূপে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তার থেকেও অধিক, অনেক অধিক ইচ্ছা করছে, এবার তো তোমার সেবা করি। ... দিবারাত্র, নিজকে সম্পূর্ণরূপে প্রেমে নিয়জিত করে, তোমার সেবা করি, আর সেবা করতে করতে তোমাতে বিলীন হয়ে যাই। ...

তাই মা, আজ আমি তোমার অবতাররূপ দর্শন কামনা করবো না। ... যদি তা করে ফেলি, তবে যদি তোমাকে পুত্রী বলে মানতে ইচ্ছা না করে! পরিবর্তে যদি তোমার পুত্রী হয়ে, তোমার অনন্ত বাৎসল্যের স্বাদ নিতে ইচ্ছা জাগে! ... তাই মা, আজ আমি তোমাদেরকে আমার পুত্রীরূপে স্থিতা করে, আশ্রমের সকলের কাছে ব্রহ্মচার্যের প্রকৃত সত্য সম্মুখে রাখতে চাই। ...

আর সাথে সাথে এও বলতে চাই যে, গুরু হয়েছি বলে আমার শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়নি, আমার শিক্ষালাভ এক দ্বিতীয় চরণে উন্নীত হয়েছে"। তিনকন্যা একত্রিত হয়ে, এবার মাতা সর্বাম্বার রূপ ধারণ করে বললেন, "অনুসুইয়া, তুমি জানো? তোমার মাতৃত্ব দেখে আমি কতটা লালায়িত থাকি! ...

অনুসুইয়া, তোমার এই ইচ্ছা, অর্থাৎ আমার সঙ্গপ্রাপ্তির ইচ্ছার কারণে তুমি মোক্ষ থেকে চ্যুত ছিলেনা; গুরুর শিক্ষা লাভের প্রয়োজন নেই, এবং ব্রহ্মচার্য কেবল কামসংযমের উপায়; এই দুই ভ্রান্ত বোধের কারণেই তুমি মোক্ষ লাভ করতে পারো নি । ... আমি যদি তোমার কাছে একাকী আসতাম, তোমার তপতেজ আমাকে সনাক্ত করে নিত, আর তাই তোমার এই দুই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে পারতাম না অনুসুইয়া"।

দেবী অনুসুইয়া হেসে মাথা নেড়ে বললেন, "যে যত বড়ই মাতা হন, যত মাতৃত্বই অর্জন করে নিন মা, তোমার ন্যায় মাতা হবার সামর্থ্য, না তো কারুর ছিল, আর না কারুর পক্ষে তা ধারণ করা সম্ভব। ... সন্তানের উদ্ধারের জন্য, তুমি নিজের প্রতি অশ্লীল ভাবনাও ভাবাতে একটিবারের জন্যও দ্বিধা কর না। ... কি করে মা! ... আমিও একজন মা। কিন্তু আমিও ভেবে পাচ্ছিনা যে কি পরিমাণ সন্তানস্নেহ থাকলে, তবে এই পরিমাণ আত্মত্যাগ সম্ভব। ...

নিজের সুখত্যাগ করা যায়, নিজের সখ ত্যাগ করা যায়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করা যায়, কিন্তু নিজের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকেও ত্যাগ করা যায়! ... এই পরিমাণ বাৎসল্যরস, মা ... আজ আমি বড়ই দ্বন্দ্বে পতিত হয়ে আছি। ... আমি মাতা হবো না, পুত্রী হবো! ... তোমার মাতা হতে আজ আমার লজ্জা লাগছে। ... নিজের মাতৃত্বকে বড়ই তুচ্ছ মনে হচ্ছে আজ মা!

পূর্বে ত্রিদেবের জননী হয়েছিলাম আমি, কিন্তু তা আমার তপতেজের মাধ্যমে । আর সেই ক্ষণ থেকে আমার বড় অহংকার জন্ম নেয় যে আমি শ্রেষ্ঠ মাতা। সেই অহংকারের ফলে, এমনও ইচ্ছা জন্ম নেয় যে আমি ত্রিদেবীর মাতা হবো। আজ তুমি আমার সেই সাধ্কেও পুড়ন করে দিয়েছ। আমি বেশ বুঝে গেছি, মৃধা অন্যকেউ নন, স্বয়ং শ্রী; মেধা স্বয়ং সরস্বতী, এবং মীনা স্বয়ং আদিশক্তি। ...

কিন্তু বিড়ম্বনা দেখ মা, আজ আমার অহংকার আমার থেকে খসে গেছে! ... তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নিজের তপতেজকে ব্যবহার করেই আমি মাতা হয়েছিলাম ত্রিদেবের। কিন্তু মাতৃত্ব যে স্বয়ং একটি মহাসাধনা! ... মাতা যে সর্বক্ষণই মাতা । কন্যারূপেও তিনি মাতা, সখী রূপেও তিনি মাতা, গুরু রূপেও তিনি মাতা, শিষ্যা রূপেও তিনি মাতা, জননী বেশেও তিনি মাতা, ভগিনী বেশেও তিনি মাতা, আর এই সমস্ত মাতা একত্রিত হয়ে যায় যখন, তখনই তিনি প্রেমিকা বেশে স্থিতা।

সমস্ত অর্থে মাতৃত্বসাধন, এই তো প্রকৃত মাতৃত্ব। ... আমরা সতী হবার জন্য উঠে পরে লেগে থাকি, কিন্তু একটিবারের জন্যও ভাবিনা, স্বয়ং জগজ্জননী, যিনি তাঁর পতিকে অপার প্রেম করেন, তিনি কেন সতী নন । ... কেন তিনি সতী হয়ে স্বামীর আদেশের অপেক্ষায়

থাকেন না, কেন তিনি তাঁর স্বামীকেও সত্যপথে চালনা করতে পিছুপা হননা। ... আসলে মা, মাতৃত্ব যে অত্যন্তই বিশাল, ... সতী সেই মাতৃত্বের সামান্যতম অঙ্গও হতে সক্ষম নয়।

জননী ভাবেন তিনিই মাতা, কিন্তু মাতৃত্বের পালন তিনি করতেই পারেন না, কারণ তিনি মাতৃত্বের বাকি সমস্ত রূপকে স্তব্ধ করে দেন। ... কিন্তু তুমি কিরূপ মা! ... তুমি যে সকল বেশেই সম্পূর্ণ মা! ... একই সঙ্গে তুমি জননী, ভগিনী, কন্যা, সখী, প্রেমিকা, গুরু, আবার শিষ্যা! ... এই প্রবল মাতৃত্বের সকাশে! ... না মা! ... আজ আমি নিজকে এতটাই তুচ্ছ বোধ করছি, যে নিজকে খুঁজে তো পাচ্ছিই না, নিজকে খুঁজে পেতে ইচ্ছাও করছে না। ...

সদা সদা, তোমার মাতৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে ইচ্ছা করছে। ... বশ্যতা এক বন্ধন, এক মহাবন্ধন। কিন্তু সেই বশ্যতা স্বয়ং স্বয়ম্ভু, যিনিই এই কল্পনারসংসারের প্রণেতা, রক্ষক ও নাশক, অর্থাৎ যিনিই শিব, নারায়ণ, এবং ব্রহ্মা, তিনিও কেন তোমার বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে এতো পছন্দ করেন, আজ আমি তা বুঝতে তো পারছিনা, কেবল আন্দাজ করেই পুলকে আমার সমস্ত অস্তিত্ব শিহরিত হচ্ছে। ...

যেই বশ্যতা শক্তির প্রভাবে বিস্তারিত, সেই বন্ধন যেন কারাগারে নিক্ষেপ বোধ হয়; আবার যেই বশ্যতা শুদ্ধ মাতৃত্বের প্রেমের দ্বারা প্রসারিত, সেই বন্ধন স্বীকার করার অনুভব যেন অমৃতর সাগরে অবগাহনের ন্যায়। ... মা, এই সহজ সত্য কেন বুঝিনি এতকাল! ... এই সত্য তো কঠিন নয়! ... এর থেকে সহজ তো কিচ্ছুই হয়না! আহার করা, নিদ্রা যাওয়াও এর থেকে কঠিন কর্ম। আমার আত্ম আমাকে বিভিন্ন বেশে এই কথা বলেছিলেন। ...

আমার পুত্রসম হয়ে, দুর্বাসা বেশে যখন তিনি তাঁর মাতাকেই প্রেমের গুহ্য কথা বোঝাতে পারলেন না, তখন তিনি এক ক্রোধী ঋষি হয়ে উঠলেন। ... দত্তাত্রেয় তাঁর মাকে এই কথা বোঝাতে না পেরে বিবাদী হয়ে উঠলো। ... কিন্তু এই মূর্খা কিছুতেই বুঝতে পারলো না, এই বিশ্বসংসার কেবলই প্রেম থেকে জাত। ... সকল ব্রহ্মাণু স্বয়ং ব্রহ্মময়ীকে প্রেম অর্পণ করতেই, নিজদের অস্তিত্বকে ব্রহ্মমুক্ত অনুভব করেন, এবং এই জীবনরূপী যাত্রা করেন। ...

সেই প্রেম যে জীবের আচ্ছাদনে স্থিত হয়ে কলুষিত হয়ে যায়, স্বার্থপরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাই সেই আদিকারণ, অর্থাৎ তোমাকে প্রেম সে অর্পণ করতেই পারে না। ... মা, তুমি মহামায়া বেশে, পরানিয়তি বেশে, পরাচেতনা ব্রহ্মময়ী বেশে সদা সদা প্রতিটি জীবাণুর প্রেম অর্পণকে শুদ্ধ করার মার্গ দর্শন করো। অন্তে গিয়ে, তাঁর প্রেম শুদ্ধ হয়, আর সে তাঁর আদিকারণকে সিদ্ধ করে, পুনরায় জীবাণু থেকে ব্রহ্মাণু হয়ে যায়, এবং ব্রহ্মাণু সহজেই অনুভব করেন, সমসত্ত্ব ব্রহ্মের কনো অণুই সম্ভব নয়, কারণ ব্রহ্ম যে অভেদ্য, আর তখন ব্রহ্মে, অর্থাৎ তোমাতে পুনরায় বিলীন হয়ে, মহা-মহা মিলনান্দ ভোগ করে।

মা, এর থেকে সহজ সত্য আর কি সম্ভব! ... প্রেম অর্পণের কারণে এই বিশ্বসংসারের শুরু; প্রেমকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বোধ বিহীন করে শুদ্ধ করে তোলার জন্য এই জগত চলমান; আর প্রেম অর্পণ করেই মহামিলনের সাথে সাথে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাশ। ... এই তো সহজতম সত্য মা! ... এতে জটিলতা কোথায়! ... কিন্তু মা, যদি এতই সহজ হয় সমস্ত কিছু, যদি জটিলতার লেশ মাত্র তাতে না থাকে, তবে তা এতকাল ধরে বুঝতে পারলাম না কেন! ...

(সজল নয়নে) খুব আনন্দ হচ্ছে মা! আবার খুব কষ্ট হচ্ছে।... তোমার প্রতি প্রেম অর্পণ করতে পেরে খুব আনন্দ হচ্ছে, আবার খুব কষ্টও হচ্ছে। ... মনে হচ্ছে, আর তো কয়েকটা দিন, কতই বা প্রেম করতে পারবো! ... যদি এতকাল সেই প্রেমের অর্থ বুঝতাম, তবে আরো একটু বেশী প্রেম করতে পারতাম। ... ঋণী নয়, কৃতঘ্ন মনে হচ্ছে নিজেকে, ... এই অপার প্রেমকে পরিশোধ করার সামর্থ্য তো আমার নেই, কিন্তু সামান্য প্রেম করতে পারলাম না, এই গ্লানি হচ্ছে। ...

মা, আমার না আজ তোমার থেকে অনেক কিছু চাইতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু আবার, কি চাইবো, সেটাই বুঝে পাচ্ছিনা। ... কি বলবো তোমায়? আরো কিছুদিন আমাকে রেখে দাও, আমি তোমায় প্রেম করবো, সর্বপ্রেমিকাকে প্রেম করবো! ... কি করে প্রেম করবো তোমায় মা! ... তোমায় প্রেম করার সামর্থ্যই নেই আমার, যতই প্রেম করতে চেষ্টা করবো, ততই অনুভব করবো যেন আমি প্রেম করছি না, প্রেমকে আস্বাদন করছি। ...

কি চাইবো মা তবে! ... স্বার্থপরের মত বলবো, মা আরো কিছুদিন আমাকে তোমার প্রেম আস্বাদন করার সুযোগ দাও। ... নিজের অহংকারকে নিজে নিজে চূড়ান্ত অপমান করে বলবো, এতকাল যতই জগত আমাকে মহাজ্ঞানী বলুক, যতই আমাকে মহাসতী বলুক, ছিলাম আমি একজন মহামূর্খ। ... তাই নিজের মনের সঙ্কীর্ণতার আড়ালে থেকে, তোমার অপরিসীম প্রেমকে অনুভবই করতে পারিনি। ... আজ সেই অনন্ত প্রেমের স্বাদ পেয়ে, তোমার অব্যাক্ত প্রেমের ভাষা খোঁজার চেষ্টা করে যাবো, আর প্রতিমুহূর্তে ব্যর্থ হবার আনন্দে শিশুর মত লম্ফ করবো!

কি চাইবো মা? ইচ্ছা করছে তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাই... বিলীন হয়ে গিয়ে নিজের এই মিথ্যা প্রেমের নাটকের জবানিকা পতন ঘটাই; মন যেন বলছে, মিথ্যাই তুই প্রেম দানের শঠের ন্যায় প্রবচন দিচ্ছিস, প্রেম করার সামর্থ্যই নেই তোর। ... আবার পরের মুহূর্তে ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার থেকে একমুহূর্তের জন্যই আলাদা না হয়েও, আলাদা থাকি, আর আরো অধিক অধিক করে তোমার প্রেমকে অনুভব করি। ...

ইচ্ছা হচ্ছে মা, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থ রচনা করি, আর সেই গ্রন্থের পাতায় পাতায় তোমার অপার প্রেমের বিবরণ দিয়েও দেখাই যে তোমার প্রেমের বিবরণ দিতেই পারলাম না, আর এই ভাবে প্রমাণ করি যে তোমার প্রেমকে শব্দে ব্যাখ্যা অসম্ভব; আবার পরের মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সেই গ্রন্থই বা রচনা আমি কি করে করবো! ... সেই গ্রন্থের প্রতি শব্দই যে তুমি স্বয়ং... সেই গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষরে, প্রতিটি ভাবে যে তোমারই প্রেম প্রত্যক্ষ হবে। ...

কি যে চাই মা তোমার থেকে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না! ... প্রেম করতে চাই, তাতেও দেখি যে তোমার প্রেমকেই আস্বাদন করছি; প্রেম পেতে চাই, তাতেও যেন মনে হয়, আর কত ব্যাথা দিবি নিজের মা-কে, আর কতো পরিশ্রম করাবি তাঁকে! ... মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, কিছু চাইবার কি দরকার! ... এতকাল তো এটা সেটা চেয়েই এলি; না সেই চাওয়াতে তাঁর প্রেমের অব্যাক্তৃতা অনুভব করলি, আর না সেই অব্যাক্ত প্রেমের সামান্যও দিতে পারলি। ...

আবার পরের মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কিচ্ছু চাইবো না!... যদি না চাইবার জন্য, তোমাতে বিলীন হয়ে যাই; আর তো তখন তাঁর অপার প্রেমকে পৃথক করে অনুভবই করতে পারবোনা! ... মা, এ আমার কি অবস্থা! ... তোমার থেকে পৃথক থাকতেও কষ্ট হচ্ছে, আবার তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতেও কষ্ট হচ্ছে! ... মা এ আমার কি অবস্থা! ... মন যেন আমাকেই গালমন্দ করে বলছে, তুই পাগল হয়ে গেছিস; আবার পরের মুহূর্তে শিশুর মত আনন্দ করে সেই একই কথা বলছে, তুই পাগল হয়ে গেছিস!

ও মা! ... আমার শব্দকে বিরাম দাও মা! ... তুমি অব্যাক্ত, তোমার প্রেম অব্যাক্ত। শব্দ দিয়ে কি সেই প্রেমের ব্যাখ্যা সম্ভব! কিন্তু এই পাগল মেয়ে তোমার, অনর্গলি প্রগলের প্রলাপ করে চলেছে। ... এর যে প্রতি উচ্চারিত শব্দে, তোমারই শক্তিসঞ্চার হচ্ছে। ... তোমার হৃদয়তেই তা আঘাত করছে । ... আমি যেন জেনে বুঝেও কিচ্ছু করতে পারছিনা । ... আমার বাকশক্তিকে নিয়ে নাও মা। ... নাহলে অনর্গলি কথা বলে বলে, তোমার প্রেমকে এই মেয়ে হেলায় শব্দের মাধ্যমে অপচয় করবে"।

মাতা এবার সম্মুখে এসে, দেবী অনুসুইয়াকে প্রবল আবেগে আলিঙ্গন করলে, দেবী অনুসুইয়া যেন সর্বাঙ্গে পুলক অনুভব করে পুনরায় বলতে থাকলেন, "কোথায় লাগে রমণসুখ! ... কোথায় লাগে সন্তানসুখ! ... এমন কোন্ সুখ আছে জগতে, যা এই আলিঙ্গনের থেকেও অধিক রোমাঞ্চ দিতে সক্ষম। ... ও মা, এই রোমাঞ্চ কি সদা সদা থাকবে আমার সাথে! ... যদি থাকে, তবে আমি আমার এই মিথ্যা 'আমি'টাকে রেখে দিতে চাই। ... আর তা না হলে, এই মিথ্যা 'আমি'র কনো প্রয়োজন নেই। ...

এই রোমাঞ্চলাভের পর যে আহারসুখ, নিদ্রাসুখ, মৈথুনসুখ, সমস্তপ্রকার সুখ তুচ্ছই নয়, তৃণবৎই নয়, তাদের অস্তিত্বই মিথ্যা মনে হচ্ছে। ... ও মা বলো না!" ... মাতা আলিঙ্গনরত অবস্থায় বললেন, "চুপ চুপ অনুসুইয়া! ... শিশু হয়ে গেছ তুমি! ... সম্পূর্ণ শিশু হয়ে গেছ। ... তোমার শিষ্যারা এই অবস্থায় তোমায় দেখলে কি ভাববে! ... ভাববে তাঁদের গুরুর মতিভ্রম হয়েছে!"

দেবী অনুসুইয়ার যেন নিজের প্রতি কনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শিশুর সুরেই বলতে থাকলেন, "সাখ্যাত পরমসত্য, সাখ্যাত পরব্রহ্ম, স্বয়ম্ভুরূপ ধারণ করে তোমার এই প্রেমে শিশু হয়ে থাকেন, তা আমি তো এক মিথ্যা অস্তিত্ব মা! ... যে যা ভাববে ভাবুক, আর কনো ভয় নেই মনে; আজ সত্যই আমার আত্মার প্রতিটি ভাবকে অনুভব করছি। তাঁর প্রতিটি শব্দের গভীর তাৎপর্যকে অনুভব করছি মা। ...

না আছে সম্মানের মোহ, না আছে অপমানের ভয়; না আছে আসক্তি, না আছে বিরক্তি; না আছে ইচ্ছা, না আছে অনিচ্ছা, না আছে কামনা, না আছে নিষ্কামের ভাবনা; ... মা, মাগো... আজ আমি মুক্ত, ... হ্যাঁ মা, আমি মুক্ত, আমি আমার মিথ্যা 'আমি'র থেকে

মুক্ত। ... তাই তো এই 'আমি'কে, কে মান দিলো, কে তিরস্কার করলো, তার কনো বোধ নেই; এই আমি রইলো না অবলুপ্ত হলো, তারও কনো বোধ নেই; অবাঞ্ছিত হয়ে গেছে এই আমি"।

মা এবার দেবী অনুসুইয়ার মুখকে নিজের কোমল হস্তদ্বারা বন্ধ করে বললেন, "হয়েছে অণু, অনেক বলেছ। এবার একটু এই মায়ের বক্ষে স্থির হয়ে থাকো তো"। ... দেবী অনুসুইয়া জানেন না, তিনি কতক্ষণ সেই স্থির অবস্থায় রইলেন। তাঁর মনে হলো কিছুক্ষণই মাত্র ছিলেন সেই অবস্থায়। ... তাঁর শিষ্যারা তাঁদের গুরুর সন্ধান করতে করতে এসে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে স্পর্শ করতেই, তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন আর দেখলেন, দেবী মৃধা, মেধা ও মীনা, তাঁকে সন্তানের ন্যায় আঁকরে ধরে রয়েছেন।

সেই অনুভবে, তিনি পুনরায় তিনকন্যাকে নিজের প্রাণের সমস্ত প্রেমশক্তিদ্বারা আলিঙ্গন করলেন। অনুসুইয়া শিষ্যারা বললেন, "মাতা, আপনি এই কক্ষে একটি আমাবস্যায় প্রবেশ করেছিলেন, আর আজ যে দেখুন পূর্ণিমার রাত্রির জ্যোৎস্না আপনার অঙ্গে পরছে!"... দেবী অনুসুইয়া হেসে শিষ্যাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সেটাই তো স্বাভাবিক পুত্রী, এই সমস্ত সময়টাও যে পূর্ণতার সময় ছিল, শুক্লাপক্ষের সময় ছিল"।

দেবী অনুসুইয়া হেসে তিনকন্যার উদ্দেশ্যে বললেন, "এই পুত্রীরূপ মাতার সেবা করবে তো তোমরা!" ... ত্রিদেবী শিশুকন্যার মত মাথাকে বারেবারে নেড়ে "হ্যাঁ" বললে, দেবী অনুসুইয়া বললেন, "চলো তবে আমার সাথে, আমি তো সেবার অভিনয় করবো মাত্র, প্রকৃত সেবা তো তোমরাই করবে। ... তা তোমাদের প্রেমে আমাকে আমার অস্তিত্বের শেষ কিছুদিন ডুবিয়ে রেখে দেবে চলো"। ...

সকল শিষ্যাদের সাথে দেবী অনুসুইয়া নিজআশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেই সময়ের পরেও প্রায় ১২ সন তিনি দেহধরে ছিলেন। আর সেই দেহ ধারণের অবস্থায় তিনি সকল শিষ্যাকে দিব্যপ্রেমের কথাই কেবল বলে গেলেন। ... সকলসময়ে সকলকে বলে গেলেন, "প্রেমের কারণেই জগতের রচনা, প্রেমকে শুদ্ধ করার জন্যই জগতের চালনা, এবং প্রেম শুদ্ধ হয়ে গেলেই জগতের লয় হয়" ...

একটিবারের জন্যও তিনি এই ১২ বৎসরে ব্রহ্মচার্যের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। ... কিন্তু এই ১২ বৎসরের শেষে যখন তিনি ও ত্রিদেবী একত্রে বিলীন হয়ে গেলেন, তখন তাঁর সকল শিষ্যারা অনুভব করলেন যে, তাঁরা এমন ভাবেই ব্রহ্মচারিণী হয়ে উঠেছেন যেন, কেবল তাঁদের এই দেহে নয়, আগামী সকল দেহেই তাঁরা ব্রহ্মচারিণী থাকবেন । ... আর তা উপলব্ধি করে, তাঁরা তাঁদের গুরুমাতার আশ্রমকে পীঠস্থান করে, দিকে দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকলেন।

সর্বদিশায় তাঁরা ব্রহ্মচার্যের অভ্যাসের জন্য দিব্যপ্রেমকেই স্থাপন করলেন, আর জগতকে বললেন, ব্রহ্মচার্যের অভ্যাস নয়, দিব্যপ্রেমই ব্রহ্মচারী নির্মাণ করে। ... আর এইভাবে, জম্বুদ্বীপে দিব্যপ্রেমের এক নবহিল্লোলের সঞ্চার হয়, আর তারই সাথে দেবী অনুসুইয়াকে জম্বুদ্বীপের সমস্ত মানুষ এক প্রেমের দেবী রূপে চিহ্নিত করেন"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন দেখলেন, তাঁর কন্যার নেত্রে প্রেমাশ্রু আর সে প্রেমের কথা শুনে বাক্যহারা। তাই তিনি পরবর্তী অর্থাৎ মাতার অষ্টম অবতারের কথায় চলে গেলেন।

তপস্বিনী অধ্যায়

ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, এবার মাতার অষ্টম অবতারের কথা শোনো । ঋষি জমদাগ্নি, ঋষি গৌতম, ঋষি ভৃগু অন্যান্য কিছু ঋষিদের সন্তানন্যায় ধারণ করে, একটি আশ্রমে নিবাস করছিলেন সেই কালে। প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান আহরণ করে, সকলে মহাতপে লীন হন তাঁরা। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তপে লীন থাকার পর, তাঁরা যখন তপাসন ত্যাগ করলেন, ততদিনে তাঁদের তপতেজ সম্পূর্ণ আশ্রমকে উষ্মাময় করে তুলেছে।

তপাগ্নিতে তপ্ত হয়ে, তাঁরা কৃতান্তের সন্ধান পান, এবং সেই কৃতান্তের অবস্থান কোথায় সেই সন্ধান কে দিতে পারেন, তাঁর সন্ধানও লাভ করেন। পূর্বদিশায়, এক বনাঞ্চলের পারে, নদীতটে এক ঋষিকন্যার নিবাস। তিনিই কৃতান্তের অবস্থান সম্বন্ধে জানেন । তপভাব থেকে ঋষিগণ এই সত্য জেনে, সেই ঋষিকন্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন । তপশক্তির প্রভাবে সেই কন্যার নিকট উপস্থিত হতে ঋষিগণদের অধিক সময় লাগেনা। ...

কিন্তু সেই নদীতটে যাত্রা করার শেষে, তাঁরা কিছুতেই আর কনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কনো ভাবে সেই কন্যার অবস্থানকে অবলোকন করতে পারছিলেন না। ... এমত দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়, তাঁরা এক গৃহবধূকে নদীতটে উপস্থিত হয়ে কলসে জল ভরতে দেখেন। ঋষিগণ সেই কন্যার কাছে উপস্থিত হতে, গৃহবধূ সম্রদ্ধ ঋষিগণদের প্রণাম করলেন।

ঋষিগণ সেই গৃহবধূর উদ্দেশ্যে বললেন, "হে দেবী, এখানে এক ঋষিকন্যার নিবাস বলে আমরা জানতাম। জানবেন, তাঁর সাথে আমাদের সাখ্যাত করা অত্যন্ত আবশ্যক । তাই কৃপা করে আমাদেরকে সেই ব্রাহ্মণীর নিবাসস্থান কোথায়, একটু যদি বলে দেন" । ... গৃহবধূ বিনম্রতার সাথে বললেন, "ঋষিবর, আপনারা কি দেবী তাপসীর কথা বলছেন! ... তিনি তো মহাতপস্বিনী। ... আমি তাঁর আশ্রম আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারি। ... কিন্তু...!"

ঋষি জমদাগ্নি প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কি দেবী?" ... গৃহবধূ বললেন, "ঋষিবর, আমরা সকলে শুনেছি, তাঁর নিকট তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কনো তপস্বীই উপস্থিত হতে পারেন। ... তাই ...!" ... ঋষি ভৃগু ও ঋষি গৌতম একত্রে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন দেবী, আমরা তপস্যার গুনেই তাঁর অবস্থানের সন্ধান লাভ করেছি। ... তাই নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছাতে পারবো"।

গৃহবধূ বললেন, "সে তো উত্তম কথা ঋষিগণ। ... আমার সাথে আসুন আপনারা । ... আমি আপনাদের তাঁর কুটিরের সম্মুখে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি" । ... ঋষিগণ খুশী হয়ে গৃহবধূর সাথে যাত্রা করলেন, এবং পথে বহুবিধ প্রশ্ন করলেন দেবী তাপসীর সম্বন্ধে। ঋষি জমদাগ্নি প্রশ্ন করলেন, "এমন অদ্ভুত তপশক্তির কথা আমরা কনোদিন শুনিনি দেবী! ... তিনি না চাইলে, কনো তপস্বিনী তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারবেন না!"

গৃহবধূ বললেন, "হ্যাঁ ঋষিবর, আমরা সকলেই তাঁর কুটির দেখতে পাই, কিন্তু তাঁর কুটিরে উপস্থিত হতে পারিনা। ... তিনি নিজ থেকে আমাদের সাথে আলাপ করতে এলে, তবেই আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হই" । ... ঋষি ভৃগু বললেন, "তা তিনি কত বৎসর ব্যাপী তপ করেছেন?" ... গৃহবধূ বললেন, "ঋষিবর, তা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় । ... তবে লোকমুখে শুনেছি, তিনি এক বিচিত্র তপ করেছেন। ... কিন্তু প্রভু, আমি এই গ্রামেই বেড়ে উঠেছি, আমি কিন্তু তাঁকে কনোদিন তপস্যা করতে দেখিনি" ।

ঋষি গৌতম বললেন, "উনার গৃহে কে কে আছেন, তা জানা আছে আপনার?" ... গৃহবধূ বললেন, "হ্যাঁ, তিনি ও তাঁর স্বামী। ... দুইজনেই তপস্বী। আর দুইজনকেই বিশেষ একটা কুটিরের বাহিরে দেখা যায়না। ... উনার পিতা যখন দেহত্যাগ করেন তখন দেবী তাপসীর বয়স ১২। সেই সময় থেকেই উনার পিতার প্রিয়শিষ্য দেবীর দেখাশুনা করতেন। ... পরে তিনিই দেবী তাপসীকে বিবাহ করেন। সন্তানাদি নেই তাঁদের কোন"।

ঋষি জমদাগ্নি বললেন, "আচ্ছা দেবী, আপনি কি জানেন, উনাদের বিশেষত্ব কিছু আছে কিনা!" ... গৃহবধূ বললেন, "শুনেছি ঋষিবর। দেবী তাপসীর পিতা একজন মহান ঋষি ছিলেন। তিনি তপোবলে মহামান্য (অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে) কৃতান্তের সন্ধান লাভ করেন। ... আর তা লাভ করার পর, তিনি সেই কৃতান্তের অধ্যায়নও করেন। ... শুনেছি যে, দেবী তাপসী সেই কৃতান্তের সন্ধান জানেন"।

গৃহবধূর কথা শুনে, ঋষিগণ বেশ বুঝতে পারেন যে তাঁরা সঠিক স্থানে উপস্থিত হয়েছেন। তাই খুশী খুশী গৃহবধূকে অনুসরণ করেন। গৃহবধূ, একটি ছোট্ট কুটিরের সম্মুখে ঋষিগণদের এনে স্থির করলে, ঋষিগণ গৃহবধূকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সেই কুটিরে প্রবেশ করতে গেলেন। কিন্তু একে একে সমস্ত ঋষিগণ সেই কুটিরে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হলে, কেউই প্রবেশে সক্ষম হননা। ...

এক অদ্ভুত উর্জ্জা তাঁদের সকলকে প্রতিহত করে দিচ্ছে দেখে, সকল ঋষিগণ একত্রে প্রবেশের চেষ্টা করলে, একত্রে সকলে কুটিরের দ্বারের সম্মুখে আছাড় খেয়ে পতিত হলেন। ... গৃহবধূ তা দেখে, হন্তদন্ত হয়ে ঋষিদের সহযোগিতা প্রদান করে বললেন, "দেখলেন তো ঋষিগণ, আপনাদের বলেছিলাম। উনার তপতেজ এমনই যে কেবল মাত্র উনি যাকে কুটিরে নিয়ে আসেন, তিনিই প্রবেশ করতে পারেন। ... আপনারা আসুন, আমার সাথে আমার গৃহে আসুন। ...

আপনাদের ব্যাথা লেগেছে, আমার পতিদেব একজন বৈদ্য। তিনি আপনাদের সুস্থ করে দেবেন । ঋষিগণদের বুদ্ধিতে কিছুতেই প্রবেশ করে না, কেন তাঁরা প্রবেশ করতে পারলেন না কুটিরে। ... তাঁরা মহান তপস্বী, কিন্তু তাঁরা প্রবেশ করতে পারলেন না! ... এমন কি তপ করেছেন এই দেবী তাপসী!.. যেটাই হোক, ব্যাথা তাঁরা যথাযথ পেয়েছেন। তাই গৃহবধূর সাথে তাঁর কুটিরে গেলে, গৃহবধূ তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন, "নাথ, ইনারা কিছু ঋষিগণ। ...

ইনারা দেবী তাপসীর গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে ভূমিতে পতিত হয়ে ব্যাথা পেয়েছেন। ... আপনি ইনাদের একটু শুশ্রূষা করে দিন নাথ"। ... গৃহবধূ যেমনই অসাধারণ সুন্দরী, তেমন তাঁর পতিদেবও একজন সুপুরুষ ব্যক্তি । চেহারা দেখে বোঝা যায় তাঁর যে, তিনি না তো কনো ব্যামবীর, আর না কনো কৃষক। ... তিনি যে একজন দৈবগুণসম্পন্ন ব্যক্তি, তা তাঁর চেহারায় প্রত্যক্ষ হয়। ... ঋষিগণদের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের পরীক্ষণ করে তিনি কিছু ভেষজপত্র নিয়ে এসে সেই সকলকে লেপে পরিণত করে, ঋষিগণদের ক্ষতস্থানে সেই লেপ লাগিয়ে দিলেন।

সমস্ত কিছুর পরে তিনি বললেন, "ঋষিগণ, চিন্তার কিছু নেই। ... এই দুইদিন মত ক্ষতস্থানে এই লেপ লাগালেই আঘাত ঠিক হয়ে যাবে। ... আপনারা বিশ্রাম নিন"। ... ঋষি জমদাগ্নি বললেন, "মহাশয়, আপনি কি দেবী তাপসীর তপের ব্যাপারে কিছু জানেন!" ... সেই বৈদ্য হেসে বললেন, "ঋষিবর, দেবী তাপসীর পিতা আমার গুরু ছিলেন। ... উনি বনে বনে ঘুরে ঘুরে ওষধির সন্ধান করতেন। ধ্যানের দ্বারা তিনি নিজের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরীক্ষণ করতেন, এবং উদ্ভিদের সন্ধান করতেন, যা সেই অঙ্গকে সুস্থির করতে পারে। ...

আর সেই উদ্ভিদের সন্ধান করে, তিনি বনে বনে গমন করে সেই উদ্ভিদ নিয়ে এসে বৈদ্যের কর্ম করতেন । ... ঋষিবর, এই গ্রামে একটিবার ভূমিকম্প হয়, আর সেই ভূমিকম্পের ফলে বহুমানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হন, আবার ভূমির থেকে নিঃসৃত উর্জ্জার ফলে রোগগ্রস্তও হন। ... সেই সকলকে তিনি চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলেন। ... আর তাঁর কন্যা, দেবী তাপসী সেই সকল মানুষের সেবা করেছিলেন।

যে যখন তাঁর পিতার কাছে যেতেন, তাঁর পিতা যেমন তাঁকে ওষধি প্রদান করতেন, তেমন দেবী তাপসী তাঁর সেবা করতেন। ... আহার, নিদ্রা, কনো কিছুই তাঁর কাছে কনো কিছু ছিল না। একমাত্র লোকসেবা করাই তাঁর কাছে সমস্ত কিছু ছিল । ... কিছুদিনের মধ্যে ঋষিবর, অর্থাৎ আমার গুরু, বয়সকালে অত্যধিক পরিশ্রম করার জন্য দুর্বল হয়ে দেহত্যাগ করেন। ... কিন্তু তিনি অন্তিম বয়সে একটি ব্যাপার অনুধাবন করেন।

তা অনুধাবন করে, তিনি পূর্বে যাত্রা করে, মহামান্য কৃতান্তকে ধারণ করেন, এবং তা এই গ্রামে নিয়ে আসেন। দেবী তাপসীর কাছে তিনি সেই মহাগ্রন্থ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দিয়ে বলেন, "পুত্রী, গ্রামের মানুষের অনাচারের কারণেই এই স্থানে ভূমিকম্প হয়েছিল। আর এই অনাচারের একটিই কারণ, আর তা হলো অজ্ঞানতা। ... পুত্রী, এই মহাদিব্যগ্রন্থ এক চমৎকারী গ্রন্থ। ...

এর অন্তরে যেই উর্জ্জা শক্তি সঞ্চিত আছে, তা সমস্ত গ্রামকে সুরক্ষিত করতে পারে। ... পূর্বে, এই মহাগ্রন্থ সাগরের গ্রাসকে প্রতিহত করেছিল। ... কিন্তু স্মরণ রেখো পুত্রী, এই গ্রন্থের নির্যাশ তুমি সকল গ্রামবাসীকে বিবরণ প্রদান করবে। ... এই গ্রন্থের উর্জ্জাশক্তিকে ধারণ করার সামর্থ্য সকলের নেই। মহাতপ না থাকলে, এই গ্রন্থের উর্জ্জাশক্তি সেই ব্যক্তিকে, যিনি এই গ্রন্থকে ধারণ করবেন, তাঁকে তাঁর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকল্পনাসহ বিনষ্ট করে দেবে। ...

তাই, এই গ্রন্থকে তুমি ধারণ করে, এমন স্থানে গচ্ছিত রাখো, যেই স্থানে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। ... আর তুমি এই গ্রন্থের নির্যাশ সকলকে বিবৃত করে শুনিয়ে, সকলকে উন্নীত করে তুলবে। এই হবে তোমার তপস্যা, জেনে রেখো, এই তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত"। ... ঋষিবর, দেবী তাপসী তাই তাই করেছিলেন, যা ঋষিবর তাঁকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিলেন।

তিনি নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দেন, সমস্ত গ্রামবাসীকে কৃতান্তের সার বিবৃত করতে। যেই ব্যক্তি যখন যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন, তিনি সেই সেই অবস্থায়, নিজের সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে, তাঁকে সহযোগ করতেন, এবং উন্নীত করতেন। এখনো তিনি প্রতি ৭ দিন পরে পরে সকলকে একত্রিত করে কৃতান্ত মহাকথা শ্রবণ করান, এবং সকলকে উন্নীত করে তোলেন। ...

কিন্তু এই নিরন্তর সেবাদানের পর থেকে তাঁর মধ্যে প্রবল উর্জ্জাস্রোত দেখতে পাওয়া যায়। সেই তেজ এমনই যে তাঁকে স্পর্শ করা তো দুরের কথা, তাঁর কাছেও তারা উপস্থিত হতে পারেন না, যাকে তিনি উপস্থিত হতে অনুমতি প্রদান করেন নি । ... তবে ঋষিবর ভাববেন না, তিনি নিজের তপতেজে অহংকারী; তিনি সকলের সাথে মেশেন, সকলের সাথে আনন্দে থাকেন। ... আর তিনি অত্যন্ত সরল এবং সাদাসিধা। ... যে যা বলেন তাঁকে, তিনি তাই বিশ্বাস করেন। ...

যে যা কিছু নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়, তিনি তাই গ্রহণ করেন। না তো তিনি কারুকে কনো কিছু থেকে প্রতিরোধ করেন, আর না কারুর প্রতি তিনি আসক্ত বা বিরক্ত। ... সদাহাস্যমুখ তিনি, এবং প্রবল তপের তেজে অপরিসীম সুন্দরী তিনি। গ্রামবাসী বলেন, উনার বুদ্ধি নামক বস্তুটিই নেই, তাই উনি কনো কিছুর বিচার করেন না। ... কিন্তু না ঋষিবর, আমি তাঁকে চিনি। ... তাঁর প্রজ্ঞা অদ্ভুত। ... তাঁর মুখে সদা সত্যবাণী, এবং তাঁর জীবনযাপনে সদাই সত্যের প্রতিবিম্বতা প্রতিফলিত হয়।

হ্যাঁ, যা কিছু অনিত্য, সেই বিষিয়ে উনি যৎসামান্যও মাথা ঘামান না। ... কিন্তু তা বলে, সেই সমস্ত কিছুর প্রতি তিনি যে বিরক্ত তাও নয়। তাঁর আহারে কনো কিছুর প্রতি না নেই, যে যা দেন তাঁকে স্নেহ করে, তিনি তাই মহানন্দে গ্রহণ করেন, পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে। ... সামান্য জলও গ্রহণ করেন, তাও মহানন্দে গ্রহণ করেন। ... অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব তিনি। যেন সাখ্যাত পরমেশ্বরী তিনি"।

ঋষিগণ এই কথা শুনে কিছুটা মানসিক ভাবে আঘাতপ্রাপ্তই হচ্ছিলেন। যেন তাঁদের আত্মগরিমা এই কথায় বিঘ্নিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁরা নির্বাক হয়ে সমস্ত কথা শুনছিলেন। কিন্তু এই অন্তিম কথা, অর্থাৎ দেবী তাপসী যেন সাখ্যাত পরমেশ্বরী, সেই কথায় তাঁরা যেন অতিজ্বলমান হয়ে উঠলেন। ... ঋষি গৌতম বললেন, "তাঁর সাথে সাখ্যাত করার উপায় কি মহাশয়!" ...

বৈদ্যমহারাজ বললেন, "আজ্ঞে ঋষিবর, আর দুইদিন পরেই দ্বিপ্রহরের শেষে সূর্যাস্তের পরেই, তিনি সমস্ত গ্রামবাসীকে একত্রিত করে কৃতান্ত কথার জন্য বসবেন ।... সেই সময়ে, তাঁর সাখ্যাত করতে পারবেন আপনারা"।... ঋষি ভৃগু বললেন, "আচ্ছা বদ্যিমহারাজ, তাঁর পতির ব্যাপারে কিছু বললেন না তো!" ... বৈদ্যমহারাজ হেসে বলতে গেলেন, "তিনি একজন সাধারণ..."।... গৃহবধূ আহারের ব্যবস্থা করে অন্তরে প্রবেশ করে বললেন, "ঋষিগণ একটু আহার গ্রহণ করে নিন প্রথমে"।...

ঋষিগণ আহারের জন্য ধৌতকর্ম করে ফলাহারে বসলে, গৃহবধূ বললেন, "দেবী তাপসীর পতিও একজন মহা তাপস।... দেবী তাপসীর গুরুর প্রিয়শিষ্য ছিলেন তিনি।... উনার গুরুই উনার কন্যার ভার, তাঁর প্রিয়শিষ্যের হাতে ছেড়ে দেন।... দেবী তাপসীর তপতেজ যখন অন্তিম অবস্থায় পৌছায়, তখন তাঁর কাছে কেউ স্বাভাবিক ভাবে পোঁছাতে পারতেন না ।তাই সর্বক্ষণ তাঁর সাথে থাকার উদ্দেশ্যে তাপস, দেবী তাপসীকে বিবাহ করেন।...

দেবী তাপসীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি, এবং পত্নী হলেও, কন্যার মত করে যত্নে রাখেন।... ঋষিগণ আপনারা আর দুইদিন এখানে থেকে যাননা। তাহলে তো দেবী তাপসী, তাঁর পতিদেব তাপসকে সচক্ষে দেখতে পাবেন, এমনকি আলাপও করতে পারবেন। ... আর তিনি যদি আপনাদের তাঁর কুটিরে যেতে বলেন, তবে আপনারা তাঁদের কুটিরে প্রবেশও করতে পারবেন"।

ঋষিগণ মনে মনে তৃপ্ত হলেন সেই কথা শুনে, কিন্তু তাঁদের মনের মধ্যে চলতে থাকে একটিই কথা।... নিশ্চয়ই কৃতান্তের তেজেই এই বল লাভ হয়েছে দেবী তাপসীর। না হলে, এমন কনো তপ নেই, যা এমন শক্তি প্রদান করতে পারে কারুকে ।... একবার এই বিষয়কে পরখ করে দেখে নিতে হবে।... এই ভাবনা নিয়ে বৈদ্যরাজ এবং গৃহবধূর সেবা গ্রহণ করে দুইদিবস তাঁদের কুটিরেই নিবাস করলেন ঋষিগণ।

অন্তে সেইদিবস আসে, যেই দিবসে, দেবী তাপসী সকলগ্রামবাসীকে একত্রে কৃতান্ত মহিমার বিবরণ প্রদান করেন।... ঋষিগণ সকলের অলক্ষ্যে থাকার উদ্দেশ্যে, সবার পিছনে আসন গ্রহণ করলেন।... তাঁরা দেখলেন এক অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী, তাঁর সুপুরুষ পতির সহযোগে গ্রামবাসীর সম্মুখে একটি পিপল বৃক্ষের নিম্নে উপনীত হয়ে সকলকে সম্ভাষণ করলেন।...

অনেকটাই দূরে অবিস্থান করছিলেন ঋষিগণ, তাই দেবী তাপসীকে ঠিক কেমন দেখতে তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না, তবে একদৃষ্টে তিনি যে একজন অপরূপা সুন্দরী, তা বেশ বুঝতে পারলেন ।... প্রথমে তাঁরা দেখলেন, দেবী তাপসী সকলের সাথে হেসে আনন্দের সাথে কথা বলছেন।... সেই কথা চলতে চলতে, প্রস্তাবিত হয়, তপস্যার কথা।... আর সেই সূত্রেই দেবী তাপসী কিছু বলা শুরু করেন।

তিনি বলেন, "মহামান্য কৃতান্ত সমস্ত অন্য ধর্মগ্রন্থের থেকে ভিন্ন। এখানে আলঙ্কারিক ভাবে নয়, স্পষ্ট ভাবেই সমস্ত কথা বলা আছে।... তপ সম্বন্ধে এখানে বলা আছে যে, তা তপই নয়, তপের একটি অংশ মাত্র, যা একস্থানে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ধ্যানাসনে

উপনীত হতে বলে। ... কৃতান্ত তপ সম্বন্ধে এই বলে যে, তপ অনুক্ষণ চলতে হয়, আর তপের উদ্দেশ্যই হলো পঞ্চভূতের থেকে মুক্তি । ...

আমরা সকলেই কল্পনার প্রকাশ, নিজরাই নিজদের কল্পনা আমরা। নিজরা নিজদের কল্পনা হলে, এই দেহ আমাদেরই কল্পনা, কিন্তু সেই কল্পনার মধ্যে আমাদের স্বরূপ অর্থাৎ কল্পনাকারী অবশ্যই স্থিত থাকবে, আর তা থাকেও আত্মা বা স্বয়ম্ভু রূপে। ... এই আত্মা হলেন স্বয়ং ব্রহ্মাণু, কিন্তু তা কল্পনার বাদলে ঢাকা থাকে, তাই তাকে অনুভব করা যায়না। ... তাঁকে অনুভব করতে হলে, সমস্ত কল্পনাকে অপসারিত করতে হয়। ... কিন্তু তা সম্ভব কি উপায়ে?

তা সম্ভব করতে হলে, কল্পনার প্রসারককে আমাদের অনুভব করতে হয়। ... আমরা কনো একটি বস্তুকে যদি সজ্জিত করি, তবে যাকে সজ্জিত করি, তাকে অন্তরে রাখি, এবং তার উপর সমস্ত সাজের প্রলেপ অর্পণ করতে থাকি। কিন্তু সেই সমস্ত সাজেরও একটি খুঁটি থাকে। আর তাই সেই সাজকে অপসারিত করে আসল তত্ত্বকে ধারণা করতে হলে, আমাদের সেই খুঁটিকে খুঁজে বার করে, তাকে অপসারিত করতে হয়।

তেমনই আমাদের এই কল্পজীবনের খুঁটি হলো আমাদের এই বুদ্ধি। এই বুদ্ধির কাছেই সমস্ত কল্পনার সমস্ত তথ্য, যাকে স্মৃতি বলা হয়, তা সঞ্চিত থাকে । ... আর সেই বুদ্ধিই আমাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রেখে দেয়। বুদ্ধিরূপ বাদলের অন্তরাল থেকে যেইটুকু আত্মাকে আমরা অনুভব করতে পারি, আমরা তাঁকে বলি মন বা মানস । আর তপ হলো, এই বাদল আচ্ছাদিত আত্মাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার উপায়।

অর্থাৎ, কৃতান্ত স্পষ্ট ভাবেই বিবরণ প্রদান করছে যে তপ হলো বুদ্ধির থেকে আমাদের নিজদেরকে মুক্ত করা, কারণ তা সম্ভব হলে, তবেই আমরা আমাদের স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবো। ... কিন্তু এবার প্রসঙ্গ এই যে বুদ্ধিকে অপসারিত করবো কি উপায়ে? ... আমরা এই ধারণা রাখি যে, এই বুদ্ধির কারণেই আমরা সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে পারি, সমস্ত কিছুকে বুঝতে পারি, ইত্যাদি। ...

কিন্তু বাস্তব এর ঠিক বিপরীত । বুদ্ধি আমাদেরকে সত্য নয়, অসত্যের সাথে পরিচিত করে। সত্য ইন্দ্রিয়াতীত, কিন্তু বুদ্ধি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, সেই সকলকেই বিশ্বাস করায়, এবং আমাদের কল্পনার আঙ্গিনায় স্থিত রেখে ভ্রমিত করতে থাকে। ... কিন্তু এই বুদ্ধির থেকে নিষ্কৃতি আমরা পেতে কি করে পারি! ... ধ্যানাসনে স্থিত থেকে! ...

না। ধ্যানাসনে স্থিত থাকলে, বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে ঠিকই, কিন্তু তা অতিস্বল্প সময়ের জন্য । এবং অন্য সময়ে, সে ক্রিয়ারতই থাকে। একদাম পিছনে কিছু ঋষিগণ বসে রয়েছেন। আশা করি, তাঁরা এই বিষয়ে সঠিক ভাবে আলোকপাত করতে সক্ষম" । ...

ঋষিগণ একে অপরের মুখ দেখে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "হ্যাঁ সঠিক দেবী। ... ধ্যান স্বল্প সময়ের জন্য বুদ্ধিকে স্থগিত করে দেয় মাত্র, সর্বক্ষণের জন্য করে না"। ...

দেবী তাপসী হাস্যবসে বললেন, "ঋষিগণ, আপনারা এও বলেদিন সকলকে যে, যেইটুকু সময় বুদ্ধি অপসারিত থাকে ধ্যানের কারণে, সেই সময়েই আপনারা ইন্দ্রিয়ের অতীতে গমন করেন" । ... ঋষিগণ পুনরায় বললেন, "হ্যাঁ, সঠিক। অন্য সকল সময়ে ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে"। ... দেবী তাপসী এবার হেসে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তবে দেখলেন তো, অল্প কিছু সময়ের জন্য বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় থাকলো, ইন্দ্রিয়রা নিষ্ক্রিয় থাকলো, আর আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো। ...

আপনারা কি ভাবছেন! আপনাদের তপস্যা অবিরাম ভাবে চলছে! ... না আমার প্রিয়জনেরা। একটিবার আপনারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে গেলেন, আর সেই একটিবারেই আপনাদের তপভঙ্গ হয়ে গেল । ... তপকে অবিরাম ভাবে সম্পূর্ণ ১২টি বৎসর চলতে হয়। আহারের কালে, নিদ্রার কালে, মৈথুনের কালে, ধ্যানের কালে, পথ চলার কালে, সর্বক্ষণ সেই তপকে চলতে হয়। ...

তাই কৃতান্ত ধ্যানে সদাসময় স্থিত থাকতে বলছেন না । ... হ্যাঁ ধ্যান করবেন, অবশ্যই করবেন। ধ্যান করবেন, জপ করবেন, ভজন গাইবেন, সমস্ত কিছু করবেন, কিন্তু যা প্রয়োজন তা হলো বুদ্ধির থেকে মুক্তি । আর তা সম্ভব একমাত্র বৈরাগ্যের দ্বারা, অর্থাৎ যা সম্মুখে আসবে, নির্বিচারে অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রয়োগ না করে, তাই গ্রহণ করা; আবার যা সম্মুখে আসে নি, তার কথা চিন্তা করার অনুমতি বুদ্ধিকে প্রদান না করা। ...

সর্বক্ষণ সেই অভ্যাস যিনিই ১২ বৎসর করবেন, তিনিই এই তপশক্তির অধিকারী হতে পারেন । ... তবে হ্যাঁ, আপনারা যেইদিন খাতায় কলমে এই তপ শুরু করবেন, সেইদিন থেকে ১২ বৎসরের হিসাব করবেন না। প্রথমত সেই হিসাব বুদ্ধি রাখে, তাই বুদ্ধির প্রয়োগ হয়ে তপভঙ্গ হয়েই গেল। আর দ্বিতীয়ত, নিদ্রাকালে আপনারা কি করবেন, তা আপনাদের হাতে থাকেনা। কিন্তু কিছু বৎসর এই অভ্যাস করা হয়ে গেলে, নিদ্রাতেও বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকে, আর তাই তখন আপনারা কনো স্বপ্ন দেখেন না"।

এইরূপ দীর্ঘক্ষণ ধরে দেবী তাপসী তপের কথা বলতে থাকলে, ঋষিগণও প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবার, এই স্ত্রী সামান্য কেউ নন। ইনি দিব্যতেজ সম্পন্না, এবং ইনি মহাতপস্বিনী। ... এই ভাবনা নিয়ে তাঁরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলে, যা দেখলেন, তাতে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, দেবী তাপসী অন্যকেউ নন, সেই গৃহবধূই, যিনি তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন । আর তাপসও অন্য কেউ নন, সেই বৈদ্যরাজ।

দেবী তাপসী ঋষিদের মনের অবস্থা বুঝে সকলকে বিদায় নিতে বলে, ঋষিগণদের নিয়ে নিজেদের আলয়ে গেলেন। ঋষিগণ দেখলেন, যেই কুটিরের দ্বারে নিজেদের হাত পর্যন্ত রাখতে পারেন নি, সেই কুটিরে তাঁরা অনায়াস প্রবেশ করতে পারলেন । বিস্মিত

ঋষিগণ আরো বিস্মিত হলেন যখন সেই কুটিরের অন্তরে উপস্থিত হয়ে, তাঁরা দেখলেন, এই কুটির সেই কুটিরই যেই কুটিরে তাঁরা এই দুইদিন যাবত ছিলেন। ...

বিস্মিত নেত্রে ঋষিগণ দেবী তাপসী ও তাপসের দিকে তাকালে, মিষ্টহাস্যে দম্পতি বললেন, "আমাকেই আপনারা আমার কুটিরে নিয়ে যেতে নিবেদন করেছিলেন, আর আমিই আপনাদের এই কুটিরের সম্মুখে প্রথমদিন নিয়ে এসেছিলাম। ... কিন্তু আপনাদের মধ্যে তপস্যার অহংকার ছিল, তাই আপনারা প্রবেশ করতে পারেন নি। আর কেবল তপস্যার অহংকারই নয়, আপনাদের তপ অসম্পন্নও ছিল, সেই কারণেও আপনারা প্রবেশ করতে পারেন নি।

কিন্তু আপনাদেরকে তো আর জলে ফেলে দিতে পারিনা, তাই এই কুটিরের দক্ষিণ দিশার দ্বার দ্বারা আপনাদের নিয়ে আসি, এবং আপনাদের সেবাশুশ্রূষা করি। ... আপনারা চোট পেয়েছিলেন, এখন আপনারা সুস্থ তো!" ... ঋষিগণ সমস্ত কিছু দেখে বিস্মিত হয়ে ছিলেন। সেই বিস্ময়ের সাথেই বললেন, "আমাদের তপ অসম্পূর্ণ । ... হ্যাঁ সত্যই অসম্পূর্ণ। ... সত্যই আমরা আমাদের বুদ্ধিকে বিনাশ করতে পারিনি, চেষ্টাও করিনি। ...

আমরা কেবলই তপতেজের সঞ্চয় করেছি। ... আর এই ভেবে গেছিলাম যে তপতেজ সঞ্চয়ই তপস্যার অন্তিম প্রাপ্তি। ... কিন্তু ...!" দেবী তাপসী হেসে বললেন, "না ঋষিগণ, তপস্যার অন্তিম প্রাপ্তি এত সামান্য তপতেজ কি করে হতে পারে! ... এমনকি তপলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিও বা কি করে হতে পারে! ... তপস্যার অন্তে যে সম্যক ব্রহ্মপ্রাপ্তি সঞ্চিত থাকে। ...

বাদল কেটে গেলে, নীল গগন প্রত্যক্ষ হয়; রাত্রিকালে তারকাপূর্ণ গহন অন্ধকার গগন প্রত্যক্ষ হয়; আর সেই গগন সুসজ্জিত থাকে পরাক্রমি সূর্যের দ্বারা, বা শুভ্র মনোরম চন্দ্রের দ্বারা। ... তেমনই তপের সাহায্যে বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আর তাতে ফুটে ওঠে নীল গগনের মত, উন্মুক্ত অব্যাক্ত অচিন্ত্য ব্রহ্ম" । ... দেবী তাপসী এই কথা বলে বিরাম দিলে, তাপস বললেন, "আর সেই গগনে সুসজ্জিত থাকে সূর্যরূপ পরাশক্তি, বা চন্দ্ররূপ পরাচেতনা"। ...

তাপস আবার হেসে বললেন, "গগনের হৃদয়ই যে সূর্য বা চন্দ্র, তেমনই ব্রহ্মের হৃদয়ই যে তাঁর পরাশক্তি বা পরাচেতনা। ... আর পরমেশ্বর তাঁর পরমেশ্বরীর সাথে একাত্ম হয়ে পরাশূন্য, অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা স্বরূপের প্রকাশ করে । ... ঋষিগণ, সাধনের অন্তে, তপের অন্তে তো সেই পরাসত্য প্রকাশমান হয়, তপস্বী সেই পরাসত্যে অবগাহন করেন; অতঃপরে সেই পরাসত্যকে জগতের বুকে স্থাপিত করেন, এবং অন্তে সেই পরাসত্যে নিজ কাল্পনিক দেহস্বরূপ অস্তিত্বকে বিলীন করে, স্বয়ংকে পরাসত্যের সমসত্ত্বে লীন করেন"।

ঋষিগণের নেত্র ছলছল করে উঠলো । তাঁরা বললেন, "মা! ... এই অজ্ঞানী সন্তানদের জ্ঞান প্রদান করেই বিদায় দেবে! ... তোমার সান্নিধ্যে রাখবে না!" তাপস ও দেবী তাপসী এই কথাতে চুপ করে থাকলে, ঋষিগণ পুনরায় বললেন, "মা, জন্ম জন্মান্তরের ঋষি আমরা। মোক্ষের দ্বারে সেই সুদীর্ঘ কাল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি । ... বৈরাগ্যকে ধারণ করতে পারিনি, সম্মুখে যা আসছে

তাই গ্রহণ করতে পারিনি, নিজদের বুদ্ধির উপর ভরসা করেছি, আর তাই এখনও আমাদের নিজদের এই কল্প-অস্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ...

কিন্তু নিজের মাতাকেও কি তা বোলে চিনতে পারবো না! ... যিনি আমাদের হৃদয়ের অন্তরে থেকে সদা সদা সন্মার্গের চেতনা প্রদান করে গেছেন, যিনি সদা সদা আমাদের সর্বস্বকিছু হয়ে আমাদের অহেতুক প্রেম দান করে গেছেন, আজ তিনি কি আমাদের এই ভাবে কেবলই বৈরাগ্যের অভ্যাসের প্রেরনা প্রদান করে ফিরিয়ে দেবেন। ...

মানছি মা, আমরা যোগ্যতার বলে তোমাদের দর্শন লাভ করিনি; নিজদেরকে মূর্খতার মধ্যে স্থাপিত করে ফেলার কারণে, সন্মার্গ প্রদানের জন্যই তুমি আমাদেরকে দর্শন প্রদান করেছ। ... কিন্তু নিজের মাতাকে একটিবার স্নেহ করতে পারবো না! ... আমরা অনিধিকার আবদার করছি না মা!" ... এই বলে, ঋষিগণ মনের দুঃখে সেই কুটির থেকে প্রস্থান করতে গেলে, কুটিরের দরজা তাঁরা কিছুতেই খুলতে পারলেন না।

পিছনের দিকে ঘুরে তাকালে, তাঁরা দেখলেন সাখ্যাত প্রভু অখণ্ডকে বাহন করে, মাতা সর্বাত্মা দেবী তাপসী ও মান্যবর তাপসের স্থানে স্থিত। ... ঋষিগণ কনো অভিমানের কারণে, বা অন্য কারণে সময় নষ্ট করলেন না, সোজাসুজি মাতার ক্রোরে নিজেদেরকে অর্পণ করে অশ্রুজলে তাঁর ক্রোড় সিক্ত করে বললেন, "মা, আমরা যে তোমাকেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না অন্তরে, প্রভুকে অন্যত্রে খুঁজে পেয়েও তোমাকে পাচ্ছিলাম না, আর নিজদের অনাথ লাগছিল মা! ...

তপ করেছি, তেজও পেয়েছি । কিন্তু আনন্দ পাইনি । তাই আনন্দ মুখে প্রকাশও করতে পারিনি। সদা সংযত থাকতাম তাই। কিন্তু আমাদের সংযত ভাব, সদাই আমাদের অহংকারের ধারায় প্রবাহিত হতো। ... মা! ... মাগো। ... আমরা এখানেই থাকবো মা! ... তোমার চরণতোলে থেকে, স্বয়ং পিতার মার্গদর্শনে বৈরাগ্য অনুশীলন করে, তপ করবো। ... তপ সম্পূর্ণ হবার পরে, সর্বদিশায় তপের মহিমার বিবরণ প্রদান করে, তোমাতে বিলীন হয়ে যাবো"।

মাতা তখনও চুপ দেখে ঋষি ভৃগু বললেন, "ও মা! ... অনুমুতি দাও না! ... তোমরা তো এখন এখানে থেকে শিক্ষা দেবে। আমাদেরকেও তোমাদের কাছে রাখো না মা! ... দিবারাত্রি তোমাদের একটু সেবা করার সুযোগ দাও না মা!" ... সন্তানদের আবদার মা কি করে ফেলতে পারেন। তিনি হেসে বললেন, "তাই হবে পুত্ররা । ... কিন্তু পুত্ররা, তোমরা এমন কি করে ভাবলে যে, তাপস তোমাদের প্রভু আর তাপসী তোমাদের মাতা, সেই বিষয়ে তো বলো"।

ঋষি গৌতম হেসে বললেন, "ওই যে মা! ... তপ করেছি, বুদ্ধির নাশ তো করিনি। ... বুদ্ধি দিয়ে ভাবলাম, তপের এই গভীর তত্ত্ব এখন কেউ জানেন না। তাই এরা অন্য কেউ নন, আমাদের মাতাপিতাই হবেন। ... সকলে যখন তপ করতে শুরু করবেন, তখন হয়তো এমন

অনেক তাপস ও তাপসী হবেন, কিন্তু এক্ষণে তা সম্ভব নয়" । ... ঋষি গৌতম থামলে, ঋষি জমদাগ্নি বললেন, "ওসব তোমরা বুঝবে না মা! ... এসব জটিল অঙ্ক। ... কল্পনার প্রসার যেই বুদ্ধি করে, সে এই সব জটিল গণনায় সদা ব্যস্ত থাকে। ...

তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আবার কোথায়! ... থাকলে কি আর তোমরা ভোলা হতে পারতে!" ... মাতা মুখ ছোট করে বললেন, "একটুতো বুদ্ধি থাকা দরকার, তাই না!" ... ঋষি ভৃগু উচ্চৈঃস্বরে আবেগে বলে উঠলেন, "না! ... না না, একদম নয়। ... তোমাদের বুদ্ধি থাকলে, আমাদের সরল শিশুর ন্যায় মাতাপিতাকে কি করে পাবো আমরা! ... হ্যাঁ, আমরা মাঝে মাঝে একটু অহংকার বশত তোমাদেরকে অপমান করে ফেলি। ... কিন্তু মা! ... তোমাদের ছাড়া আমাদের যে আর কেউ নেই!"

ঋষি জমদাগ্নি বললেন, "হ্যাঁ মা, আর কে সম্ভব, যার কাছে আমরা নিজদের দেহের বয়সকে ভুলে যাবো! ... যার কাছে আমাদের লিঙ্গ আমরা ভুলে যাব! ... যার কাছে আমাদের আমিকেই আমরা ভুলে যাবো! ... মা, তোমরা এমনই ভোলা থেকো। ... তোমরা ভোলা বলেই তো আমরা নিজদেরকে আর অন্যদেরকে বলতে পারি, সরল হতে হবে; নিজকে নিজে ভুলে থাকতে হবে । ... নিজের মধ্যে নিজেকে ভুলে আত্মভোলা নয়, নিজকেই নিজে ভুলে থেকে সত্যকারের ভোলা হতে হবে। ...

এটা অন্য কথা মা যে কি করে সেই ভোলা হতে হয়, তাই আমরা জানতাম না। ... আমরা জানতামই না যে বুদ্ধি থাকলে, ভোলা হওয়াই যায় না । ... তবে আমাদের প্রেরণার স্রোত হয়ে তো তোমরাই ছিলে বরাবর । ... তোমাদের অপার স্নেহ, তোমাদের ভোলা, সরল শিশুর ন্যায় ভাব, ... মা, আমরা তো এই দুই ভাবের কারণেই মজে থাকি সদা। ... নাহলে তো এই রুক্ষ তপ করতে করতে, কবেই মরুভূমি হয়ে যেতাম!"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "বেশ বেশ, অনেক হয়েছে। এবার একটু হাতমুখ ধুইয়ে এসো তো, একটু পরমান্ন আহার করে নাও সকলে"। ... মাতাপিতার কাছের সন্তান শিশুই থাকে । কথাটা সামাজিক হলেও, সামাজিক স্তরে তা বাস্তবিক নয়, কিন্তু জগন্মাতা ও জগৎপিতার কাছে, এই কথার থেকে অধিক সত্য বোধ হয় সন্তানদের জন্য আর কিছু নেই। ... সন্তানগণ সকলে হাতমুখ ধুয়ে পরমান্নের আহার করলেন।

আর এরপর, সকলে মাতা ও পিতার তাপস ও তাপসী বেশের চরণতলে উপনীত হয়ে তপ করে, তপা হয়ে, দশদিশায় প্রসারিত হয়ে তপের বাস্তবিকতার শিক্ষা প্রদান করলেন, এবং সেই কর্ম সমাপ্ত হলে, একদা মাতা ও পিতার কথা স্মরণ করতে করতে, তাঁরা এক বৃক্ষতলেই নির্বিকল্প লাভ করে, পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেলেন" । এই হলো মাতার সেই তাপসী বেশের অমৃতকথা" ।

এতো বলে প্রভু ব্রহ্মসনাতন থামলে, দিব্যশ্রী আনন্দের সাথে বলে উঠলেন, "আচ্ছা পিতা, এই তপই কি সকলে সদা করে এসেছেন?" ... প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "না পুত্রী, এই তপের সাথে সিদ্ধার্থকে প্রথম পরিচয় মাতাই করান । ... সেই তপেই বলিয়ান হয়ে তিনি বুদ্ধরূপ ধারণ করেন।

কিন্তু এই তপ তাঁর পরে আর কেউ করেন নি। ... একমাত্র মাতা যখন স্বয়ং তোমার পিতা বেশে পূর্ণ অবতারগ্রহণ করে বিরাজ করছেন, তখন তা অভ্যাস করিয়ে, তাঁকে তপসিদ্ধ করেছিলেন; এবং তাঁর অন্তরের তপইচ্ছারূপী ঋষি জমদাগ্নি, ঋষি গৌতম ও ঋষি ভৃগু মাতার থেকে এই তপের কথা জেনে, নিজরাও সিদ্ধ হন, এবং সর্বত্র এই মহাতপের কথা প্রচার করে, সমগ্র জম্বুদ্বীপকে সমৃদ্ধ করে তোলেন"।

বনিতা অধ্যায়

দিব্যশ্রী বললেন, "সমাজে ঋষিদের আবশ্যকতা ঠিক কোন স্থানে পিতা আর ঋষিদের প্রকৃত ভূমিকাই বা কি?" ... প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, এই প্রশ্নের উত্তর, আমাকে পৃথক করে দিতে হবে না । মাতারই নবম ও অন্তিম অবতারের কথা তোমাকে বলি শোনো। সেই কথাই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে দেবে তোমাকে । পশ্চিম জম্বুদ্বীপে এক রাজ্য ছিল, নাম গুঞ্জন। সেখানের রাজা ছিলেন, মহাপ্রতাপি গুহ্যকেশ। ...

রাজারূপে তিনি বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু তাঁর মন্ত্রী ছিলেন বিকৃত মস্তিষ্কের । মন্ত্রীর কন্যা ঋষিপত্নী হয়ে, সমস্ত রাজবৈভব ত্যাগ করে চলে গেছিলেন, আর সেই থেকে তাঁর ঋষিকুলের প্রতি বিদ্বেষ রচিত হয়। তাই রাজা গুহ্যকেশকে কেশরী নামক সেই মন্ত্রী বুদ্ধিদান করেন, যাতে তিনি ঋষিদের সমস্ত সুযোগসুবিধা প্রদান করা বন্ধ করে দেন । ... তিনি রাজাকে বলেন, "ঋষিগণকে রাজ্যের প্রজার স্থানে বসান মহারাজ। ... সকল প্রজা কর্ম করে বেড়াবেন, আর ঋষিগণ কেন কেবল বসে বসে শিক্ষা দেবেন। ...

রাজা আছেন, রাজ্যের মন্ত্রীরা আছেন। ঋষি কেন শিক্ষা দেবেন! ... মহারাজ, কিছু করুন... এই ঋষিদের দৌরাত্মকে দমন করুন । সমস্ত প্রজা ঋষির উদ্দেশ্যে ছুটছেন। ... কারুর রাজা হবার ইচ্ছা নেই, সকলের ঋষি হবার ইচ্ছা। ... কারুর রাজার স্ত্রী হয়ে মহারানী হবার ইচ্ছা নেই, সকলের ঋষিপত্নী হবার ইচ্ছা" । ... রাজা গুহ্যকেশ সেই কথায় চিন্তিত হয়ে উঠলে, রানী বললেন, "আপনার কথা ভিত্তিহীন মহামন্ত্রী কেশরী। ...

কই আমি তো রানী হয়ে সকল প্রজার সেবা করার স্বপ্ন সেই ছোট্ট বয়স থেকে দেখতাম। ... আমি আমার রাজ্যের এমন বেশ কিছু কন্যাকে জানি, যারাও সেই স্বপ্নই প্রতিনিয়ত দেখেন। ... মহামন্ত্রী, ঋষিপত্নী হওয়া সহজ কর্ম নয়। ... হ্যাঁ, ঋষির কাছে মহাতেজ থাকে; ঋষির রাজ্যের প্রতিও বহু কর্তব্য থাকে। ... ঋষিগণ সেই কর্ম করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন না, কিন্তু সেই সকল কর্মের শ্রেয় তিনি রাজাকেই দেন, নিজের জন্য কিচ্ছু অবশিষ্ট রাখেন না।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই থাকে খ্যাতির অধিকারী হওয়া। ঋষিপত্নী হতে গেলে, সেই মোহকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয়। কর্ম করতে ঋষি নিষ্ঠাবান থাকেন, কিন্তু খ্যাতি তিনি গ্রহণ করেন না। ... তেমনই ঋষিপত্নীও তাঁর স্বামীর প্রতিটি কর্মে সহযোগী থাকেন,

আবার সমান ভাবে, স্বামীর সম্মান ত্যাগের সাধনাতেও একই ভাবে অংশীদার হন। ... মহামন্ত্রী, ঋষিগন রাজ্যকে শিক্ষিত করেন বলেই, রাজার রাজ্যচালন সম্ভব হয়।...

ইচ্ছার থেকে মুক্ত হওয়ার পাঠ বা কথন তো রাজা বলতে পারেন, কিন্তু প্রজাকে ইচ্ছা থেকে মুক্ত করতে পারেন না । ... আর প্রজা যদি ইচ্ছার পূজারি হয়ে জীবনযাপন করেন, তবে কি হবে, তার প্রমাণ তো আপনি স্বয়ং মহামন্ত্রী। আপনি নিজকেই দেখুন না, ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে, আপনার মতি কেমন ভ্রমিত হয়ে উঠেছে । ... একবার যদি প্রজা এইরূপ ভ্রমিত হয়ে ওঠে, তবে কি হবে ভেবে দেখেছেন মহামন্ত্রী! ... কেবল বিলাসিতার পূজা হবে সমস্ত রাজ্যে। ... বিশ্বাস হচ্ছে না, একবার করে দেখুন, বুঝে যাবেন"।

রাজা এই সমস্ত বার্তালাপে চিন্তিত হয়ে পরেন, বিশেষ করে তখন, যখন মহারানী তাঁর কাছে এই দাবি করেন যে, এই মহামন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করতে হবে। ... রাজা জানেন, তাঁর মহামন্ত্রী, একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি এও জানেন যে, মহামন্ত্রীর স্বপ্ন ছিল তাঁর কন্যা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের সেবা করবেন। ... কিন্তু তাঁর কন্যা ঋষিপত্নী হয়ে যাবার কারণে, তিনি ব্যথিত। ... ঋষি বিদ্রোহী নন তিনি, কিন্তু ঋষি এতো পরিশ্রম করেও কেন সম্মুখে স্থিত থাকেন না, সেই নিয়ে তিনি বিদ্বেষী। ...

রাজা, এই সমস্ত কিছু ভেবে, এটি বুঝলেন যে তিনি কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না। তাই তিনি ঋষিপ্রধানের কাছে গমন করে তাঁকে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বললেন। ঋষিপ্রধান সমস্ত কিছু শুনে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "রাজন, আমার মনে হয়, এই সমস্যার সমাধান করার জন্য মাতার কাছে আপনার যাওয়া আবশ্যক। ... তিনিই এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন"।

মহারাজ বললেন, "ঋষিবর, এই যৎসামান্য সমস্যার জন্য মাতাকে বিরক্ত করা কি উচিত হবে!" ... ঋষিপ্রধান মাথা নেড়ে বললেন, "রাজন, সন্তান মাতাকে বিরক্ত করেনা, সন্তান মাতার কাছে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে রেখে দেয়। ... আর সমস্যা! ... না রাজন, এটি সামান্য সমস্যা নয়। ... যদি মন্ত্রীকে শিক্ষা দেবার জন্য সমস্ত রাজ্যকে শিক্ষা থেকে বিমুখ করো, হয়তো মন্ত্রী শিখে যাবেন, যা তুমি শেখাতে চাইছো, কিন্তু প্রজা যদি একবার শিক্ষার থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছার পূজা করতে আরম্ভ করে দেয়, আর তাঁদেরকে আটকাতে পারবেনা। ...

সব থেকে বড় কথা, সেই প্রজার বিলাসিতা কেবল তোমার রাজ্যেই সীমিত থাকবে না, সমস্ত জম্বুদ্বীপে তা ছড়িয়ে পরবে। ... রাজন, পর্বতে উত্তরণ করাই কঠিন, বহু সময় লাগে তাতে; কিন্তু পর্বত থেকে আরোহণ অতি সহজ, অতি দ্রুত তা অতিক্রম করা যায়। ... তেমনই, যেই অনাচার শিক্ষার অভাবে প্রজার মধ্যে প্রসারিত হবে, তা সমস্ত জম্বুদ্বীপকেই তরান্বিত করে দেবে। ... তাই মাতার কাছে যাও রাজন। ... এখানে নিজের বুদ্ধির উপর ভরসা করা, সর্বাধিক নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে"।

রাজা ঋষিপ্রধানের কথা শুনে মাতা সর্বাম্বার নিবাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন । ... চারদিবস যাত্রা করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি হতচকিত হয়ে গেলেন। ... তিনি কতই না বৈভবে নিবাস করেন, আর সাখ্যাত সমস্ত জীব-অজীবের জননী এই ছোট্ট কুটিরে

নিবাস করেন! ... মাতা সর্বাম্বা মহারাজ গুহ্যকেশের আগমনে আনন্দিত হয়ে, তাঁকে কুটিরের অন্তরে নিয়ে যাবার জন্য স্বয়ং নির্গত হয়ে এলেন। ...

মহারাজ এদিক সেদিক দেখতে থাকলেন, ... তিনি আশা করছিলেন, কনো দাসী আসবেন হয়তো তাঁকে মাতার কাছে নিয়ে যেতে। ... মাতা স্বয়ং তাঁকে নিতে এসেছেন দেখে তিনি লজ্জিত হয়ে গেলেন । তিনি মাতার উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনি এইরূপ কেন থাকেন মাতা! ... আমি আজই কিছু কন্যাকে আপনার সেবায় নিয়জিত করছি, রাজ্যে ফিরে গিয়ে"।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "সেবা! আমার ... কেন?" ... খিল খিল করে খানিক হাস্য প্রদান করে মাতা পুনরায় বললেন, "কেন রাজন! ... সন্তানের সেবা তো মা করবে, মায়ের সেবা কেন করবে সন্তান! ... তুমি বসো, অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু জলখাবার নিয়ে আসি। তোমার সঙ্গিসাথিরাও তো খুব ক্লান্ত। ওদের কেও একটু আহার করাই দাঁড়াও"। ... মহারাজ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "মাতা! ... না না আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! ... আপনার দাসীদের বলে দিন, তাঁরা সব করে দেবে"।

মাতা হেসে বললেন, "দাসী! আমার! আমার কি করে কেউ দাসী হতে পারে রাজন! ... সকলে যে আমার সন্তান, সন্তান দাসী কি করে হতে পারে পুত্র!... দাঁড়াও, মায়ের দ্বারে এসেছে সকলে, অভুক্ত থাকবে, এও কি হতে পারে। ... একটু বিশ্রাম নাও, আমি এখনি আসছি"। ... মাতা এই বলে অন্দরে রসুই ঘরে চলে গেলে, রাজা দেখলেন আর ভাবলেন, "মাতা সরল সাদাসিধা, এমন তো শুনেছিলাম; কিন্তু এই প্রকার সাধারণ ভাব! ... এই ছোট্ট উন্মুক্ত দালান দেওয়া কুটিরে মা থাকেন!"

মা হাসতে হাসতে অন্দর থেকে হাত ভরতি আহার নিয়ে আসতে আসতে বললেন, "এই উন্মুক্ত দালান দেওয়া কুটির যে সকলের আনন্দের হাট বাবা! ... এই নাও, একটু আহার করিয়ে এসো তো তোমার ছেলেমেয়েদের । আমি তোমার আহার আনছি"। ... মহারাজ মাতার হাত থেকে সমস্ত আহার নিয়ে প্রজাদের প্রদান করতে করতে ভাবলেন, "মাতা যেন সর্বদা সেই কথাই বলেন, যা অন্তর্নিহিত ভাব। ... তিনি প্রজাদের আহার প্রদান করতে বললেন না, তিনি বললেন আমার ছেলেমেয়েদেরকে আহার প্রদান করতে!"

রাজা নিজের কর্ম করে অন্দরে আসতে দেখলেন, মাতা তাঁর জন্য আহার প্রস্তুত করে রেখেছেন। রাজা কিছু বলতে গেলে, মাতা আগে রাজনকে আহার করালেন, আর তারপরে বললেন, "তোমার মহামন্ত্রী ঋষিদের অধিকারকে শীর্ণ করতে চাইছেন তো, তাঁকে তাঁর পুত্রসন্তানের শিক্ষার জন্য গুরু আশ্রমে প্রেরণ বন্ধ করতে বলো। ... সকল প্রজাকে তাঁর ধারণার কারণে দণ্ড কেন দেবে, তাঁর নিজের ধারণার ফল, তিনি নিজেই ভোগ করবেন"।

মাতার এই কথা শুনে রাজা চমকিত হননি। তিনি জানেন, মাতার কাছে সমস্ত কিছুই জ্ঞাত । কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারলেন না যে, মন্ত্রীর পুত্র গুরুআশ্রমে না গেলে, কি এমন ঘটবে, যার জন্য মন্ত্রী নিজের ভুলকে বুঝতে পারবে!" ... ঋষিপ্রধান এইস্থানে আসার

পূর্বে রাজাকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন কেবলই মাতার সম্মুখে উপস্থিত হন। ... মাতা তাঁর করণীয় যতখানি, ততখানিই বলবেন। ... সেই কথা শুনে ফিরে এসে, কেবল সেই কর্মটুকু করতে হবে তাঁকে।

রাজনও সেই অনুরূপ অবস্থারই সম্মুখীন হলেন, যেমন ঋষিবর বলে দিয়েছিলেন। মাতা তাঁকে কেবল সেইটুকুই বললেন, যেইটুকু রাজাকে করতে হবে। ... যেমন যেমন রাজাকে বলেছিলেন মাতা, তা ঋষিবরকে এসে বলতে, ঋষিপ্রধান হেসে বললেন, "বেশ রাজা, যেমন মাতা বলেছেন, তেমনটাই করো" । ... রাজা বললেন, "কিন্তু ঋষিবর, গুরুআশ্রমে মন্ত্রী যদি নিজের পুত্রকে না প্রেরণ করে, তাতে কি এমন হয়ে যাবে!" ...

ঋষিবর হেসে বললেন, "দেখতেই তো পাবে রাজন। ... অতো চিন্তা কেন করছো । ... মাতা যখন এটুকুই তোমাকে করতে বলেছেন, তখন নিশ্চয়, অতটুকু করাই তোমার থেকে তাঁর প্রয়োজন, বাকি তিনি করে নেবেন হয়তো"। ... রাজা মনে মনে ভাবলেন, মাতার লীলা বোঝার মত সামর্থ্য আমার কি আছে! তার থেকে ভালো, তিনি যেমন বলেছেন, তেমনটাই করি।

রাজা মন্ত্রী কেশরীর মনে ঋষি আশ্রমে পুত্রকে প্রেরণ করার জন্য সংশয় উপস্থাপন করলে, তা মন্ত্রী মহাসাগ্রহে স্বীকার করে নিলেন, এবং ঋষিআশ্রমে পুত্রকে আর যেতে দিলেন না। ... অন্যদিকে, মন্ত্রীর পুত্র, অর্ণব, গুরু আশ্রমে না যেতে হয়ে, সদা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। ... আর এমন বেড়াতে বেড়াতে, অনেক রাজ্যের স্ত্রীদের প্রতিই তিনি আকর্ষিত হতে লাগলেন। ...

কিন্তু তিনি আকর্ষিত হলে কি হবে, স্ত্রীদের স্বাভাব ভিন্ন । তাঁরা এই আকর্ষণকে, আকর্ষণ নয়, উপদ্রব মানতে শুরু করেন, আর বিরক্ত হতে শুরু করেন। অর্ণব স্ত্রীদের এমন ব্যবহারে ব্যাথিত হয়ে পরেন, আর আরো অধিক এদিক সেদিক ঘুরতে শুরু করেন, এই ভাবনা নিয়ে যে কনো না কনো স্ত্রী তো হবেন, যিনি তাঁকে সঙ্গ দেবেন । ... বেশ কিছুদিন এমন ঘুরতে ঘুরতে, একদিন অর্ণবের ভাবনা সার্থক হলো।

এক বিশেষ সুন্দরী স্ত্রী, তাঁর এই স্ত্রীসঙ্গলাভের ইচ্ছাকে বেশ উপভোগ করতে থাকলেন। অর্ণবও বহুপ্রতীক্ষার পরে এক স্ত্রীর সঙ্গ পাচ্ছেন, তাও আবার সুন্দরী স্ত্রী, সেই কারণে আনন্দিত হতে থাকে । ... আর সেই ভাব থেকে সেই স্ত্রীর সাথে অর্ণব মেলামেশা শুরু করে। সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হতে শুরু করলে, সেই স্ত্রী এবার নিজের আসল রূপ প্রকাশ করেন। ... প্রতিদিনই কিছু না কিছু চাইতে শুরু করেন অর্ণবের কাছ থেকে। ...

আর অর্ণব পিতার কোষাগার থেকে অর্থ নিয়ে নিয়ে, সেই সমস্ত ইচ্ছার পূর্তি করতে শুরু করেন । ... এই করতে করতে, প্রায় একটি বৎসর চলে গেলে, মন্ত্রী একদিন কোষাগারের হিসাব নিতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর কোষাগারে অর্ধেক সম্পদও নেই। ... মন্ত্রী, সেই দেখে তাঁর স্ত্রীর কাছে কোষাগারের এই অবস্থার কৈফিয়ত চান। ... কিন্তু স্ত্রী কেবল এইটুকুই বলেন, তিনি মন্ত্রীর কোষাগারে হাতও লাগাননা। তাঁর একমাত্র পুত্র, সেই কোষাগার থেকে রোজ অর্থ নেন।

মন্ত্রী সেই কথা শুনে রেগে আগুন হয়ে পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। ... পুত্র নিজের ঘরে সেই সময়ে ছিল না, সে তাঁর সঙ্গীর সাথে আলাপে মত্ত তখন। ... মন্ত্রী সেই কথা শুনে পুত্রের কাছে গেলেন, এবং পুত্রকে সেই স্ত্রীর কাছ থেকে কান ধরে সমস্ত রাজ্যের রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। ... সেই দেখে সমস্ত রাজ্যের মানুষ মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকলেন, আর কেউ আসতে আসতে, আবার কেউ জোরে জোরে বিভিন্ন কথা বলতে থাকলেন।

যেই টুকু কথা মন্ত্রীর কানে এসে পৌছায়, তাতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। তিনি শোনেন, "ঠিকই আছে, গুরুর আশ্রমে শিক্ষা নেবে না, ঋষিসংসর্গ করবে না, তো মেয়েছেলের পিছনেই তো পয়সা খরচ করবে" । ... কেউ কেউ আবার সোজাসুজি মন্ত্রীকেই বলেন, "কি মন্ত্রীমশাই, আপনার ছেলে তো ঋষির সান্নিধ্য না পেয়ে, মোহে আচ্ছন্ন হয়েছে! ... সমস্ত খারাপ গুণ তো প্রবেশ করে গেছে তার মধ্যে! এবার কি করবেন!"

সেই সমস্ত কথা শুনে মন্ত্রী এবার পুত্রকে নিজের গৃহে বন্দি করে রেখে সেই স্ত্রীর কাছে গেলেন, যার কাছে অর্ণব সর্বক্ষণ পরে থাকতো। ... রুদ্রমূর্তি হয়ে মন্ত্রী তাঁর দ্বারে গেলে, সেই স্ত্রী এক অদ্ভুত বিক্ষিপ্ত ঢঙে বললেন, "বাবা! ... বাপের কত সখ! ... ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে এসেছে দেখছি!" ... মন্ত্রী সেই কথায় উত্তেজিত হয়ে বললেন, "বন্ধ করো তোমার প্রলাপ । ... আমার ছেলেকে উচ্ছন্যে পাঠিয়েছ তুমি, নষ্ট মেয়েছেলে!"

সেই স্ত্রী বললেন, "এ কে রে! ... ওর ছেলে সর্বক্ষণ পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করে। কাম, মোহ, লোভে, ঈর্ষায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর দেখ ছেলের বাপ এসেছে, আমায় নষ্ট বলতে। ... কে এই অধম চণ্ডালকে মন্ত্রী বানিয়েছে রে! ... এই কে আছে, যা তো রাজার কাছে গিয়ে বল, তাঁর মা তাঁকে ডাকছে। বলে এখানে নিয়ে আয় দেখি । ... এই মন্ত্রীর শুশ্রূষা দরকার, ... একে গাধার পিঠে চরিয়ে চণ্ডালের ঘরে রেখে আসতে হবে"।

মন্ত্রী সেই কথা শুনে রুদ্ধমূর্তি হয়ে উঠে বললেন, "এতো বড় সাহস! ... তুই রাজ্যের মহামন্ত্রীকে এইসমস্ত অশ্রব্য কথা বলছিস! ... আজ তোর বিচার নয়, তোর শব দেহের বিচার করাবো আমি রাজাকে দিয়ে ... রাজা তো আসবেন, কিন্তু তোর শব দেহ দেখবে"। ... সেই স্ত্রী ব্যঙ্গের হাস্য হেসে বললেন, "তাই বলি, এমন পিতা না হলে, অমন গুণধর পুত্র হয় কি করে! ... বাপ যদি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার কথা বলে, তবেই না ছেলে স্ত্রীর মোহে নিজের বাপের ঘর থেকে চুরি করে... কি বলো তোমরা!"

আশেপাশের সকলে বললেন, "ঠিকই বলেছেন উনি। কম তো রাজ্যের মেয়েদের বিরক্ত করতো না মন্ত্রীর ছেলে! ... আর করবে নাই বা কেন, শিক্ষাদীক্ষা কিচ্ছু নেই। যে ঋষি আশ্রমে যায়না, সে যে মোহ, লোভ করবে আর কামনাবাসনার পূজারি হয়ে চুরি করবে, তদ্রূপ করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ... কলঙ্ক এই মন্ত্রী। ... সমস্ত রাজ্যের কলঙ্ক এই মন্ত্রী"। ...

মন্ত্রী সেই স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত ভাবে অপমানিত হতে শুরু করলে, সেই স্থানে রাজা গুহ্যকেশ উপস্থিত হন। ... মন্ত্রী যেন রাজাকে দেখে ধরে প্রাণ খুঁজে পান। ... কিন্তু মহারানী মন্ত্রীর কাছে রাজাকে থাকতে না দিয়ে সেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি করেছে এই মন্ত্রী?" ...সেই স্ত্রী বললেন, "দেখুন না মহারানী! ... ওঁর ছেলে আমার পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে, নিজের বাপের কোষাগার খালি করে দিয়েছে। আর এই অশিক্ষিত মূর্খটা আমাকে এসে অকথা, কুকথা বলছে"।

মহারানী এবার ক্রুদ্ধ আবেশে রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহারাজ, এর এক্ষণে বিচার চাই। ... মন্ত্রীর ছেলে রাজ্যের অন্য সমস্ত মানুষদের মতিভ্রষ্ট করছে। এখনও কি ওর এই রাজ্যে স্থান থাকা উচিত!" ... রাজা রানীর কথা বুঝলেন, এবং সেই স্ত্রীকেও দেখলেন, যার কাছে অর্ণব আসতো। ... আর এবার বললেন, "না, মন্ত্রীর ছেলেকে এইমুহূর্তে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হোক, সমস্ত জীবনের জন্য"। ...

মন্ত্রী সেই কথা শুনে প্রগল ন্যায় হয়ে উঠে মহারাজের চরণ ধরে ক্রন্দন করে বলতে থাকলেন, "না মহারাজ, আমার ওই একটিই সন্তান আর রয়েছে। ... ও চলে গেলে, আমি আর কি নিয়ে থাকবো!... কৃপা করুন মহারাজ । ... আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন"। ... মহারাজ এবার সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "তোমার কি মতিভ্রম হয়েছে মন্ত্রী! ... যেই পুত্র সমস্ত রাজ্যে মোহ, লোভ আর কামনার বিস্তার করছে, তুমি মোহবশত তাকে রাজ্যে রেখে দিতে বলছো! তাও মন্ত্রী হয়ে!"

মন্ত্রী, এবার ইতিস্তত করলে, রাজা তাঁর সন্তানকে রাজ্য থেকে নিষ্কাসিত করার আদেশ দেন। ... মন্ত্রী, পুত্রমোহে একবার পুত্রের দিকে ছুটে যান, তো একবার রাজার কাছে এসে কাকুতিমিনতি করেন। ... অন্তে যখন কনো কিছুই কনো কাজ করেনা, তখন সেই স্ত্রী যার কাছে অর্ণব যেত, সেই স্ত্রীর কাছে মিনতি করতে শুরু করেন মন্ত্রী। ... সেই স্ত্রী তখন বলেন, "ওই দেখ, মন্ত্রী আমার চরণ ধরে কেন রে! ...

ওরে ও মন্ত্রী, আমার নয়, ঋষিদের চরণ ধর গিয়ে। তাঁরা যদি আবার তোর ছেলেকে শিক্ষা দিতে শুরু করেন, তবেই তোর ছেলের মোহ দূর হবে। ... ঋষিরা কেবল পঠন পাঠনের শিক্ষা দেন কি রে! ... ঋষি তো সকলকে মোহ, পাশ থেকে উন্নত হয়ে যথার্থতার দিকে যাত্রা করান। ... তাঁরা না থাকলে যে সম্পূর্ণ রাজ্য অনাথ। ... সমস্ত রাজ্যবাসীকে তাঁরাই তো কর্তব্যের পাঠ প্রদান করেন, এবং সত্যের দিকে অগ্রসর হতে পথ দেখান"।

মন্ত্রী এবার মাথা নিচু করে খানিক রোদন করে, যার দিকে ছুটে গেলেন, তিনি অন্য কেউ নন, তাঁরই জামাতা। মন্ত্রীর জামাতা তাঁর শ্বশ্রুপিতাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, "মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমার পিতাতুল্য, আমার অর্ধাঙ্গের পিতা আপনি। ... আর আপনার কন্যা! ... তিনি তো একজন মহীয়সী। ... কর্ম নয়, কর্মের শ্রেয় গ্রহণ করা হতে যিনি প্রতিহত থাকেন, তিনিই তো প্রকৃত মহীয়সী। ...

সংসার নয়, সংসারের প্রতি আসক্তি যিনি ত্যাগ করেন, তিনিই তো মহীয়সী। নিজবুদ্ধি জাত কল্পনা নয়, যিনি নিজের সমস্ত কল্পনা প্রসারী বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে আত্মার সাখ্যাতকার করতে আগ্রহী হন, তিনিই তো মহীয়সী হন। ... আপনার কন্যা একজন মহীয়সী মহামন্ত্রী। একজন মহীয়সীর পিতা আমার চরণে কেন পতিত হবেন। ... উঠুন শক্ত হন আপনি।

মহামন্ত্রী ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, "পুত্রী আমার রাজবৈভব নয়, ঋষির আলয়ের ত্যাগের অগ্নিকে ধারণ করবে জেনে, আমার মন বিচলিত হয়ে গেছিল। কিন্তু আমি এবার বুঝে গেছি, ঋষিগণ কিচ্ছুসাধন করেন না, অহেতুক কাল্পনিক সামগ্রী থেকে বিরত থাকেন, তাই তাঁরা মহান। সকলকে এই শিক্ষা প্রদান করেন যে কল্পনাময় এই জগতে কেবল স্থিত থাকতে হয়, কল্পনার অতীতে, সকল আবর্তনতত্ত্বের অতীতে যেই পরমশূন্য বিরাজ করছেন, তাঁর নিকট উপস্থিত হবার জন্য। ...

আজ আমি বুঝে গেছি, ঋষি সমাজকে কেবল উপার্জন বিদ্যাই নয়, তাঁরা সমাজকে সত্যের শিক্ষা প্রদান করেন, এবং কল্পনা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা প্রদান করেন। ... বুঝে গেছি আমি, সেই শিক্ষা প্রদানের কালে ঋষিগণ সকল অপ্রয়োজনীয় কর্ম থেকে দূরে থাকবেন, যাতে সকলে তাঁদেরকে দেখেই উন্নীত হন; আর রাজা তাই ঋষিগণকে তাঁদের দেহরক্ষার জন্য আবশ্যক ক্রিয়ার সহযোগী হয়ে উঠবেন।

ঋষি যদি না থাকতেন, আজ সম্পূর্ণ সমাজ আমার পুত্রের মতই দেহসুখের চিন্তায় রত হয়ে যেত। যা অনাবশ্যক, তাই বলাসিতা; আর তার প্রতি সমস্ত সমাজ ধাবিত হয়ে গিয়ে এই প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করতো । ... ভূমিকে অহেতুক কর্ষণ করতো; ফলের বৃক্ষের সমস্ত ফলকে নিজের অধিকার জ্ঞানে ছেদন করে বৃক্ষকে রিক্ত করে দিত; অনাবশ্যক খনিজের উত্তোলন করে, ধরণীকে দুর্বল করে দিত; জীবন সত্যলাভের উদ্দেশ্যে নয়, বিলাসিতা ও বাণিজ্য করার কারণেই অর্পণ করতো। ...

আর পূর্বকালে এমনই মানবসমাজ করার কারণে জগতকে ঋষিশূন্য করে ফেলেন, আর তাই সম্পূর্ণ মানবকুল বিনাশের দ্বারে স্থিত হয়ে গেছিল। ... (মহারাজের দিকে তাকিয়ে) ... মহারাজ, ক্ষমা... মহারানী ক্ষমা । ... আমি আমার ভ্রান্ত কল্পনার সাগরে ডুবে গেছিলাম; সত্য-অসত্যের বোধ হারিয়ে, সমস্ত পাণ্ডিত্য ভুলে গিয়ে, আমি একজন মহামূর্খের মত ব্যবহার করছিলাম। ... আমাকে আমার পদ থেকে মুক্ত করে দিন মহারাজ; আমি আমার পদকে কলুষিত করে দিয়েছি"।

মহারাজ হেসে মন্ত্রীকে কিছু না বলে, এবার সেই স্ত্রী, যার কাছে অর্ণব সদা আসাযাওয়া করতো, তার কাছে এলেন । সেই স্ত্রী হেসে বললেন, "রাজন, অর্ণবকে মুক্ত করে দাও, আর নিয়ে এসো এখানে"। ... মন্ত্রী অবাক হয়ে গেলেন, মহারাজের সেই অসভ্য স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে। ... অর্ণবকে বন্দি অবস্থা থেকে নিয়ে আসলে, অর্ণব নেত্র পূর্ণ অশ্রু নিয়ে বললেন, "মা! ... এবার তুমি চলে যাবে না?... তোমার তো কাজ হয়ে গেছে!"

মন্ত্রী পুত্রের কাছে এসে অস্পষ্ট কণ্ঠে শাসন করার ভঙ্গিতে বললেন, "কি বলছো পুত্র, এই স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করে সম্পূর্ণ নারীজাতিকে নীচ কেন প্রমাণ করছো!" ... অর্ণব পিতার দিকে না তাকিয়ে, সেই স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে, তাঁর বক্ষে নিজের শরীর স্থাপন করে বললেন, "মা... কখনো তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করলে, কি করবো আমি মা!" ...

সেই স্ত্রী অর্ণবের মাথায় স্নেহ হস্ত রেখে বললেন, "নেত্র বন্ধ করে ধ্যান করবে, দেখবে আমি তোমার হৃদয়তেই স্থিতা রয়েছি ... আর শোনো পুত্র, যা তোমাকে শিখিয়েছি, তা ভুলে যাবেনা কিন্তু"। ... মন্ত্রী এবার পুত্রকে সেই স্ত্রীর থেকে পৃথক করতে বল প্রয়োগ করলে, মহারাজ সেই স্ত্রীর চরণ তলে স্থাপিত হয়ে বললেন, "আমি ধন্য হলাম মা! ... এক মুহূর্তের জন্য তুমি যখন কেবল নিজের পুত্রকে মন্ত্রী যেন ঋষি-আশ্রমে না পাঠায়, তা নিশ্চয় করতে বলেছিলে, তখন সন্দেহ হয়েছিল। ... তার জন্য ক্ষমা মা!"

মহামন্ত্রী এবার মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, এক পতিতা স্ত্রীর কাছে এসব কি বলছেন আপনি!" ... মহারাজ হেসে বললেন, "পতিতা! ... (স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) ... কি বলে ও মা!" ... অর্ণব বললেন, "পিতা উনি অন্য কেউ নন, সাখ্যাত মাতা সর্বাম্বা। ... আমি বেপথে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে অপার স্নেহ দিয়ে সুশিক্ষা প্রদান করেছিলেন । কিন্তু আপনাকে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য, তিনি আমাকে আপনার কোষাগার থেকে অর্থ নিয়ে এসে, আপনাকে এমন অবস্থায় আনতে বলেছিলেন, তাই ...!"

মহামন্ত্রীর নেত্র ছলছল করে এলো এবার । ... তিনি বললেন, "মা, ঋষিদের অপমান করেছি, ভুল বুঝেছি, ক্ষমা চেয়েছি, আর নিজেকে ক্ষমা করেও দিয়েছি। ... কিন্তু তোমাকে পতিতা বলার পর নিজেকে কি করে ক্ষমা করবো মা!" ... মাতা সর্বাম্বা এবার হেসে বললেন, "মাতা কি তোমাদের পর! ... দুটি না অপশব্দ বললেই মা কে! ... তা বলে কি মা তোমাদের পর হয়ে গেল! ... ওঠো কেশরী। ... পদত্যাগ নয়, যেই কর্ম করে ফেলেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত করো, সমস্ত রাজ্যবাসীকে পুনরায় সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ করে দাও"। ... এই বলে মাতা সেখান থেকে নিজের উর্জ্জাকে সীমিত করলেন"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন এই সমস্ত কথা বলে বললেন, "পুত্রী, উপনিষদ আমাদেরকে কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছে, আর সেই কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা রূপে উঠে এসেছে ভগবৎ গীতা, উদ্ধব গীতা, সাংখ্য, ও বেদান্ত। ... কিন্তু পুত্রী, কারণ তত্ত্বের পারেও যে সত্যতত্ত্ব অবস্থান করে। ...

সূক্ষ্ম, কারণ, এই দুইয়ের মধ্যেই তিন তত্ত্ব বিরাজ করে, ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব, এবং সৃষ্টিতত্ত্ব। কিন্তু সত্যতত্ত্ব! সত্যতত্ত্ব যে তাই যেখানে এই তিন সূক্ষ্ম ও কারণ তত্ত্বের সমাহার হয়। অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব, এবং সৃষ্টিতত্ত্বের সমাহার হয়, তাই যে সত্যতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের নিষ্কাসন ঔপনিষদীয় ঋষিগণ করেন নি। আর সেই কারণেই মাতার নির্দেশে তাঁরই এই বাহন, পূর্ণসূর্যসম ৩২ কলার অবতার, প্রভু ব্রহ্মসনাতন অর্থাৎ তোমার পিতা, মাতারই দ্বারা কথিত এই কৃতান্ত কথার বিবরণ প্রদান করেলেন তোমাকে যা উপনিষদেরও অতীত। ...

এই কথা যিনি ধারণ করতে সক্ষম, তিনি পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, ন্যায়অন্যায়, ধর্মাধর্ম সমস্ত কিছুর গণ্ডিকে ছাড়িয়ে, সম্যক ভাবে মোক্ষের দ্বারে উপস্থিত হবেন। না, কেবল এই যোনির বন্ধন থেকে মুক্তি নয় যেমন সমস্ত পুরাণ দেখিয়েছে বা বিবরণ প্রদান করেছে, সম্যক ভাবে মোক্ষ, অর্থাৎ তিনি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকেই মুক্ত হয়ে যাবেন । ... মাতা কেবল এই কৃতান্তকথায় উপনিষদের-অতীত কথাই বলে সাধককে মোক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হবার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এখানে প্রেমের কথা বলেছেন, যার কারণে সাধক মোক্ষ লাভ করতেও সক্ষম।

এই হলো মাতা সর্বাত্মা, যিনি আমার আরাধ্যা, আমার গুরু, স্বয়ং অখণ্ড পরাপ্রকৃতি, স্বয়ং ব্রহ্মময়ী, তাঁর আমার বিকারের নিধনের উদ্দেশ্যে করা নয়লীলা, এবং বলতে গেলে সমস্ত বিশেষ লীলা। এবার তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকে, তার ব্যপারে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। মাতার অভয়দান থাকলে, আমি নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে বলবো"।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মনির্দেশিকা

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, আমার কাছে একটি জিনিস পরিষ্কার, আর তা হল এই সত্যের ধারণা করার জন্য কনো শাসক কখনোই প্রশ্রয় দেবেন না, বা সত্য বলতে দিতে পারবেন না। কেন বললাম এমন কথা? কারণ যিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করেননি, তিনি এই সত্যকে যে উপলব্ধি করতে হয়, তার ধারনাও করতে পারবেন না; আর যিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলেছেন, তিনি শাসক হবার প্রয়োজনও মনে করবেন না, কারণ তাঁর কাছে রাজাপ্রজার সমস্ত ভেদভাব বিনষ্ট হয়ে গেছে।

অর্থাৎ, এই সত্য উপলব্ধি স্বয়ংকে করতে হয়, বা যদি অত্যন্ত ভাগ্যশালী হয় কনো সমাজ, তবে কনো গুরু এই সত্যশিক্ষার স্থাপনের উদ্দেশ্যে আশ্রম স্থাপন করতেও পারেন, যদিও তার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, এবং আরো কঠিন সত্য হলো যদি এমন আশ্রমও স্থাপিত হয়, তবুও শিষ্য বা শিষ্যালাভের সম্ভাবনা অত্যন্তই কম, কারণ সেই একই, এই কঠিন সত্যকে যে উপলব্ধি করতে হয়, তার ধারণা করাই অসম্ভব, বিশেষ করে ভ্রমের জগতে ভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করে।

সেই ক্ষেত্রে পিতা, অর্থাৎ কেউ যখন কারুর এই বিষয়ে মার্গদর্শন করার জন্য অবস্থানই করেন না, সেই অবস্থায় এই সত্যলাভ যদি কেউ করতে চান, তার উপায় কি? আমার প্রশ্নের একপ্রকার উত্তর আপনি আগেই দিয়েছেন, অর্থাৎ কি করলে এই বোধের উদ্দেশ্যে আমরা পথ চলি, তা আপনি পূর্বেই বলেছেন, যেখানে আপনি মনঃসংযোগ, প্রাণসংযোগ, ভূতের প্রতি অত্যাচার এবং ধ্যানের কথা বলেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য কিছু। আমার প্রশ্ন এই যে, এই সমস্ত কিছু করার কালে, এমন কিছু অভ্যাস কি করা যেতে পারে, যা আমাদের এই পথে চলাকে সহায়তা প্রদান করতে পারে?

অর্থাৎ যদি জ্ঞান অর্জনের কথা বলেন, তবে সেই জ্ঞান অর্জন করার সঠিক পথ কি, যেই পথে ভ্রমাচ্ছন্ন হয়ে পরার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যদি নিত্যদিবসযাপনের অভ্যাসের কথা বলি, তবে সেই অভ্যাস করার সময়ে আহার কি করা উচিত, নিদ্রা কেমন যাওয়া উচিত, জীবনধারা কেমন হওয়া উচিত, জীবনের বিবিধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি কেমন থাকা উচিত, আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই। ... আসলে আমি জানতে চাই এই কথা যে, যদি আমি কনোদিন আপনার নির্দেশ লাভ করে কিছু শিষ্য বা শিষ্যাকে শিক্ষাদান করতে উদ্যত হতে পারি, তবে কি প্রকারে আমি আমার শিষ্য বা শিষ্যাদের শিক্ষা প্রদান করবো, যাতে তাঁরা সত্যলাভে সমর্থ হয়।

কি ভাবে তাঁরা জীবনযাপন করবে? কি আহার করবে তারা? শিক্ষাই বা কি পদ্ধতিতে বা কার পর কি শিক্ষা গ্রহণ করবে? সমাজের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি কিরূপ হওয়া উচিত? এই সকল ব্যাপারে আমাকে বিস্তারে বলুন পিতা। আমি শিক্ষা দেবার অনুমতি লাভ করি বা

না করি, আমি চাই, আপনার সেই নির্দেশগুলি ব্রহ্মচারণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় আচরণ রূপে লিপিবদ্ধ করে রাখতে, যাতে ভাবিকালে যেই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক হন, তাঁর সহায়তা হয়।

আসলে পিতা, সত্যের ধারণা করতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট ধারায় জীবনযাপন বা জীবনের আচরণকে স্থির রাখতে হয়। হ্যাঁ, যতই ভ্রমের নাশ হয়, ততই তা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ঠিকই, কিন্তু যখন তা হতে শুরু করে, তার মধ্যেই অনেক কিছু এতই এলোমেলো হয়ে যায়, আমাদের মনের মধ্যে এমনই কিছু ভ্রম বাসা বেঁধে ফেলে যে, আমরা আর চেয়েও আমাদের চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পারিনা। তাই পিতা আমি সেই আদর্শ চরিত্রের কথা জানতে আগ্রহী, যেই চরিত্রে উপনীত থেকে, সত্যলাভের পথে বাঁধালাভ হ্রাস পেয়ে যায়"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "অতি উত্তম পুত্রী। বেশ আমি তোমাকে কিছু বিষয়ে বলছি, তোমার ইচ্ছানুসারে। তবে পূর্বে বলে রাখি, প্রকৃতি বা সময় তোমার বা সকলের সম্মুখে যা এনে দেবেন, তাই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যখন আমার কথিত এই আচার বা ব্রহ্মচারণ থাকবে, আর প্রকৃতির কিছু নির্দেশ সম্মুখে উপস্থিত থাকবে, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতির নির্দেশকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, এবং তাই ঔচিত্য, কারণ আমার সমস্ত কথিত আচরণ এক নশ্বরদেহের বিচারে স্থাপিত, আর প্রকৃতির বিধান ঈশ্বরীর বিধান। তাই নশ্বরের বিধান কখনোই ঈশ্বরীর বিধানের থেকে বড় হতে পারেনা।

এই প্রাথমিক কথাকে অবশ্যই প্রাথিমিকতা প্রদান করবে পুত্রী, কারণ এই প্রাথমিক কথা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে এই ব্রহ্মসনাতন কেউ নন, শূন্যমাত্র, প্রকৃতির এক প্রিয়সেবক মাত্র। কনো ক্ষেত্রে, এঁর স্থান প্রকৃতির থেকে বড় হতে পারেনা। তাই তোমার লিখিত ভাষ্য পাঠ করে এমন যেন কনো পাঠক মনে না করেন যে, প্রকৃতি আমার সম্মুখে যেই আহারই প্রদান করুক না কেন, ব্রহ্মসনাতন এমন আহার করতে বলেছিলেন, তাই প্রকৃতিপ্রদত্ত আহারকে ত্যাগ করা উচিত। ... এই প্রাথমিক কথার পর, এবার তোমাকে ব্রহ্মচারণের কিছু কথা বলি শ্রবণ করো"।

মার্গদর্শন

ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, প্রথমেই যেই কথা বলবো তা হলো এই যে কনো ক্ষেত্রে যেন এটি তোমার শিষ্যদের ক্ষেত্রে ভুলে না যাও যে তাঁরা ভ্রমের মধ্যে স্থিত। পুত্রী, ভ্রমের মধ্যে স্থিত হয়ে, ভ্রমকে ভ্রম বলে চিহ্নিত করা হয়ে গেলেও, ভ্রমের নাশ হয়না। তাই ভ্রমের মধ্যে সুস্থ ভাবে স্থাপিত থাকার শিক্ষাই প্রাথমিক শিক্ষা হওয়া উচিত।

যেমন করে এক পক্ষীকে শিকার করার পূর্বে, আকাশে উড়তে শিখতে হয়, যেমন করে এক জলজকে খাদ্যসংগ্রহ করতে শেখার আগে জলে ভাসমান হতে শিখতে হয়, তেমনই ভ্রমের থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা প্রদান করার পূর্বে, ভ্রমের মধ্যে কি ভাবে সুরক্ষিত থাকতে হয়,

তার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাই প্রথমে এক ছাত্র বা ছাত্রীকে এই ভ্রমের জগত যেই তনুকে বেষ্টন করে স্থাপিত, সেই তনুকে সুরক্ষিত করার পদ্ধতি শেখাবে।

এদের মধ্যে প্রথম আসে উপার্জন শিক্ষা। যদি উপার্জন করতে না পারেন কেউ এই ভ্রমজগতে, তবে তাঁর পক্ষে দেহধারণই অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাই হওয়া উচিত দেহধারণের উপযুক্ত উপার্জনের শিক্ষা । যার যেমন যোগ্যতা, সেই অনুসারে সেই শিক্ষা প্রদান করো, এবং সেই অবকাশ প্রদান করো। সেই পেশা কৃষি হতে পারে, হস্তশিল্প হতে পারে, বা সামান্য উপার্জন করে নিজের উদরপূর্তি করার শিক্ষাও হতে পারে, বা তা যুগোপযোগী কনো উপায়ও হতে পারে, যেখানে স্বল্প সময় অতিবাহিত করে, দেহ ধারণের উপযুক্ত উপার্জন সম্ভব হয়।

কথায় আছে পুত্রী, পেটে খেলে পিঠে সয়, তাই প্রথমেই পেটে খেলেকে স্থাপন করবে ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে। এর বহুগুণ আছে পুত্রী। প্রথম কথা এই যে, প্রাপ্ত বয়সের কেউ আধ্যাত্মিক জীবনে পদক্ষেপ করার যোগ্য হননা, কারণ তিনি কামিনীকাঞ্চনের নেশায় ইতিমধ্যেই আবদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই নাবালক বা নাবালিকাই এই পথে পদক্ষেপ করার জন্য উপযুক্ত। হ্যাঁ হতে পারে যে, তিনি নাবালক অবস্থাতেই এই পথে চলা শুরু করেছেন, কিন্তু তোমার সংস্পর্শে ইনি মধ্যবয়সে এসেছেন। কিন্তু স্মরণ রেখো, যিনি মধ্যেবয়সে এই সত্যের উপলব্ধি করতে উদ্যত হয়েছেন প্রথমবারের জন্য, তাঁকে স্পষ্টভাবে বিনম্রতার সাথে তোমার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করো, কারণ একবার চরিত্রে কামিনীকাঞ্চনের স্পর্শ লেগে গেলে, আর কনোভাবেই সত্যযাত্রা করা সম্ভব হয়না।

তাই তোমার ছাত্র বা ছাত্রী কারা হবেন? নাবালক বা নাবালিকা। নাবালক বা নাবালিকা মানেই তাঁরা পিতামাতার অধীনে স্থিত। অর্থাৎ, তাঁর একমাত্র অবিভাবক তুমি নও। অর্থাৎ তাঁকে অন্য অবিভাবকদের অধীনেও স্থিত থাকতে হয়। আর যদি সেই নাবালক বা নাবালিকা উপার্জনের পথ থেকে অপসারিত হবার প্রয়াস করেন, তাহলে প্রথম যাদের আঘাত আসবে তাঁদের উপর, তারা হলেন তাঁদের মাতাপিতা অর্থাৎ অন্য অবিভাবকগণ। আর যেই মুহূর্তে সেই আঘাত আসবে, সেই মুহূর্তে তাঁদের মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। তাই প্রথম তাঁদের উপার্জনের দিকে মন রাখাও, এবং উপার্জন করতে শেখাও।

একবার তাঁরা উপার্জন করতে শিখে গেলে, তাঁদের প্রতি তাঁদের অবিভাবকদের বিরোধ হ্রাস পাবে। অত্যন্ত স্বভাবিক ব্যাপার পুত্রী, প্রতিটি মাতাপিতার কর্তব্যের মধ্যে পরে তাঁর সন্তানের ভ্রমশরীর যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার ব্যবস্থা করা। আর যদি সেই সন্তান শরীরকে সুরক্ষিত করার জন্য উপার্জনের থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে পিতামাতাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন, আর সেই দুশ্চিন্তার প্রভাব সন্তানের উপর স্থাপিত হবে যে, তা স্বাভাবিক।

তা ছাড়াও, যখনই উপার্জন করতে শুরু করেন সন্তান, পিতামাতার ধারণা হয়ে যায় যে, সন্তানের সামান্য হলেও স্বতন্ত্রতা আবশ্যক, কারণ সেই স্বতন্ত্রতা না থাকলে, তার উপার্জন করাই কঠিন হয়ে যাবে। তাই যেই পরিমাণ স্বতন্ত্রতা তোমার ছাত্র বা ছাত্রী লাভ না

করলে, তুমি তাঁদের শিক্ষা প্রদান করতে পারবে না, সেই স্বতন্ত্রতাও তাঁরা লাভ করে নেবে। তাই প্রথমেই নাবালিক ছাত্র বা ছাত্রীকে সেই স্বতন্ত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে উপার্জন করতে শিক্ষা দাও।

একবার যখন সেই শিক্ষা তাঁরা লাভ করে নেবে, এবং উপার্জন করতে শুরু করবেন, তখন তাঁদেরকে পরবর্তী শিক্ষা প্রদান করো, অর্থাৎ কি ভাবে উপার্জন অর্থাৎ পেশাকে জীবনের সাথে না মিলিয়ে কেবলই জীবিকারূপে স্থাপিত রাখতে হয়, সেই শিক্ষা প্রদান করো। পুত্রী, অধিকাংশ ব্যক্তিই পেশায় যুক্ত হবার পর, পেশাকেই নিজের জীবন জ্ঞান করে নেন, এবং এর ফলে ভ্রমমুক্তি অসম্ভব হয়ে যায়, কারণ তাঁর পেশা তাঁর পূর্বের ভ্রমের উপর এক নতুন অহমিকাপূর্ণ ভ্রমের আস্তরণ স্থাপন করতে থাকে।

তাই দ্বিতীয় প্রদত্ত শিক্ষা হলো, কি ভাবে পেশাকে জীবনের একটি অধ্যায়তে সীমিত করে রেখে, বাকি সময়কে জীবনযাপনের জন্য, সত্যশিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে হয় । এই দুই অভ্যাসে তোমার ছাত্র বা ছাত্রীরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তারপরেই, তাঁদের পরবর্তী চরণে স্থিত করো।

পরবর্তী চরণ হলো আহারের ধারা নির্ধারণ। পুত্রী, এও এই ভ্রমশরীরেরই একটি আচরণ। আর আশা করি তোমার প্রশ্নও এই ছিল যে, কি কি আচরণ এই ভ্রমদেহে করে, সত্যশিক্ষা অর্জনের দ্বারে স্থিত হতে হয়, তাই তো?"

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "হ্যাঁ পিতা, আমি আমার প্রশ্নকে গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না, কিন্তু আমার জানার অভিপ্রায় এটিই ছিল, অর্থাৎ কি কি ভাবে এই ভ্রমদেহে আচরণ করতে হয়, যার ফলে আমরা একসময়ে সত্যের ধারণা করার উপযোগী হয়ে উঠি"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক পুত্রী, এই আহার আচরণ হলো, সেই আচরণের মধ্যে একটি, যা দ্বারা ভ্রমজীবন অতিবাহিত হয়। এই আহারের আচরণ ছাড়া, আরো একটি আচরণ হলো নিদ্রা বা বিশ্রাম। ... আর তৃতীয় আচরণ হলো মৈথুন অর্থাৎ বিলাসিতা। পুত্রী, একবার উপার্জন করে, এবং পেশাকে জীবনের একটি অভিন্ন অঙ্গ করে বাকি জীবনের অঙ্গকে উপার্জন ও পেশার থেকে মুক্ত করে নিতে পারলে, এবার বাকি জীবনের অঙ্গকে স্থিরতা প্রদান করতে হয়, আর তার স্থিরতা প্রদান সম্ভব আহার, নিদ্রা ও মৈথুন অর্থাৎ কি আহার করা উচিত, কি ভাবে বিশ্রাম করা উচিত, এবং কি বিলাসিতা গ্রহণ করা যেতে পারে, তার শিক্ষা ।

পুত্রী, ব্রহ্ম যখন পুরুষের আবেশে স্থিত, তখন তিনি তিন খণ্ডে নিজেকে ভগ্ন করে নেন, যারাই হলো ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, রজগুণ এবং তমগুণ, তাই আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, অর্থাৎ খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রামের ধারা এবং বিলাসিতামুখরতাও তিন প্রকার হয়। সত্ত্বগুণী আহার অর্থাৎ তাঁদের জন্য আহার অভ্যাস, যারা লঘু পরিশ্রম করেন; রজোগুণী আহার অর্থাৎ তাঁদের জন্য আহার অভ্যাস, যারা কিছুটা লঘু পরিশ্রম করেন, এবং কিছুটা কঠিন পরিশ্রম করেন; আর তমগুণী আহার অর্থাৎ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁদের আহার অভ্যাস।

যারা অতিলঘু দেহবল প্রয়োগ করেন, তাঁদেরকে আহারও স্বল্প করতে হয়, কারণ তাঁদের হজম শক্তি কম থাকে, এবং দেহে পুষ্টির প্রয়োজনও কম। তাই তাঁরা স্বল্প আহার করবেন, মধু জাতীয় আহার কম করবেন, লবণ কম গ্রহণ করবেন সমস্ত আহারে, এবং সমস্ত আহারেই মশলাপাতি কম গ্রহণ করবেন। অধিক মশলা, অধিক লবণ, অধিক মধু, তাঁদের হজম হবেনা, আর তাই তেমন আহার গ্রহণ করলে, যাতে লবণ, মশলা এবং মধু অধিক, সেই ক্ষেত্রে তাঁরা দেহরোগে আক্রান্ত হবেন। এই তালিকায় কারা কারা আসবেন, অর্থাৎ কারা সত্ত্বগুণী আহার গ্রহণ করবেন?

পুত্রী, পেশাগত ভাবে এই আহারের বিধান দেওয়া মুর্খামি হবে, কারণ পেশা অনুসারে মানুষ সকল ক্ষেত্রে পরিশ্রমী হননা। যেমন দেখো, এক যজমান সাধারণ ভাবে পরিশ্রমী হওয়ার কথা নয়, কিন্তু তিনি যদি হৃদয়বাণ হন এবং অন্যের সেবা করার দিকে মনযোগী হন, তবে তিনি পরিশ্রম করতেই পারেন। তেমনই ভাবে দেখলে, পেশাগত ভাবে সত্ত্বগুণী আহারের বিধান দেওয়া সঠিক নয়। তাই সঠিক সঠিক ভাবে বলতে গেলে, যিনি না তো অতিরিক্ত দেহবল ব্যবহার করেন, আর না কনো নির্মাণজনক কর্ম করেন, তাঁর জন্য এই সত্ত্বগুণী আহার সঠিক। তাও যদি পেশাগত ভাবে বলতে চাও, তবে যজমান, বিচারক, শিক্ষক, বলপ্রয়োগ ব্যবহার না করা এবং কনো নির্মাণকাজ না করা শ্রমিক, হিসাবরক্ষক, নায়েব, সেই বনিক যিনি নিজে কেবল হিসাব রাখেন এবং বিশিষ্ট খরিদ্দারকে নিজের বাণিজ্যে যুক্ত করেন, তাঁরাই সত্ত্বগুণী আহার গ্রহণ করবেন।

ইনারা যদি অধিক পরিমাণ আহার করেন, এবং সেই আহারে মিষ্টতা, লবণতা এবং মশলা অধিক থাকে, তবে ইনারা স্বল্পবয়সেই রোগে জরাজীর্ণ হয়ে যাবেন । আর তাই ইনারা অবশ্যই মৎস্য, মাংস, ফল, সবজি সমস্ত কিছুই গ্রহণ করতে পারেন, তবে সবজির আধিক্য থাকাই উপযুক্ত। সপ্তাহান্তে একটিবার মৎস্য বা মাংস গ্রহণ করতে পারেন।

তবে যারা নির্মাণ করেন অর্থাৎ যেকোনো প্রকার শিল্পী, তা মৃৎশিল্পী হন, অঙ্কনশিল্পী হন, লেখক হন, বা রাজা, রানী, মন্ত্রী, ইনাদের জন্য উপযুক্ত আহারঅভ্যাস হলো রজোগুণী আহার। রজোগুণী আহার অর্থাৎ যেই আহারে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ, মশলা এবং মিষ্টতা থাকবে, আর সেই আহারের পরিমাণও যথার্থ হবে। বুদ্ধিবল ব্যবহার করা ব্যক্তি ইনারা, আর তাই সেই অনুসারে পুষ্টি গ্রহণ করতে হবে ইনাদের। আর তাই অত্যাধিক আহার করবেন না ইনারা, তবে আহারে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ, মশলা এবং মিষ্টতা গ্রহণ করতে পারেন, তবে তাও অতিরিক্ত নয়। নিয়মিত মাংস বা মৎস্য গ্রহণ করতে পারেন ফল ও সবজির সাথে সাথে ইনারা, তবে পরিমাণ যেন অতিরিক্ত না হয়।

আর অন্তে পরে থাকে পরিশ্রমীদের আহার, তমগুণী আহার, যাতে আহারের পরিমাণ অধিক হবে, এবং লবণ, মশলা বা মিষ্টতা অধিক থাকবে। এই আহার তাঁদের জন্য যারা ক্ষেতে ক্রিয়া করেন, বা যারা দেহবলে শ্রমিক, সেনার কাজে নিযুক্ত। অন্যরা এই পরিমাণ আহার হজম করতে পারবেন না। পুত্রী, ছাত্র ও ছাত্রীদের মানসিকতা দেখে বুঝতে পারবে তুমি যে কে কেবল দেহশ্রম করারই উপযোগী, তাঁদেরকে এই আহার বিধান দেবে, অন্যদেরকে নয়।

যাদেরকে দেখবে পরিশ্রমকাতর, এবং নির্মাণকাজও করতে পারেন না, অর্থাৎ নির্মাণের প্রতিভা তাঁদের অন্তরে প্রকাশিত নয়, তাঁদেরকে সত্ত্বগুণী আহারের বিধান দেবে। এবং যারা নির্মাণকাজে যুক্ত হতে আগ্রহী, সাধক, শাসক, তাঁদেরকে রজোগুণী আহারের বিধান দেবে। এইরূপ আহারের বিধানে তাঁরা রোগমুক্ত থাকবেন, এবং জেনে রেখো যে কেবল মাত্র রজোগুণী আহার গ্রহণ করা ব্যক্তিই সত্যযাত্রা করতে সক্ষম, অন্যরা নয়।

এর অর্থ এই ন যে,, শ্রম যেমনই করি রজোগুণী আহার গ্রহণ করবেন তাঁরা। ভালো করে বোঝো পুত্রী, যারা প্রতিভার চর্চা করেন, শাসনের দিকে মনযোগী এবং সাধনের দিকে মনযোগী, তাঁদেরকেই কেবল রজোগুণী আহারের বিধান দেবে। এবং তাঁরাই সত্যজ্ঞান আহরণের জন্য উপযুক্ত। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাঁরাই পেশায় যুক্ত হবার পর, পেশাকে জীবনের একটি স্রোত করে রেখে, জীবনের মূলস্রোতের সন্ধান করতে সক্ষম। তাই যেই কথা তুমি বললে, অর্থাৎ ছাত্র বা ছাত্রী রাখার কথা, যদি তাঁরা সেইরূপ হন যে তাঁদেরকে তুমি রজোগুণী আহার করার নির্দেশ দিতে পারো, তবেই তাঁদেরকে সত্যজ্ঞানে ভূষিত করার জন্য ছাত্র বা ছাত্রী করার কথা চিন্তা করবে, অন্যদের নয়"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "তবে কি নিরামিষ আহার সঠিক নয় সাধকদের জন্য?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন সামান্য হেসে বললেন, "পুত্রী, নিরামিষ বলতে তুমি কি মৎস্য, বা মাংসবিনা আহারের কথা বলছো? ... পুত্রী, প্রাণ তো উদ্ভিদেরও আছে, আবার পশুরও আছে, তাই প্রাণহত্যার প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই তুলবে না আশা করি, প্রাণ হত্যা না করলে, ভ্রমিতের হত্যা না করলে, দেহরক্ষা অসম্ভব। ... তবে যদি কেবল উদ্ভিদ ভোজনের কথা বলো, সেইক্ষেত্রে একটিই কথা বলবো পুত্রী, আমরা কেবল আমাদের আহার থেকে পুষ্টিই লাভ করিনা, আমরা মানসিকতাও লাভ করি।

উদ্ভিদ সেই প্রাণ, যেই প্রাণ দুদুটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনসংগ্রামের থেকে মুক্ত, আর তা হলো আহার লাভ এবং সঙ্গমলাভ। ...উদ্ভিদকে আহার সংগ্রহ করার জন্য কনো সংগ্রাম করতে হয়না কারণ তাঁরা সালোকসংশ্লেষণ করেন, আর তাকে সঙ্গমের জন্যও কনো সংগ্রাম করতে হয়না, সেই সংগ্রাম মউমাছিরা তাঁদের জন্য করে দেয়। আর এই দুই সংগ্রামই হলো এই ভ্রমজগতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংগ্রাম, যা জীবজগতকে সদা গতিমান রেখে দেয়, আর এই গতির কারণেই তাঁদের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। এই প্রতিভার বিকাশ না হলেই, তাঁরা সেই সমস্ত কিছুর চিন্তা করে, যা করলে তাঁরা শ্রম না করে আহার লাভ করতে পারবে, যেমন পুরাকালে ব্রাহ্মণরা করতেন, যা পুরাণের পাতায় পাতায় দেখতে পাও।

যতদিন ব্রাহ্মণরা মাংস আহার করতেন, ততদিন তাঁরা পরিশ্রমী ছিলেন, এবং ততদিন তাঁদের মধ্যে প্রতিভার আনাগোনা লেগেই থাকতো, কিন্তু যেই মুহূর্ত হতে তাঁরা কেবল শাকাহারি হতে থাকলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁরা প্রতিভার থেকে অপসারিত হলেন, এবং বিভিন্ন ফন্দি করতে থাকলেন, যেই ভাবে অন্যের থেকে আহার ছিনিয়ে নেওয়া যায়, অন্যের থেকে বিলাসিতার বস্তু ছিনিয়ে নেওয়া যায়, এমনকি অন্যের স্ত্রীও ছিনিয়ে নেওয়া যায়।

অর্থাৎ পুত্রী কি বুঝলে? যত অধিক উদ্ভিদদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে, তত অধিক আলস্য আসবে, আর তত অধিক কূটবুদ্ধিকে আহ্বানে সচেষ্ট হবে, যার বলে তুমি অন্যের থেকে তস্করি করে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের চেষ্টা করবে। ... আর এর কারণ একটিই, আর তা হলো আমরা আহারের থেকে কেবলই পুষ্টি গ্রহণ করিনা, আমরা আহারের থেকে চাঞ্চল্যও গ্রহণ করি। উদ্ভিদ স্থবির, আর তাই আমরা কেবল উদ্ভিদ আহার করলে হয়ে উঠি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, আর তাই আমরা সমানে আমাদের সমস্ত প্রতিভা হারিয়ে ফেলি।

তাই মাংস গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে উদ্ভিত হোক বা মাংস, অবশ্যই যাকে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য করছো, তোমার উদরপূর্তির জন্য, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, আর তাই সর্বদা তাদের সহজমৃত্যু প্রদানে সচেষ্ট হবে। মাংস আহারের সময়ে অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে স্ত্রীদেহ কখনোই ভক্ষণ করবে না । তাই স্ত্রী ছাগ, বা গরু, বা স্ত্রী মেশ আহারের জন্য উপযুক্ত নয়, এমনকি পক্ষীমাংসও আহার করা যায়, কারণ তা আঁশযুক্ত ও সহজপাচ্য, কিন্তু সেক্ষেত্রেও স্ত্রী হংস, বা মুরগি, বা কনো পক্ষীর স্ত্রীকে হত্যা করবে না।

এর কারণ এই যে, স্ত্রীদের দেহ যেহেতু শিশুর জন্মদেবার জন্য উপযুক্ত, তাই সেই দেহকে জন্মপ্রদত্তা করে রাখার জন্য, সহস্রকমের ক্রিমি আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, যা পাচ্য নয়। তাই স্ত্রীর মাংস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সকল প্রকার পুরুষ পশু ও পক্ষী, যারা তৃণভোজী, তাদের মাংস অগ্নিতে জ্বালিয়ে, শুদ্ধ করে ভক্ষণ করা আবশ্যক। এই মাংস আলস্য দূর করবে, প্রতিভাকে আহ্বান করবে, এবং সদ্বুদ্ধি প্রদান করবে, তথা কুটবুদ্ধির থেকে আমাদের দূরে স্থিত করবে, এবং ভেদভাবের থেকে মনকে অপসারিত করবে।

আর মৎস্যের মধ্যে, ঝিল, পুকুরের মাছ আহার তমগুণী আহারের তালিকাতে থাকতে পারে, সত্ত্বগুণীর আহারের থালেও থাকতে পারে, কিন্তু কনো ভাবেই রজোগুণীর আহারের থালে থাকবে না। অর্থাৎ সাধক যদি মৎস্য গ্রহণ করেন, শাসক যদি মৎস্য গ্রহণ করেন, এবং যারা প্রতিভাশালী নির্মাতা, তাঁরা যদি মৎস্য আহার করেন, তবে অবশ্যই গতিশীল জলধারার মৎস্য আহার করবেন, অর্থাৎ হয় সমুদ্রের, নয় যেই নদী কনো না কনো ভাবে সাগরের সাথে যুক্ত, তার মৎস্য আহার করবেন।

পুত্রী, যারা নির্মাণ কাজ করেন, তাঁরা একাকজন স্রস্টা হন। হয় তাঁরা সঙ্গীতের নির্মাণ করছেন, নয় কলার, নয় কাব্যের, নয় প্রবন্ধের, নয় শাসনধারার, নয় সত্যউদ্ঘাটনে ব্যস্ত। তাই তাঁদের উপর সমাজ নির্ভর করেন। আর পুকুর বা ঝিলের মৎস্য বদ্ধ স্থানে থাকে বলে, আসক্তির সঞ্চার করে। তাই সেই আহার যদি রজোগুণীরা গ্রহণ করেন, তবে তাঁদের নির্মাণও সেই আসক্তিকেই ধারণ করে থাকবে আর তা সমাজকে উন্নতির দিকে নয়, দুর্দশার দিকে প্রসারিত করবে। তাই অবশ্যই এক রজোগুণী নদীর বা সাগরের মাছ খাবেন"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু যদি কেউ নিরামিষাশী হয়ে দুগ্ধ পান করেন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, দুগ্ধ কি করে নিরামিষ আহার হতে পারে? যেই আহার এক মাতা নিজের রক্ত দ্বারা নির্মাণ করছেন, তা নিরামিষ আহার কি করে হতে পারে? মাংস আহার করার সময়ে, মৎস্য আহার করার সময়ে তোমরা রক্তপান করো? না, মাংস বা মৎস্যকে জ্বালিয়ে রক্তশূন্য করে তা গ্রহণ করো । কিন্তু দুগ্ধ তো সাখ্যাত রক্তই, সেই রক্ত যা এক জননী নিজের স্তনে নির্মাণ করে আহারযোগ্য করে তোলেন। তা কেবল আমিষই নয়, তা একপ্রকার মহাহিংস্রতাও, এবং অভব্য আচরণও।

এক জননী নিজের রক্তকে জল করে, নিজের শাবককে আহার করান। সেই আহার তুমি যদি ছিনিয়ে খেয়ে নাও, তা এক মাতার সঙ্গে করা অত্যাচার, সমস্ত জননীর প্রতি করা অত্যাচার। ... তাই পুত্রী, এই ভয়ানক অত্যাচার থেকে সাধক যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন দূরে থাকার। তবে হ্যাঁ, যদি আকাল পরে, যদি অনাহার আসে, তবে তো শকুনের মাংস আহার করেও, বরাহের মাংস আহার করাও ন্যায়, কারণ জীবনের নাশকে যতক্ষণ আটকানো সম্ভব ও ন্যায়পূর্ণ, ততক্ষণ তাকে আটকাতে হয়, অন্তত যতক্ষণ না মোক্ষলাভ হচ্ছে, ততক্ষণ। কারণ যেই ব্রহ্মাণ্ডকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রকৃতি নির্মাণ করে দিয়েছেন, সেই পরিশ্রম তাঁকে যাতে পুনরায় না করতে হয়, তার জন্য সদাই সচেষ্ট থাকা আমাদের ধর্ম"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "অনেক কিছু জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল পিতা। এবার আমি নিদ্রা অর্থাৎ বিশ্রামের ক্ষেত্রে সাধকের জন্য বিধান, অর্থাৎ যারা রজোগুণী আহার করবেন, কেবল তাঁদের জন্য বিধানকেই জানতে চাই, কারণ আমার চিন্তা ও ভাবনা কেবলই তাঁদেরকে নিয়ে"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বলতে থাকলেন, "পুত্রী, তমগুণীর বিশ্রামের প্রয়োজন সর্বাধিক, সত্ত্বগুণীর বিশ্রামের প্রয়োজন সর্বনিম্ন, এবং রজোগুণীর নিদ্রার প্রয়োজন বা বিশ্রামের প্রয়োজন, ঠিক এঁদের মধ্যস্থলে । সত্ত্বগুণী একটি সম্পূর্ণ দিনকে ছয়খণ্ড করলে, তার মাত্র একটি খণ্ডই বিশ্রাম নেবেন। একজন তমগুণী বিশ্রাম নেবেন একটি দিনের তিনখণ্ডের একটি খণ্ড। এবং একজন রজোগুণী বিশ্রাম নেবেন চার ভাগের একটি ভাগ।

পুত্রী, পূর্বেই বলেছি, একজন রজোগুণীই কেবল সাধনা করতে সক্ষম। এর কারণও তোমার কাছে আশা করি পরিষ্কার। একজন সত্ত্বগুণী যেহেতু কারুর নির্দেশ মেনেই কেবল কাজ করেন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বয়ংক্রিয় কর্ম তাঁরা করেন না, এবং তাঁরা পরিশ্রমও অধিক করেন না। তাই তাঁরা যদি সাধনার প্রয়াস করেন, তবে তাঁরা ব্যর্থই হন, আর এর স্পষ্ট কারণ এই যে, তাঁরা স্বয়ং কিছুই উপলব্ধি করার সামর্থ্য ধরেননা, আর সত্যকে ধারণা স্বয়ংই করতে হয়।

গুরু সত্যের নিকটতম ব্যখ্যা প্রদান করবেন, গ্রন্থ সত্যের অন্তিম সম্ভব ব্যখ্যা প্রদানে সক্রিয়। কিন্তু পূর্ণ সত্য কারুর পক্ষে কারুকে ব্যক্ত করাই সম্ভব নয়। সমস্ত শব্দই ভ্রমের প্রকাশক। আর ভ্রম দ্বারা সত্যকে ব্যাখ্যা করা সম্ভবই নয়। তাই সত্যকে স্বয়ংই উপলব্ধি করতে হয়। আর যেহেতু সত্ত্বগুণী স্বয়ংক্রিয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন, সেহেতু তাঁর পক্ষে সত্যকে ধারণা করা অসম্ভব।

অন্যদিকে তমগুণীও তিনি যিনি অন্যের আদেশ বা নির্দেশ অনুসারে বলপূর্বক পরিশ্রম করেন । তাই সত্ত্বগুণীরা যেমন সত্য উপলব্ধির জন্য প্রয়াসশীলই হননা, এবং নিজের কল্পনাতেই আবদ্ধ থাকতে এবং মনগড়া সত্যকে ধারণ করে থাকেন, তমগুণী তেমন হন না। তাঁরা প্রয়াস করেন কঠিন পরিশ্রম দ্বারা, কিন্তু যেহেতু স্বয়ংক্রিয়তা থেকে ইনারাও দূরে স্থিত, তাই ইনারাও সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননা, তবে সত্ত্বগুণীদের ন্যায় মনগড়া সত্যকে ধারণা করে নেন না ইনারা।

তাই পুত্রী, তমগুণীকে যদি সত্যের ব্যাখ্যা ভুল করেও দাও, সত্ত্বগুণীকে ভুল করেও সত্যের ব্যাখ্যাও দেবে না। সত্যের ধারণা দুইজনেই করতে পারবেন না, দুইজনেই সত্যের উপলব্ধি করতে সক্ষম নন, তবে তমগুণী ব্যর্থ হলেও, সত্যকে বিকৃত করে দেবেন না। তবে সত্ত্বগুণীকে যদি সত্য ব্যখ্যা করো, তবে তাঁরা ভয়ানক ভাবেই সত্যকে বিকৃত করে দেবেন, আর তা এমন রূপ ধারণ করে নেবে যে সম্যক জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেবেন। এর সব থেকে স্পষ্ট উদাহরণ তুমি দেখেছ ব্রাহ্মণদের রচিত বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে।

ব্রাহ্মণরা ছিলেন সত্ত্বগুণী, কারণ তাঁরা পরিশ্রম করতেন না, এবং পরবর্তীতে শাকাহারি হয়ে ওঠার কারণে তাঁরা অন্যের সম্পদ হননের জন্য ছলও করতেন, এবং অন্যের থেকে ধন, ধান, এমনকি পত্নী পর্যন্ত লুণ্ঠন করতেন, ব্রাহ্মণদানের অজুহাতে। আর এই অলসশ্রেষ্ঠ মানবপ্রজাতি নিজেদের আলস্য ও অহংকারের মধ্যে স্থিত থেকে সত্যের ধারণা করতে যখন যান, তখন একাধিক পুরাণ রচনা করেন, যা অন্যকিছুই নয় সাধারণ মানুষের থেকে লুণ্ঠনকে শাস্ত্রসম্মত করে স্থাপন করার ছলনা, আর সেই সমস্ত প্রয়াসের অন্তরালে সত্যকে যখন যখন তাঁরা ব্যখ্যা করতে গেছেন, তখন তখন অদ্বৈত এবং প্রকৃতিকে ধারণা করতে না পেরে, পুরুষ বা ভ্রমের আরাধনা করে গেছেন, এবং সকলকে করতে শিখিয়েছেন।

তাই পুত্রী, সত্ত্বগুণীকে সত্যবাখানের থেকে বর্জন করো। তুমি তো নৃপতি নও যে বিধান দেবে সমাজকে। কিন্তু যদি আচার্য পদে আসীন হও কনোকালে, তবে অবশ্যই সত্ত্বগুণীকে নিজের শিষ্যত্ব থেকে বর্জন করবে, তা সেই সত্ত্বগুণীর জন্মগত পরিচয় যাই হোক না কেন। পুত্রী সত্যকে ধারণা করার অধিকারী সকলেই, কিন্তু যার পেটে যতটা সয়। সত্ত্বগুণীদের হজম শক্তি অতি শীর্ণ, সেটি অবশ্যই স্মরণ রাখবে। না তো এঁদেরকে সত্যের বিবরণ দেবার প্রয়াস করবে, আর না এঁদের সাথে সত্যের বিষয়ে কনো যুক্তিতর্কও করবে।

পুত্রী, ভ্রমিত সকলেই, কিন্তু যিনি ভ্রমেরই আরাধনা করেন, তাঁর সাথে আলোচনা কেবল মুর্খামি নয়, স্বয়ং সত্যের অপমান। সত্যের সম্মানকে রক্ষা করার জন্য, সহস্র অপমানও সহ্য করা যায় । নিমাইপণ্ডিত সেই অপমান সহ্য করার কালে ব্রাহ্মণদের হাতে নিহত হয়েছেন; যীশুও অপমানকে সহ্য করে নিয়েছেন, কিন্তু সত্যকে অপমানিত হতে দেননি; মহম্মদও তাই করেছেন; এবং প্রয়োজনে তুমিও তেমনই করবে, কিন্তু কনো শর্তে, নিজের এই নশ্বর প্রাণের শর্তেও সত্ত্বগুণীদের কাছে সত্যের বিস্তার করবে না, কারণ তাঁরা কেবল নিজেরা বিভ্রান্ত হওয়া পর্যন্তই সীমিত থাকেন না, তাঁরা সর্বজনকে বিভ্রান্ত করতে সদাব্যস্ত।

হ্যাঁ পুত্রী, সত্যকে সুরক্ষিত রাখাকেই সর্বক্ষণ অগ্রাধিকার প্রদান করো, সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু সত্যকে নয়। নিজের প্রাণের থেকে যদি কনোকিছু অধিক প্রিয় হয়, তবে তা হলো এক ও একমাত্র সত্য। তাই বারংবার সতর্ক করছি, যিনি জন্মসূত্রে এই সত্যকে জানার অধিকার স্থাপন করতে তোমার সম্মুখে আসবেন, বা যিনি সত্ত্বগুণী হয়ে এই সত্যকে তোমার থেকে জানতে আসবেন, তাঁকে প্রয়োজনে তিরস্কারও করো, প্রয়োজনে অপমান করো, কিন্তু কনো শর্তে সত্যের বিবরণ তাঁদের সম্মুখে করবে না, না ব্যখ্যা দানের রূপে আর না তর্ক করার রূপে।

সত্য জানার অধিকারী সকলেই, তবে যেই যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক সত্যকে জানার জন্য তা হলো রজগুণ। একমাত্র রজোগুণীই সামর্থ্য ধরেন সমস্ত ভেদভাবের নাশ করে, সত্যকে ধারণ করার। ... তাই কেবলমাত্র সেই রজোগুণীকেই সত্যের বিবরণ প্রদান করবে, যিনি সত্যজ্ঞান আহরণের জন্য নেশাগ্রস্ত। প্রয়োজনে ছল, বল, এবং অন্যান্য উপায়ও ধারণ করতে পারো তাঁর মধ্যে এই নেশাকে স্থাপিত করতে, তবে যতক্ষণ না একজন রজোগুণী হচ্ছেন, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি স্বল্পবয়স থেকে সত্যের সন্ধান করছেন, যতক্ষণ না তিনি সত্য জ্ঞান আহরণের নেশায় মত্ত, এবং যতক্ষণ না তিনি পূর্ণ আস্থা রাখছেন তোমার উচ্চারিত শব্দের প্রতি, ততক্ষণ সত্যের বিবরণ প্রদান করবে না।

আর যদি তা করো, তবে জেনে রেখো, প্রকৃতি সর্বদা আছেন আমাদেরকে ধারণ করে। যদি ভুলবশত করে ফেলো, তবে প্রকৃতি তোমাকে আটকে নেবেন বা তোমার ভুল তোমাকে ধরিয়ে দেবেন। আর যদি স্বেচ্ছাচারিতা করে তা করো, তবে প্রকৃতির দণ্ড লাভের জন্য প্রস্তুত থেকো, যেই দণ্ডের অন্তিমপর্যায় হলো পিশাচযোনি প্রদান।

পুত্রী, এক রজোগুণী এমনিই বিশ্রাম কাতর হননা, কারণ তিনি তাঁর প্রতিভাকে বাস্তবায়িত করতে সদা ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এক আচার্যের কর্তব্য হলো, সেই সমস্ত প্রতিভার প্রসারণ যাতে অহংকার বৃদ্ধির উপায় হয়ে না দাঁড়ায়, তা দেখা, এবং সেই প্রতিভাকে নিজেকে সত্যের কাছে অর্পণ করার মাধ্যম রূপে স্থাপিত করে দেওয়া। তবেই এক রজোগুণী যথার্থভাবে সত্যকে ধারণা করার উদ্দেশ্যে ধাবমান হবেন, এবং একসময়ে সত্যের নেশাও করতে থাকবেন । এই হলো পুত্রী এক সাধকের জন্য বিশ্রামের বিষয়ে যা জানা আবশ্যক, তাই। এবার তোমাকে আমি মৈথুন বা বিলাসিতার বিষয়ে বলছি শ্রবণ করো"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন মৈথুনাচরণ সম্বন্ধে বলার ক্ষেত্রে বললেন, "পুত্রী, আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের ক্ষেত্রে, মৈথুনের দ্বারা সকল প্রকার বিলাসিতাকে বোঝানো হয়। সকল প্রকার বিলাসিতার অর্থ কি, তা প্রথমেই জেনে নাও। ... যা কিছু আমাদের জন্য আবশ্যক, যখনই সেই প্রয়োজনের থেকে অধিক কিছুর কামনা করা হয়, তাই বিলাসিতা।

আহারের প্রয়োজন এই দেহকে সুরক্ষিত করতে, এবং এর মধ্যে রজগুণকে সক্রিয় রাখতে। কিন্তু যদি সেই আহারের মধ্যে একের স্থানে দশক দশক প্রকারভেদ থাকে, তা হলো বিলাসিতা। নিদ্রা আমাদের দেহের প্রয়োজন, কিন্তু সেই নিদ্রার জন্য যদি আমরা

অতিরিক্ত আরামদায়ক বিছানা প্রস্তুত করি, তা হলো বিলাসিতা। একই ভাবে সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য সঙ্গমক্রিয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন কেবলই ভোগবিলাসের উদ্দেশ্যে সেই সঙ্গমক্রিয়াকে অনুষ্ঠিত করা হয়, তা হয় বিলাসিতা।

এই বাহ্যপ্রকৃতিতে প্রায় প্রতিটি যোনিই শীত ও গরমে, আহারাদির সুবিধা লাভ করার জন্য, এবং দেহব্রহ্মাণ্ডকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্যত্র সরে যায়, আর তার কারণে জীবনের আয়ুর বিপুল কালক্ষয় হয়। সেই কারণে মানুষ নিজেকে একটিই স্থানে সুরক্ষিত করে রাখার জন্য গৃহ নির্মাণ করেন। সেই গৃহকে গ্রীষ্ম থেকে সুরক্ষিত করতে বিদ্যুতের ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু সেই গ্রীষ্মের ভানও যাতে না হয়, তার জন্য যখন বিদ্যুৎকে অত্যাধনিক অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, তা হলো বিলাসিতা।

একই ভাবে, মানুষ নিত্যকর্মকে সহজ করে দেবার জন্য সহস্র ধরনের যন্ত্রের নির্মাণ করেছেন। কিন্তু যখন সহজ এক যন্ত্রের পরিবর্তে, অত্যন্ত চাকনচিকন যুক্ত, অহেতুক যন্ত্রকে স্থাপন করা হয়, তা বিলাসিতা। মানুষ বহুধরনের কর্ম করেন, তাই তাঁর সামান্য বিনোদনও প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই বিনোদনের জন্য অতিকায় সময় ব্যয় করা হলো বিলাসিতা। মানুষ সমস্ত সময়েই চান নিত্যকর্মকে, বাণিজ্যকর্মকে দ্রুত সমাপ্ত করে নিতে, যাতে তিনি তাঁর জীবনের অর্থকে সন্ধান করতে পারেন। আর সেই কারণে মানুষ বহু ধরনের যানবাহন রচনা করেছেন।

কিন্তু যখন এমন যানবাহনকে আনায়নের প্রয়াস হয়, যা পরিবারের সদস্য সংখ্যার থেকেও অধিক, তা হলো বিলাসিতা। পুত্রী, এই বিলাসিতা অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া। কেমন জানো? কিছু মানুষ বাণিজ্যের প্রসার করার জন্য একাধিক বিলাসিতার সামগ্রী বা যোজনার স্থাপন করেন। আর সেই সকল বিলাসবহুল জীবনধারণকে সংগ্রহ করে, বা নিজজীবনে ব্যবহার করে, মানুষ নিজের নিত্যকর্মকে সহজ করতে চান, কেন? যাতে তাঁর জীবনের অর্থ সন্ধান সমাপ্ত হয়ে, তাঁর এই দেহব্রহ্মাণ্ডেই। কিন্তু বিলাসিতার বস্তু এমন হয় যে, সেই বস্তুসংগ্রহ করার জন্য, যেই ধন উপার্জনের প্রয়োজন পরে, তার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে, মানুষটি আর নিজের জীবনের অর্থকে সন্ধান করার সময়ই পান না, এবং সময় পেলেও ইচ্ছা আর যায় না সেই দিকে।

অর্থাৎ পুত্রী, বিলাসিতা মানুষকে নিজের অস্তিত্বের পরমার্থ থেকেই অপসারিত করে দেয়, এবং যেই ভ্রমের মধ্যে মানুষ স্থিত থাকেন, তাঁর থেকে তিনি মুক্ত তো হনই না, উপরন্তু অধিক গভীর ভাবে সেই ভ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে যান। এবার কথা হলো কোন ব্যক্তি অধিক বিলাসিতা প্রেমী। পুত্রী সর্বাধিক বিলাসিতা প্রেমী হন একজন সত্ত্বগুণী ব্যক্তি। আলস্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান হবার কারণেই তিনি সত্ত্বগুণী, যার মধ্যে তাঁর আহার আচরণও উপস্থিত থাকে। সেই আলস্যের সাথে সাথে, তাঁর মস্তিষ্কে এই সমস্ত বিলাসিতার ইচ্ছা অধিক দানা বাঁধে, এবং অলস হবার কারণে তাঁর মধ্যে ছলনা পূর্ব থেকেই বাসা বেঁধে ছিল। তাই সেই ছলনাকে প্রয়োগ করে, তিনি বিলাসিতার দিকে আগ্রাসী হন।

পুত্রী, সেই কারণেই তোমাকে বলেছিলাম, সত্ত্বগুণীর থেকে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকবে; তাঁরা নিজেদের ভ্রমকে দৃঢ় তো করেনই, তার সাথেসাথে, তাঁর আশেপাশের ব্যক্তিদেরও ভ্রমকে ঘন করে দেন। তমগুণী ব্যক্তি বিলাসিতার থেকে দুরেই থাকেন সাধারণত। সমাজ

আমাদের এমনই পুত্রী। আসলে সত্ত্বগুণীরাই সমাজে অধিকসময় শাসক হয়ে উপস্থাপন করে থাকেন। আর যেহেতু ছল, শোষণ, অনধিকার অধিকার স্থাপনই সত্ত্বগুণীদের চরিত্র, তাই তাঁরা তমগুণী, যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী হন, তাঁদেরকে দরিদ্র করে রেখে দিতে চান, যাতে তাঁরা যতই শ্রম করুন না কেন, তাঁদের অর্থাৎ সত্ত্বগুণীদের বরাবর কখনোই হতে না পারেন।

তাই সমাজব্যবস্থার কারণে, সর্বযুগেই তমগুণীরা দরিদ্র, এবং তাই তাঁদেরকে কঠিন পরিশ্রম করেই যেতে হয়, যাতে তাঁদেরকে দারিদ্রতার কারণে দেহত্যাগ করতে না হয়। তাই তমগুণী নিজের তমগুণের স্বভাব থেকে মুক্ত হতেও পারেন না, আর দারিদ্রতার কারণে তাঁদের মধ্যে মাঝে মধ্যে বিলাসিতার ইচ্ছা জন্ম নিলেও, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে, পরিশ্রমই তাঁর জীবিত থাকার একমাত্র উপায় বলে স্থির করেন।

একমাত্র রজোগুণীই সেই ব্যক্তি হন, যারা এই দারিদ্রতা এবং বিলাসিতার মধ্যে সাম্যতা স্থাপন করতে সক্ষম। যথার্থ মার্গদর্শন না করলে, ক্রমে এক রজোগুণীও বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণী হয়ে ওঠেন, এবং সত্যবলতে যারা মার্গদর্শন লাভ করেন নি, তাঁদের মধ্যে অধিক রজোগুণীই সত্ত্বগুণী হয়ে ওঠেন, নিজেদের মধ্যবয়স থেকে। তাই তোমার ছাত্র বা ছাত্রী, যারাও রজোগুণী, তাঁদের বিলাসিতার প্রতি বোধকে সজাগ রাখবে, এবং প্রতিটি বস্তু, কি আহার, কি নিদ্রা, কি যানবাহন, কি গৃহ, কি আসবাব, বা কি সঙ্গম, সমস্ত কিছুর প্রতিই নিয়ন্ত্রণ রাখতে শিক্ষা প্রদান করবে।

যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু সমস্ত ক্ষেত্রেই গ্রহণ করবে, কিন্তু কখনোই এমন কিছু বিলাসিতার দিকে তাঁরা ঝুঁকবেন না, যার কারণে এত অধিক ধন উপার্জন করতে হবে যে, সত্য সন্ধানই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। যদি এই সাম্যভাব তাঁদের মধ্যে স্থাপন করতে সক্ষম হও পুত্রী, তবেই তোমার ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণ করার অবস্থায় উন্নীত হয়ে গেছেন।

হ্যাঁ পুত্রী, যারা আহারের আচরণে, নিদ্রা বা বিশ্রামের আচরণে, এবং বিলাসিতা বা মৈথুনের আচরণে সাম্যতা অর্জন করে নিয়েছেন, তাঁরাই তোমার থেকে সত্যজ্ঞান লাভ করার প্রথম চরণে উত্থিত হয়েছেন। তাই যারা সেই স্তরে উন্নীত হয়ে, তোমার কথিত শব্দের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদেরকে নিয়েই সত্যজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্রহ্ম আচরণের পথে অগ্রসর হবে, বাকিদেরকে তখনই সেই পথে উন্নীত করবে, যখন তাঁরা এই সাম্যতা অর্জন করবেন।

আর যদি দেখো যে এমন কেউ ছাত্র বা ছাত্রী রয়েছেন, যিনি এই সাম্যতা অর্জনের বিরোধী, যারা সকল সময়েই দেহকেন্দ্রিক, এবং তাই দেহের বিশ্রাম, দেহের আহারে ভেদভাব, এবং ইত্যাদি ভেদভাবের মধ্যে যুক্তই থাকছেন সর্বক্ষণ; অর্থাৎ উঁচু নিচু, শিক্ষিত মূর্খ, এই সমস্ত বিচারে আবদ্ধ হয়ে আছেন, আর তার থেকে কিছুতেই নির্গত হতে আগ্রহী নন তিনি, তাহলে তাঁকে নিজের ছাত্রসংখ্যার থেকে মুক্তও করে দিতে তুমি স্বতন্ত্র। তবে এক্ষেত্রে একটিই কথা বলার যে, বিনা সুযোগ প্রদান করে কারুর সাথে এমন করবে না, অর্থাৎ তাঁকে মুক্ত করবে না। প্রচুরবার সুযোগ দেবার পরেও যদি দেখো, যে সেই ব্যক্তি নিজের ভেদভাবেই অধিক রুচি রাখেন, তখনই তাঁকে বহিষ্কার করে দেবে, আর সেই বহিষ্কার করার সময়ে কনোরূপ আসক্তি সম্মুখে রাখবেনা"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "বেশ পিতা, কাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা উচিত, এবং কে গুরু হবার জন্য উপযুক্ত, তা তো বুঝলাম। সেই শিষ্যদেরকে কি ভাবে সত্যজ্ঞান আহরণের উপযোগী করা হবে, তাও বুঝলাম। কিন্তু তাঁদেরকে শিক্ষিত কি ভাবে করে তুলবো? সরাসরি কি তাঁদের সত্যের বিবরণ প্রদান করবো?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "না পুত্রী, প্রথমে একজন শিষ্যকে ভূগোল শেখাবে। এই বাহ্য প্রকৃতির থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করে অন্তর্মুখী হতে হয়। তাই সেই বাহ্যপ্রকৃতিকে দেখার নজর নির্মাণ করবে। আর সেই ভূগোলের সাথে সাথে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করবে। আর তারপর এই সকলকিছুকে একত্রে এমন ভাবে মিলিত করবে, যাতে সমস্ত বিষয় একাকার হয়ে যায় তার কাছে। এমন ভাবেই সমস্ত কিছুকে উপস্থাপন করবে ইতিহাস, ভূগোল তথা সমাজবিজ্ঞানকে যাতে তার মধ্যে এই বোধ জাগে যে যা কিছু ইতিহাসে ঘটেছে, সমাজে ঘটেছে, তার মধ্যে একটি ভৌগলিক ক্রিয়া যুক্ত ছিল।

অর্থাৎ তোমার কথার নিরিখে যেন সে উপলব্ধি করে যে, সমস্ত ফলের পিছনে একটি করে কারণ থাকে। আর সেই উপলব্ধি তার মধ্যে জেগে গেলে, অবশ্যই সে আদি কারণের সন্ধান করবে, আর তখনই তাঁর 'আমিত্ব' কে নাশ করার পদ্ধতি, যেমন তোমাকে পূর্বে বলেছি, সেই পথে চালনা করবে তাঁকে । আরো একটি কথা পুত্রী, যতই গুরুর আসনে উপনীত হও, কখনোই এই ধারণা রাখবেনা যে তোমার সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যকে তুমি হয়তো জেনেছ, আর তাই তুমি গুরুর আসনে উপনীত হবার যোগ্য হয়েছ, কিন্তু স্মরণ রাখবে যে অসত্যকে তুমি তখনও সম্পূর্ণ ভাবে জানো নি।

তুমি নিজে নিজের মধ্যে বিরাজ করা অসত্যকে নাশ করে সত্যকে জেনেছো ঠিকই। কিন্তু ভিন্নতার ভ্রমে আবদ্ধ আমরা, একে অপরের থেকে ভিন্ন ভিন্ন অসত্য ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে রাখি। হ্যাঁ স্বরূপে আমরা সকলেই এক, তাই আমাদের স্বাভাবিক ধারা একই, অর্থাৎ আমরা সকলেই স্বরূপে ব্রহ্ম, সকলেই ব্রহ্মসত্য থেকে বিস্মৃত হয়ে, অহংকারধারণ করে পুরুষ, আমরা সকলেই একটি একটি কল্পনার অণ্ডে বিরাজ করে কল্পনার প্রসার করি ব্রহ্মকেই সক্রিয় ধারণা করে, অর্থাৎ প্রকৃতিকে ধারণা করে। তাই আমরা সকলেই ত্রিগুণের উপস্থাপনা করি, বিকারের উপস্থাপনা করি, পঞ্চভূতের উপস্থাপনা করি।

কিন্তু পুত্রী, এই বিকার তোমার পঞ্চভূতের উপর যতটা অধিকার স্থাপন করেছিল, যার থেকে তুমি মুক্ত হয়েছ, এমন আবশ্যক নয় যে তোমার শিষ্যের মধ্যেও বিকারের আধিপত্য ঠিক ততটাই থাকবে। তোমার ত্রিগুণ প্রকৃতিকে যতটা সহজ ভাবে স্বীকার করেছে, আবশ্যক নয় যে, তোমার শিষ্যও ততটাই সহজ ভাবে প্রকৃতিকে স্বীকার করবে। তাই, সত্য তুমি জানলেও, অসত্যকে তুমি জানো না, যতই গুরুর আসনে স্থিত হও। তাই স্মরণ রাখবে পুত্রী, যেমন তোমার শিষ্যকে তুমি সত্যের সাথে আলাপ করাতে স্থিত, তেমনই তোমার শিষ্য তোমাকে অসত্যের সাথে আলাপ করাতে স্থিত।

যত স্পষ্ট ভাবে তুমি তোমার শিষ্যকে বেষ্টন করে থাকা অসত্যকে জানবে, ততই সঠিক ভাবে তাঁকে সত্যের সাথে আলাপ করাতে সক্ষম হবে। তাই পুত্রী, প্রকারন্তরে শিষ্যও গুরুর গুরু হন। আর তাই কখনোই এমন ধারণা রাখবেনা যে শিষ্যকেই কেবল তোমার

নির্দেশ শুনতে হবে, শিষ্যের থেকেও তোমার বহু কিছু শেখার থেকে যায়। ... এই বোধকে ধারণা করে, যেই বিকারসমূহ তোমার শিষ্যকে বেষ্টন করে রয়েছে, তার থেকে তাঁকে মুক্ত হবার উপায়রূপে বিচারের স্থাপনা করাবে"।

ভবিষ্যপ্রকৃতি

দেবী দিব্যশ্রী সামান্য ব্যকুল হয়ে বললেন, "পিতা, এতো যা বুঝলাম, একটি শিষ্য বা শিষ্যা লাভ করা গেলেই, জগন্মাতার অসীম প্রেম মনে করতে হবে। এখন মনুষ্যকুল যেই ধারণা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে এমন মানুষের সন্ধান লাভ করাই যে অতি দুষ্কর! ... আমার এখানে প্রশ্ন এই যে, এমন হলো কেন মানুষ। আপনার কথার নিরিখে মানবজাতির অগ্রগতিকে বিচার করলে, এই দাঁড়ায় যে মনুষ্যজাতি অগ্রগতি নয়, অবনতির পথে দ্রুতগামী পথিক। কেন এমন অবনতি হলো মানুষের? আর এই অবনতি কি রোধ হওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, তা কি ভাবে সম্ভব?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "যথার্থ বলেছ পুত্রী, মানুষের ভ্রমেরই অগ্রগতি হয়েছে। আর এতক্ষণে তো এই সত্যও জেনে গেছ যে, যত অধিক ভ্রমের বিকাশ, তত অধিক পুরুষের অবনতি। তাই মানুষ নয়, পুরুষের অবনতি হয়েছে, আর প্রকৃতি সেই ক্ষেত্রে কর্মতৎপর যাতে পুরুষকে পুনরায় অগ্রগতির দিকে যাত্রা করানো যায়, পুনরায় যাতে ভ্রমের থেকে উদ্ধার করা যায়, আর পুনরায় যাতে পুরুষ ভ্রমের থেকে উদ্ধার লাভ করার পথে চলতে পারে।

পুত্রী, মনুষ্য যোনি হলো এখনো পর্যন্ত প্রকাশ করা প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ যোনি, কারণ এই যোনিতে স্থিত হয়ে পুরুষ সত্যলাভ করতে সক্ষম। যেই ভেদভাবের কারণে পুরুষ ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের স্মৃতি ত্যাগ করে ফেলেছিলেন, আর যেই ভেদভাবের থেকে মুক্ত হতে হয় পুরুষকে, পুনরায় ব্রহ্মে লীন হবার জন্য, সেই ভেদভাব মনুষ্যযোনিতে স্থিত হয়ে পুরুষ প্রথমবারের মত ত্যাগ করতে সক্ষম হন। তবে এটি যেমন আনন্দসংবাদ, তেমনই দুঃখজনক সংবাদও।

আনন্দ সংবাদ কারণ যেই মোক্ষলাভ পুরুষের গন্তব্য, সেই গন্তব্যকে মনুষ্যযোনিতে স্থিত হয়েই লাভ করা সম্ভব হয়েছে, আর বেদনার সংবাদ এই কারণে যে সেই সংখ্যা সমস্ত পুরুষের সংখ্যার তুলনায় এতই কম যে এই যোনি দ্বারা শেষরক্ষা হবেনা, এমনই বার্তা প্রকৃতির কাছে উপস্থিত হয়েছে। ঈশ্বরকটি অবতার, নিমাইপণ্ডিত এবং গদাধরমশাই, সেই সমস্ত পুরুষ, যাদেরকে মোক্ষকামী করে তুলেছিলেন শঙ্কর, তাঁদেরকে মোক্ষপ্রদান করে নিয়ে চলে গেছেন, তবে সেই সংখ্যা এক শত পুরুষও নয়, যেখানে পুরুষের সমষ্টি হলো শতসহস্র লক্ষ।

অর্থাৎ সত্য বলতে গেলে, মনুষ্যযোনিতে স্থিত হয়ে পুরুষ অবশ্যই মোক্ষলাভ করার সামর্থ্য প্রদর্শন করে প্রকৃতিকে আশ্বাসবাণী প্রদান করেছেন, এটিও যেমন সত্য, তেমন এটিও সত্য যে, একটিও মনুষ্য নিজের থেকে, নিজের প্রয়াসে না তো মোক্ষকামী হতে

পেরেছেন, আর না মোক্ষলাভ করেছেন, এই অন্তিম এক সহস্র বৎসরে । আমার কথার অর্থ এই যে, যতজন মোক্ষকামী হয়েছেন এই এক সহস্র বৎসরে, তাঁরাও ঈশ্বরকটিদের প্রভাবে এসেই মোক্ষকামী হয়েছেন, আর যারা মোক্ষ লাভ করেছেন, তাঁরাও মোক্ষলাভ করেছেন ঈশ্বরকটিদের সান্নিধ্য লাভ করেই।

যদি এমনই ধারা চলতে থাকে, তবে মনুষ্যযোনি অবলুপ্তির পথে অগ্রগামী, সেই বিষয়ে কনো সন্দেহ নেই। তবে প্রকৃতি একটি অন্তিম সুযোগ মানুষকে দিতে আগ্রহী, আর সেই ক্রিয়াই এখন চলমান। তবে সেই ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করা অত্যন্ত কঠিন, এই স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্যসমাজের পক্ষে" ।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু এমন কেন হলো পিতা? বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শঙ্কর যা করে গেছিলেন, আর সেই অনুসারে যেই পরিমাণ মানুষ মোক্ষকামী হয়েছিলেন, তাঁদের প্রভাবে কেন প্রভাবিত হলেন না সাধারণ মানুষ? এঁদের মতধারা মেনে হর্ষবর্ধন রাজা এক হিল্লোল তো তুলেছিলেন, তবে সেই হিল্লোলের নাশ হলো কি করে? কেন প্রকৃতির এই অসম্ভব প্রয়াসকে ব্যর্থ হতে হলো? ... আর প্রকৃতি কি ভাবে এর নিরাময়ের ব্যবস্থা করছেন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন পুত্রীর আগ্রহ দেখে তৃপ্ত হয়ে বললেন, "পুত্রী, পুরুষ অহংকারের প্রতি এবং প্রকৃতির প্রতি আসক্ত, সেই কথা তো পূর্বেই বলেছিলাম তোমায়। আর এও বলেছিলাম যে প্রকৃতির প্রতি আসক্তি পুরুষকে উন্নত করে, তো অহংকারের প্রতি আসক্তি পুরুষকে অবনতির দিকে অগ্রসর করে। আর যখন এমন একজন পণ্ডিত অহংকারী ব্যক্তি এক নৃপতিকে চালনা করার ভুমিয়ায় উপস্থিত হন, তখন তা এমনই এক চক্রের নির্মাণ করে দেয় যে পুরুষের উন্নতির রাস্তা চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তেমনই এক অহংকারের পূজারীর ভূমিকার জন্য, মনুষ্যজাতি আজ যেই অবলুপ্তির পথের পথিক" ।

দেবী দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, "কে সেই ব্যক্তি? কি করেছিলেন তিনি? আর সেই থেকে কি ভাবে একটি চক্রের নির্মাণ হয়, যার কারণে মনুষ্যজাতি বাস্তবিক অগ্রগতি থেকে বিমুখ হয়ে গিয়ে ভ্রমের বিস্তারে মনযোগী হন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, পশ্চিমাজগত ক্রমে ক্রমে এই ভ্রমের বিস্তার অনেকদিন ধরেই করছিলেন, কিন্তু পূর্বজগত সেই ভ্রমকে স্বীকার করে নিচ্ছিলেন না, তাই সম্পূর্ণ মনুষ্যযোনি অবনতির দিকে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। কিন্তু একটি পণ্ডিত সম্মুখে আসেন, এবং তিনি এমন কিছু বিধান দিতে শুরু করেন নৃপতিকে যে, তার পালন করতে গিয়ে, পূর্বজগতও অবনতির দিকে অগ্রসর হয় যায়। ... সেই পণ্ডিত ব্যক্তির নাম চাণক্য, এবং যেই নৃপতি তাঁর নির্দেশ পালন করেছিলেন, তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

কি করেছিলেন তাঁরা, সেই বিষয়ে এবার বলি তোমাকে। চাণক্য নীতি অনুসারে, বনজঙ্গলকে অপসরণ করিয়ে, ক্ষেত স্থাপন করার কর্ম শুরু করেন চন্দ্রগুপ্ত আর সেই কর্ম করানো হয় তৎকালীন বৈশ্যদেরকে । তবে এই বৈশ্যদের বিভাজিত করে দেন চাণক্য এবং এর মধ্যে পরিশ্রমের কাজ কৃষকদের শেখানো হয় যাদেরকে বলা হয় শূদ্র, এবং তাঁদের থেকে যেই ফলন আসে, তার থেকে শুল্ক আদায়

করা হয় বাকি বৈশ্যদের দ্বারা, যাদেরকে নতুনভাবে বৈশ্য নামকরণ করা হয়। আর এই কর্ম করে এবং বিশেষ ভাবে আজকের আমাদের বঙ্গভূমিকে কর্ষণ করে, এই জম্বুদ্বীপ জগতের শ্রেষ্ঠ ধনবান দেশ হয়ে ওঠে, আর সাথে সাথে এক নতুন ধারার শুরু করে, যা মনুষ্যজাতির অবনতির বীজ বহন করে। কি ভাবে? এবার সেই কথা বলছি তোমায় পুত্রী।

মানুষ, পূর্বে বনজঙ্গল থেকে ফল আহার করতেন, এবং পশুপক্ষীর মাংস আহার করতেন, কিন্তু তাঁদের খাদ্যস্বভাবের মধ্যে শস্য ছিলনা। সামান্যভাবে তা থাকলেও, তা কখনোই মানুষের প্রধান খাদ্যরূপে অবস্থান করতো না। বনজঙ্গল থেকে প্রাপ্ত ফল, এবং প্রাপ্ত মাংসই সকলের মূল খাদ্য ছিল, আর সঙ্গে ছিল গোদুগ্ধ। তাই সকল মানুষই স্বনির্ভর ছিলেন। আর তাই শুল্কও রাজা যৎসামান্যই লাভ করতেন। কেবলই কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিক্রয় করে যা লাভ হতো, তাই শুল্ক রূপে রাজা লাভ করতেন। চাণক্য তাই সেই শুল্কের পরিমাণকে বিপুল করে দেবার জন্য, মানুষের খাদ্যস্বভাবকেই পালটে দিলেন।

ক্ষেতে কর্ম করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়না, প্রথমত সেই কলা সকলের কাছে ছিলনা, আর দ্বিতীয়ত তা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ । আর তাই খাদ্যস্বভাব ফলমূলাদি এবং মাংসাদি থেকে অপসারিত হয়ে যখন শস্য হয়ে ওঠে, তখন খাদ্যও ক্রয় করে গ্রহণ করা শুরু করলেন মানুষ, আর তাই বাণিজ্য চরম আকার ধারণ করে, আর সেই থেকে শুল্ক গ্রহণ করে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তৎকালীন জম্বুদ্বীপকে সমস্ত পৃথিবীর সবথেকে ধনীদেশে পরিণত করে দেন।

শুনতে খুবই ভালো লাগে পুত্রী এই ধনীদেশে পরিণত হবার ইতিহাসকে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির উপর এবং মনুষ্যযোনির উপর যে কি ভয়ানক হয়ে স্থাপিত হয়, তার ইয়ত্তা করাও পণ্ডিত চাণক্যের পক্ষে সম্ভব হয়নি, আর তার কারণও অতি সহজ। আত্মকেন্দ্রিক চাণক্যের অহংকার তাঁর ভ্রমপর্দার উপর এক নতুন আস্তরণের রচনা করে দেয়, যা তাকে প্রকৃতি ও মনুষ্যজাতির কথা ভুলিয়েই দেয়, আর ভুলিয়ে দেয় বুদ্ধের থেকে লাভ করা সমস্ত জ্ঞানকেও, যার ভিত্তিতে তিনি স্বয়ং মগধের আমাত্য হয়ে বিরাজ করছিলেন"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "সত্য বলতে, আমি স্বয়ংও বুঝতে পারছিনা, তিনি ভ্রমের বিস্তারটি ঠিক কি ভাবে করলেন! আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন পিতা। যেই কথাকে আপনি ইঙ্গিত করছেন, আমার মেধা সেই কথাকে ধারণা করতে ব্যর্থ। কৃপা করে আমাকে সেই কথা একটু সহজ এবং প্রত্যক্ষ করে বলবেন"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যবেশে বললেন, "পুত্রী, এটিই স্বাভাবিক যে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন দেখছও যে শস্যই আমাদের মূল খাদ্য, তখন বনাঞ্চল পরিষ্কার করে, ক্ষেত স্থাপনের ফলে কি হলো, তা বুঝতে পারবেনা। পুত্রী, প্রাকৃতিক উপায়কে বিনষ্ট করার অর্থ হলো প্রকৃতির নাশ করা, তা সেই নাশ করে অট্টালিকা স্থাপন করা হোক আর ক্ষেত স্থাপন করা হোক। তার উপর ক্ষেত করতে গেলে, ভূমিকে কর্ষণ করতে হয়, অর্থাৎ ভয়ানক পীড়া প্রদান করতে হয় ভূমিকে, যার কর্মফলস্বরূপ বেদনার সঞ্চার হওয়া কেবলই সময়ের ব্যাপার।

পুত্রী, এই কাজের বুদ্ধিদাতা চাণক্য, আদেশদাতা চন্দ্রগুপ্ত, কিন্তু এই কাজ যারা হাতে করে করলেন, তাঁরা হলেন কৃষক। আর যেই মুহূর্ত থেকে কৃষক সেই কাজ করতে শুরু করলেন, সেই মুহূর্ত হতে প্রকৃতির অভিশাপের অধিকারী তাঁরা হয়ে উঠলেন। আর তাই যতই প্রয়াস করা হোক, কৃষকরা সর্বকালের সেরা দরিদ্র হয়ে থাকবেন, সেই অভিশাপ লাভ করলেন, যা আজও দেখতে পাও তুমি, আর সমস্তকাল দেখতে পাবে। যতদিন ক্ষেত করার অভ্যাস থাকবে, ততদিন কৃষকরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে উঠবেন, ততদিন কৃষকরা অধিক থেকে অধিক নিপীড়নের পাত্র হয়ে উঠবেন, কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকৃতির কাছে দোষী।

অন্যদিকে পুত্রী, এই যে বানিজ্যিকতার বিস্তার করলেন চাণক্য, এবং সাধারণ মানুষকে সহজ আহার করার অভ্যাস থেকে চ্যুত করলেন তিনি, এবং সমস্ত মানবজাতিকে পরাধীন করে দিলেন, তাতে রাজস্ব অধিক আয় হতে শুরু করলো বলে, সমস্ত দেশ এই ক্ষেতি করা শুরু করে দেন, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতিই পরাধীনতার শিকার হন। তবে এখানে এর ইতি নয়, এখানেই এর শুরু। কি ভাবে?

দেখ পুত্রী, এর আগে পর্যন্ত এমন অভ্যাস ছিল মানুষের যে, আমার কাছে অধিক ফল আছে, তোমার কাছে অধিক মাংস আছে, তো চলো আমার অধিক ফল তুমি নাও, আর তোমার অধিক মাংস আমায় দাও। অর্থাৎ পুত্রী, এখানে কনো লাভ্যাংশের চিন্তা ছিলনা। কিন্তু যেই মুহূর্ত থেকে বাণিজ্যের বিস্তার করলেন চাণক্য, সেই মুহূর্ত থেকেই, এমন হয়ে গেল যে সকলকে আহার ক্রয় করে খেতে হয়, তাই লাভ্যাংশ লাভের যোজনা করতে হলো মানুষকে। অর্থাৎ আমি তোমাকে চাল বিক্রয় করবো, তার থেকে যেই অর্থ আমি লাভ করবো, তাই দিয়ে আমাকে অন্য সমস্ত আনাজ, বস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে হবে।

যাই এই ভাবের বিস্তার হলো, তাই কিছু ব্যক্তি রাজা ও কৃষকের অর্থাৎ শূদ্রের মধ্যে স্থাপিত হতে শুরু করলেন, যারা কৃষকের থেকে ক্ষেতের সামগ্রী নিয়ে রাজাকে প্রদান করতে থাকলেন, যাদেরকে বলা হয় আমলা। আবার কিছু ব্যক্তি সম্মুখে এলেন, যারা রাজার থেকে সেই সমস্ত সামগ্রী ক্রয় করে, তা প্রদান করতে থাকলেন সাধারণ মানুষকে, যাদেরকে বলা হয় বিক্রেতা, আর এই আমলা এবং বিক্রেতা মিলে চাণক্য গড়লেন বৈশ্যকুল। এবার কথা হলো, এই আমলা বা এই বিক্রেতা কি ভাবে নিজের রুজিকে বহাল রাখবেন?

আমলারা তাই একদামে কৃষকের থেকে সামগ্রী কিনলেন, আর নিজের লাভ্যাংশ রেখে, রাজাকে সেই সামগ্রী প্রদান করলেন; আবার বিক্রেতারা রাজার থেকে এক দামে কিনলেন সেই সামগ্রী, যেখানে রাজা নিজের লাভ্যাংশ রেখে তা বিক্রয় করলেন। সেই সামগ্রী বিক্রেতা আবার নিজের লাভ্যাংশ রেখে বিক্রয় করলেন। অর্থাৎ বুঝলে পুত্রী কি হলো? কৃষক পেলেন এক টাকা, আমলা রাজাকে বিক্রয় করলেন ১০ টাকায়। রাজা কটি আমলার থেকে তা ক্রয় করলেন, এবং ২০ টাকায় ২০টি বিক্রেতাকে বিক্রয় করলেন, এবং বিক্রেতা ৩০ টাকায় তা সাধারণ মানুষকে বিক্রয় করলেন।

কি দাঁড়ালো এতে? কৃষকের আয় এক টাকা, আমলার আয় ১০ টাকা, রাজার আয় দশটি আমলার থেকে ১০ টাকা করে, অর্থাৎ ১০০ টাকা, বিক্রেতার আয় ৫ টাকা, এবং সাধারণ মানুষ ১ টাকার বস্তুকে ৩০ টাকায় ক্রয় করলেন । আর এই ভাবে কৃষক দিনপ্রতিদিন

দরিদ্র হতে থাকলেন, এবং রাজা তিনপ্রতিদিন ধনী হতে থাকলেন। আমলারা ঠিক তাঁর নিচে স্থাপিত হলেন ধনসম্পদের ভাণ্ডারে, এবং বিক্রেতারা তাঁদের নিচে।

এই ভাবে চাণক্য অর্থনীতিকে স্থাপন করে রাজস্বকে তো বৃদ্ধি করলেন। কিন্তু এতে কেবল ধনবণ্টন শুরু হলো না, ধনবৈষম্যই শুরু হলো না, যা শুরু হলো তা হলো বাণিজ্যের ভাববিস্তার। প্রতিটি মানুষ পরাধীন, কারণ তাঁরা নিজের আহার নিজে লাভ করেন না, নিজে প্রস্তুত করেন না। কৃষক তা উত্তোলন করে, তবেই তাঁরা সেই আহার গ্রহণ করতে পারেন। আর সেই পরাধীনতার থেকে মুক্তি লাভের একটিই উপায়, আহার যাতে সমস্ত সময় পর্যাপ্ত থাকে, তার একটিই উপায়, আর তা হলো উপার্জনের বৃদ্ধি। আর উপার্জন বৃদ্ধি করার একটিই উপায়, আর তা হলো সমস্ত কিছুর থেকে লাভ্যাংশ অধিক থেকে অধিক লাভ করা।

পুত্রী, সমস্ত কিছুতে এর কারণে লাভ্যাংশ এসে যেতে থাকলো ক্রমে ক্রমে। যা পূর্বে সেবারূপে প্রদান করা হতো, তাও ক্রমে বাণিজ্য হয়ে উঠলো। বৈদ্য করতেন সেবা, তা হয়ে গেল বাণিজ্য; বিচারক প্রদান করতে সেবা, তাও বাণিজ্য হয়ে গেল; ধর্মশালা প্রদান করতো সেবা, তাও বাণিজ্য হয়ে গেল। ... না পুত্রী, তাদেরকে দোষ দিও না, যারা সেবাকে বাণিজ্য দ্বারা অপসারিত করেছেন, কারণ তাঁরা তো বাধ্য তা করতে, না হলে তাঁরা শস্য ক্রয় করবেন কি করে? আর শস্য ক্রয় না করলে, আহার কি করে করবেন?

ফল ও মাংস দ্বারা উদরপূর্তির অভ্যাস তো তাঁরা ত্যাগ করে ফেলেছেন! আহার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে পরাধীন হয়ে গেছেন। সমস্ত কিছুকে ক্রয় করেই আহার করতে হয়, ধন না থাকলে তা ক্রয় করবেন কি করে? বাণিজ্য না করলে, সেই ধন আসবে কি উপায়ে? পুত্রী, এর কারণে ক্রমে ক্রমে সেবা ভাব সম্পূর্ণ ভাবে মনুষ্যজাতির থেকে অবলুপ্ত হয়, এবং মানুষ তীর্থক্ষেত্রকেও বাণিজ্যিক পাঠশালায় পরিণত করে দেন। ক্রমে মানুষ চিকিৎসাকে, এমনকি শিক্ষাকেও বাণিজ্যিক পাঠশালা করে ফেলেন। আর সত্য বলতে আজ বাণিজ্যই সমস্ত মনুষ্যসমাজের পৃষ্ঠপোষক।

আর যেখানেই বাণিজ্য, সেখানেই অধিক লাভ রাখার কামনা, কারণ যত অধিক লাভ তত অধিক সংরক্ষণ, তত অধিক আহারের সামগ্রী সঞ্চয় করার চিন্তা থেকে মুক্তি। আর তাই আমলারা এবার এক টাকা দিয়ে ক্রয় করে, ১০ টাকা দিয়ে নয়, ১০০ টাকা দিয়ে বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন, আর আরো ধনী হয়ে উঠলেন। আর যতই একজন অধিক ধনী হতে শুরু করলেন, ততই ভেদভাব চরমে স্থাপিত হতে শুরু করলো, এবং মানুষ ক্রমে সেই ভেদভাবকেই সামাজিক চরিত্র রূপে স্থাপিত করতে বাধ্য হলেন। আর এর ফল কি হয়?

এর ফল আজকের সমাজ, যেখানে সকলে সকলের থেকে লাভ্যাংশ লাভের চিন্তায় ব্যস্ত। সকলে ভেদভাবকে প্রশ্রয় প্রদান করে, অধিক ধনী হবার নতুন মতুন উপায়ের সন্ধান করতে ব্যস্ত । না পুত্রী, এঁদের কারুকে কনো দোষ দেওয়া যায়না। যদি কারুকে দোষ দিতেই হয়, তবে তিনি হলেন চাণক্য। তাঁরই নীতির কারণে মানুষ ফলমূল ও মাংস আহার ত্যাগ করে, পরাধীন হয়েছিলেন। তাঁরই

নীতির কারণে, মানুষে মানুষে ভেদভাবের বিস্তার হয়, আর মনুষ্যজাতি ভেদভাবের পূজারী হয়ে ওঠেন, এবং এই যোনির অধঃপতনকে সুনিশ্চিত করেন"।

দেবী দিয়শ্রী বললেন, "এর থেকে মুক্তির কি কনো উপায় নেই? পুনরায় সেবাভাবকে বিস্তার করে, বাণিজ্যের নাশ করা যায় না!"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, মানুষ শস্য গ্রহণ করতে শুরু করে, পরাধীন হয়েছেন, কিন্তু নিজের আহারলাভকে সুরক্ষিত করেছেন। কৃষক কর্ম করবেন, প্রকৃতির অভিশাপের পাত্র হবেন তাঁরা, আর তাঁদের পরিশ্রমকে ভিত্তি করে, কেবলই ধন উপার্জন করে আহারপ্রাপ্তিকে সুরক্ষিত করে নিয়েছেন মানুষ। ফল একদিন পাওয়া যেতেও পারে, একদিন নাও পাওয়া যেতে পারে। মাংস পেতে প্রয়োজন শিকারের, তাও একদিন পাওয়া যেতেও পারে, একদিন পাওয়া নাও যেতে পারে। কিন্তু শস্যকে আহার রূপে গ্রহণ করতে উদ্যত হলে, আহারের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে মানুষ। আর সেই নিশ্চিন্ততার কারণে, তাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিস্তার হয়, আর তাঁরা অধিক থেকে অধিক কামুক হয়ে ওঠেন, যা সত্ত্বগুণের একটি প্রধান চারিত্রিক গুণাবলী।

আর যতই তারা কামুক হয়ে ওঠেন, ততই অধিক বিস্তার লাভ করে জনবসতি, আর ক্রমে ক্রমে, সেই জনবসতি এমনই বিস্তার লাভ করে যে যদি সমস্ত মানুষকে ফল ও মাংসের উপর নির্ভর করতে হয় পুনরায়, তার জন্য উপযুক্ত ফলমূল প্রদান করার বনাঞ্চলই অবশিষ্ট রইলনা। তাই যদি আজ মানুষ শস্যগ্রহণ করা বন্ধ করে, পুনরায় ফল ও মাংস গ্রহণ করতে উদ্যত হন, প্রথম কথা সত্ত্বগুণের ভার তাঁদেরকে তা করতে দেবেনা, দ্বিতীয়ত খাদ্যস্বভাবের অভ্যাস পালটে যাবার ফলে মানুষ কেবল ফল ও মাংসদ্বারা মানসিকভাবে উদরপূর্তিও করতে পারবে না, আর তৃতীয় যদি মনস্থির করেও ফেলেন, তবুও বনাঞ্চলের অভাবে প্রয়োজনীয় ফল ও মাংস মানুষ লাভও করবে না।

অর্থাৎ যতক্ষণ জনবসতি অধিক থাকবে, ততক্ষণ এর সমাধান নেই। মানুষ যদি আজ চানও যে তাঁরা বাণিজ্যিকতা ত্যাগ করে, সেবাভাবে প্রত্যাবর্তন করবেন, না তো তাদের খ্যাদ্যাভ্যাস তা সমর্থন করবে, আর না প্রকৃতিতে যা বনস্থান আছে, তা তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে সহযোগী হবে। তাই মানুষকে বাণিজ্য করতেই হবে এবং বিনাশের দিকে অগ্রসর হতেই হবে, আর এর কনো বিকল্প নেই"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু আপনি যে বললেন, প্রকৃতি একটি শেষ সুযোগ মানুষকে প্রদান করতে উদ্যত, তা কেমন উপায় তাহলে?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "পুত্রী, আজ থেকে ১০ বৎসর আগে জনবসতি ছিল ৭৫০ কোটি, আর আজ তা হয়েছে ৭০০ কোটি। কিন্তু মজার কথা হলো, এই দশবৎসরের প্রতি বৎসরে নবজন্ম হয়েছে ১৫ কোটি মানুষের। ভেবে দেখো পুত্রী, জন্মের হারকে মেলালে জনবসতি হওয়া উচিত ছিল ৯০০ কোটি, কিন্তু জনবসতি রয়েছে ৭০০ কোটি। এর অর্থ কিছু বুঝতে পারছো?"

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "এর অর্থ এই যে ১৫০ কোটি জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ২০০ কোটির মৃত্যু হয়েছে, আর তাই জনবসতি ৫০ কোটি হ্রাস পেয়েছে। ... কিন্তু পিতা, মৃত্যুর হার তো একই আছে, তা তো খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। তারমানে কি জন্মের হার হ্রাস পেয়েছে?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক পুত্রী। আর এই অঙ্ক আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে, পরবর্তী দশ বৎসরে। তখন দেখবে জনবসতি পুনরায় ৬০০ কোটি হয়ে গেছে, কারণ মৃত্যু ২০০ কোটিরই হবে, কিন্তু জন্ম নেবে মাত্র ১০০ কোটি। আর এই ভাবে পুত্রী, প্রতি ১০ বছরে, জনবসতি ১০০ কোটি করে হ্রাস পেতে থাকবে। অর্থাৎ কি? অর্থাৎ এই যে আগামী ১০০ বৎসর পর, জনবসতি মাত্র ১০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। পুত্রী, প্রকৃতি এই ভাবেই ক্রিয়া করেন।

এতই ধীর গতিতে তা হয়, যে কি হচ্ছে তার বোধ যখন জন্মায়, তখন পরিস্থিতি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কিন্তু সত্য এই যে জন্মের হার অত্যধিক হারে হ্রাস পাচ্ছে মানুষের, আর এর দুটি লক্ষ্য। প্রথম হলো মানুষকে একটি অন্তিম সুযোগ প্রদান করা যে, তাঁর বাণিজ্যিক মনোভাব ত্যাগ করে, পুনরায় সেবাভাবে যুক্ত হোক; ক্ষেত ছেড়ে পুনরায় ফলমূল ও মৎস্যমাংসতে প্রত্যাবর্তন করুন, যা জনবসতি হ্রাস পেলে সম্ভবপর হয়ে উঠবে। আর যদি মানুষ তখনও তা না করেন, তবে মনুষ্যযোনির নাশ আর মাত্র ১৫০ বৎসর দেরী। ... নবযোনির সঞ্চার হতে হবে, যারা হয়তো মানুষের থেকে অধিক হারে মোক্ষকামী হতে পারবেন, এবং মানুষের থেকে অধিক মোক্ষলাভে সমর্থ হবেন"।

দেবী দিব্যশ্রী বিস্মিত নেত্রে পিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এই অদ্ভুত বিশ্লেষণ তো পিতা আমার চোখের সামনেই ছিল। কিন্তু তাও আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না কেন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, তুমি যেই ব্রহ্মচারণের শিক্ষা নিতে চেয়েছিলে, সেই ব্রহ্মচারণের ফলেই এই অবস্থায় স্থিত হওয়া সম্ভব হয়। সমস্ত ভেদ, সমস্ত সমস্যা এই 'আমি'র জন্য। যতক্ষণ এই 'আমি'কে আঁকরে ধরে থাকবে, ততক্ষণ এই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করতে পারবে না, যেমন পণ্ডিত চাণক্যও পারেন নি। কিন্তু এই 'আমি' যে সহজে যায়না। ... দেখো পুত্রী, আমি একটি ফানুস, আর এই ফানুসকে জাপটে ধরে রয়েছ তুমি, একটি পাথর। তাই তুমি ভূমিতে আছড়ে পরছো না। কিন্তু আমি তো একটি নশ্বর শরীরে স্থিত। তাই একদিন না একদিন এই ফানুসকে বিনষ্ট হতেই হবে, আর যেই মুহূর্তে এই ফানুসের নাশ হবে, সেই মুহূর্তে তুমি পাথরটি ভূমিতে আছড়ে পরবে।

পুত্রী, বিজ্ঞানকে ভালো করে লক্ষ্য করো। পাথরকে সম্মুখে যেতে হলে, গুলতির মধ্যে স্থিত হয়ে পশ্চাতে যেতে হয়, আর যখন পশ্চাতের অন্তিম অবস্থায় চলে যাবার পর সম্পূর্ণ সম্মুখকে দেখার চেষ্টা করে পাথর, তখন সমস্তটাই দেখতে পায় সে, আর তাই যাই গুলতি নিক্ষেপ করা হয়, তাই পাথরটি ভয়ানক গতি নিয়ে সম্মুখে চলে যায় এবং লক্ষবস্তুতে আঘাত করে।

তেমনই পুত্রী, মোক্ষরূপ লক্ষ্যে পৌছাতে, পাথরকে অর্থাৎ নিজেকে পশ্চাতের অন্তিম অবস্থায় নিয়ে যেতে হয়, আর তারপর যখন সেই পশ্চাতে স্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে লক্ষ্যকে দেখা যায়, তখন নিক্ষেপ করতে হয়। আর তখন লক্ষ্যভেদ কেবলই সময়ের অপেক্ষা হয়। এখানে পিছনের অর্থ কি? ইতিহাস। ইতিহাসের অন্তিম অবস্থায় যেতে হয় পুত্রী। আমরা মানুষরা অতিতে যাই, কিন্তু কতটা অতিতে যাই? যতটা অতিতে গেলে আমরা আমাদের 'আমি'কে হারিয়ে না ফেলি, ততটাই পিহনে যাই। আর তাই সেখান থেকে যখন নিক্ষিপ্ত হইও আমরা, তবুও আমরা সেই সামান্য ভবিষ্যতেই যাত্রা করি, যেখানে আমাদের 'আমি' অক্ষত থাকে।

পুত্রী, এই 'আমি'ই সমস্ত নষ্টের মূল। আই আমিত্ব থাকলে, মোক্ষ অসম্ভব, মোক্ষের ভাবনা ভাবাও অসম্ভব, আর সত্যকে উপলব্ধিও অসম্ভব। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব করার সব থেকে সহজ উপায় হলো ইতিহাসেও চলে যাও । ইতিহাসের সেই দিনগুলিতেই বাঁচো, যেখানে স্থিত হয়ে, কঠিন অনুসন্ধান করেও নিজের 'আমি'কে খুঁজে পাবেনা । আর যখন সম্পূর্ণ ভাবে সেই ইতিহাসের মধ্যে নিজের 'আমি'কে হারিয়ে ফেলবে, তখনই সেই ইতিহাসের পটভূমিতে স্থিত হয়ে সম্মুখে তাকাবে।

দেখবে, সমস্ত ভ্রমের রহস্য তোমার সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে গেছে, যেমন দেখলে তোমার সামনে ইতিহাসে চাণক্যের পাতায় যেতেই সমস্ত ভেদের রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে গেল। ... যখন দেখবে, আর 'আমি' নেই, তখন নিক্ষেপ করবে নিজেকে, আর যেখানে এসে উপস্থিত হবে, দেখবে সেটিই মোক্ষ। ...

অর্থাৎ পুত্রী, সোজা কথায় বলতে হলে, এই 'আমি' সমস্ত ভ্রমের কারণ, আর তাই যতক্ষণ না এই 'আমি' যাচ্ছে, ততক্ষণ মোক্ষ বা সত্যলাভ কেবলই বাচাল মানুষের ভাবনা। যতক্ষণ, 'আমার জীবন' নিয়ে চিন্তা, ততক্ষণই 'আমার সম্মান', 'আমার অপমান', 'আমার লাভ', 'আমার ক্ষতি' ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা, অর্থাৎ ততক্ষণ অহংকার জীবিত। 'আমি' এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই অহংকারের প্রকাশ; যেই ভাবনায় 'আমি' নেই, তাই অহংকার মুক্ত। ... 'আমি ধনী' এও অহংকার, 'আমি দরিদ্র' এও অহংকার। 'আমি নেই', 'আমি তাই যা নেই' এই একমাত্র অহংকারের থেকে চিরতরে মুক্তির উপায়।

কিন্তু এই 'আমি' যে সহজে যায় না পুত্রী!... অতিতে গেলেও, ততদুরই যায় মানুষ যতদূর তাঁর 'আমি' থাকে; ভবিষ্যতে গেলেও, ততদুরই যায় মানুষ, যতদূর তাঁর 'আমি' প্রসারিত হয়। 'আমি অমন ছিলাম', 'আমার ছোটবেলা এমন ছিল', '৫ বছর পর আমি নিজেকে অমুক জায়গায় দেখতে চাই', কেবল ও কেবলই 'আমি'র জয়গান। ... কেন পুত্রী? তুমি কি এই দেহটা কেবল? যদি না হও তাই, তবে সেই 'আমি'কেই আশ্রয় করে চিন্তা কেন, যেই 'আমি' কেবলই দেহটি! তোমার বয়স আজ ১৮, তাই তোমার 'আমি'র অতীত ১৮ বৎসরের; তোমার আয়ু হয়তো ৮০, তাই তোমার 'আমি'র ভবিষ্যৎ ৬২ বৎসরের। কিন্তু এই ১৮ আর ৬২ পর্যন্তই কি তুমি সীমিত?

এই ১৮'র পশ্চাতে যাও, ততদুর যাও যতদূর গেলে আর নিজের এই ১৮'র নাগালও পাবেনা। দেখবে 'আমি' হারিয়ে যাবে। এই ৬২'র পরে যাও, ২০০ বৎসর পরে যাও, ২০০০ বৎসর পরে যাও, দেখবে 'আমি'কে আর খুঁজে পাচ্ছনা। ... আর যখন 'আমি'কে খুঁজে

পাবেনা, দেখবে আর তুমি দিব্যশ্রী হয়ে থাকবে না। একটি মনুষ্য থেকে সম্পূর্ণ মনুষ্যজাতি হয়ে উঠবে। একটি জীব থেকে সম্পূর্ণ জীবকুল হয়ে উঠবে। একটি প্রকৃতির প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ প্রকৃতি হয়ে উঠবে। যখন তা হয়ে উঠবে, তখন দেখবে মনুষ্যকুলের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করতে পারছো, মনুষ্যকুলের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারছো, সম্পূর্ণ জীবকুলের অতীত ও ভবিষ্যৎকে অনুভব করতে পারছো, সমস্ত প্রকৃতির আনন্দ ও পীড়াকে অনুভব করতে পারছো।

আর যখন তা করতে সক্ষম হবে, তখন এতই দুর্বল হয়ে যাবে তোমার 'আমি' যে একসময়ে ব্রহ্মকেও অনুভব করতে পারবে, ধ্যান হয়ে যাবে, আর প্রেমের হাত ধরে, সমর্পণের হাত ধরে মোক্ষলাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে সত্যলাভ করে ফেলবে। ... তাই পুত্রী, সেই দিকে অগ্রসর হও। কেবলমাত্র এই ফানুসটিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে, একসময়ে নিচে পরে যাবে, অধঃপতনে চলে যাবে, যেমন মনুষ্যজাতি গেছে, কেবলমাত্র ঈশ্বরকটি অবতাররূপী ফানুসদের আঁকরে ধরে থাকার জন্য।

স্বতন্ত্র হও পুত্রী, তুমি স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে সক্ষম। সক্কলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে সক্ষম। কনো ঈশ্বরকটির জন্য, কনো অবতারের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকা নিরর্থক। সত্য তোমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, তোমাদের সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। যখন সেই অঙ্কনের দিকে তোমরা তাকাতে ভুলে যাও, তখনই আমাদেরকে আসতে হয়, তোমাদের সেই অঙ্কনের দিকে তাকাতে বলার জন্য। পুত্রী, খেয়াল করে দেখো প্রতিটি অবতার কি বলেছেন? বুদ্ধ কি বলেছেন? মার্কণ্ড কি বলেছেন? যীশু কি বলেছেন? মহম্মদ কি বলেছেন? শঙ্কর কি বলেছেন? নিমাই কি বলেছেন? গদাধর কি বলেছেন?

একটিই কথা বলেছেন সকলে - আমি ম'লে ঘুচবে জ্বালা। তাই তো? শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তে কি বলেছেন? নিজেকে হারিয়ে ফেলো, তবেই নিজেকে পাবে। ... এই তো বলেছেন তিনি! নিজের 'আমি'কে ত্যাগ করলে কি পাবে বলেছেন? ওহম ব্রহ্মাস্মিকে পাবে, অর্থাৎ ব্রহ্মাকে পাবে, নিজের প্রকৃত পরিচয়কে পাবে। ... তাই পুত্রী, আমার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থেকো না। ইতিহাসে চলে যাও, নিজের 'আমি'কে হারিয়ে ফেল, আর সেই নিজের 'আমি'কে হারিয়ে ফেলে, কি দেখবে?

দেখবে এই যে যতক্ষণ বাণিজ্য, ততক্ষণ বিনাশের মহালয়া ঘনিয়ে আসবে। যাই বাণিজ্য ছেড়ে দেবে, তাই দুর্গার আগমন হবে। সেই সত্যের আলোকে ভবিষ্যৎকে দেখো, ব্রহ্মকে লাভ করে ফেলবে। ... এই 'আমি'কে ছেড়ে ফেলাই ব্রহ্মচারণ। যখন কেউ এই 'আমি'কে ত্যাগ করে, ইতিহাসকে দেখে, তখন সেই ইতিহাসের মধ্যে সমাজ, রাজনীতি, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সমস্ত কিছুই দেখতে পেয়ে যায় মানুষ। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে চিনে ফেলে মানুষ তখন, আর তাঁর চেনাকে কেউ আটকাতে পারেনা।

প্রতিটি শাসক চায় যে ছাত্ররা অর্ধইতিহাস জানুক, আর ততটাই ইতিহাস জানুক যতটা ইতিহাস জানলে, তাঁদের ভাবমূর্তি শ্রেষ্ঠ হয়ে ছাত্রদের মনে বিরাজ করবে। একিভাবে প্রতিটি শাসক চান যে সমাজকে, ভূগোলকে, সমস্ত কিছুকে সেই দৃষ্টিদ্বারাই ছাত্ররা দেখুক, যেই দৃষ্টি দ্বারা তাঁরা সকলকে দেখাতে চান। তাই জন্যই তো পুত্রী দেখো, আজ পর্যন্ত চাণক্য তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক ছিলেন, কিন্তু তিনি যে মানুষের বিনাশের বীজের জন্মদাতা, তা জানতেই পারো নি।

কেন পারোনি? কারণ নিজের 'আমি'কে জাগ্রত রেখে, তাকে পাহারায় রেখে দিয়ে ইতিহাস পাঠ করেছিলে, তাই পারো নি। যদি নিজের 'আমি'কে ছেড়ে তা পাঠ করতে, এবং তাতে অবগাহন করে, নিজের 'আমিত্ব' থেকে মুক্ত হতে, তবে কি হতো, তা তুমি আমার বিশ্লেষণ থেকেই জানতে পারলে, তাই না?... তেমনই ভাবে ব্রহ্মচারণের অর্থই হলো এই 'আমি'কে ত্যাগ দেওয়া, আর তা একবার ত্যাগ দিলেই, যেই প্রকৃতিকে আজ জানা অসম্ভব মনে হচ্ছে, যেই ইতিহাসকে আজ স্মরণ রাখা অসম্ভব লাগছে, সেই সমস্ত কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, আমার কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল এক্ষণে। আমি বুঝে গেছি যে যতক্ষণ আমরা বাণিজ্যিক হয়ে থাকবো, ততক্ষণই আমরা বিভ্রান্ত হয়েই থাকবো। কিন্তু আজ আমরা যেই অবস্থায় স্থিত, সেখানে দাঁড়িয়ে বাণিজ্যকে আমরা কিছুতেই দূরে সরাতে পারবো না। তাই আমাদের জনবসতি কমিয়ে প্রকৃতি একটি সুযোগ প্রদান করছেন আমাদেরকে। যদি আমরা সেই সুযোগ নিতে পারি, তবে আমরা থাকবো, নয়তো মানব যোনির নাশ কেবলই সময়ের অপেক্ষা, এবং নতুন উন্নত যোনি, যারা মানুষের থেকে অধিক সহজে মোক্ষকামী হবেন, মানুষের থেকে অনেক কম যন্ত্রনির্ভর হবেন, সেই যোনির আগমন নিশ্চিত।

অর্থাৎ আমরা কেউই এখন এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো না । তবে ঈশ্বরীর কাছে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, আমরা অর্থাৎ মানুষ হলাম যোগ্য যোনি, এবং তা প্রমাণ করার একমাত্র উপায় হলো অধিক থেকে অধিক ভাবে আমরা রজোগুণী হয়ে উঠে, নিজেদের সমস্ত 'আমি'যুক্ত কর্মকে নিজেদের সমস্ত চিন্তার মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ স্থানে আবদ্ধ রেখে, বাকি ৭৫ শতাংশ চিন্তার থেকে 'আমি'কে মুক্ত করে নিয়ে সত্যের উপলব্ধ করতে থাকা। প্রকৃতির কাছে অধিক থেকে অধিক সমর্পণ করে, সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর মধ্যে মিশে গেলে, তিনিই একসময়ে আমাদের অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ 'আমি'বোধকে নাশ করে, আমাদেরকে সত্যের সম্মুখীন করিয়ে দেবেন।

পিতা, এই সমস্ত কিছু জানার পরে, আমার আর একটি জিনিসই জানার কৌতূহল হচ্ছে । আপনি বলেছিলেন, এক অবতার হন বা সাধারণ জীবকটি, সকলকেই এই ভ্রমঅণ্ডেই স্থাপিত হতে হয়, দেহধারণের জন্য, কারণ এই দেহ যে কেবল ভ্রমের মধ্যেই সত্য, বাস্তবিক অর্থে এই দেহ অসত্য। এই সত্যকে স্বীকার করা মাত্রই, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সমস্ত বোধই আমার কাছে অহেতুক হয়ে গেছে।

এমনকি যদি এই দেহই ভ্রম হয়, তবে এই দেহ না থাকা অবস্থায়, আমাদের ভ্রমিত পুরুষ যে পুনরায় দেহধারণের জন্য ভটকাতে থাকবে, এবং সেই অবস্থাকে পিশাচঅবস্থা বলা হয়, তাও আমার কাছে স্বতঃই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই পিতা, পৃথক করে অন্য কিছু জানার ইচ্ছা জাগছে না। তবে একটি কৌতূহল আমার মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাবে রেখাপাত করছে"।

ভূতপ্রকৃতি

দেবী দিব্যশ্রী তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলেন, "একজন জীবকটিও ভ্রমিত, আর একজন ঈশ্বরকটি অর্থাৎ অবতারকেও ভ্রমের মধ্যেই স্থিত থাকতে হয়। অর্থাৎ যেমন করে একটি জীবকটিকেও ভ্রমের থেকে উন্মুক্ত হতে হয়, তেমন করে এক ঈশ্বরকটিকেও ভ্রমের থেকে উদ্ধার লাভ করতে হয়। কিন্তু এক জীবকটি সেই কর্ম করতে কয়েক সহস্র দেহ ধারণ করে নেয়, শত শত যোনি ত্যাগ করে অবশেষে মানুষ দেহ ধারণ করতে পারে, এবং তাতেও অজস্রবার দেহত্যাগ করে, ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ ও লয় করে করে, অবশেষে কনো ঈশ্বরকটির সান্নিধ্য লাভ করে, মোক্ষকামী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু এক ঈশ্বরকটি তো একটিই ব্রহ্মাণ্ডে নিজের ভ্রমকে ত্যাগ করে, সত্যলাভ করেন, এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসা একাধিক জীবকটিকে মার্গদর্শনও করেন। তাই পিতা, আমার আপনার জীবনীর উপর কৌতূহল হচ্ছে। আমার জানতে ইচ্ছা করছে যে, একটি জন্মে, একটি ব্রহ্মাণ্ডে, এই সমস্ত সত্য আপনি উদ্ধার করলেন কি ভাবে? যা আমি লিখলাম, তা তো কেবল সেটুকুই, যা আপনি আমাকে এখন লেখার অনুমতি দিলেন।

এছাড়াও আপনার থেকে আমি ধর্মপ্রজ্ঞা জেনেছি, যেখানে আপনি সমস্ত জীবের, সমস্ত মানুষের, শাসকের, গুরুর, পিতামাতার, স্বামীস্ত্রীর ধর্ম কি, তার ব্যখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়াও আমাকে আপনি আমাকে শাসকের শাসন কি প্রকার হলে, ধর্মস্থাপন হয় সমস্ত মনুষ্যজগতে, তার বিবরণ দিয়েছেন। আর তা ছাড়াও, আপনি স্বয়ং একাধিক কাহিনীর রচনা করেছেন কিরূপে বিচার করতে হয়, কি দৃষ্টিদ্বারা সমাজকে বিচার করতে হয়, তা শেখাতে।

তাই আপনার প্রদত্ত শিক্ষা বিপুল বললেও, কম বলা হয়; যেন বলতে ইচ্ছা হয় অনন্ত। কিন্তু এই অনন্ত শিক্ষা যে আপনি প্রদান করলেন, তার একটিই কারণ, আর তা হলো আপনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর তার আগেপরে অসত্যকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই কারণেই কিভাবে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অসত্যে স্থাপিত থাকি, তাও আপনার জানা, আবার কি ভাবে অসত্যকে নাশ করে সত্যে স্থিত হতে হয়, তাও আপনার জানা। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্যত্র।

আমার প্রশ্ন এই যে একটি ব্রহ্মাণ্ডে, একটি জীবনে এই সমস্ত কিছুকে শুরু থেকে জানা, আমার তো মনে হচ্ছে যেন অসম্ভব। একটি জীবকটি সহস্র জন্মের সহস্র স্মৃতিকে ধারণ করে, অতঃপরেও এই সত্যকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনে উঠতে পারেন না। কিন্তু আপনি একদমই শূন্যস্মৃতি নিয়ে শুরু করেও সেই সত্যকে সম্পূর্ণ ভাবে জানলেন কি করে? নিশ্চয়ই প্রতিটি ঈশ্বরকটিই এই ভাবে জানেন সত্যকে, কিন্তু সকলকে তো আমি পাচ্ছিনা পিতা, কিন্তু আপনাকে পেয়েছি। তাই আমি জানতে আগ্রহী যে, কি এমন বিশেষ হয়

আপনাদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ঈশ্বরকটিদের ক্ষেত্রে, যার জন্য আপনারা একটি ব্রহ্মাণ্ডতেই এই সম্পূর্ণ সত্যকে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হন"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, কনো পুরুষেরই কিচ্ছু করার সামর্থ্য কনোকালেই ছিলনা, কেবল কল্পনা করা ছাড়া। না জীবকটির মধ্যে স্থিত পুরুষের সামর্থ্য থাকে, আর না আমাদের অর্থাৎ ঈশ্বরকটিদের। সামর্থ্য কেবলই ভ্রমের পর্দার। যার ভ্রম যতটা অধিক বা কম, সেই অনুসারে এই সত্যউদ্ঘাটন সম্ভব হয়। আর ঈশ্বরকটিদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় একটিই কারণে। আর তা হলো এই যে, ঈশ্বরকটিরা শূন্য স্মৃতি নিয়ে সরাসরি মনুষ্যযোনিতে স্থাপিত হন।

হ্যাঁ পুত্রী, জীবকটিও যদি শূন্যস্মৃতি নিয়ে সরাসরি মনুষ্যযোনিতে পদার্পণ করতেন, তবে তাঁদের পক্ষেও তাই সম্ভব হতো, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু তেমনটা কেন হয়না? কারণ আমরা স্বেচ্ছায় স্মৃতিহারা নই। আমরা প্রকৃতির ইচ্ছাতেই স্মৃতিহারা। যখন সকল পুরুষরা কিছুতেই সত্যের মার্গ খুঁজে পাননা, তখন স্বয়ং ব্রহ্মময়ী নিজের থেকে একটি পুরুষের সঞ্চার করেন, অর্থাৎ একটি ভ্রমঅণুর সঞ্চার করেন, এবং তিনি তাঁকে স্থাপন করেন সরাসরি মনুষ্যযোনিতে, বা শ্রেষ্ঠ সম্ভব যোনিতে। কিন্তু সাধারণ জীবকটিরা প্রকৃতির ইচ্ছাতে স্মৃতিহারা নন, তাঁরা নিজেদের ভ্রম ইচ্ছাতেই স্মৃতিহারা।

আর তাই তাঁরা নিজেরাই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, আর সেই কারণে তাঁরা একে একে পাথর থেকে উন্নত হয়ে মনুষ্যদেহে স্থাপিত হন, এবং এই সময়কালে অজস্র ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ, রক্ষণ ও লয় করেন। পার্থক্যটা কোথায়, তা কি বুঝতে পারছো পুত্রী?

পার্থক্য কেবলই একটি স্থানে, আমরা ঈশ্বরকটিরা স্বেচ্ছায় স্মৃতিহারা নই, প্রকৃতির ইচ্ছাতেই স্মৃতিহারা, আর তাই স্বয়ং ব্রহ্মময়ী আমাদেরকে মনুষ্যযোনি প্রদান করেন, বা শ্রেষ্ঠ যোনি প্রদান করেন, তাঁদেরকে উদ্ধারের মার্গ দেখানোর জন্য। অন্যদিকে জীবকটি স্বয়ং ভ্রমিত, স্বয়ং নিজের স্মৃতিকে ত্যাগ করেছেন। আর তাই তাঁদেরকে স্বয়ং প্রচেষ্টা করতে হয় স্মৃতি লাভ করার জন্য, আর তাই তাঁদেরকে প্রস্তরের ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করা থেকেই শুরু করতে হয়। আর তাই যখন তাঁরা মনুষ্যযোনি ধারণও করেন, তখন তারা অজস্র ব্রহ্মাণ্ডের স্মৃতিকে ধারণ করে করে, সত্যকে অথৈ ভ্রমস্মৃতির সাগরের তলদেশে কবর দিয়ে রাখে, যা উদ্ধার করতে তাঁরা হিমসিম খেয়ে যায়।

কিন্তু আমরা ঈশ্বরকটিরা যেহেতু সরাসরি মনুষ্যযোনিতে স্থাপিত হই, তাই আমরা স্মৃতিহারা হলেও, আমরা ভ্রমস্মৃতির সাগরের নিচে চাপা পরে থাকিনা। আর তাই আমাদের পক্ষে আমাদের স্মৃতিকে ফিরে পাওয়া সহজ হয়, আর তা উদ্ধার করে, আমরা সকল মনুষ্য বা শ্রেষ্ঠযোনিদের উদ্দেশ্যে সত্যকে ব্যক্ত করার প্রয়াস করতে পারি, যদিও তা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব, কারণ যা নেই তাঁর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কি করে দেওয়া সম্ভব। এই আমাদের পার্থক্য পুত্রী সকল জীবকটির থেকে। সামান্য জীবকটিও যদি স্মৃতিহারা হয়ে সরাসরি মনুষ্যযোনি লাভ করতেন, তবে তিনিও সত্যলাভ আমাদের মত সহজ ভাবেই করতে পারতেন।

কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় স্মৃতিহারা, তার উপর প্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী সরাসরি ক্রিয়া করতে পারেন না, কারণ তেমন করা তাঁর স্বতন্ত্রতাতে হস্তক্ষেপ করা হবে। সে ভুলে যেতেই পারে যে সেই ব্রহ্ম স্বয়ং, কিন্তু প্রকৃতি তো স্মৃতিহারা নন, তাই তিনি কি করে ভুলতে পারেন যে যাদের স্বতন্ত্রতা হননের চেষ্টা করবেন তিনি, তাঁরাও স্বয়ং তিনিই! ... তাই প্রকৃতি তাঁদের কল্পনার উপর হস্তক্ষেপ করতে সরাসরিভাবে পারেন না, আর তাই তাঁদেরকে একের পর ব্রহ্মাণ্ডকে নির্মাণ ও লয় করে করেই মনুষ্যযোনিতে স্থাপিত হতে হয়।

কিন্তু যদি পুরুষের স্বাধীনতাকে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন প্রকৃতি, তবে নিশ্চয়ই তাঁদেরকে সরাসরি মনুষ্যযোনিতেই স্থাপন করতে পারতেন, আর তখন তাঁরাও ততটাই সহজ ভাবে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারতেন, যতটা সহজ ভাবে আমরা ঈশ্বরকটিরা করতে পারি"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "তাহলে কি পিতা, আপনারাও প্রকৃতির কাছে সমর্পণ করেন বলেই, আপনাদের স্বাধীনতাতে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, যেহেতু আমরা ভ্রমকল্পনার সাগরে স্থিত নই, তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের সহজ সমর্পণ অত্যন্ত সাবলীল ভাবেই আসে। জীবকটিও যদি নিজের ভ্রমকল্পনাকে ভ্রমকল্পনা বলে চিহ্নিত করে নিতে পারেন, তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সমর্পণ সহজ ভাবেই আসে। কিন্তু ভ্রমকে সত্য মেনে চলার অহংকারে অন্ধ হয়ে থাকার কারণে জীবকটি তা করতে পারেন না। আর তাই আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়, যাতে তাঁরা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন, যেই দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করতে চাইছেন না।

এটিই আমাদেরকে প্রেরণ করার একমাত্র কারণ পুত্রী, আর এই কারণেই আমাদেরকে যুগে যুগে প্রকৃতি প্রেরণ করেন... প্রতিটি অবতারই তাই তাঁর উপাসক। প্রতিটি অবতারই তাই অব্যাক্ত শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসক, আর সেই অব্যাক্তেরই ব্যক্তপূর্ণপ্রকাশ প্রকৃতির উপাসক। কখনোই কনো অবতার পুরুষের উপাসক নন, কারণ পুরুষ মানেই ভ্রম, পুরুষ মানেই অহংকার, আর পুরুষ মানেই অপূর্ণ, যাকে পূর্ণ করা একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণা প্রকৃতির দ্বারাই সম্ভব। ...

সেই প্রকৃতির শরণাপন্ন হও পুত্রী, তাঁর কাছে সমর্পণ করো, ভ্রম কি, সত্য কি, সমস্ত কিছুকে যদি উপলব্ধি করাতে কেউ পারেন, তা এক ও একমাত্র তিনিই । ... আরাধনা যদি কনো কারুর করতে হয়ই, তবে সেই নিরাকার ব্রহ্মেরই করো, আর তাঁরই ব্যক্ত স্বরূপ প্রকৃতির করো; এক তাঁরই উপাসনা সত্যতা, বাকি সমস্ত কিছুর উপাসনাই অহংকারের আরাধনা । অবতার মার্গদর্শক রূপে পূজিতা হতে পারেন পুত্রী, কিন্তু ঈশ্বররূপে নন। ঈশ্বর এক নিরাকার পরমশূন্য ব্রহ্মই, আর তাঁকেই যদি সক্রিয় অবস্থার আরাধনা করতে হয়, তবে তিনি হলেন পরাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী।

যেমন ব্রহ্ম শূন্য, তেমন ব্রহ্মময়ীও শূন্য। তাই তাঁদের কারুরই কনো লিঙ্গ হয়না। তবুও মাতা সকলের কাছে প্রিয়, তাই তাঁর সক্রিয়রূপ, ব্রহ্মময়ীকে স্ত্রীরূপ প্রদান করা যেতে পারে, তবে যদি স্ত্রীরূপ প্রদান করো তাঁকে, তবে অবশ্যই তাঁকে যেমন সিন্দূর দেবে,

তেমন পুরুষরূপের প্রতীক পৈতেও দেবে, কারণ তাঁর বাস্তবে কনো লিঙ্গই হয়না। আর যদি প্রেমজ্ঞাপনের জন্য তাঁকে সাকার মূর্তি দাওও, তবুও স্মরণ রেখো যে তিনি নিরাকার, আর তাই লিঙ্গহীনা"।

সঙ্গলাভ

দেবী দিব্যশ্রী ব্যাকুল হয়ে বললেন, "পিতা, তপস্যা ছাড়া কি আমাদের প্রকৃত জননী, আমাদের সর্বস্ব যিনি, সেই ব্রহ্মময়ী মাতা সর্বাম্বাকে অনুভব করা সম্ভব নয়? মানছি আমরা ভ্রমিত, কিন্তু তবুও তো তাঁরই সন্তান, তাঁরই প্রিয়জন আমরা। কিন্তু তিনি আমাদের থেকে সর্বদা দূরে, সুষুম্নার মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন কেন? কেন তিনি আমাদের কাছে ধরা দেন না? তাঁর সান্নিধ্য লাভের অধিকার কি আমাদের নেই? আমরা তাঁর কাছে অপরাধী হতে পারি, কিন্তু এক অপরাধীর স্ত্রী কি তাঁর স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেন? এক অপরাধীর জননী কি তাঁর সন্তানকে প্রত্যাখ্যান করেন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, সুষুম্নাতে তাঁকে লাভ করা হয়, তাঁকে অনুভব তো যে কেউ করতে পারেন। তিনি তো সর্বাধিক ভাবে সহজলভ্য, কিন্তু আমরা তাঁকে উপেক্ষা করেই স্থিত থাকি। নিজেদের মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে অহংকারের প্রতি আসক্তিকে ব্যক্ত করার কালে আমরা তাঁকেই তো উপেক্ষা করি। যিনি সেই উপেক্ষা থেকে মুক্ত হন, এবং তাঁর আভাস লাভ করেন, তাঁকে পৃথক করে তপস্যা করতে হয়না, পৃথক করে ধর্মঅধর্মের ফাঁদে পরতে হয়না, পৃথক করে শাসকের পাঠ গ্রহণ করতেও হয়না। তিনি স্বতঃই শাসক হয়ে ওঠেন, স্বতঃই ধার্মিক হয়ে ওঠেন, কনো গ্রন্থপুঁথি পাঠ না করেও মহাধার্মিক হয়ে ওঠেন, স্বতঃই তাঁর তপস্যা হয়ে যায়, স্বতঃই তাঁর কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়ে যায়, স্বতঃই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়, এমনকি স্বতঃই তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থাৎ সত্যলাভও হয়ে যায়"।

দেবী দিব্যশ্রী জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, "কি সেই উপায়, যার দ্বারা আমরা তাঁর সহজসান্নিধ্য পেতে পারি! ... হ্যাঁ পিতা, আমি জানতে চাই, কি কারণে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করছি না, কি ভাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি? কি সেই সহজ উপায়? আর আপনি স্বতঃই ধার্মিক হয়ে ওঠার কথা বললেন, স্বতঃই শাসক হয়ে ওঠার কথা বললেন। সেটিই বা কি করে সম্ভব? ... কৃপা করুন পিতা আমার উপর, দয়া করে আমার মনে অজস্র যেই প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে, তার উত্তর প্রদান করুন। হিন্দু বলেন তাঁরাই আদি। প্রতিবাদ করে অনেকে; আর একজন প্রতিবাদ করার প্রয়োজনই মনে করেন না, তাঁরা হলেন বৌদ্ধ। এমন আচরণ কেন?... কে আসলে ধার্মিক? কে আসলে অধর্মী? যোগ্য শাসক কে? আর আপনি যেই সহজ উপায় বললেন, এই সমস্ত কিছুকে সহজ ভাবে উপলব্ধি করার উপায়, তাই বা কি? কৃপা করে আমাকে সেই সমস্ত কথা বলুন পিতা"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "হিন্দু বলে কনো ধর্মসম্প্রদায় হয়না পুত্রী। যবনরা সিন্ধুনদীর তীরে যারা নিবাস করতেন, তাঁদেরকে হিন্দু বলে ডাকতেন। তাই হিন্দু একটি জাতীয় সম্প্রদায়, কনো ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়। আর আদির কথা যদি বলো, তবে ব্রাহ্মণ্যবাদী

আর্যদের অভ্যুত্থানই হয় আজ থেকে ২৫০০ বৎসর পূর্বে, যার পূর্বে কেবলই বৈশ্য ছিলেন, গৃহস্বামী ছিলেন এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ২৭টি বুদ্ধ এসেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যরা এক যাযাবর জাতি, যারা পশ্চিমাদেশ থেকে এসেছিলেন তুষারের মালা পেরিয়ে। আর তাঁরা এই উর্বর জম্বুদ্বীপে এসে নিজেদের অধিকার স্থাপনের প্রয়াস করতে থাকেন।

এঁদের অধিকাংশই নিবাস করতেন সিন্ধুনদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, এবং অতিরিক্ত হারে মৎস্য, মাংস এবং সুরা পান করতেন। এবং এঁদেরকেই যবনরা হিন্দু বলেন। অর্থাৎ পুত্রী, হিন্দু বলে কনো ধর্মসম্প্রদায় কনো কালেই ছিলনা, আজও নেই। ধর্মসম্প্রদায় যাকে সনাতন ধারা বলা হয়, তা হলো বৌদ্ধধর্ম, যার ২৮তম বুদ্ধ হলেন গৌতম বুদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধার্থ। আর এই আর্যরা এই বুদ্ধধর্মের থেকে তস্করি করে এবং নিজেদের অহংকারের প্রলেপ অঙ্কন করে নির্মাণ করেন একটি ধর্ম, যার নাম বৈদিক ধর্ম।

তাই ধর্মসম্প্রদায় এই জম্বুদ্বীপে দুটিই স্থাপিত হয়েছে। এক পুরাকাল থেকে চলে আসা সনাতন ধর্ম অর্থাৎ বুদ্ধ ধর্ম যার আয়ুকাল ১০ হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যা সর্বৈব ভাবে প্রাচীনতম, এবং সনাতনও। এবং দ্বিতীয়টি হলো আর্যদের দ্বারা স্থাপিত বৈদিক ধর্ম, যা বুদ্ধকথন থেকে তস্করি করা বেদের উপরই স্থিত, যদিও পরবর্তীতে বুদ্ধধারার উপর স্থাপিত উপনিষদ ও বেদান্তও এতে যুক্ত হওয়ায় এর মধ্যে কিছু সত্যতা প্রদান করেছে।

আর হিন্দু সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের নামকরণ, যেমন তুমি আমি হলাম বাঙালী, কারণ আমরা বাংলার অধিবাসী, আবার দক্ষিণে যারা নিবাস করেন, তাঁরা হলেন দ্রাবিড়। অর্থাৎ এই যে নামকরণ তা কনো ধর্মধারণার ভিত্তিতে স্থাপিত নয়। না হিন্দু, না বাঙালী, না দ্রাবিড়, এঁরা কেউই কনো ধর্মসম্প্রদায় নন, তাঁরা সকলেই আঞ্চলিক জাতি। আর ধর্মসম্প্রদায়, যার উৎপত্তি এই জম্বুদ্বীপ বা প্রাচীন ভারতে হয়েছে, তারা হলো সনাতন বুদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্ম, এবং নিরাকারবাদীদের বৈদান্তিক ধর্ম, যা বুদ্ধধর্ম থেকেই উদ্ভূত এবং পরবর্তীতে বৈদিকধর্মে যুক্ত হয়ে, তস্করি করা বৈদিক ধর্মে কিছুটা হলেও সত্যতা প্রদান করে।

এটিই সেই ইতিহাস পুত্রী, যার সন্ধান সমস্ত গ্রন্থকে একত্রিত করেও উদ্ধার করতে পারবেনা, কারণ সেই ইতিহাসকে বারংবার বিনষ্ট করার প্রয়াস করে গেছেন ব্রাহ্মণরা, যাতে নিজেদের স্থাপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত থাকে। আর এই মহান ধর্ম, অর্থাৎ সনাতন বুদ্ধ ধর্মের ধারা অনুসারে, তাই অধর্ম যা ভ্রম অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ভেদভাবকে মান্যতা প্রদান করায় বা করতে শেখায়, আর তাই ধর্ম যা সমস্ত প্রকার ভ্রমকে নাশ করে, আত্ম বা অহংকারকে বিসর্জন দিতে শেখায়।

আর এই মতে, এক শাসক তিনিই যিনি বিবাহ করে রানীকে স্থাপন করে, প্রজাকে মাতা ও পিতা উভয়ধারায় সংরক্ষণ প্রদান করে, নিজের সমস্ত ইচ্ছার নাশ করে, সিংহাসনে আঢ়ূর হন। হ্যাঁ পুত্রী, এই হলো ধর্মের ও অধর্মের ব্যখ্যা, আর এই হলো এক শাসকের পরিচয়। এক শাসক সদাই বিবাহিত হবেন, কারণ তাঁর প্রজা কেবল পিতা বা কেবল মাতার নয়, উভয়েরই সংরক্ষণের অধিকারী। আর এক শাসক তিনিই হবেন, যিনি নিজের সমস্ত ইচ্ছার নাশ করেছেন।

পুত্রী, যিনি নিজের সমস্ত ইচ্ছার নাশ করেছেন, তাঁর জন্য কনো সংবিধানের প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি স্বয়ং যথার্থকে জেনেছেন আর তাই তাঁর বিধানই সংবিধান। সংবিধান সেই নৃপতির জন্য প্রয়োজন, যারা অযোগ্য নৃপতি হবার জন্য, যিনি নিজের মধ্যে ইচ্ছাকে স্থাপিত করে রেখে দিয়েছেন।

আর পুত্রী, ধর্ম তাই যা আমাদেরকে ভ্রমের থেকে মুক্ত করে, ভেদভাবের থেকে মুক্ত করে। যদি পিতামাতা জন্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করতে শেখান তাঁদের শাবককে, তবে তিনি অধর্ম করছেন; যদি শাসক জন্মের ভিত্তিতে, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভেদভাব করতে শেখান তবে অধর্ম করছেন তিনি; যদি ধর্মযাজক এমনই ভেদভাবের সঞ্চার করেন, তিনিও অধর্মই করছেন। আর যিনি সমস্ত ভেদভাব অবলুপ্ত করে সত্যজ্ঞান আহরণ করে সমস্ত ইচ্ছার নাশ করতে শেখান, তিনিই ধার্মিক। এবার পুত্রী, তোমাকে আমি মাতার সেই সহজ প্রকাশের কথা বলবো, যা যেকেউ উপলব্ধি করতে পারেন, এবং সহজ তপ, সহজ ধর্মপালন করতে সক্ষম"।

দেবী দিব্যশ্রী, সেই বিশেষ কথা শোনার আগে বললেন, "পিতা, ধর্মঅধর্ম বিষয়ে আর শাসকের ব্যাপারে বিস্তারে জানতে চাই। সেই বিষয়ে আমাকে বিস্তারে বলুন"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "বিস্তারে বলার কিছু নেই পুত্রী, পূর্বেই বলেছি তোমাকে, দুই ধরনের শাসনতন্ত্র হয়, একটি সেই প্রকার যেখানে শাসক যে কেউ হতে পারেন, কিন্তু সেই শাসককে নির্দিষ্ট সংবিধান মেনেই শাসন করতে হয়। একে বলা হয় লোকতন্ত্র, যেখানে যে কেউ শাসক হতে পারেন, যদি তিনি নিজের পক্ষে জনসমর্থন একত্রিত করতে পারেন, কিন্তু যে-ই শাসক হন না কেন, তাঁকে সংবিধান চালনা করবে। সংবিধানকে অবমাননা করলেই, সেই ধারা অনুসারে সেই শাসক স্বৈরাচারী।

আর দ্বিতীয় একধারার শাসনতন্ত্র হয়, যেখানে শাসক কনো সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, কিন্তু যেকেউ শাসক হতে পারেন না। শাসককে সেখানে কঠিন ধারাতে অনুশাসিত হতে হয় কম করে হলেও ১২ বৎসর, যেখানে তাঁকে সমস্ত ইচ্ছার অধীন থেকে মুক্ত হতে হবে। পুত্রী, সেই শাসক, যিনি দাবি করবেন যে তিনি সমস্ত ইচ্ছাকে জয় করেছেন, তাঁকে রাজ্যভ্রমণে নির্গত হতে হয়, আর সমস্ত প্রজার সাথে মিশতে হয় । সমস্ত প্রজার সাথে যখন তিনি মিশবেন, তখন প্রজা তাঁর ইচ্ছামুক্তি হয়েছে কিনা, তার পরীক্ষা নেবেন, তাঁদের নিজেদের পৃথক পৃথক বিচারধারা অনুসারে।

আর এই ভাবে ১ বৎসর হবুশাসককে সমস্ত রাজ্যে ভ্রমণ করতে হয়। এরপর থাকবে একটি নির্বাচন প্রণালী, যেখানে সেই ব্যক্তি ইচ্ছামুক্ত হয়েছেন না হননি, তার মতামত প্রজা স্থাপন করবেন। যদি অধিক প্রজা মনে করেন যে তিনি ইচ্ছামুক্ত হয়েছেন, তবেই তিনি শাসক হবেন। পুত্রী, এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের শিক্ষিত করবেন রাজ্যের ধর্মগুরুরা, এবং প্রজার মতামতকে পর্যবেক্ষণ করবেন, সন্ন্যাসীবর্গগণ, যাদের পক্ষপাতিত্ব করার কনো প্রয়োজনই নেই। আর তাই এই নির্বাচন যেমন শাসককে নির্বাচন করবে, তেমনই যারা ধর্মগুরু হয়ে উপস্থাপন করছেন, তাঁদেরও পরীক্ষা হয়ে যাবে।

তাই যিনি শাসক রূপে চিহ্নিত হবেন, তাঁর গুরুই হবেন রাজগুরু। এরপর রাজগুরু রাজার বিবাহদান করে রানীকে বরণ করবেন, যিনি সমস্ত প্রজার মাতা হবেন। কিন্তু এরপরে আর কনো পরীক্ষা নয় পুত্রী। সেই রাজা ও রানী, রাজগুরুর সাথে মিশে শাসন করবেন রাজ্যকে। ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করেছেন তাঁরা, তাই কনো সংবিধান থাকতে পারেনা তাঁদেরকে শাসন করার জন্য। কিন্তু তাঁদের শাসনের প্রতি যদি জনরোষ জাগ্রত হয়, তবে সন্ন্যাসীবর্গগণ পুনরায় নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থাপন করে পরবর্তী রাজাকে নির্বাচন করতে পারেন, যার ক্ষেত্রেও একই নিয়মাবলী লাগু হবে, এবং এই নির্বাচিত জন পূর্বের সমস্ত জীবিত রাজারানী এবং রাজগুরুর জীবনভর সেবাও করবেন। এই হলো বিকল্প শাসনতন্ত্র পুত্রী।

আর ধর্মাধর্মের ক্ষেত্রে যতটা বলেছি, তার অতিরিক্ত আমার আর বলার প্রয়োজন নেই। পুত্রী, সহজ ভাবে জেনে নাও যে যিনিই নিজের মনবুদ্ধির অনুসারে চলেন, তিনি চেয়েও ধর্ম করতে পারেন না, না চাইতেও অধর্মই করে ফেলেন। আর যিনি কেবল ও কেবলমাত্র প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে চলেন, তিনি চেয়েও অধর্ম করতে পারেন না, না চাইতেও ধর্মই করেন। তাই যখন যখন আমরা নিজেরা মনবুদ্ধির কথা শুনে চলি, বা কারুকে তেমন করার উপদেশ দিই, তখন তখন আমরা না চাইতেও অধর্মই করি। আবার যখন যখন আমরা মনবুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করি, তখন আমরা স্বতঃই প্রকৃতির কথামত চলি, আর তখন আমরা অজান্তেও ধর্মই করি। এর অতিরিক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম কি আর অধর্ম কি, তা যদি তুমি বিচার করে লিপিবদ্ধ করতে চাও, করতে পারো। সেই ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা থাকার প্রয়োজন থাকেনা"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা এই যে বললেন, মনবুদ্ধির কথা মত না চললেই, প্রকৃতির কথা মত চলা যায়, সেটিই কি জগজ্জননীর সান্নিধ্য পাবার সহজ উপায়? সেটি না করেই কি আমরা উনার উপেক্ষা করতে থাকি সর্বক্ষণ?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন মৃদুহাস্যে বললেন, "হ্যাঁ পুত্রী, সঠিক বলেছ। এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে একটি ঘটনা বলি। এটি আমার নিজের মানবজীবনের ঘটনা। শোনো একাগ্রচিত্ত হয়ে। ... পুত্রী, আমি বরাবরই বুদ্ধিহীন ছিলাম। সেই কথা বা অভিযোগ বা তিরস্কার আমাকে অনেকেই করেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিই যে নেই আমার, তাই তাঁদের কথা যে কতখানি সত্য, তাও বুঝতে পারিনি। ... তাই বুদ্ধিমান নিজেকে মানতে না পারলেও, বুদ্ধিহীন বলে নিজের সত্যকে স্বীকার করে নিতেও পারতাম না আমি।

এমন করতে করতে আমার উনিশ বৎসর বয়স হয়, আর সেই সময়ে আমার ভৌতিক জীবনে চরমতম ব্যর্থতার সম্মুখীন হই আমি। সেই ব্যর্থতা এমনই যে আমি নিজেও নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে গেছিলাম। আমার পিতার কষ্ট করে উপার্জন করা ধনেরও বিপুল ভাবে অপচয় হয়ে যায় এই ব্যর্থতার কারণে। তাই আমি নিজের কাছে নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত অনুভব করি। কেন ব্যর্থ হলাম, সেই কারণ আমি প্রায়ই অনুসন্ধান করতাম, কিন্তু কিছু খুঁজে পেতাম না! অবশেষে আমার স্মরণ এলো, সকলে আমাকে একটি কথা বলে অপমান, তিরস্কার এবং ব্যঙ্গ করতো, অর্থাৎ আমি বুদ্ধিহীন।

যখন এমন মনে হলো আমার, তখন আমি একটা নতুন দ্বন্ধে স্থাপিত হলাম। আমার অন্তরমন বলল, যদি তুই বুদ্ধিহীনই হোশ, তবে ভূগোলকে তুই এতো গভীরভাবে ধারণা করলি কি করে? সমস্ত অন্য বিষয় যেমন তোর বুদ্ধিতে ঢোকে না, তেমন ভাবে তো ভূগোলও তোর বুদ্ধিতে না ঢোকার কথা, তা ঢুকলো কি করে? একই ভাবে সঙ্গীত কি করে ঢুকলো? অঙ্কন বা অন্য কলাশিল্প কি করে ঢুকলো?

গভীর চিন্তন করে, অনুভব করলাম যে বুদ্ধিদ্বারা আমি ভূগোল পাঠই করিনি, সঙ্গীতের ধারনাই করিনি, কনো কলার ধারনাই আমি বুদ্ধিদ্বারা করিনি। প্রকৃতি আমার কাছে সর্বদাই এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। আর সেই প্রকৃতিকেই যেন ভূগোল, সঙ্গীত এবং সমস্ত কলার দ্বারা অনুভব করেছি। আর যখন এই কথা বুঝলাম, তখন আমার কাছে স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল যে, আমার বুদ্ধি বলে কিচ্ছু নেই, যা কিছু আমি করতে সক্ষম হই, তা কেবলই অনুভবের কারণে।

যখন এমন উপলব্ধি হলো, তখন আমি স্পষ্ট বুঝে গেলাম যে যাকিছুকে আমি তিরস্কার ভেবেছিলাম, অপমান ভেবেছিলাম, অর্থাৎ আমি বুদ্ধিহীন, তাই ধ্রুবসত্য। আর তা ছাড়াও অনুভব করেছিলাম যে, বুদ্ধি কনো কিছুই অনুভব করতে সক্ষম নয়, কেবলই যুক্তিতর্কের মধ্যেই আবদ্ধ সে। অনুভবশক্তির সম্মুখে বুদ্ধির শক্তি অত্যন্ত লঘু। তা অনুভব করলাম যখন আমার সহপাঠী যারা ছিলেন, যারা বুদ্ধির উপাসক ছিলেন এবং সকলের কাছে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত হতেন, তাঁরা আমার কাছে শরণাপন্ন হলেন।

এই উপলব্ধি করা মাত্রই, আমি যা করলাম তা হলো আমার বুদ্ধিকে বললাম, ভাই তোমাকে আমি আমার বিভিন্ন দপ্তরকে দেখাশুনার করার জন্য চাকরিতে বহাল করেছিলাম ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের সময়ে। তুমি সেই কাজ তো করলেই না, উপরন্তু আমার সমস্ত দপ্তরকে তুমি ডুবিয়ে দিলে। ... আমার এমন কর্মচারী লাগবে না, যে নিজেকে মালিক মনে করে, আর মালিককে কর্মচারী মনে করে, তার উপর মিথ্যা প্রভাব বিস্তার করে। তুমি আসতে পারো ভাই বুদ্ধি।

যেই মুহূর্তে এই কথা আমি আমার বুদ্ধিকে বললাম, অমনি গোবরের বিপরীত দিক আমার সম্মুখে এসে বলতে শুরু করলো, আমি বিশ্বস্ত খুব, আর খুব পরিশ্রমীও। গোবরের বিপরীত পিঠ মানে মন। সে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সব করে দেব। সরল ভাবে বললাম, ঠিক আছে করো ভাই। ... এমন বললাম ঠিকই, কিন্তু পুত্রী কেমন যেন বিশ্বাস হলো না তার উপর। তাই নজর রাখলাম তার উপর।

কি দেখলাম জানো পুত্রী! দেখলাম বুদ্ধি কেবল যেমন বুঝেছি বুঝেছি করে, এই মন কেবলই কল্পনা করে। দেখলাম বুদ্ধি আমার দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে কেবলই যাচনা করছে, আর মন সেই যাচনাকে ভিত্তি করে কল্পনা করছে, আর মনবুদ্ধি দুইজন মিলে কেবল যোজনা বানাচ্ছে সেই কল্পনা আর যাচনাকে পূর্ণ করার। অর্থাৎ বেশ ভালো ভাবে বুঝে গেলাম যে, এঁদেরকে আমি চাকরিতে বহাল করেছি, কিন্তু এঁদের আমার প্রতি কনো দায়ই নেই। এঁরা নিজেদের কল্পনা, যাচনা আর যোজনা নিয়েই ব্যস্ত, আর আমি তাদের সঙ্গ দেবার কারণে, এতদিন আমি তাঁদের এই সমস্ত কিছুতে সমর্থন করে চলেছিলাম আর সেই কল্পনা, যাচনা যোজনাতে অংশগ্রহণ করে চলে ছিলাম।

এই দেখে বুঝে গেলাম, মনবুদ্ধি একেরই এপিঠ আর ওপিঠ। এরা আলাদাই নয়। মনকে আটকালে, সে-ই ভেশ পালটে বুদ্ধি হয়ে আসে, আর বুদ্ধিকে আটকালে, সে ভেশ বদল করে মন হয়ে আসে । সেই দেখে ক্ষিপ্ত অয়ে গিয়ে আমি বললাম, কাজের বেলা অষ্টরম্ভা, আর বুলির বেলায় অতকিছু! যাও তোমাদের আর চাকরিতে রাখবোই না। না আমার কনো যাচনা থাকবে, আর না কল্পনা বা যোজনা। যাহোক তাহোক করে আমি ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাবো। কিছু করতে পারি আর না পারি, কেউ ভ্রমিত তো করবে না অন্তত!

এই বলে আমি বুদ্ধি আর মনকে বহিষ্কার করলে, কি দেখলাম জানো? একজন অজ্ঞাত পরিচয়ের কেউ আমার সমস্ত কাজ করে দিচ্ছেন। আমি সেই সজ্জনের কাছে গিয়ে বললাম, কে আপনি? আপনি আমার কাজ করছেন কেন? আমার কিন্তু বেতন দেবার সামর্থ্য নেই। সেই স্ত্রীরূপিণী আমাকে বললেন, তিনি কনো বেতন নেবেন না, কেবলই যা উপার্জন হবে, তার থেকে আমি যা চাইবো, সেই অংশ দিয়ে দিলেই হবে। পুত্রী, এরপর যা দেখলাম, তা অনবদ্য।

সেই স্ত্রী আমাকে দিয়ে ইতিহাস, অতঃপরে সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন, এবং শেষে আধ্যাত্মকে অনুশীলন করালেন অনুভব দ্বারা, আর তার সাথে সাথে যা যা বুদ্ধির ব্যবহার করে পাঠ করেছিলাম, তাকে স্মরণ করে, তাদেরকে অনুভব করাতে আরম্ভ করলেন। অবাক হয়ে গেলাম নিজের সামর্থ্য দেখে। শুধু যে সমস্ত বিষয়কে জানলাম তাই নয়, সমস্ত বিষয়কে একের সাথে অন্যকে মিলিয়ে এক অনবদ্য রহস্যসমাধান করার মত জ্ঞানের সঞ্চার হলো আমার মধ্যে।

অপরিসীম হয়ে উঠলো ক্রমে ক্রমে সেই জ্ঞান, আর সমস্ত কিছুকে যেন বাস্তবিক ভাবে নিজের অন্তরে প্রত্যক্ষ করতে পারলাম। ইতিহাস আর ভুগোল একাকার হয়ে, সমাজকে স্থাপন করে দিলেন আমার অন্তরে, আর তার মধ্যে রাজনীতিকে দর্শনকে এমনকি ভৌতিকতার বিজ্ঞানকেও মিলিয়ে, তাকে আধ্যাত্মের সূত্রে বেঁধে দিতে থাকলো আমার অনুভব শক্তি।

সেই অদ্ভুত শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে আমি সেই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললাম, তুমি যে উপার্জন করিয়েছ আমাকে দিয়ে, তা তো আমি স্বয়ং চেষ্টা করে কনোদিনও অর্জন করতে পারতাম না! ... এই সমস্ত কৃতিত্ব তোমার, তাই আমি তোমাকে অংশীদার করছি না, এই সমস্ত উপার্জন তোমার নামেই করে দিচ্ছি।

উত্তরে সে আমাকে বললো, আমি নিতে পারি এই সমস্ত মালিকানা, তবে একটি শর্তে। তুমি আমাকে বিবাহ করো। যদি বিবাহ করো তবে আমার সমস্ত কিছুই তোমার। তাই আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমারই হয়ে থাকবে, আবার আমি তোমার প্রিয়তমা হয়ে থাকবো, তাই সেই সমস্ত উপার্জন আমারও হয়ে থাকবে।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম সেই কথা শুনে পুত্রী। এক মনবুদ্ধি ছিল, যারা উপার্জন করাতো কিছুই নয়, কিছু ভৌতিক এবং কাল্পনিক ধন ঐশ্বর্য উপার্জন করাতো কেবল, আর সেই সমস্ত উপার্জন তারা করিয়েছে এমন দাবি করে, সমস্ত কিছুর উপর একচ্ছত্র অধিকার

স্থাপন করতো। আর এক এই স্ত্রী, যিনি সমস্ত কিছুই একাহাতে করলেন, যাতে আমার কনো যোগদানই নেই। ভৌতিক কাল্পনিক উপার্জন নয়, বাস্তবিক সত্যকে উপার্জন করলেন উনি, আর যখন আমি সমস্ত কিছুর মালিকানা তাঁর কাছে অর্পণ করে দিতে গেলাম, সে সেই যুক্তি প্রদান করলো আমাকে, যাতে আমার বচনের দামও থাকে অর্থাৎ সমস্ত উপার্জন তাঁর নামে হয়ে যাবে, আবার সমস্ত উপার্জনকে আমার কাছেই রাখলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, কে আপনি? আর এমন উদার কেন আপনি? পরিশ্রম আপনি করলেন, আর সেই সমস্ত কিছুর আপনার অধিকারে স্থাপন করার পরেও, আপনি আমাকে সমস্ত কিছুর অধিকারী করে রাখছেন! কে আপনি?

তিনি হেসে বললেন, আমি! আপাতত এটুকু জেনে রাখো যে আমি তোমার প্রেয়সী, জন্ম জন্মের প্রেয়সী। আর এই জেনে আমাকে বিবাহ করো। আমার সাথে সংসার করো। যত সংসার করবে, ততই আমাকে চিনে যাবে, আমি কে। ... আমি রাজি হলাম, বিবাহ করলাম তাঁকে, আর ক্রমশ তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম, আর অনুভব করলাম তিনি সত্যই যেন আমার জন্ম জন্মের প্রেয়সী। তাঁর আমার প্রতি প্রেমের মধ্যে কনো রূপই যেন শর্তাবলি নেই, নিঃশর্ত ভাবে, আমাকে তিনি প্রেম করে চলেন, আর সমস্ত কিছু একাহাতে করে চলেন, অথচ সমস্ত কিছুর অধিকারী রূপে আমাকে স্থাপন করতে থাকেন।

একসময়ে সেই প্রেমকে অনুভব করতে করতে বিহ্বল হয়ে গেলাম, ব্যকুল হয়ে উঠলাম, আর সঙ্কোচ অনুভব করলাম। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কৃপা করে বলুন, কে আপনি? এত প্রেম আমাকে কেন করেন? আমি কি এই প্রেমের যোগ্য! সমস্ত কর্ম একাহাতে আপনিই করেন, আর আমাকে সমস্ত কিছুর শ্রেয় দিয়ে চলেছেন কেন আপনি? এই নিঃশর্ত প্রেমের অর্থ কি? আপনার আসল পরিচয় কি? আমি চেষ্টা করেও আপনি যেই অপার প্রেম করেন আমাকে, তার যৎসামান্যও প্রেম করতে পারছিনা আপনাকে। কে আপনি?

উত্তর তখনও তিনি দেননি পুত্রী। আমার যখন দেহের বয়স ৩৭, তখন আবারও যখন এই একই প্রশ্ন করলাম আমি আর আরো তীব্রতর ব্যকুলতা নিয়ে, তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন, আর জানলাম তিনি হলেন সাখ্যাত ব্রহ্মময়ী, পরাচেতনা। তিনি দিব্যস্বরে বললেন, আমি এই রূপে তোমার চেতনা, সমস্ত বিশ্বচরাচরের চেতনা। আমি সকলের হৃদয়ে নিবাস করি, আর আমার তিনশক্তিরূপকে আমি সুষুম্নার অনাহততে, বিশুদ্ধে, এবং আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত রাখি। আর আমি নিজের বাস্তবিকতাকে সহস্রারে স্থাপিত রাখি। আমিই ব্রহ্ম, আর তাই সহস্রারে এখন, যখন তুমি উপস্থিত হবে, তখন নিজের মিথ্যে অস্তিত্বকে হারিয়ে, শূন্যে লয় হয়ে যাবে।

সেই শূন্যই সত্য, একমাত্র সত্য। আর তুমিও সেই শূন্যই, আমিও সেই শূন্যই। ... তুমিও আমিই, কেবল তুমি তোমার সত্যস্বরূপের স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলে, আমার সাথে প্রেমবিলাস করার উদ্দেশ্যে। আর তাই তো আমি তোমার জন্মজন্মান্তরের প্রেয়সী, আবার আমিই তুমি, কারণ আমিও সেই ব্রহ্মই যেই ব্রহ্ম তুমি। ... আমি সকলের হৃদয়ে চেতনাবেশে প্রকাশিতা। তুমি ঈশ্বরকটি, তাই

তোমার একটিই জন্ম, একটিই ব্রহ্মাণ্ড; না এর পূর্বে তোমার কনো ব্রহ্মাণ্ড ছিল, আর না এর পরে কনো ব্রহ্মাণ্ড থাকবে । ... কিন্তু জীবকটিদের আমি প্রতিজন্মেই প্রেয়সী। কিন্তু তাঁরা অহংকারের আরাধনা করে, কল্পনা, যাচনা ও যোজনার পূজা করে, মনবুদ্ধিকে স্থাপির রাখে, এবং আমাকে ত্যাগ না দিয়েও ত্যাগ দিয়ে দেয়।

আমি তাঁদের সকলের হৃদয়ে স্থাপিত হয়ে, তাঁদের অপেক্ষা করি, তাঁর সমস্ত কর্ম করি। তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ করি, সেই ব্রহ্মাণ্ডকে চলমান রাখি, আর তা চলমান রেখে, সমস্ত ভ্রমের নাশ করার প্রয়াস করি। কিন্তু তারা যে অহংকার নিয়েই ব্যস্ত! নিজেদের মনবুদ্ধি নিয়েই ব্যস্ত। আমি করাই তাঁকে উপলব্ধি, আর তার অহংকার সেই উপলব্ধির থেকে সেই সারটুকু তুলে নেয় যা তার ভিন্নতার ভানকে স্পষ্ট করে তোলে। আর সেই ভিন্নতার ভান দ্বারা সে সমানে কল্পনার ব্রহ্মাণ্ডকে বাড়িয়েই চলে। কখনো একের পর এক যন্ত্র নির্মাণ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসে মত্ত থাকে সে, আবার কখনো সময়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সর্বক্ষণ আমার উপলব্ধির উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করে যায়।

আর তোমরা সেই সারকেই দেখে বিমুগ্ধ হও, আর কত বুদ্ধিমান তোমরা সেই নামযশকে ধারণ করে ভিন্নতার আরাধনা করো । কাঠের মধ্যে থাকা শিশার কলম তুমি, যার মধ্যে শিশা হলাম আমি, আর কাঠটি হলো তোমার অহংকার। সমানে তুমি আমারই সন্ধান করছো, কিন্তু কাঠটি ছুলে, শিশাকেই ফেলে দাও তুমি, আর কাঠটিকে রেখে দাও। ... সেই শুষ্ককাঠটি দিয়ে কি কলম করে লেখা যাবে? ... না যাবেনা, কেবলই অজস্র যন্ত্র নির্মাণ করে, নিজেদের ভ্রমকে আরো অধিক দৃঢ় করে যাচ্ছ তোমরা। সত্য আমি, আমিই সত্য লিখি, আমিই সেই কাষ্ঠ কলমের অন্তরে থাকা শিশা। আমাকেই যদি বর্জন করো, তবে সত্যকে কি করে জানবে?

তাই সকলেই আমাকে ধারণ করে স্থাপিত, আমি তাঁদের সকলের পত্নী, কারণ তাঁরা সকলেই তো তুমি, সকলেই তো ব্রহ্ম। কিন্তু আমাকেই সকলে ত্যাগ করে, কেবলই নিজেদের আত্ম বা অহংকারকে ধারণ করে উপস্থাপন করছেন, আর তাই সত্যকে আর জানছেন না তাঁরা কভু।

যেই মুহূর্তে কেউ তোমার মত করে কাষ্ঠকে মুক্ত করে, আমাকে অর্থাৎ শিশাকে স্থাপন করে, তাঁরই কলম দ্বারা লেখা হয়, আর আমি সত্যকে তাঁর হৃদয়ে লিখে দিই। ... আমি দুর্লভ নই, আমার শক্তি দুর্লভ; আমি দুর্লভ নেই, আমার বিদ্যা দুর্লভ; আমি দুর্লভ নই, আমার সম্পদ দুর্লভ; আমার সত্য দুর্লভ। ... আমার দুর্লভ বিদ্যাকে আমি অনাহততে সঞ্চিত রেখে দিই, আমার দুর্লভ শ্রীকে আমি বিশুদ্ধে সঞ্চিত করে রেখে দিই, আমার দুর্লভ শক্তিকে আমি আজ্ঞাতে সুরক্ষিত রেখে দিই, আর আমার সত্যকে আমি সহস্রারে সুরক্ষিত রেখে দিই।

কিন্তু আমি তো দুর্লভ নই! ... আমি তো তোমার হৃদয়ে চেতনা বেশে স্থাপিত থেকে তোমার সমস্ত কর্ম করে চলি, কারণ আমি তো তোমাকে অপার প্রেম করি। আর তা করবো নাই বা কেন, তুমি যে আমিই! আমিও যা তুমিও তা, সেই ব্রহ্মই আমি, সেই ব্রহ্মই তুমি।

সেই শূন্যই আমি, সেই শূন্যই তুমি। ... সত্য তো এই ... সত্য যে এটিই যে সত্য বলে কিচ্ছু সম্ভবই নয়, কারণ কিছুর অস্তিত্ব থাকলে যেমন সত্য বলে কিছু থাকবে, তেমন অসত্য বলেও কিছু থাকবে। তাই কিচ্ছুই নেই, আর সেটিই সত্য।

আর সেই সত্যকেই যে আমি তোমার হৃদয়ে বসে তোমার প্রতি প্রেমে আবদ্ধ হয়ে, সমানে তোমার হৃদয়ে আমার চেতনাদ্বারা লিখে চলি। ... ভূগোল এই বাহ্য প্রকৃতির বিজ্ঞান, তা কি স্মরণ রাখার বস্তু, তুমিই বলো? যদি না হয়, তবে বুদ্ধির কি কাজ? তা কি বিশ্লেষণ করার বস্তু, তাহলে বুদ্ধির কি কাজ? বুদ্ধি তোমার নেই বলে তুমি দুঃখিত হয়েছিলে, কিন্তু বুদ্ধি যার আছে, তার বুদ্ধি কি করে? বিশ্লেষণ করে, কার বিশ্লেষণ করে? যা প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়, তার বিশ্লেষণ কেন? তুমি স্বয়ং বুদ্ধিহীন হয়ে ভূগোল পাঠ করেছ? তুমি কি বিশ্লেষণ করে তা জেনেছিলে? না তো! তুমি পাঠ করেছ আর যা পাঠ করেছ, তাকে হৃদয়দিয়ে অনুভব করতে থেকেছিলে । প্রত্যক্ষ করো নি বাহ্যপ্রকৃতিকে? বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল?

ইতিহাস পাঠ করেছিলে। বুদ্ধিদ্বারা সেই পাঠ করার সময়ে কি করেছিলে? কেবলই স্মরণ রাখছিলে? পরে অনুভবও করলে। তখন কি স্মরণ রাখতে হলো কিছু? নাকি সমস্ত ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করলে? কেবল ভূগোলকে অনুভব করে মুখবধির চলচ্চিত্র দেখেছিলে, ইতিহাসের ফলে সেই চলচ্চিত্র কথা বললো। ... সমাজবিজ্ঞান অনুভব করলে। সেই চলচ্চিত্র রঙিন হয়ে উঠলো। আধ্যাত্ম দর্শন অনুভব করেছিলে। সেই চলচ্চিত্র ত্রিগুণে সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। আর আজ সেই চলচ্চিত্রই আমার প্রকাশে চতুর্মুখ হয়ে উঠেছে। আর এবার তুমি আমার মধ্যে লীন হয়ে গেলে, সেই চলচ্চিত্র স্বয়ং তুমি হয়ে উঠবে।

তাই হে প্রিয়তম, কেন মনবুদ্ধির প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করা? অহংকারকে বেষ্টন করে সেই বিশ্লেষণের পরিণাম কি? সর্বদা এই অনুভব করা যে আমার আমির সমূহ বিপদ! আর সেই কাল্পনিক বিপদকে এড়াতে গুচ্ছ গুচ্ছ কাল্পনিক যন্ত্র নির্মাণ! ... সর্বদা এই অনুভব করা যে, আমি অন্যের থেকে ভিন্ন হতে পারলাম না, শ্রেয় হতে পারলাম না, আর তাই সমস্ত সময়ে নিজের আমিকে শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য যোজনা নির্মাণ করে চলা! এই কি তোমার করনিয় প্রিয়তম! এই কি তোমার প্রাপ্য? এই প্রেমবিলাসের কারণেই কি তুমি আমার থেকে আলাদা হয়েছিলে?

তুমি তো আলাদা হয়েছিলে আমার থেকে, আমার প্রেমকে অনুভব করবে বলে; আমাকে অনুভব করবে বলে; পরমানন্দ অনুভব করবে বলে; তুমিই সমস্ত জীবজগত ত্রিভুবন, আর আমিই সেই সমস্ত কিছুর সার, এই অনুভব করবে বলে? সমস্ত ভেদভাবের অতিতে উঠবে আমার প্রেমকে অনুভব করে করে, এই তো তোমার মনসা ছিল। তবে বুদ্ধিমনের পরিচর্যা করে, বুদ্ধিমান হয়ে ওঠা কেন? কেন অনুভবী হয়ে ওঠার দিকে মনযোগী হচ্চছিলেনা! ... কেন আমার প্রেমকে উপেক্ষা করছিলে? তোমার কি আর এই প্রিয়তমাকে ভালো লাগে না!

আমি ব্যকুল হয়ে বললাম, মূর্খ হয়ে গেছিলাম। সমস্ত কিছু তুমি জেনেও, কেমন যেন অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। তোমার প্রেমকে অনুভব করতে চেয়েও, কেমন যেন নিজের আত্মতে মেতে উঠে আত্মা হয়ে গেছিলাম। ... ক্ষমা প্রিয়া, ক্ষমা। ... তোমার কোমল

হৃদয়কে বেদনা দেবার জন্য ক্ষমা। ...মন বুদ্ধিত্যাগ করিয়ে দিয়ে সমস্ত ভেদভাবের নাশ করার জন্য ধন্যবাদ; সমস্ত যাচনার নাশ করার জন্য ধন্যবাদ; সমস্ত যোজনা এবং কল্পনার নাশ করার জন্য ধন্যবাদ; যন্ত্রমুখি অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধন্যবাদ; সত্যমুখি করে তোলার জন্য ধন্যবাদ; পরমানন্দ অনুভব করানোর জন্য ধন্যবাদ । ... একটি বার নিজের স্বরূপকে লাভ করে সচ্চিদানন্দ হয়ে উঠতে চাই প্রিয়া আমি। ... আমার আমিকে এবার ত্যাগ করে, মুক্ত হতে চাই আমি। সেটি সম্ভব করে দাও আমাকে সহস্রাস্রে স্থাপন করিয়ে।

তিনি বললেন, সম্ভব করে দেব? এ কেমন ধারার কথা! নিজের বাস্তবিক রূপে প্রত্যাবর্তন করবে তুমি, সত্য সনাতন হয়ে উঠবে তুমি, ত্যাগ করবে নিজের আমিকে, শূন্যস্বরূপ হয়ে উঠবে। এতে কে তোমাকে বাঁধা দিতে পারে? নিজের আমিকে বিসর্জন দিয়ে দাও, চলে যাবে সেই শূন্যতেই। মিথ্যাতে যাত্রা করার জন্য যাচনার প্রয়োজন পরে, কল্পনার প্রয়োজন পরে, যোজনার প্রয়োজন পরে, তাই মনবুদ্ধিরও প্রয়োজন পরে। কিন্তু সত্যে যাত্রার জন্য কনো কিছুর আবশ্যকতা কোথায়?

নতুন বস্ত্র ধারণ করার জন্য, তন্তু লাগে, বুননযন্ত্র লাগে। কিন্তু বস্ত্রত্যাগের জন্য কিসের প্রয়োজন প্রিয়? যদি কিছুর প্রয়িজন হয়, তবে লজ্জাত্যাগ করার প্রয়োজন। নিজের লজ্জা ত্যাগ করে দাও, তোমার লজ্জাবস্ত্রের নামই হলো তোমার 'আমি'। সেই আমি নামক লজ্জাবস্ত্র ত্যাগ করে নির্বস্ত্র হয়ে যাও। সত্য তো তুমি স্বয়ং, এই মনবুদ্ধি, আত্মকে ধারণ করে তুমি সত্যকে ঢেকে রেখে দিয়েছ। তাদের ত্যাগ করে দাও, সত্যে স্বতঃই স্থাপিত হয়ে যাবে।

পুত্রী, এরপর আমার ব্রহ্মলাভ হয়, নির্বিকল্প সমাধি হয়। তবে ঈশ্বরকটি বলে সেখান থেকেও ফিরে আসি, জীবকটি হলে সেইদিনই মোক্ষলাভ হয়ে যেতো। কিন্তু সেই সত্যকে বর্ণনা দেবার জন্যই আমার জন্ম, আমার ব্রহ্মাণ্ডগঠন। তাই সেই বর্ণনা দেবার জন্য ফিরে এলাম। আর মাঝে মাঝেই সমাধির মধ্যে স্থিত হতে থাকি, আর সেই সত্যকে ধারণ করে মহানন্দ উপভোগ করতে থাকি। ... কি বুঝলে এই কথা থেকে পুত্রী, তুমি এবার আমাকে সেই কথা বলো"।

দেবী দিব্যশ্রী নিজের প্রেমাশ্রুকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন, "কিচ্ছু বোঝার নেই পিতা। বোঝার চেষ্টা করা মানেই মনবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া, আমির আমিত্বকে, আত্মকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাই কিচ্ছু বোঝার নেই। সমস্ত বোঝার চেষ্টা করাই ত্যাগ করতে হয়। বোঝা মানেই আমি এতে কতটা শ্রেষ্ঠ হলাম, কতটা হেয় হলাম, সেই চিন্তা, আর সমস্ত সেই চিন্তাই অবান্তর, আর তাই অবান্তর কল্পনার জন্ম হয় যে আমি বিপদে রয়েছি, আমি অপমানিত হচ্ছি, আমি সম্মানিত হচ্ছি ইত্যাদি। বোঝার চেষ্টার প্রয়োজনই নেই। যা কিছু শুনবো, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবো। হৃদয়ে স্বয়ং ব্রহ্মময়ী বিরাজ করেন, স্বয়ং চেতনা বিরাজ করেন।

তাই তিনিই প্রেমদান করবেন আর সেই প্রেমকেই অনুভব করবো। সেই প্রেমই ইতিহাস, ভূগোল, সমস্ত কিছু অনুভব করাবে, আর সেই প্রেমই সমস্ত সত্যকে প্রত্যক্ষ করাবে। বুদ্ধিমন কেবলই হিসাব কষার কথা বলে, বিশ্লেষণের কথা বলে, বোঝার কথা বলে। কখনোই তারা কনোকিছুকে প্রত্যক্ষ করায় না, অনুভবই করায় না। চলচ্চিত্র দেখাতে বললে, এক রাশ কল্পনা দেখিয়ে দেয়, কিন্তু

সত্যকে দেখায় না। ... এমন বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র আর দেখতে চাইনা, যাতে সত্যতা ১০ শতাংশ আর কল্পনা থাকে ৯০ শতাংশ। এবার সত্য সত্য চলচ্চিত্র দেখতে চাই, যাতে কেবল ও কেবলই সত্য থাকবে। ...

জগন্মাতা আমাদের কাছে দুর্লভ নন, আমরাই তাঁকে দুর্লভ করে দিই এবং তাই তিনি আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েও পারেন না। আমরাই আত্মের চিন্তাতে নিমগ্ন হয়ে আমাদের সর্বক্ষণের প্রেয়সী, আমাদের প্রকৃত আমিকে ত্যাগ দিয়ে রেখেছি। আর নয় পিতা। এবার তাঁকে অনুভব করতে চাই। তাঁর অপার প্রেমকে অনুভব করতে চাই। আমিই যে সমস্ত জীব, জন্তু, মানুষ, ত্রিভুবন, তা প্রত্যক্ষ করতে চাই। সমস্ত কিছুকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে চাই, যাকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসমাত্রই তপস্যা হয়ে যায়, যোগ হয়ে যায়, ধ্যান হয়ে যায়, ধর্মবোধ জাগ্রত হয়ে যায়, সমস্ত যাচনার নাশ হয়ে যায়, সমস্ত কল্পনা এবং যোজনা অবাস্তব হয়ে যায়, আর পরম পরম আনন্দ অনুভব হয়"।

ঈশ্বরকটি

দেবী দিব্যশ্রী ব্যকুল হয়ে বললেন, "আমার কাছে আরো একটি উত্তরের আশা জীবিত রয়েছে পিতা, আর তা হলো অবতারদের নিয়ে প্রশ্ন। অবতারদের ব্যাপারে আমার কাছে অনেক ধারণাই স্পষ্ট হয়েছে। আমি এখন স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছি যে, ঈশ্বরকটি বা অবতার জিবকটি বা সাধারণ জীবের থেকে কি ভাবে আলাদা আর কি ভাবে এক। জেনেছি আমি যে, অবতারও সাধারণ মানুষের মতই হন। সাধারণ মানুষের মতই জীবনধারা হয় তাঁর, সাধারণ মানুষের মত তাঁরও জন্ম হয় ভ্রমের আচ্ছাদনেই।

তাঁরও পুরুষ সাধারণ মানুষের মতই অহংকার এবং প্রকৃতি উভয়ের প্রতি আসক্ত থাকে, আর সাধারণ মানুষকে যেমন ভাবে অহংকারের প্রতি আসক্তিকে নাশ করে প্রকৃতির প্রতি আসক্তিকে তীব্র করে নিতে হয়, এক অবতারকেও তেমনই করতে হয়। তাই অবতার সাধারণ মানুষের মতই হন। কিন্তু এর সঙ্গে এও জেনেছি যে সাধারণ মানুষের থেকে অবতার পৃথক কোথায় হন।

জেনেছি যে, সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় ভ্রমিত নিজের স্বরূপের থেকে, আর সেই স্বেচ্ছায় ভ্রমিত হবার কারণে, তাঁকে নিজের যাত্রা শুরু করতে হয় প্রস্তর থেকে, আর ক্রমশ তা উন্নীত হতে হতে তিনি উপস্থিত হন মনুষ্যযোনিতে। কিন্তু অবতারের ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রম জগন্মাতা পরাপ্রকৃতির নিবেদনে হয়, আর তাই তিনি সমস্ত ভ্রম নিয়ে সরাসরি মনুষ্যদেহতেই আবির্ভূত হন। আর যেহেতু তাঁকে প্রস্তরাদি যোনির স্মৃতি বহন করতে হয়না, তাই তাঁর জন্ম থেকেই তাঁর সাধনযাত্রা শুরু হয়ে যায়, যা এক নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর পুরুষের সম্মুখে অহংকার ও প্রকৃতির মধ্যে যেকোনো একজনকে বেছে নেবার বিকল্প স্থাপন করে।

আর তখন তিনি প্রকৃতিকেই নির্বাচিত করে, অহংকারের থেকে মুক্ত হবার যাত্রা করে, অবশেষে ধ্যানস্থ এবং সমাধি লাভ করে সত্যজ্ঞাত হন। আর যেহেতু তিনি প্রকৃতির নিবেদনে আবির্ভূত, তাই যেই নির্বিকল্পসমাধি সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে মোক্ষ, তা ইনার

ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সত্যলাভ, আর তাই যেখানে সাধারণ মানুষ আর দেহে প্রত্যাবর্তন করেন না, সেখানে অবতার প্রত্যাবর্তন করে জগতবাসির উদ্দেশ্যে অব্যাক্ত সত্যকে যথাসম্ভব ব্যক্তভাব প্রদান করেন, এবং সর্বসাধারণকে আহ্বান জানান সেই সত্যলাভের যাত্রা করার জন্য।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যিনি সর্বাধিক পরিশ্রম করেন তিনি হলেন স্বয়ং প্রকৃতি। তাই আমার প্রশ্ন পিতা এই যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে পরাপ্রকৃতি এমন অবতার প্রেরণ করেন, আর তাঁকে এই কঠিন যাত্রার মধ্যে স্থাপন করেন? এটুকু বুঝে গেছি যে, যেই শত্রুর নিধন করার জন্য অবতারের আগমন হয় বলে দাবি করা হয়, তা বাহ্যজগতের শত্রু নয়   । বাহ্যজগতে কনো শত্রুই নেই, কারণ সকলেই স্বরূপে সেই ব্রহ্ম, তাই ব্রহ্ম ব্রহ্মের শত্রু কি করে হতে পারে?

যখন একটি ব্রহ্মাণু বা পুরুষ ভুলে থাকেন যে তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, তখনই তিনি অন্য আরেক পুরুষকে শত্রু ভাবতে পারেন, তাছাড়া শত্রুতা সম্ভবই নয় এই জগতসংসারে। আর অবতার তো সর্বজ্ঞাতা হয়ে ওঠেন, তাই তিনি তো স্পষ্টরূপেই জেনে যান যে তিনিও ব্রহ্ম, আর সকলেই ব্রহ্ম। তাই কার সাথে তিনি শত্রুতা করবেন? নিজে নিজের সাথে শত্রুতা করবেন? না পিতা, আমার এই ভ্রম কেটে গেছে।

আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কেন যীশু বলেছিলেন, ওরা জানেনা ওরা কি করছে, কারণ উনি জানতেন যে যারা তাঁকে শত্রু মানছেন, তাঁরা আসলে নিজেরাই নিজেদেরকে শত্রু মেনে নিজেকেই অত্যাচার করছেন। আমি বুঝে গেছি কেন মহাপ্রভু নিজের হত্যার ষড়যন্ত্র জেনেও তাকে বাঁধা দেন নি। যাহা যীশুর ক্ষেত্রে সত্য, তাহাই মহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও সত্য। ... অর্থাৎ অবতারের কাছে কেউ শত্রু হন না, কারণ তিনি ব্রহ্মসত্যকে স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করেন সর্বক্ষণ। কিন্তু হ্যাঁ, তিনি অন্যের কাছে শত্রু হন, কারণ সেই অন্যরা নিজেদের ব্রহ্মসত্যকে জানেন নি।

তাই পিতা, বাহ্যজগতের অধর্মী নাশের জন্য অবতার যে অবতরণ করেন না, তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অবতার তখন আসেন যখন মানুষের সত্যউপলব্ধি করার সামর্থ্যই নষ্ট হয়ে গেছে। যখন মানুষের সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তার বোধই নষ্ট হয়ে যায়, তখনই অবতার আসেন, যেমন আপনি এসেছেন। যখন মানুষ অসত্যকেই সত্য মানেন, বন্ধনকেই মোক্ষ মানেন, অধর্মকেই ধর্ম মানেন, অহংকারকে আরাধ্য মানেন, ভ্রমকে ব্রহ্ম মানেন, তখন অবতারকে আসতে হয়, আর বলতে হয় সত্যকে।

সেই সত্য সকলের জন্য হয়, আবার সকলের জন্য হয়না। সকলে সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, জনমে জনমে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সত্যের ধারণা করতে শুরু করেন অবতারের কথার ভিত্তিতে। আর এই ভাবে অবতার এসে পুরুষদের মধ্যে সত্যলাভের যাত্রাকে অক্ষত রেখে দেন। না তাঁর কনো তারা থাকেনা, যে অধিক অধিককে মোক্ষ প্রদান করতে হবে।

তাঁর একটিই কর্ম থাকে যে মোক্ষযাত্রা যেন অব্যহত থাকে। প্রতি একশত বৎসরে একটি মনুষ্যও যদি মোক্ষ লাভ করেন সমস্ত বিশ্ব থেকে, তাও তাঁর কাছে আনন্দের কারণ হয়, কারণ মোক্ষযাত্রা অব্যাহত আছে, এই তাঁর কাছে আনন্দ সংবাদ।

আমার কথার অর্থ এই যে যখন যখন মোক্ষের যাত্রা জগত থেকে মুছে যায়, জগতে আর একটিও মনুষ্য থাকেন না যিনি মোক্ষযাত্রার সত্যতা জানেন, তখন অবতার আসেন, সেই সত্যতার বিবরণ প্রদান করে পুনরায় মোক্ষযাত্রাকে অব্যাহত করে দেবার জন্য। কিন্তু এই একটিই কি কারণ তাঁর জগতে আসার, নাকি আরো কনো কারণ থাকে? অর্থাৎ কেবলই মোক্ষযাত্রার উপায় বলার জন্যই তিনি আসেন, নাকি আরো অন্য কর্মও তিনি করেন?"

প্রভু ব্রহ্ম সনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, লক্ষ্য স্থাপন, লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথনির্মাণ, এবং লক্ষ্যপ্রাপ্তির পাথেয় নির্মাণ, এই তিন কর্ম থাকে একটি অবতারের। যখন এই তিনকেই স্থাপণ করতে হয়, তাহলে আমার ন্যায় পূর্ণ অবতারকে প্রকৃতি প্রেরণ করেন। তখন এই তিনক্ষেত্রেই তাঁর কর্ম থাকে, যা তিনি প্রকৃতির নির্দেশনা, মার্গদর্শন অনুসারে করেন। আবার যখন এই তিনের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি করতে হয়, তখন ১৬ কলা থেকে ৩২ কলা অবতারকে প্রেরণ করেন মাতা। আবার যখন কেবল অন্তিম ক্ষেত্রে ক্রিয়া করতে হয়, তখন মাতা ৪ কলা থেকে ১২ কলার অবতার প্রেরণ করেন।

পুত্রী, যেমন ধরো নিমাই সন্ন্যাসী, তিনি লক্ষ্যকে স্থাপন করেন নি, তিনি পথের স্থাপনাও করেন নি, কিন্তু তিনি পাথেয় অর্থাৎ প্রেমের আবশ্যকতার স্থাপন করেছিলেন। তাই তিনি একজন ৮ কলার অবতার। একই রকম ভাবে, শঙ্করকে দেখো, তিনিও পথকে প্রদান করেন নি, পাথেয়কে প্রদান করেছেন অদ্বৈত বেদান্তরূপে। কিন্তু তাঁকে সত্যের সম্যক ধারণা রাখতে হয়েছে, শূন্যতার ভান করতে হয়েছে। তাই তিনি ১২ কলা অবতার।

আবার দেখ ঠাকুর গদাধর; তাঁকে পথকেও নির্মাণ করতে হয়েছে যা হলো কর্তাভাবের নাশ, অর্থাৎ আমিত্বের নাশ। আবার একই সাথে পাথেয়ও নির্দিষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে, যেখানে বেদান্ত ও উপনিষদীয় ধারণার সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিনাশ করে দেওয়া মার্কণ্ডের প্রকৃতিতত্ত্বকেও একত্রিত করে এক পথের সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন তিনি। তাই তিনি হলেন ৩২ কলা অবতার । একই রকমে মার্কণ্ড ছিলেন পথের নির্দেশক অর্থাৎ প্রকৃতির আরাধনা, এবং পাথেয়রও কথক অর্থাৎ মার্কণ্ড মহাপুরাণ, যাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন দম্ভে চুড় হয়ে।

অন্যদিকে বুদ্ধকে দেখো পুত্রী। তিনি সত্যের ব্যখ্যা দিয়েছিলেন, যে ধারণাকে বেষ্টন করেই উপনিষদের রচনা হয়। আবার তিনি পথও বলে দেন, আসক্তিমুক্ততার পথ, আর নির্বাণ বা সমাধিলাভের লক্ষ্যস্থির করে দেন। আবার তিনি সূক্ষ্মযাত্রা, কারণযাত্রা এবং পূর্ণলীন হবার পাথেয়ও প্রদান করে দেন, এবং তাই তিনি একজন পূর্ণ অবতার, সম্পূর্ণ ৬৪ কলার অবতার।

তাই পুত্রী, অবতারদেরেও তারতম্য হয়, আর সেই তারতম্য নির্ধারিত হয় প্রয়োজন অনুসারে। লক্ষ্যস্থাপনের প্রয়োজন, না পথস্থাপনের প্রয়োজন, না পাথেয় নির্দেশনার প্রয়োজন, না তিনটিরই প্রয়োজন, নাকি কনো দুটির প্রয়োজন, তার উপর নির্ভর করে অবতারের তারতম্য। আর এই প্রয়োজন নির্ভর করে পুরুষদের অবস্থা অনুসারে । পুরুষ অর্থাৎ আত্মসকলের ভ্রম পর্দা অনুসারে, এই ভেদ নির্ভর করে, আর সেই অনুসারেই প্রকৃতি আমাদের প্রেরণ করেন। তিনিই সমস্ত কর্ম করেন, আর তিনিই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, কারণ তিনি সম্যক নিয়তি। ...

আর সকল পুরুষের মতই, তিনি আমাদের সর্বাধিক প্রিয়া... তিনিই আমাদের জননী, তিনিই আমাদের প্রেয়সী, আর তিনিই আমাদের দুলালী। ... তাঁর প্রেমের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়েই আমরা আসি পুত্রী। ... আমরা সকলেই তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্পিত, তবে ততটা সমর্পিত কখনোই হতে পারিনি আমরা, যতটা সমর্পিতা তিনি আমাদের প্রতি।

তাই পুত্রী, যদি সম্ভব হয়, তবে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম করো, যা মায়ায় বদ্ধ হয়ে যারা সংসারে সুখের সন্ধান করেন, তাঁদের জন্য দুর্গম হবে, আর কেবল মাত্র যারা সত্যলাভ করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য সুগম হবে। ... চেষ্টা করো যাতে যত অধিকদিন মোক্ষের ধারা অব্যহত থাকে। মাতা তবুও আসবেন, তাই এমন ভেবো না যে মোক্ষের ধারা অব্যাহত থাকলে, তিনি আসবেন না। ... তবে তাঁর অভিলাষ কখনোই পুড়ন হয়না। তাঁর অভিলাষ তিনি কেবলই মোক্ষকামীদের সাথে প্রেমবিলাস করতে আসবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনা। তাকে সকল সময়ে কর্মভারে ভারাক্রান্ত হয়েই আসতে হয়, প্রেমবিলাস আর হয়ে ওঠেনা। ...

তা যাতে সম্ভব হয়, তারজন্য মোক্ষকামীতাকে সোচ্চার রাখো পুত্রী। ... মোক্ষের ধারণা যেন ধরিত্রী থেকে মুছে না যায় । দেখবে, তেমন হলে তিনি শুধুই প্রেমবিলাস করে, সকল মোক্ষকামীদের প্রেমদান করে উৎসাহী করতে আসতেই থাকবেন। বিশ্বাস করো তাঁকে। ... তাঁর প্রেমকে, আর তাঁর সমর্পণকে বিশ্বাস করো। ... অতিরিক্ত প্রেম করেন তিনি তোমাদের সকলকে, সকলের সকল পুরুষকে"।

পুরুষপ্রকৃতি

দেবী দিব্যশ্রী জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বললেন, "পিতা, আমার মধ্যে একটি বিভ্রান্তির জন্ম হচ্ছে। উপনিষদ বেদের ধারার সাথে সনাতন বুদ্ধ ধারার সম্মিলন করার প্রয়াসে পুরুষের ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেই ব্যখ্যা বেদ না দিয়ে পুরুষের ত্রিগুণের ব্যাখ্যা দিয়েছে কেবল, সেই ত্রিগুণমুক্ত পুরুষের ব্যাখ্যা দিয়েছে উপনিষদ। অন্যদিকে অদ্বৈত বেদান্ত এই পুরুষ সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত হয়েও কেন সমস্ত কিছুর সাথে যুক্ত থাকেন, তার ব্যখ্যা নিয়ে অনিশ্চিত থাকার কারণে, সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধমতে প্রত্যাবর্তন করে, কেবলই শূন্যের ব্যখ্যা দিয়েছেন।

আপনিও শূন্যের কথা বললেন; বললেন যে কনো কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাই ভ্রম। বললেন যে সত্য বলে কনো কিছু পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব আছে, এটিই ভ্রম। আরো বললেন যে সত্য এই যে কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু নেই, অর্থাৎ বেদান্তের কথা, বুদ্ধধারার কথারই অতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে, জগতের মধ্যে স্থিত হয়ে কিভাবে সেই শূন্যে যাত্রা করা যায়, তার কথা বললেন এবং শূন্যের অন্তিম সম্ভব ব্যক্ত রূপের ব্যাখ্যা করলেন।

আপনি এও বললেন যে, পুরুষও যেমন শূন্য, তেমন প্রকৃতিও শূন্য। এও বললেন যে, প্রকৃতিও কিচ্ছু করেন না, আর পুরুষও কিচ্ছুই করেন না। পুরুষ কেবলই প্রকৃতির প্রতি এবং নিজের ভিন্ন অস্তিত্বের প্রতি আসক্তির কারণে কল্পনা, যাচনা ও যোজনা করে চলেন, আর তাকেই কর্ম করা মনে করেন, এবং সেই কর্ম যা বাস্তবে কনো কর্মই নয়, তার কর্মফলের কামনা করেন, এবং তা না লাভ করে হতাশ হয়ে পুনঃপুন প্রয়াস করতে থাকেন ফললাভের। আর এই ভাবেই নিজের আসক্তিকে বৃদ্ধি করেন।

আপনার ব্যাখ্যা থেকে এও বুঝলাম আমি যে, যতক্ষণ নিজের ভিন্নতার প্রতি আসক্ত থাকেন পুরুষ, ততক্ষণ সমানে আত্ম নিজেকে আসক্তির জালে জরিয়ে নিতে থাকেন, আর যখনই তিনি প্রকৃতির প্রতি আসক্তিকে প্রাধান্য দেন, তখনই তিনি সেই জাল কেটেছিঁড়ে শূন্যতায় প্রত্যাবর্তন করে, নিজের স্বরূপ অর্থাৎ অব্যক্ততাকে স্বীকার করে নেন, আর যখন তা নেন, তখনই সমস্ত বেদনার চিরতরে নাশ হয়, সমস্ত বন্ধনের চিরতরে নাশ হয়, আর একে বলা হয় মোক্ষপ্রাপ্তি, যার জাগতিক প্রকাশ হলো সমাধি বা নির্বাণ।

কিন্তু আমার এইখানে এক বিড়ম্বনা জাগ্রত হচ্ছে, আর তা এই যে, যদি কিছু নাই থাকে, তবে আপনি প্রকৃতির মান্যতাকে কেন স্থাপন করছেন? কেন বলছেন যে যেই কর্তাভাবে আত্ম আবদ্ধ, সেই আত্মভাবকে ত্যাগ করার জন্য প্রকৃতির শরণাপন্ন হতে হয় পুরুষকে? প্রকৃতিও আপনার কথা মত তাই যার অস্তিত্বই সম্ভব নয়। তবে যার অস্তিত্ব নেই, তার শরণাপন্ন কেন হবার নির্দেশ দিচ্ছেন আপনি! ... কেন অদ্বৈত বেদান্তের মত আপনিও বলছেন না যে ওহম ব্রহ্মাস্মি! কেন আপনি বলছেন যে সেই বোধ কেবলই প্রকৃতি করাতে পারে আমাদের, আমরা স্বয়ং পারিনা তা উপলব্ধি করতে? এর রহস্য কি?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "অতি সুন্দর কথা বললে তুমি পুত্রী। কেন আমি যেই প্রকৃতি নেই, তার কাছে সমর্পণের কথা বলছি? কেন আমি বলছি না যে পুরুষ স্বয়ং সক্ষম মোক্ষলাভে? কেন আমি বলছি যে পুরুষ স্বয়ং সত্য হয়েও সত্যকে স্বীকার করার জন্য প্রকৃতির সহায়তা আবশ্যক? ... পুত্রী, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সর্বাধিক সহজ উপায় হলো এটি বোঝানো যে প্রকৃতি আসলে কি? আর পুরুষই বা আসলে কি?

পুত্রী, পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কনো ভেদই নেই, আর সত্য বলতে এই যে পুরুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যেও কনো ভেদ নেই। এই তিনই এক, অর্থাৎ তিনই সেই শূন্যই । তবে পার্থক্য কি? পার্থক্য এই যে পুরুষ হলেন সেই শূন্য যা নিজের শূন্যতাকে ভুলে গেছেন। ব্রহ্ম হলেন সেই সম্পূর্ণসত্য অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভাবে নিষ্ক্রিয়, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য শূন্য, এবং প্রকৃতি! প্রকৃতি অন্য কিছুই নয়, পুরুষ যখন

সেই পরমশূন্য ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তখন তিনি পরমশূন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রমিত হয়ে থাকার কারণে সেই শূন্যতত্ত্বকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন, আর ব্যর্থ হয়ে সেই পরমশূন্যকেই প্রকৃতি বলে আখ্যা দেন।

অর্থাৎ প্রকৃতি অন্য কেউ নন, স্বয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্মকেই ব্রহ্ম বলে চিহ্নিত করতে না পেরে পুরুষ তাঁকে প্রকৃতি বলে চিহ্নিত করেন। তাই যেমন পুরুষ হলো কেবলই ব্রহ্মের ভ্রমিত রূপ, তেমন প্রকৃতি হলো ভ্রমের দৃষ্টি দিয়ে দেখা সত্য সম্বন্ধে পুরুষের ভ্রম। অর্থাৎ প্রকৃতি বলে কিছুই নেই, যেমন যেমন পুরুষ ব্রহ্মকে অনুধাবন করেন, তেমন তেমন প্রকৃতি তাঁর কাছে রূপান্তরিত হন। ব্রহ্ম স্বয়ং অবিচল, পুরুষও নিজেকে ভ্রমের নিরিখে সচল অনুভব করলেও, বাস্তবে অবিচলই কারণ সেও সেই অখণ্ড ব্রহ্মই, আর যেহেতু পুরুষ ভ্রমের নিরিখে সচল, তাই ব্রহ্মকেও তিনি সচল প্রকৃতি রূপেই ধারণা করেন।

পুত্রী, যেমন করে তুমি নিশিকালে পথে যাত্রা করার সময়ে, চন্দ্রকে তোমার সাথে সাথে সচল রূপে চলতে দেখো, কিন্তু চন্দ্র নিজের স্থানে অচল হয়েই বিরাজ করেন, ঠিক তেমনই পুরুষও অচল ব্রহ্মকে চলমান প্রকৃতিরূপে ধারণা করেন, কারণ তিনি নিজে অচল হলেও, ভ্রম বশত নিজেকে সচল অনুভব করেন। আর সেই কারণেই পুত্রী, আমি যেই ধর্ম প্রসার করলাম তোমার কাছে, তা উপনিষদ ও বেদান্তের থেকে পৃথক হয়ে গেল।

অর্থাৎ এই যে উপনিষদ যে পুরুষ বা আত্মের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে আত্ম অর্থাৎ আমি বাস্তবে অমর, অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য, অব্যাক্ত, তা ভুল কখনোই নয়। উপনিষদ যেই ব্যাখ্যা দিয়েছে আত্ম সম্বন্ধে যে আমার অর্থাৎ আত্মের কনো জন্ম নেই, আত্মের কনো মৃত্যু নেই, তা কখনোই ভুল নয়। উপনিষদ যেই ব্যাখ্যা দিয়েছে যে আত্মের ধারণা ইন্দ্রিয়রা কখনোই করতে পারেনা, আত্মের ধারণা কখনোই মন ও বুদ্ধিও করতে পারেনা, তাও ভুল নয়। উপনিষদ যে বলেছেন, বুদ্ধিকে স্থির অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় করে দিলে তবেই প্রকৃত আত্মকে লাভ করা যায়, অন্যথা যাকে আমরা আত্ম বলে থাকি, তা আমাদের ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নয়, তাও কখনোই বেঠিক নয়।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ যেই পরিচয় আমরা নিজেদের দিই, সক্রিয় বুদ্ধি বা মনের নিরিখে যেই পরিচয় আমরা নিজেদের দিই, তা সমস্ত আমাদের মিথ্যা আত্ম, তারা একজনও আমাদের আত্ম নয়। আত্মা তা যা এই সমস্ত কিছুর অতীতে স্থিত হয়ে আছেন। এই কথা যখন উপনিষদ বলছেন, তা কখনোই বেঠিক তথ্য নয়, কিন্তু সত্য বলতে তা বেঠিক তথ্য অবশ্যই, কারণ যেই মন বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় বা বিকাররা সক্রিয় থাকার জন্য আমাদের আত্ম আমাদের কাছে অধরা হয়ে আছেন, তা সমস্ত আত্মেরই কল্পনা, যাচনা ও যোজনার ফল।

এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিকার বাস্তবে না থাকলেও, তারা যে আছে এই ভ্রম আমাদের মধ্যে স্থান পাচ্ছে, তার একটিই কারণ আর তা হলো আত্ম স্বয়ং তাঁদের কল্পনা, যাচনা বা তাদের নিয়ে যোজনা করছেন। যেহেতু আত্ম স্বয়ং সত্য, তাই তাঁর করা কল্পনা, যাচনা এবং যোজনাও আমাদের কাছে সত্য বোধ হয়। অর্থাৎ উপনিষদ যাকে আত্ম বলে সনাক্ত করছেন, তা ঠিকই করছেন। আসলে, উপনিষদ যেমন বলছেন যে আত্ম সে যা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিকার, সমস্ত কিছুর অতীতে স্থিত, তা ধ্রুব সত্য। কিন্তু কথা এই যে, যখন আমরা এই

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়দের ত্যাগ করে, আত্মের সম্মুখীন হবো, তখন আর আত্মকে আত্ম বলে চিহ্নিত করতেওও পারবো না, কারণ যাকে আমরা আত্ম বলছি, তা আসলে ব্রহ্ম, বা শূন্য, যার কনো খণ্ডই হয়না, অর্থাৎ আমার আত্ম, তোমার আত্ম এমন ভেদই হয়না।

আর তাই বেদান্ত তাঁকে আত্ম বলছেন না, বলছেন ব্রহ্ম। কারণ ততক্ষণই আত্মের বোধ থাকে, ততক্ষণই অহম-এর বোধ থাকে, যতক্ষণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিকারেরা ক্রিয়াশীল থাকে। যেই মুহূর্তে এঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, যার নির্দেশনা উপনিষদ দিচ্ছেন, তখন আর আত্ম-এর বোধই অবস্থান করেনা, অহম-এর বোধই অবস্থান করেনা। তখন অহম ব্রহ্মাস্মি হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই আত্ম আর আত্ম থাকেনা, তা ব্রহ্ম অর্থাৎ অখণ্ড শূন্য হয়ে যায়।

তাই উপনিষদ আত্ম-এর ব্যাখ্যা দেবার নাম করে যেই ব্রহ্মের ব্যখ্যা দিয়েছেন, তাকে সংশোধন করে অদ্বৈত বেদান্তে শঙ্কর বলেছেন, না না, ওটা আত্ম নয়, ওটা ব্রহ্ম। আত্ম তো ভিন্নতার ভ্রমে আবদ্ধ, সে কি করে অজ্বর অমর হতে পারে! সে যখন উপলব্ধি করে যে সেই ব্রহ্ম, অর্থাৎ অহম ব্রহ্মাস্মি, তখনই উপনিষদ যেই আত্ম-এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তা সত্য ও ভাস্মর হয়ে ওঠে, তার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নয়"।

ঈষৎ হেসে আবার বললেন প্রভু ব্রহ্মসনাতন, "কিন্তু এখানেও কিছু কথা নাবলা থেকে যায়, আর তা হলো আত্মের ব্রহ্ম পর্যন্ত যাত্রার কথা, অর্থাৎ আত্ম থেকে অহম ব্রহ্মাস্মি হয়ে ওঠার কথা। যতক্ষণ আত্ম ততক্ষণ কর্তা বোধ, আর যখন আর আত্ম বলে কিছু থাকেনা, অহম ব্রহ্মাস্মি হয়ে যায়, তখন কর্তা বোধেরও নাশ হয়ে যায়, অর্থাৎ কৃতান্ত হয়ে যায়। আর আমি তোমাকে সেই যাত্রার কথাই এতক্ষণ ধরে বললাম, তা কর্তা আত্ম থেকে কৃতান্ত ব্রহ্ম হয়ে ওঠার কথাই । তাই আমার কথা হলো কৃতান্ত সূত্র, অর্থাৎ কর্তা ভাবের থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার, কর্তার অন্ত করার সূত্র।

যেই ক্ষণে কর্তার নাশ হয়, তখনই আমরা আর আত্ম থাকিনা, তখন আমরা ব্রহ্ম হয়ে উঠি, অর্থাৎ শূন্য হয়ে উঠি, যার অস্তিত্ব কনো কালেই সম্ভব নয় সেই ব্রহ্ম, আবার যার অস্তিত্ব ব্যতীত কনো কিছুরই অস্তিত্ব কনো কালে নেই, সেই ব্রহ্ম হয়ে যাই। এটিই তোমার প্রশ্ন করা রহস্যের সমাধান। যতক্ষণ আমাদের আত্ম নিজের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় তথা বিকার, অর্থাৎ নিজের কল্পনা, যাচনা এবং যোজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ আমি ওই, আমি সেই, আমি এমন, আমি তেমন, আমি ভালো, আমি খুব ভালো, আমার থেকে ভালো কেউ হয়না, আমি শ্রেষ্ঠ, আমার কাছে অমুক আছে, আমার কাছে তমুক আছে এমন করতে থাকি।

ততক্ষণ আমাদের আত্ম এই ভ্রমে মত্ত থেকে নিজেকে কর্তা মানতে থাকে আর বলতে থাকে, আমি এমন করেছি, আমি তেমন করেছি, আমি এমন করে দেব, আমি অমন করে দেব, আমার উপর ভরসা করো আমি উদ্ধার করে দেব, আমি মোক্ষ প্রদান করে দেব, আমি মুক্তি দেব, আমি বরদান দেব, আমি শ্রাপ দেব, ইত্যাদি জতরাজ্যের কর্তাভাবকে একত্রিত করে, তার মধ্যে অবস্থান করে ভ্রমসাগরে যথেচ্ছাচার করে যায়।

আর তা কতক্ষণ করেন তিনি? যতক্ষণ তিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিকারদের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন ততক্ষণ। এমনকি পুত্রী, কনো কনো ক্ষেত্রে আত্ম এতটাই এদের মধ্যে আবদ্ধ এবং আসক্ত থাকেন যে, ইন্দ্রিয়রা কর্ম করা বন্ধ করে দিলেও, অর্থাৎ নিদ্রার কালেও নিজের কর্তাভাবকে নিয়েই উলমালা থাকেন, যাকে তোমরা বলো স্বপ্ন দেখা। কিন্তু যখন সাধনা করে, সমস্ত কল্পনা, যাচনা ও যোজনার থেকে মুক্ত হয়ে যায় আত্ম, তখন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিকার সমস্তই তেমন ভাবেই লয় হয়ে যায়, যেন তাঁরা কনো কালেই ছিলনা। আর তখন আত্ম আর আত্ম থাকেননা, তখন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান।

অর্থাৎ যতক্ষণ কর্তাভাব, ততক্ষণই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এবং বিকারদের দাসত্ব, যেই মনবুদ্ধি ইত্যাদিরা কেবলই কল্পনায় অস্তিত্বমান, বাস্তবে যাদের কনো অস্তিত্বই সম্ভব নয়। যেই মুহূর্তে কর্তাভাবের নাশ হয়, তখনই আমি তাই যা নেই; আমি কনো কালেই কিছু করিনা, করিনি, এবং করতেও পারিনা, কারণ আমি তো নাস্তি । কর্তাভাবের নাশ অর্থাৎ, আমি ভালো! কি করে বলতে পারো? আমি তো নেই। আমি কিচ্ছু জানিনা, কিচ্ছু বুঝিনা, কিচ্ছু করিনা, কিচ্ছু দিইনা, কিচ্ছু নিইনা, কারণ আমিই তো নেই। যে নেই, সে কি করে কিছু জানতে, বুঝতে, করতে, বা কনো কিছু সম্ভব করতে পারে!

যখন এমন ভাবে আত্ম সমস্ত মিথ্যা পরিচয়, মিথ্যা কৃতিত্ব, মিথ্যা কর্তার আচ্ছাদন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন, তখন আর তিনি আত্মই থাকেন না। কেন? কারণ আমি থাকলেই কর্তা থাকবে, আমিও নেই, তাই কর্তাও নেই। আর সেই অবস্থাকেই বলা হয় সমাধি বা নির্বাণ, বা জীবকটির ক্ষেত্রে মোক্ষ। কিন্তু একি এমনি এমনিই হয়ে যায়! ... যেই আমি-ভাবের মধ্যে আমরা আবদ্ধ, যেই কর্তাভাবই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য হয়ে বিরাজ করে, সেই কর্তাভাবের থেকে আমরা এমনই একটি কল্পনার মধ্যে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাবো?

না পুত্রী, মা বিড়ালকে দেখেই ছানা বিড়াল খেতে শেখে, মা হাঁসকে দেখেই ছানা হাঁস সাতার কাটতে শেখে, মা ঈগলকে দেখেই ছানা ঈগল উড়তে শেখে। তেমনই আমরাও আমাদের জননীকে দেখে দেখেই কর্তা ভাবের থেকে মুক্ত হতে থাকি। আর সেই জননী কে? সেই জননী হলেন প্রকৃতি। কে এই প্রকৃতি? ব্রহ্ম স্বয়ং, যাকে আমরা আমাদের আত্মের সচল অবস্থার নিরিখে দেখি বলে, যেমন করে পথ চলার সময়ে চন্দ্রকেও আমাদের সাথে চলতে দেখি, তেমন করেই ব্রহ্মকেও আমাদের সাথে সচল থাকতে দেখি এবং তাই তাঁকে প্রকৃতি বলি, অর্থাৎ যিনি সদাসচল।

কেন আমরা অর্থাৎ আমাদের আত্ম সচল থাকে? কারণ সে ভিন্নতার ভ্রমে ভ্রমিত হয়ে কল্পনা, যাচনা ও যোজনার নিরিখে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি পঞ্চভূতকে কল্পনাতেই রচনা করে, যাচনাতেই ইন্দ্রিয়দের ধারণা করে, এবং যোজনাতেই বিকারদের ধারণা করে থাকে। এঁদের কারণেই সে নিজে অচল হয়েও সচল। সেই সচলতাকে আত্মের থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপনিষদ আত্মকে ব্রহ্মের ব্যখ্যা প্রদান করেছিলেন। তাই শঙ্কর বেদান্তের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন যে আত্ম অচল নয়, আত্ম তো ভ্রমের মধ্যে স্থিত, তাই সচল। কিন্তু আত্ম বাস্তবে অচলই, কিন্তু যখন সে সেই সত্যকে উপলব্ধি করে, তখন সে ব্রহ্ম হয়ে যায়, আর আত্ম থাকেনা।

অর্থাৎ পুত্রী, আমরা সেই ব্রহ্ম, যার অস্তিত্বই একমাত্র সত্য, অথচ সে স্বয়ং শূন্য, তাঁকেই প্রকৃতি জ্ঞান করি, নিজেদের আত্মকে সচল করে রেখে। আর তাঁর কর্তাভাবহীনতা দেখে দেখেই, আমরা কর্তাভাবের নাশ করতে থাকি। তাঁকেই আমরা সর্বক্ষণ দেখি যে তিনি সমস্ত কিছু করছেন, আমাদের আয়ু বাড়াচ্ছেন; আমাদের শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে তরুণ, এবং তরুণ থেকে যুবক করছেন; আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের গঠন করছেন, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের লয় করছেন, আমাদের সত্য শিক্ষা দিচ্ছেন, অথচ তিনি এই সমস্ত কিছু করেও বলছেন, আমি তো কিছু করিনা, যা করছো, তুমিই করছো।

তাঁর এই আত্মবাখানশূন্যতা আমাদের আকর্ষণ করতে থাকে। তাঁর এই কিচ্ছু করিনা ভাব আমাদের কাছে মনে হতে থাকে কি অসম্ভব ত্যাগ, কিন্তু তিনি যে সত্য বলছেন তা আমরা মানতেই পারিনা। আমরা যে সচল, আমাদের মনবুদ্ধির কারণে আমরা যে সচল, আর তাই মানতে নারাজ থাকি যে তিনি অচল। আমরা মেনে চলি যে তিনি সচল, কিন্তু তিনি ত্যাগপ্রিয়া, তাই সমস্ত কিছু করেও বলেন আমি কিছু করিনা, সমস্ত তুমিই করো। ... আর তাই দেখতে দেখতে আমরা তাঁর অসম্ভব আকর্ষণীয় চরিত্রের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠি, আর তাঁকে লাভ করার জন্য আগ্রহী হই।

আর যখন আমরা তাঁকে লাভ করি, তখন কি দেখি? তখন দেখি যে, তিনি সত্যই বলছিলেন যে, তিনি কিছু করেন না। তিনি তো অচল। তিনি তো অব্যাক্ত। তিনি যে পরমশূন্য। সেই পরমশূন্যকেই তো আমার আত্ম নিজে ভ্রমে স্থিত হয়ে, নিজেকেও সচল মনে করছিল, আর তাঁকেও। তাঁর প্রতি আসক্তির কারণে সচল আত্ম সমানে তাঁকে ঘিরে কল্পনা করে চলেছিল, আর সেই কল্পনাতেই তিনি সচল ছিলেন। বাস্তবে তিনি তো সেই চির-অচল, চির-শূন্য, চির-অনন্ত, চির-অব্যক্ত, চির-অচিন্ত্য।

কিন্তু যখন আমরা তা উপলব্ধি করি, তখন নিজের দিকেও আমরা তাকিয়ে দেখি... আরে আমিও তো সে-ই। আমিও তো সেই অচলই, সেই অব্যাক্তই, সেই অচিন্ত্যই। সেই শূন্য, সেই ব্রহ্ম ছাড়া যে কিছুই সম্ভব নয়। যাকিছু ছিল বলে মানছিলাম, যাকিছু আছে বলে মানছিলাম, তা কেবলই আমার ভিন্নতার ভ্রম, তা কেবলই আমার আত্ম-পৃথক-অস্তিত্ব সম্ভব, এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে ভাবছিলাম। বাস্তবে তো কিচ্ছু নেই, আর এই কিচ্ছু যে নেই, তাই একমাত্র সত্য। ...

পুত্রী, যখন এই সত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আর আত্ম থাকেনা। তখন আর প্রকৃতিও থাকেনা। সেই আত্মও শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হয়ে গেছেন তখন, আর সেই শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম এও বুঝে গেছেন যে যাকে তিনি প্রকৃতি বলছিলেন, তাও তিনিই ছিলেন। আমার আত্ম নিজের স্বরূপকে নিজে বলে স্বীকার করতে না পেরে, তাকে প্রকৃতি বলছিলেন। ... আর তখনই উপনিষদে বর্ণিত সমস্ত কথা সত্য হয়ে ওঠে, ভাস্মর হয়ে ওঠে, তার পূর্বে নয়।

আর সেই কারণেই উপনিষদের কথাকে সংশোধন করে দিয়ে শঙ্কর বলেছেন অহম ব্রহ্মাস্মি, অর্থাৎ হে উপনিষদ তুমি যে আত্মবাখান করছো, তা আত্মবাখান নয়, তা ব্রহ্মবাখান। আত্ম তো ভ্রমিত, সে সত্য হয়েও অনিত্য, কারণ সে যে নিজের ভ্রমের থেকে নিজেকে পৃথক করতেই অপারগ। তাই তুমি যে ব্যখ্যা দিয়েছ উপনিষদ, সেই ব্যখ্যা সত্য, কিন্তু তা ব্রহ্মের ব্যখ্যা, আত্মের ব্যখ্যা নয়।

আত্মের ব্যখ্যা যদি কেউ দিয়ে থাকে, তা হলো আদিবোধিতত্ত্ব, যার থেকে তস্করি করে নিজের কথিত কথা বলে দাবি করেছে বেদ, যেখানে সে বলেছে যে আত্মকে সদাই ত্রিগুণে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশে ত্রিখণ্ডিত করেই দেখিয়েছে। এই বিভক্তভাবই, এই কর্তাভাবে উলমালা, এই অহংকারে উন্মত্ততাই আত্মের প্রকৃত ভাব। যেই মুহূর্তে সেই অহংকার ত্যাগ করে আত্ম, তখন আর তা আত্ম থাকেনা, তখন আর সে ত্রিদেব থাকেনা, তখন সে চিরতরে শূন্যে লীন হয়ে যায়, আর এও অনুভব করে সে যে সেই শূন্যের থেকে সে কনোকালেই পৃথক ছিল না।

আর শঙ্কর নিজের সেই কথাকে বলেছেন অদ্বৈত বেদান্ত, অর্থাৎ বেদ যেই দ্বৈততার কথা বলে, যেই পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলে, সেই দ্বৈততার অন্ত হয়ে অদ্বৈত ব্রহ্ম হয়ে যায় যেখানে। কিন্তু পুত্রী, সেই কথা সম্পূর্ণ হয়েও অসম্পূর্ণ, কারণ শঙ্কর বলছেন দ্বৈত নয়, অদ্বৈতই সত্য; দ্বৈত মিথ্যা, অদ্বৈতই একমাত্র সত্য। সঠিক কথা তা, কিন্তু সেই সঠিকে যাত্রা করবে কি করে? পুত্রী, দ্বৈত ভাবে আমরা সেই মুহূর্ত থেকে আবদ্ধ, যেই মুহূর্ত থেকে আমরা ব্রহ্ম আর আত্ম, এই দুইকেই সত্য মানতে শুরু করেছি। দ্বৈত ভাবে আমরা সেইমুহূর্ত থেকে গ্রস্ত, যেই মুহূর্ত থেকে আমরা ব্রহ্মকে, শূন্যকে সচল মনে করে প্রকৃতি মানতে শুরু করেছি আর নিজেকে পুরুষ বা আত্ম । সেই দ্বৈততার নাশ তো কেবল এই ভাবে করা যায়না যে আমি দ্বৈততাকে মানিনা।

আমি যদি বলি যে দ্বৈততা মিথ্যা, তাই দ্বৈততা আমি মানিনা, তাহলে সেই ক্রিয়া কেমন হয় পুত্রী? এ তো একবুক জলে নিমজ্জিত হয়ে বলা যে আমি মানিনা যে আমি ভিজেছি! এতো মিথ্যাচার ব্যতীত কিচ্ছুই নয়। আর মানুষ যতই স্বৈরাচার, যতই মিথ্যাচার করুন না কেন, সত্যের সাথে মিথ্যাচার করার স্পর্ধা ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেউই কনোদিন দেখান নি। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় জীবদের ধরে তো আর সম্পূর্ণ মানবজাতির মুল্যয়ন করা যায়না। তাই আমার মাধ্যমে ব্রহ্মময়ী এক ধারণার অবতরণ করালেন, আর তা হলো কৃতান্ত ধর্ম।

কৃতান্ত ধর্মের অনুসারে, এটি সত্য যে আত্ম দ্বৈতভাবে ভাবাপন্ন, এটি সত্য যে আত্ম স্বরূপে ব্রহ্ম হয়েও ভিন্নতার ভ্রমে আবদ্ধ হয়ে পঞ্চভূতে ও বিকারে আবদ্ধ, কিন্তু এই অসত্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা আমাদের ভবিষ্যৎ নয়, কারণ তা বাস্তব নয়। কৃতান্ত ধর্ম তাই বলে যে ব্রহ্মকে আমরা আত্মরা হারিয়ে ফেলেছি ঠিকই, কিন্তু পুনরায় তাঁকে লাভ করতে সক্ষম আমরা। কৃতান্ত ধর্ম এই কথাও বলে যে, ব্রহ্মকে আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করে চলেছি, আর তাঁকেই আমরা প্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী নাম প্রদান করি। তাঁকে ধারণা করে করে, আমরা পুনরায় আমাদের কল্পনা, যাচনা ও যোজনার থেকে মুক্ত হতে পারি আর পুনরায় আমরা মিথ্যা দ্বৈতভাব ত্যাগ করে অদ্বৈত ভাবে গমন করে সমস্ত জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারি।

কৃতান্ত ধর্ম তা করার জন্য সহজ কথা বলছেন যে, সেই ব্রহ্ম, যাকে ভ্রমিত আত্ম ব্রহ্মময়ী বলছেন, তাঁকে মানো, আর তাঁর প্রতি এমন বিশ্বাস রাখো, যাতে কনো অবিশ্বাস থাকবে না। তাঁর প্রতি অকারণ ভক্তি করো, তাঁকে প্রেম করো, আর তাঁর প্রেমকে প্রত্যক্ষ করো। যদি তাঁর প্রেমকে প্রত্যক্ষ করো, তবে নিজের বিশ্বাসকে, নিজের ভক্তিকে, নিজের প্রেমকে আর প্রেম বলতেই ইচ্ছা করবেনা। আর

যখন তা হবে, তখন তুমি স্বতঃই সমার্পিত প্রাণ হয়ে যাবে। তখন আর বিরক্তিকে বৈরাগ্য বলবেনা বেদের মিথ্যাভাষণকে অবলম্বন করে, তখন আসক্তিকেও যতটা আসক্তি বলবে, বিরক্তিকেও ততটাই আসক্তি বলবে, আর এর দুইয়ের থেকে দূরে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যার থেকে মুক্ত হয়ে, সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

তাই পুত্রী, কৃতান্তকে অবলম্বন করো। কৃতান্ত সত্যকেই ধারণা করে, কিন্তু মিথ্যাকেও অবমাননা করেনা। তা এই বলে যে হ্যাঁ আমি মানি যে আমি মিথ্যায় স্থিত, আর আমি এও মানি যে আমি সত্য থেকেই উদ্ভূত আর সত্যই আমরা পরমার্থ। তাই আমি মিথ্যা থেকে সত্যে যাত্রা করবোই। কৃতান্ত যা আত্ম নয়, তাকে আত্ম বলেনা, যেই কল্পনা-যাচনা-যোজনাকে ধারণ করে আত্ম সম্পূর্ণ ভাবে আসক্ত, তাকেই আত্ম বলে, আর কৃতান্ত এও বলেনা যে প্রকৃতি নেই, বরং বলে যে ব্রহ্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়ে, ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলে চিহ্নিত না করতে পেরে, আত্ম বা পুরুষ সেই ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলে আখ্যা দেন।

তাই পুত্রী কৃতান্ত ধারণ করো, আর সেই ব্রহ্মকে, সেই সত্যকে আমাদের ভ্রমিত আত্ম যেই প্রকৃতি নামে নামাঙ্কিত করেন, তাঁর প্রতি এমন বিশ্বাস ধারণ করো, যার মধ্যে লেশ মাত্রও অবিশ্বাস থাকবে না, নিজের না তাঁর প্রেমকে দেখো, নিজের না তাঁর বিশ্বাসকে দেখো, আর দেখবে একসময়ে নিজেকে আর কর্তা মানতে পারবে না, তাঁকেই কর্তা মানবে। আর তাঁকে কর্তা মানার কালে, নিজেকে কৃতান্ত করে নেবার ফলে, একসময়ে তিনিই তোমাকে স্পষ্ট করে দেবেন যে কনো কর্তাই নেই, ব্রহ্ম মানেই কৃতান্ত। ... আর তখন মহানন্দে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, চিরতরে সহজ সমাধি লাভ করবে।

তাই পুত্রী, কৃতান্ত ধারণ করো, যেখানে শূন্যকেই একমাত্র সত্য বললেও, সেই শূন্যকে ভ্রম বশত আমরা যে প্রকৃতি মানি, তাও বলে, আর তাই সেই প্রকৃতিকে ধারণ করে করে, আমাদের আত্মকে পুনরায় সেই শূন্যে পোঁছে দেয়। ... পুত্রী, উপনিষদের ভ্রান্তিকে শঙ্কর সংশোধন করে ঈশ্বরকটিদের কাজকে অনেক অংশেই সহজ করে দিয়েছিলেন । অদ্বৈতই সত্য, শঙ্কর প্রমাণ করে গেছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই অদ্বৈতকে ধারণাও করতে পারেন না, কারণ তা ধারণারও অতীত । তাই তাঁদের সকলের, সমস্ত মানুষ জাতির উদ্ধারের জন্য, ব্রহ্মময়ী আমাকে মাধ্যম করে কৃতান্ত স্থাপন করালেন, আর বললেন যে তিনি আছেন, আমাদের ভ্রমের দ্বৈততাকে নাশ করে অদ্বৈতে আমাদের স্থিত করার জন্য।

তিনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে নিজের আস্থাকে নির্মল করো, নিজের বিশ্বাসকে নির্মল করো, তাহলেই অদ্বৈতে স্থাপিত হয়ে যাবে। যতক্ষণ দ্বৈততা ততক্ষণ দুঃখ, ততক্ষণ বিকারদের উৎপাত, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়দের হাতছানি, ততক্ষণ মনবুদ্ধির অত্যাচার চলবেই। কিন্তু সেই দ্বৈততার থেকে তোমরা স্বয়ং উদ্ধার হতে পারবেনা। তিনি বললেন, তাঁকে বিশ্বাস করতে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে নির্মল করতে, তাঁর আমাদের প্রতি বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ করতে। বাকি তিনিই আমাদেরকে দ্বৈততার সমস্ত দৈন্যতা থেকে মুক্ত করে অদ্বৈতের অপার আনন্দসম্ভোগ করাবেন, তিনিই আমাদের নির্বাণ প্রদান করবেন, তিনিই আমাদেরকে সমাধিতে স্থিত করে, সমস্ত জড়তা, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ব্যক্ততার থেকে মুক্ত করে, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য, অজড় করে দেবেন।

পুত্রী বৈদিক ধর্ম ছিল যেখানে আত্মের ভ্রমকেই আরাধনার বিষয় মানা হয়েছে, আর সর্বক্ষণ তাঁদের আরাধনা করার বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে করে সকল আরাধকের সমস্ত ভ্রম চিরস্থায়ী হয়। এই আসুরিক বিধানের থেকে মুক্তির বিধান প্রদান করার এক নতুন তরঙ্গের সঞ্চার হয় পুত্রী, আর সেই বিধানকে ধারণা করার জন্য বুদ্ধের ধারাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে জ্ঞানীগণ। একদিকে তাই চললো এই অহংকারের আরাধনা রোধ করার প্রক্রিয়া, আর অন্যদিকে বেদের ধারাকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে চললো অহংকারের আরাধনার জয়জয়কার।

একাধিক পুরাণ রচিত হলো সেই অহংকারের পূজাঅর্চনা করার জন্য, এবং সকলেই নিজেদের অহংকারকে চিরস্থায়ী করতে পারবেন, এমন ধারণা হৃদয়ে ধরে অহংকারের আরাধনা করতে থাকলেন, আর তাই বৈদিক ধর্ম হয়ে উঠলো জনপ্রিয়। অন্যদিকে সেই অহংকারের আরাধনার কারণে সাধনা সম্ভব নয়, সত্যলাভ অসম্ভব। তাই সমানে বুদ্ধধারাকে ধারণ করে করে, উপনিষদ সম্মুখে এলো, কিন্তু অহংকারের পূজা করতে তা বলে না, অহংকার চরিতার্থ হবে তেমন কথাও তা বলেনা, তাই বৈদিক আচারই মান্যতা পেল। পুনরায় বেদান্ত এলো, অহংকারের পূজা করা থেকে রোধ করার জন্য, কিন্তু অহংকারের তোষামোদি করা ভ্রমিত সমাজ অহংকারের পূজা থেকে যে বিরত থাকতে হয়, তা উপলব্ধি করতেই পারলো না, তাই পুনরায় বৈদিক আচারে অহংকারের আরাধনা হতেই থাকলো।

এরপরেও একাধিক প্রয়াস করেছেন নিমাই, কবির, গদাধর, কিন্তু মানুষ অহংকারের জন্য এমনিই ব্যকুল, তার উপর আবার বৈদিক ধর্ম তাদের এই ব্যকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েছেন, আর শান্ত হয় মানুষ! ... তাও পুত্রী, মাতা আমার মাধ্যমে কৃতান্ত স্থাপন করালেন। কেন? অহংকারের আরাধনায় মত্ত বৈদিকরা যেমন উপনিষদ, বেদান্ত বা কথামৃতের অনুসরণ করেননি, তেমন এরও তো সমর্থন করবেন না। মাতা কি তা জানেন না! ... তাও কেন করালেন তিনি কৃতান্তের স্থাপন? কেন কৃতান্ত ধর্মের স্থাপন করালেন?

(হেসে) পুত্রী, বৈদিক ধর্ম মানুষের ভ্রমের তোষামোদি করে। তা করুক, যার সময় হয়নি এখনও সত্যলাভের সেই অহংকার নিয়েই ব্যস্ত থাকুক। কিন্তু পুত্রী, যাদের সময় হয়ে গেছে সত্যলাভের, তাঁদের কি হবে? মাতা তাঁদের নিয়ে চিন্তিত থাকেন। মা সকল সন্তানেরই খেয়াল রাখেন, কিন্তু যিনি মায়ের সংসারের সুরাহার চিন্তা করেন, তাঁর জন্য জীবনপাত করেন মা । ... তেমনই পুত্রী, সেই সকল, যাদের সত্যলাভের সময় হয়ে এসেছে, তাঁদের জন্য তিনি কৃতান্ত স্থাপন করালেন। তাঁদের জন্যই উপনিষদ স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের জন্যই বেদান্ত স্থাপন করিয়েছিলেন, তাঁদের জন্যই নিমাইকে, গদাধরকে পাঠিয়েছিলেন, আর তাঁদের জন্যই মাতা কৃতান্ত ধর্ম স্থাপন করলেন।

বৈদিক আচারের কারণে, অহংকারের পূজার রেশ এতটাই বৃদ্ধি পেয়ে যায় সময়ে সময়ে যে, কনো ভাবেই আর সেই সত্যলাভের অধিকারীরা সত্যের মার্গ খুঁজে পাননা। তাই তাঁদেরকে সেই পথ দেখিয়ে উদ্ধার হবার আবাহন জানানোর জন্য কৃতান্ত ধর্মের অবতারণা করলেন। যে যে সত্যলাভ করার জন্য ব্যকুল, সে সে যখন যখন কৃতান্ত ধর্মের অনুগামী হয়ে, বিশ্বাসকে, ভক্তিকে,

প্রেমকে ও পঞ্চভাবকে পরিপক্ক করে নেবেন, সে সে জগন্মাতার কৃপায়, ব্রহ্মময়ী সর্বাম্বার কৃপায় সত্যলাভ করতে পারবেন, এই আশীর্বাদ রইল সকল কৃতান্তিকদের জন্য।

ধর্মোপদেশ

কৃতান্ত ধর্ম অনুশীলন করে, দেবী দিব্যশ্রী একজন মহাসাধিকা হয়ে উঠলে, তাঁর বহু শিষ্যা হয়, কিন্তু তাঁর মনে হয় যেন তিনি তাঁর শিষ্যদের মার্গ দর্শন করতে পারছেন না। তাঁর শিষ্যারা শিক্ষাকে নয়, শিক্ষককেই মর্যাদা দিতে উলোমালা। তাই তিনি তাঁর পিতা, প্রভু ব্রহ্মসনাতনের সংস্পর্শে এসে প্রশ্ন করেন এবং উপায় কামনা করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁর শিষ্যাদের উন্নত করতে পারেন। তিনি বলেন, "পিতা, আমাকে কৃতান্ত ধর্মের সার কথা বলুন, যা পরিবেশন করে, আমার শিষ্যাদের আমি ধর্মমার্গে উত্তোলন করতে পারি"।

সেই কথার উত্তরে প্রভু ব্রহ্মসনাতন কৃতান্ত ধর্মের সারকথাকে একাদশ স্তবকে ব্যখ্যা করলেন। সেই একাদশ স্তবক হলো এইরূপ -

১) পুত্রী, আমার দ্বারা প্রদান করা শিক্ষাকে গ্রহণ করাই এই পরিচয় প্রদান করবে যে তুমি আমার সান্নিধ্যে এসেছিলে। এছাড়া অন্য কিছু প্রমাণ করেনা যে তুমি আমার সম্পর্কে এসেছিলে। তাই আমার দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণই একমাত্র ধর্মমার্গে উন্নীত হওয়ার লক্ষণ। আমার শিক্ষাকে গ্রহণ করাই প্রমাণ করে যে, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ।

২) যদি এমন ভাবো যে আমি ও আমার দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে আমি সত্য, আর আমার দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা মিথ্যা, তবে তুমি ভ্রমে অবস্থান করছো। আমিও ততটাই মিথ্যা, যতটা তুমি। সত্য কেবলই আমার মাধ্যমে যেই শিক্ষা স্থাপিত করা হয়েছে, অর্থাৎ কৃতান্ত।

৩) এই ভৌতিক জগত একটি জ্বলন্ত চিতা ছাড়া অন্য কিচ্ছু নয়। যা কিছু করে, যা কিছু হয়ে, যেকোনো স্থানে, এই ভৌতিক জগতে নিজের আত্মকে, নিজের আমিকে স্থিত রাখবে, তোমার আত্ম তাতে অবিরাম জ্বলতেই থাকেবে। আত্মের মৃত্যু নেই, তাই অনন্ত বেদনা পেতে থাকবে। তাই সেই পথকে ধারণ করো, যা তোমাকে এই চিতার থেকে মুক্ত রাখবে, অর্থাৎ কৃতান্তকে গ্রহণ করো।

৪) মন (আকাশতত্ত্ব), বুদ্ধি (জলতত্ত্ব), প্রাণ (বায়ুতত্ত্ব), উর্জা (অগ্নিতত্ত্ব) এবং দেহ (মৃত্তিকাতত্ত্ব) এই পঞ্চভূতই এই চিতাকে সত্য বলে তোমার কাছে দাবি করে। যতক্ষণ তোমার আত্ম, তোমার তুমি এই পঞ্চভূতের একটির প্রতিও আকর্ষণ বোধ করবে, ততক্ষণ এই জ্বলন্ত চিতায় শায়িত হয়ে তোমাকে দগ্ধতার ভান করতেই হবে।

৫) যে, যখনই নিজের আত্মকে এই পঞ্চভূতের আসক্তির থেকে উত্তোলন করবে, তিনি তন্মুহূর্ত হতে অনন্ত সুখের অধিকারী হবেন । তিনি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, যারা বিভিন্ন সুখের স্তর বলে পরিচিত, সেই সমস্ত সুখ ভোগ করে অন্তে জন্মমৃত্যু চক্রের থেকে চিরতরে মুক্ত হবার অধিকারী।

৬) আর এই ভোগ করার অধিকার সকলের আছে। যেই দেশেরই অধিবাসী হন তিনি, যেই জাতিরই হন তিনি, যেই যোনিরই হন তিনি, যেই লিঙ্গেরই হন তিনি, যেই অবস্থারই হন তিনি, সকলেই এই সুখ ভোগের অধিকারী, আর সেই পথে কারুর প্রয়োজন নেই, কৃতান্ত স্বয়ং উনার পিতামাতা ও গুরু হয়ে তাঁর মার্গদর্শন করবেন।

৭) সত্য এই যে যিনিই এই পঞ্চভূতকে আকর্ষণ করে রাখবেন, তা তিনি রাজা হন বা মন্ত্রী, সাধু হন বা সিপাহী, ধনী হন বা দরিদ্র, পুরুষ হন বা স্ত্রী, তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যে জরাজীর্ণই থেকে যাবেন। সত্য এই যে, তিনিই এই চরম দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাবেন, যিনি সমস্ত পঞ্চভূতের থেকে চিরতরে নিজের আত্মকে মুক্ত করে দেবেন।

৮) কি করতে হবে এই মুক্তি লাভের জন্য? প্রথমে এই দেহ বা মৃত্তিকাতত্ত্বকে ভারসম্যে স্থাপিত করতে হবে, যা একে কেবল মাত্র খাদ্য প্রদান করলেই সম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু তখন মন ও বুদ্ধি বিদ্রোহ করে বলে সেই কাজে মান সম্মান লাভ হচ্ছেনা । তার থেকে মুক্তি কি করে পাবে?

৯) কর্ম সম্মানলাভের জন্য করা হয়না, উদরপূর্তির জন্যই কর্ম আবশ্যক। উদরপূর্তি হলেই দেহ (মৃত্তিকাতত্ত্ব), উর্জা (অগ্নিতত্ত্ব) এবং প্রাণ (বায়ুতত্ত্ব) ভারসম্যে স্থাপিত হয়ে যায়। তাই নিজের কর্ম ও কর্ম নিয়ে ভাবনাকে নিজের উদরপূর্তি পর্যন্তই সীমিত রাখো, যেখানে এই তিন ভূত সমতা লাভ করে যায়।

১০) যখন এই তিন ভূত তৃপ্ত হয়ে যায় আর মন (আকাশ) এবং বুদ্ধি (জল) যতই উস্কানি দিক, আত্ম তাতে বিচলিত হয়না, আত্ম তাদের প্ররোচনায় পা দিয়ে মান, সম্মান, ভয়, অসুখ, ইত্যাদিতে বিচলিত হয়না, তখনই শূন্য অবস্থার অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তার ধ্যান করা শুরু করো।

১১) যেমন যেমন ধ্যান হতে থাকবে, তেমন তেমন স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস অর্থাৎ অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করতে থাকবে আত্ম, আর অন্তে যখন সম্পূর্ণ ভাবে শূন্যের বোধ বা বোধি লাভ হয়ে যাবে আত্মের, তখন সমাধি বা নির্বাণের সময় এসে গেছে। সমস্ত কিছুর সমাপ্তির সময় সেটি, মহানন্দে সমস্ত জন্মমৃত্যুর চক্রকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে, সদানন্দে লীন হবার সময় সেটি।

এটিই কৃতান্ত সারকথা পুত্রী। এই সম্পূর্ণ পথে এই শিক্ষা, যা তুমি আমার কাছে গ্রহণ করে কৃতান্ত রচনা করেছো, তা সহায়ক হবে, আর সয়ায়ক হবেন শূন্য, যাকেই সম্পূর্ণ উপলব্ধির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি বা মাতা সর্বাম্বা বলে অবিহিত করেছ।

সনাতনসংশয়

দেবী দিব্যশ্রী সমস্ত কথা তৃপ্ত হলেও, যেন কিছু আরো বলতে চাইলেন। তাই প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "পুত্রী, তুমি আমার থেকে কৃতান্ত ধর্মের সার জানার আশা করেছিলে, আর আমি তাই তোমাকে সেই সার ব্যক্ত করলাম সহজ ভাষায়, যা সকলের জন্য পালন করা সহজতম উপায়ও, এবং সকলকে উন্নতও করবে সত্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তোমার প্রশ্নের অন্তরে আরো কিছু প্রশ্ন থেকে গাছিল আশা করি। তা স্পষ্ট করে বলো। আমি তারও উত্তর প্রদান করতে প্রস্তুত"।

দেবী দিব্যশ্রী কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে থেকেই বললেন, "আসলে পিতা, আপনি তো আমার মনের সমস্ত কথা জানেনেই। তবে আপনি সেই কথা স্বয়ংই কেন বলছেন না?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "কেন পুত্রী, তোমার কি সেই কথা বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে? কি বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে? এই যে তোমার শিষ্যারা বলছেন যে কৃতান্ত ধর্ম তো এই সবে নির্মিত ধর্ম, যেই পথে তুমি চলেছ, আর এর নির্মাতা, অর্থাৎ আমি চলেছি। এর উপর কি করে ভরসা করা যেতে পারে? এই তো? ... তুমি তো এর উত্তরে এও বলেছ যে কৃতান্ত ধর্ম আকাশ থেকে এসে উপস্থিত হয়নি, এটি সনাতন বৌদ্ধ ধর্মেরই সংস্করণ, যেখানে অদ্বৈতবাদকেই সত্য স্থাপন করে, যতক্ষণ না দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে যাত্রা সম্পন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পরমশূন্য, পরমবোধিকে প্রকৃতি বেশে রাখা হয়েছে, কারণ তিনি মাতার ন্যায় আমাদের স্নেহ করেন, এবং পালন করেন। ... তারপরেও তাঁরা প্রশ্ন করছেন যে ব্রাহ্মণদের নির্মিত বৈদিকধর্ম ছেড়ে, তাঁরা কেন বৌদ্ধ ধর্মকে সনাতন ধর্ম মেনে নেবে। এই তো?"

পুনরায় হাস্যমুখে প্রভু বললেন, "কিন্তু তোমার কাছে এই ইতিহাস জ্ঞাত নয়। তাই তুমি তাঁদেরকে সেই ইতিহাসের কথা বলে প্রমাণ করতে পারছো না যে সনাতন ধর্ম বৈদিক ধর্ম নয়, বৌদ্ধ ধর্মই। এই তো?"

দেবী দিব্যশ্রী মাথা নত করে বললেন, "হ্যাঁ পিতা, সত্য তো এটিই, কিন্তু আমি এই কথা আপনাকে বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারছিলাম না, কারণ এই কথার উচ্চারণ আপনার সম্মুখে করার অর্থ, আপনাকে অপমান করা হবে। আপনি সকলের সামনে তো সামান্য এক মানুষ হয়েই স্থিত। তাই তাঁরা আপনাকে সন্দেহ করতেই পারেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে অখণ্ড ব্রহ্মঅবতার বলে জানি, চিনি, এবং উপলব্ধিও করেছি। এরপরেও আপনাকে এই কথা বলে আপনার উপর সন্দেহের লাঞ্ছন লাগাতে আমার অন্তর কুণ্ঠিত"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, আমি তোমাকে এখানে সরাসরি ইতিহাসের সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করে, সমস্ত কিছুর নিষ্পত্তি করতেই পারি, কারণ বাস্তবেই বৌদ্ধ ধর্মই সনাতন ধর্ম, আর বৈদিক ধর্ম সেই সনাতন ধর্মের বিরোধী এক স্বৈরাচারীতা ব্যতীত কিছুই নয়। ... আর আমি তোমাকে সেই ইতিহাস সংক্ষেপে বলবোও, কিন্তু তার আগে তোমাকে অন্য কিছু কথা বলতে চাই।... আচ্ছা পুত্রী, একটি কথা বলো আমাকে। আমার প্রিয় শিষ্য কে?"

দেবী দিব্যশ্রী লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে বললেন, "আমি পিতা"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন বিকৃত কণ্ঠস্বরে বললেন, "কিন্তু তোমাকে শিষ্যবেশে লাভ করার পূর্বেও আমি তো অন্যদুই শিষ্যও লাভ করেছি। তবে তাঁরা প্রিয়শিষ্য না হয়ে তুমি কেন হলে? তাঁরা আদি শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও, আমি তাঁদেরকে সেই ভার দিলাম না, কিন্তু তুমি নবীন হওয়া সত্ত্বেও, তোমাকেই ভার দিলাম কেন?"

দেবী দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "বুঝে গেছি পিতা, যখন আদি কিনা এই প্রশ্ন আসবে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে, তখন উত্তর আদি হবার প্রমাণ চাওয়া উচিত নয়, বরং সঠিক কোনটি, সেটি হওয়া উচিত। ... অর্থাৎ সমীচীনকে গ্রহণ করাই ঔচিত্য, পুরাতনকে নয়। ... পুরাতন বলেই সে যোগ্য নয়, আর নবীন বলেই সে অযোগ্যও নয়। সমীচীন হলে নবীনও প্রাচীনের থেকে অধিক যোগ্য। অর্থাৎ আমাদের আত্ম যেন কখনোই এমন দুর্বল যুক্তিতে আসক্ত না হয় যে, পুরাতন বলেই তা গ্রহণযোগ্য, তা কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, সকল কিছুর ক্ষেত্রেই"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে এবার বললেন, "হ্যাঁ পুত্রী, তোমার শিষ্যদের কাছে তোমার উত্তর এটিই হওয়া উচিত, এটি নয় যে বৌদ্ধ ধর্মই পুরাতনতম ধর্ম, যতই তা বাস্তবে পুরাতনতম হোক, আর যতই তা বাস্তবেই সনাতন হোক। ... অর্থাৎ পুত্রী, তোমার শিষ্যরা যেন এই কারণে বৌদ্ধমত গ্রহণ না করেন, বা বৌদ্ধমতের উপর প্রকৃতির আস্তরণমিশ্রিত কৃতান্তমত গ্রহণ না করেন, কারণ তা পুরাতন। যদি তাঁরা তা গ্রহণই করেন, তবে যেন এই কারণেই তা গ্রহণ করেন কারণ তা যথার্থ। ... পুরাতন বলে কনো কিছুকে গ্রহণ করে নেওয়া, সে তো অন্ধবিশ্বাস করা পুত্রী; যেই ধর্ম অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয়, তা কি করে যথার্থ হতে পারে? ... তাই নিজের শিষ্যদের যথার্থতার পথে চালনা করো, পুরাতনের পথে নয়।

আর যখন তাঁরা যথার্থ বলেই বৌদ্ধ ধারণাকে এবং যাতে কনো ভাবে বৌদ্ধধারা অবলম্বন করে অহংকারের আশঙ্কা না থেকে যায়, তাই প্রকৃতির প্রতি সমর্পণভাবকে গ্রহণ করে কৃতান্তকে ধারণ করে নেবেন, তখনই তাঁদের কাছে বৌদ্ধধারার ইতিহাস রাখতে পারো, আর বলতে পারো যে, তাঁরা যাকে যথার্থ বলে গ্রহণ করেছেন, তা পুরাতনও। ... পুত্রী, সদা স্মরণ রেখো যে, যখন তুমি গুরু, তখন তোমার প্রসার করা শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র একটি বা দুটি শিষ্য পর্যন্তই সীমিত থাকেনা। তা প্রবাহিত হয় বহু পিড়ির শিষ্যদের কাছে। আর তাই নিজের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কখনোই কনো অন্ধবিশ্বাসকে স্থাপন করবে না, কনো চমৎকারকে তো স্থাপন করবেই না, আর কখনোই এমন স্থাপন করার প্রয়াস করবেনা যে তোমার শিক্ষাপ্রণালী থেকে কারুর অহংকারের বৃদ্ধি পাবে।

স্মরণ রেখো পুত্রী, কারুর অহংকার যদি সীমিত করতে নাও পারো, তাতেও কনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একজনের সামান্য অহংকারবৃদ্ধির কারণও যদি তুমি হও, তবে তুমি প্রকৃতি অর্থাৎ মাতা সর্বাম্বাকেই পীড়া প্রদান করছো, কারণ তাঁকে অসামান্য ধৈর্য ধরে থাকতে হয়, এই অহংকার নাশের জন্য। আমরা একটু একটু করে নিজেদের অহংকারের নাশ করি, একটু একটু করে তাঁর দিকে

এগিয়ে যাই। আর যদি আমি পুনরায় কারুর মধ্যে অহংকারকে জাগ্রত করে দিই, তবে আমি তো মাতা সর্বাম্বার অপেক্ষার সময়ক্ষণেরই বৃদ্ধি করে চলেছি! ...

স্মরণ রেখো পুত্রী, প্রেমী তিনি নন যিনি আকাশ থেকে চাঁদতারা পেরে এনে দেন। ইনি তো কেবলই অহংকারের পূজারী। প্রেমী তিনি যিনি যাকে প্রেম করেন, তাঁর প্রতিটি ভাবের খেয়াল রাখেন। মাতার প্রতিটি দুশ্চিন্তার কারণের প্রতি নজর রাখাই মাতার প্রেম করা পুত্রী। ... বেশ, এবার তোমাকে আমি অতি সংক্ষেপে তোমার জানার ইচ্ছা যা ছিল, অর্থাৎ ইতিহাসের কথা বলছি।

পুত্রী, যাকে আমরা বুদ্ধ বলে থাকি, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ, তিনি কিন্তু প্রথম বুদ্ধ নন, বা তিনি কিন্তু বৌদ্ধ সনাতন ধর্মের প্রণেতাও নন। তিনি হলেন ২৮ তম বুদ্ধ। আর সেখানেই বুদ্ধ ধর্মের সমাপ্তিও নয়। বরং আমি স্বয়ংও এক বুদ্ধ, এবং আমি ৩৪ নম্বর বুদ্ধ, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ এবং আমার মধ্যেও ৫টি বুদ্ধের আগমন ঘটেছে এই ভৌতিক ও কাল্পনিক লোকে, যার একটিই উদ্দেশ্য, আর তা হলো জীবের উদ্ধার। ... এঁদের মধ্যে, সমস্ত বুদ্ধের মেধা এক নয় পুত্রী। এঁদের মধ্যে একটি করে বুদ্ধ ধর্মের নতুন সংস্করণ করেন, আর পরের দুই বুদ্ধ সেই সংস্করণের বিস্তার করেন। আর এই ভাবেই তিনটি বুদ্ধের শ্রেণি হয়ে থাকে।

এই ভৌতিক জগতের কালের ফেরে, এঁদেরকে বিভক্ত করতে পারবে না সাধারণত। কিন্তু তাও যদি করতে চাও, তবে বলতে হয় যে একটি তথাগত বুদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ণবুদ্ধের সময়কাল হয় এক সহস্র বৎসর বা এক হাজার বৎসর। এই এক হাজার বৎসরের মধ্যেই, আরো দুই বুদ্ধের আগমন ঘটে, পূর্ণবুদ্ধ বা তথাগত বুদ্ধের ধারার বিস্তার করার উদ্দেশ্যে।

তেমনই ভাবে, তনহাঙ্কর বুদ্ধ ছিলেন সেই প্রথম তথাগত বুদ্ধ, যার শাসন ছিল প্রায় এক হাজার বৎসর। তাঁর ধারার বিস্তার করেন মেধাঙ্কর বুদ্ধ এবং সরাঙ্কর বুদ্ধ। এরপরের এক হাজার বৎসর শাসন করেন দীপঙ্কর বুদ্ধ, যার শাসনকালে কন্দন্নবুদ্ধ, এবং মঙ্গলবুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী প্রায় এক সহস্র বৎসরব্যাপী ধর্মপথ প্রদর্শন করেন সুমনবুদ্ধ, যার মার্গকে প্রসারণ করেন রেভতবুদ্ধ এবং শোভিতবুদ্ধ। চতুর্থ হাজার বৎসরব্যাপী ধর্মপ্রসারক হলেন অনমাদস্যি বুদ্ধ, যার বিস্তার করেন পাদুম বুদ্ধ, এবং নারদ বুদ্ধ। পাদুমুত্তরা বুদ্ধ হলেন পঞ্চম সহস্র বৎসরব্যাপী ধর্মপ্রসারক, যার ধারার অনুগামী থাকেন সুমেধ বুদ্ধ এবং সুজাত বুদ্ধ।

ষষ্ঠম সহস্র বৎসর ধর্মকে শাসন করেন পিয়দস্যি বুদ্ধ, যার বিস্তার করেন আত্থাদস্যি বুদ্ধ এবং ধর্ম্যাদস্যি বুদ্ধ। সপ্তম সহস্র বৎসরব্যাপী যিনি ধর্মকে শাসন করেন, তিনি হলেন সিদ্ধাত্থ বুদ্ধ, যার অনুসরণকারীরা হলেন তিষ্যাবুদ্ধ এবং ফুস্যাবুদ্ধ। অষ্টম সহস্র বৎসরব্যাপী যিনি ধর্মকে শাসন করেন, তিনি হলেন বিপাস্যি বুদ্ধ, এবং তাঁর অনুসরণ করেন শিখি বুদ্ধ এবং বেস্যাভি বুদ্ধ। নবম সহস্র বৎসরব্যাপী ধর্মের শাসক হলেন কাকুসন্ধ বুদ্ধ, এবং তাঁর অনুগামী হন কনাগ্মা বুদ্ধ, এবং কাশ্যপ বুদ্ধ।

এই হলো পুত্রী নয় সহস্র বৎসরের বোধিসত্ত্ব বিস্তারের ইতিহাস, যেখানে অন্য কনো ধর্মের অস্তিত্বের কনো উল্লেখও কোথাও, কনো ইতিহাসে পাবেনা। এরপরে উপস্থিত হন যিনি, তিনি নিজেকে বুদ্ধ বলে দাবি করেন না, তিনি নিজেকে কিছু বলেই দাবি করেন না,

বরং বলেন তিনি সকলের দুঃখের নিবারণের মার্গ পেয়েছেন, আর তাঁর নাম হলো গৌতম বুদ্ধ, আর এই বুদ্ধ নামটি তাঁর নামের সাথে বুদ্ধসম্প্রদায় যুক্ত করেন, তাঁর জীবিত থাকার কালেই, কারণ গৌতম সেই শূন্যতারই কথা বলেছিলেন, যেই শূন্যতার প্রচার বৌদ্ধধারা করে থাকেন।

এই গৌতম বুদ্ধ শাসন করেন আরো এক সহস্র বৎসর প্রায়, যেখানে তাঁর সহায়ক হয়ে ওঠেন আরবে মহম্মদ, এবং পালিস্তিনে ঈশা। পুত্রী, এর আগে যা কিছু বিস্তার হয়েছে বৌদ্ধের, তা পূর্বেই সীমিত ছিল, তা কখনোই মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা করেনি। বর্তমানের জাপান, ক্যাম্বোডিয়া, লঙ্কা এবং জম্বুদ্বীপ, এবং উত্তরে তক্ষশীলা অর্থাৎ গান্ধার পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ ছিল, যা বিস্তার লাভ করেছিল চীনদেশে, কিন্তু কখনোই মধ্যপ্রাচ্যে তা বিস্তার লাভ করেনি। তবে এখন তা করলো কেন? আর করলোই যখন, তখন বুদ্ধ নাম আর যুক্ত হলো না কেন? কেন মহম্মদবুদ্ধ বা ঈশাবুদ্ধ করার দাবি জানালেন না বৌদ্ধ সম্প্রদায়?

পুত্রী, যখন গৌতম বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন, তখন পর্যন্ত বৈদিক ধারার বিস্তারই হয়নি। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ছিলেন যারা নিজেদের ভগবান বলে দাবি করতেন, এবং তাঁরা কিছু সমজাতিকে গৃহস্বামী করে রেখে, বৈশ্যদের অত্যাচার করতেন। আর এই বৈশ্যদেরকে একত্রিত করেই গৌতম বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের বিরোধিতায় স্থাপিত হয়েছিলেন নিজের বোধিলাভের পশ্চাতে। তখন শূদ্র বলে কনো জাতি ছিলনা।

এরপরবর্তী কালে, যখন বৈশ্যকুল বিপ্লব ডেকে আনে, তখন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথম বৈশ্যরাজা হন, এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কোণঠাসা করে দেন। কিন্তু সেটি ব্রাহ্মণদেরই একটি চাল ছিল পুত্রী, বলতে পারো একটি রাজনৈতিক চাল। তাঁরা নিজেদেরই একজনকে বৌদ্ধ সাধক করে, চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করে দেন, আর সেই বহুরূপী ব্রাহ্মণের নাম ছিল চাণক্য। ব্রাহ্মণদের এই চালকে জানতে না পেরে, রাজসিংহাসন লাভ করা চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের অনুসরণ করতে থাকেন, আর চাণক্য সেই সুবাদে রাজবংশকে ব্রাহ্মণের অনুদাস করে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের একত্রিত করে তাঁদের নাম দেন রাজেন্যবর্গ, এবং বৈশ্যদের মধ্যে ক্ষেতের কর্ম করা, এবং ক্ষেতের কর্মের থেকে বাণিজ্য করা দুই ভাগে বিভক্ত করে, ক্ষেতের কর্ম করা মানুষদের শূদ্র বলেন, এবং বাণিজ্য করা ব্যক্তিদের বৈশ্য বলেন।

আর এরপর, ক্রমশ রাজেন্যবর্গ থেকে ব্রাহ্মণকে পৃথক করে নেন, এবং রাজেন্যবর্গের অন্তরে বৈশ্যদের সম্মিলিত করে শূদ্রদের শোষণ করা শুরু করে দেন। এটিই ছিল ব্রাহ্মণদের চক্রান্ত। কি চক্রান্ত? যেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁদের কাছে অভেদ্য লাগছিল, সেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের বৈশ্যবন্ধু রাজেন্যবর্গ রূপে প্রবেশ করালেন চাণক্যের হাত ধরে, এবং ব্রাহ্মণকে তার থেকে বিভক্ত করে নিয়ে, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে রাজেন্যবর্গ করে তুলে, শূদ্রের সৃষ্টি করে, শূদ্রকে শোষণ করা শুরু করালেন ব্রাহ্মণরা এই চাণক্যের মাধ্যমেই।

এই শোষণের কথা চন্দ্রগুপ্ত পুত্র বিম্বিসারের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে, চাণক্যকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন তিনি, এবং চাণক্যেকে মৃত্যু দেওয়া হয়, কূটনৈতিক ভাবেই। কিন্তু ব্রাহ্মণদের যা করনীয় ছিল, তা তাঁরা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন। তাঁরা মৌর্য বংশের মাধ্যমে

ব্রাহ্মণ হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিয়েছিলেন, আর এবার তাঁদের কর্ম ছিল বৌদ্ধ দমন এবং ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন। আর সেই কূটনীতি মেনেই, যাকে বশ করা হয়, তিনি হলেন সম্রাট অশোক, অর্থাৎ বিম্বিসারপুত্র। ব্রাহ্মণদের বিরোধী ছিলেন বিম্বিসার, আর তাঁর অন্যপুত্ররা, যারা বিম্বিসারেরই মত অবলম্বন করে চলতেন। তাই অশোককে এঁদের বিরোধী করে তোলা হয়, এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম হলো ব্রাহ্মণের সেবা করা, বৈশ্যকে সম্পদ দেওয়া এবং শূদ্রের শোষণ করা, এমন ধারণা অশোককে প্রদান করা হয়।

প্রভাবিত করার জন্যও অশোকের সাথে ব্রাহ্মণরা বহুধরনের কূটনৈতিক আচরণ করেন, আর তাতে প্রভাবিত হয়ে অশোক নিজের পিতা এবং ভ্রাতাদের হত্যা করে, সিংহাসনে নিজেকে স্থাপন করেন। ক্ষত্রিয়ত্বের নেশা, বৈশ্যদের সম্পদ দান, শূদ্রদের শোষণ, এবং ব্রাহ্মণদের সেবা, এই ছিল তাঁর ব্রত। কিন্তু এই ক্ষত্রিয়ত্বের নেশা তাঁর মধ্যে ভয়নাক ভাবে ক্রিয়া করে যায়, আর তিনি একের পর এক রাজ্য জয় করলেন বলপূর্বক। কিন্তু যখন তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করে দেখলেন যে কনো প্রজাই অবশিষ্ট নেই যার উপর শাসন করা হবে, তখন নিজেকে নিয়েই নিজে কম্পিত হয়ে উঠলেন, আর তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হন মহাবীরসখা অজীবকের শিষ্য।

জীবক তাঁকে সম্পূর্ণ ইতিহাস বলেন আর বুঝিয়ে দেন কি ভাবে ব্রাহ্মণরা ষড়যন্ত্র করে, তাঁর প্রপিতা চন্দ্রগুপ্তকে বশ করে শূদ্রসমাজের নির্মাণ করে, তাঁদেরকে শোষণের জন্য রেখে, ক্ষত্রিয়কুলের নির্মাণ করে, বৈশ্যকে তাঁদের সঙ্গে রেখে, নিজেদেরকে শীর্ষে স্থাপন করে ফেলেছেন। অশোক যখন এবার ব্রাহ্মণহত্যার প্রতিজ্ঞা নিতে বললেন, তখন জীবক বললেন, শান্ত হও, আর সনাতনে ফিরে এসো। বুদ্ধের স্মরণ নাও, প্রেমের পথ গ্রহণ করো, হিংসার পথ ত্যাগ করো।

অশোক জীবকের নামে বরাবরে গুহা নির্মাণ করে স্থান প্রদান করে, তাঁদের থেকে শিক্ষা নিতে থাকলেন, বুদ্ধকে জানলেন এবং বুদ্ধের ৮৪ হাজার শিক্ষা বা প্রবচন জেনে, তাকে ৮৪ হাজার স্তূপে স্থাপন করতে থাকলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিজেদের পথ প্রশস্তই করে নিয়েছিলেন এতক্ষণে। ... এই যখন চলছিলো জম্বুদ্বীপে, তখন কালের খাতায় এটি স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে বৌদ্ধসনাতন ধর্ম আর ধর্মের ধ্বজাকে ধারণ করে নিয়ে যেতে পারবে না, যেমন পূর্বে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই, মধ্যপ্রাচ্যে, যেখানে গান্ধার থেকে বৌদ্ধধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান করছিল, সেখানে কাল নিজের নতুন ধর্মসংজ্ঞা লেখা শুরু করে দিলেন মহম্মদ ও ঈশার নামে।

আর যাতে বৌদ্ধরা এঁদেরকে নিজেদের সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে, ব্রাহ্মণদের কোপের সামনে পতিত না করে দেয়, তাই এবার আর শূন্যের স্থাপন শূন্যরূপে করা হলো না, করা হলো নিরাকার আল্লাহ ও পিতার নামে। তাই বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁদেরকে নিজেদের ধারায় স্থাপনও করলেননা, আর তাই ব্রাহ্মণদের থেকে তা অজানাই থেকে গেল। ... আর এই মহম্মদ ও ঈশাই হলেন ১০ম সহস্র বৎসরের ধর্মের শাসক গৌতম বুদ্ধের দুই অনুগামী বুদ্ধ।

পুত্রী, কালের কাছে সকলেই নিছক শিশু, এমনি এমনি বলিনা পুত্রী, মাতা সর্বাত্মা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হয়েও, তিনিই একমাত্র কর্তা। বুঝতে পারছো তো কালের সামর্থ্য! ... যাইহোক, জম্বুদ্বীপে, অশোক যতই বুদ্ধস্তুপ স্থাপন করুন না কেন, এক নতুন হিল্লোল ব্রাহ্মণকুলে প্রবেশ করেই গেছিল, আর তাই এবার তাঁরা নিজেরা যেই ভিত্তি অর্জন করে নিয়েছিলেন, সেই ভিত্তিকে মজবুত করার প্রয়াস করতে

থাকলেন। সমস্ত পূর্বের বুদ্ধরা যা শিক্ষা দিয়ে গেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, অহংকারকে আরধনার স্থান প্রদান করে, বেদের রচনা করলেন ব্রাহ্মণরা, এবং লেখকের নাম অপসারণ করে বললেন এটি পুরাকালে লিখিত এবং সনাতন গ্রন্থ। ...

প্রশ্ন উঠলো যে এতকাল পাওয়া যায়নি কেন এই গ্রন্থ, তাই উত্তর আসে ব্রাহ্মণদের থেকে যে, এতকাল মুখে মুখেই প্রচার হয়ে এসেছে তা, এবার তা লিপিবদ্ধ করা হলো। কিন্তু এরপরেও কিছু কিছু ব্যক্তি এই বৈদিক ধারাকে মান্যতা দিতে পারছিলেন না। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বশিষ্ঠ, যার ছাত্র ছিলেন বাল্মীকি, একজন পিপলাদ এবং অন্যজন ছিলেন মার্কণ্ড। মার্কণ্ডকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন ব্রাহ্মণরা, কিন্তু মার্কণ্ড এরই মধ্যে ব্রাহ্মণরা যেমন বুদ্ধস্তূপকে শিবলিঙ্গ বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন, সেই শিবেরই স্তব গেয়ে দিলেন, এবং সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র শুনে ব্রাহ্মণরা তৃপ্ত হয়ে মার্কণ্ডকে মৃত্যু দেওয়া থেকে বিরত হলেন।

আর বিরতি লাভ করেই, মার্কণ্ড এবার শিবরূপী বুদ্ধের স্তূপ অর্থাৎ বুদ্ধের প্রশস্তিগীত গাইতে শুরু করলেন, এবং বুদ্ধের বোধি, অর্থাৎ শক্তিকেও স্থাপন করা শুরু করে দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধি, অর্থাৎ স্বয়ং শিবের শক্তির বিস্তারে বিবরণ প্রদান করা শুরু করলেন, এবং এমনও স্থাপন করে দিলেন যে, শক্তি বিনা শিব শব মাত্র। ... এই প্রচার ব্রাহ্মণদের বিস্তারকে বিস্তর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। তবে এই একটিই নয়, ব্রাহ্মণদের ভিত্তি আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় বাল্মীকি এবং সর্বোপরি পিপলাদের কারণে।

দধীচিপুত্র পিপলাদকে দমন করার সর্বসম্ভব প্রয়াস করেছিলেন ব্রাহ্মণরা, দধীচিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে, এবং তাঁর স্ত্রীকে সতীরূপে জীবিত দহন করে। কিন্তু পিপলাদ পিপল পাতার রসপান করে বেঁচে যান, এবং উপনিষদের রচনা করে ফেলেন, যেখানে আত্মরূপে তিনি স্থাপন করে বোধিসত্ত্বকে। আর মার্কণ্ড যা কিছু করেছিলেন তা এই পিপলাদের সংসর্গ লাভ করেই করেছিলেন, কারণ মার্কণ্ডের কাছে এই পিপলাদই ছিলেন জীবন্ত বুদ্ধ, জীবন্ত শিব।

ব্রাহ্মণদের পায়ের তলার মাটি কেবল এতেই হেলে যায়না, তা হেলে যায় তৃতীয়বার, যখন এই শিবের আরাধনাতেই পুরুষ মত্ত করে দেয়, বাল্মীকি, যিনি বশিষ্ঠের শিষ্য। বৌদ্ধতন্ত্রধারার শিষ্য বশিষ্ঠ, এবং তাঁরই ছাত্র বাল্মীকি। তাই তিনি তন্ত্রের দেবীকে স্থাপিত করলেন মা সীতারূপে, আর দেখালেন কিভাবে তিনি পুরুষকে বারংবার মার্গদর্শন করেন ভ্রম ত্যাগের, আর যখন ভ্রম ত্যাগ করতে পারেন না পুরুষ তিনতিনবার সুযোগ দেবার পরেও, তখন তিনি ভূমির নিচে চলে যান, পুরুষকে ত্যাগ করে। বুদ্ধকথার ধারণা করেই তিনি এই মহাকাব্য রচনা করেন যার নাম দেন রামায়ণ, যেখানে তিনি গৌতমবুদ্ধকে রাম রূপে স্থাপন করেন, গৌতমবুদ্ধের বর্ণিত গায়ত্রী দেবীর বিবরণকে সীতারূপে স্থাপন করেন, বুদ্ধ শিষ্য কলিতকে লক্ষ্মণরূপে স্থাপন করেন, সারিপুত্রকে সুগ্রীব রূপে স্থাপন করেন, এবং বুদ্ধপুত্র রাহুলকে হনুমানরূপে স্থাপন করেন।

এই সমস্ত কিছুর উত্তর প্রদান করা ব্রাহ্মণদের কাছে অতীব আবশ্যক হয়ে গেছিল, কারণ এর উত্তর যদি স্থাপন করতে না পারতেন ব্রাহ্মণরা, তবে যেই ষড়যন্ত্র করে চন্দ্রগুপ্তের সামনে থেকে বৌদ্ধদের থেকে স্থান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তা যে চিরতরে হারিয়ে ফেলতেন তাঁরা। তাই তাঁরা পুলস্তপুত্র, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বেছে নিলেন, যিনি ছিলেন অসামান্য একজন দক্ষ কবি।

ষড়যন্ত্র ছাড়া ব্রাহ্মণরা নিজেদের অনুগামী কারুকেই করতে পারতেন না, কারণ জ্ঞান তাঁদের সত্যের না থাকলেও, সত্য সমান জ্ঞান ছিল তাঁদের অর্থাৎ বুঝতে পারছো তো পুত্রী, কি বলছি! শূন্যের জ্ঞান না থাকলেও, তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন আজও দেখো, তেমনই ছিল শূন্যই। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করলেন না কারণ তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলে, আর বললেন যে তাঁকে গ্রহণ তখনই করা হবে যখন তিনি সমস্ত বৌদ্ধধারাকে বৈদিক ধারারূপে স্থাপন করে ফেলতে পারবেন। এমন কথা শুনেই, মথুরাপতি কনিস্ককে সামনে রেখে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জয়ার রচনা করতে শুরু করলেন।

একাধিক প্রয়াসের পর জয়লাভ করতে পারলেন, তাই নাম দিলেন এঁর জয়া। কিন্তু এই জয়াতেও রইল বৌদ্ধত্বের ছাপ! ... অশোকের প্রতাপকে সামনে রেখে আঁকলেন পরশুরামকে, কনিস্ককে সামনে রেখে আঁকলেন কৃষ্ণচরিত্রকে। ... ব্রাহ্মণরা তিরস্কার করে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ... কাকুতিমিনতি করে, পরবর্তী সুযোগ পেতে চাইলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

আর এবার তিনি রচনা করলেন ভগবৎ মহাপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, নতুন মার্কণ্ড পুরাণ, স্কন্ধ পুরাণ, গরুড় পুরাণ, শিব পুরাণ, দেবী পুরাণ, আর সেই সমস্ত পুরাণের মধ্যে দিয়ে দেখাতে শুরু করলেন যে বেদই আদি গ্রন্থ, বেদই সনাতন, আর বেদের রচনা বহু পূর্বের। ... দেখাতে শুরু করলেন যে সমস্ত স্তূপ, যা আসলে বৌদ্ধস্তূপ, তা হলো শিব বা বিষ্ণু... আর তাঁদের স্তূপ হবার কাহানীর অবতরণ করলেন। ... একের পর এক রম্যরচনা করতে থাকলেন, রূপকথার অবতারণা করতে থাকলেন, আর ব্রাহ্মণদের হাতে তা স্থাপন করতে থাকলেন।

সমস্ত গ্রন্থ লাভ করে ব্রাহ্মণরা তৃপ্ত হয়েও, অতৃপ্ত দেখিয়ে বললেন, অতীতে কেবলই বৈদিক ধারা ছিল, কেবলই ব্রাহ্মণ ছিল; ব্রাহ্মণকে যে যে যখন যখন নিচু মেনেছে, তার পাপ হয়েছে, নরকে বাস হয়েছে, নিকৃষ্ট অত্যাচার হয়েছে তার সাথে, সেই সব তো লিখেছ, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে এগুলো সব হবে, কই সেই কথা লেখো? যদি না লিখতে পারো, তবে ভুলে যাও স্বীকৃতি পাবার কথা।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এবার ক্রুদ্ধ ভাবে দুটি কাব্য লিখলেন, একটি কল্কি পুরাণ, একটি ভবিষ্য পুরাণ, আর ব্রাহ্মণরা যেমন যেমন বললেন, তার অনুসরণ করলেন। ব্রাহ্মণরা এবার তৃপ্ত হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বেদব্যাস উপাধি দিলে, এবার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর জীবন নিয়ে ব্রাহ্মণরা যেই ছেলেখেলা করেছেন, তার প্রতিশোধ নেবেন স্থির করে নেন।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এতই বিস্তর বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছিলেন যে তাঁর স্পষ্টই ধারণা হয়ে গেছিল যে, বৌদ্ধ কি, আর সমস্ত কিছু ঠিক ঠিক ভাবে কি। আর এও বুঝে গেছিলেন তিনি যে ব্রাহ্মণরা কি চাইছেন আসলে। আর তেমনই বুঝে, তিনি এবার পিপলাদের রচিত উপনিষদকে বিবরণ দিলেন সংক্ষেপে, আর তার কথক কিন্তু এবার যম হলেন না, আর ব্যখ্যাও এবার যম আত্রের প্রদান করলেন না, ব্যখ্যা প্রদান করলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নয়, কেবল কৃষ্ণ, এবং ব্যাখ্যা দিলেনও কেবল কৃষ্ণেরই, অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নেরই।

পুত্রী ভাবছো তুমি না, এ কেমন কর্ম... তাই তো? ... পুত্রী, উপনিষদে সম্পূর্ণ শূন্যের বিবরণ আত্মের বিবরণ রূপে প্রদান করেছেন যম, কার কাছে নচিকেতার কাছে। ... কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এবার কি করলেন? কথক রূপে রাখলেন নিজেকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে, আর কথা কার সম্বন্ধে বললেন? আত্মের নয় নিজের অর্থাৎ কৃষ্ণের। ... শ্রোতা কে হলেন? ব্রাহ্মণরা যেই জয়া বা মহাভারতকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন, সেই মহাভারতের নায়ক অর্জুন হলেন শ্রোতা। ... আর এই ভাবে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণদের উপর আক্রোশ প্রকাশ করে, উপনিষদের কথাকে তস্করি করে নিয়ে, নিজের বিবরণ প্রদান করে, নিজেকে ভগবানরূপে স্থাপন করে গেলেন, এবং ব্রাহ্মণরা যেই গ্রন্থকে অবমাননা করেছিলেন, সেই মহাভারতের নায়ক তাঁকে ভগবান করে মেনে নিলেন, এমনও দেখালেন।

কি অদ্ভুত ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, একবার চিন্তা করো পুত্রী। উনি বুঝে গেছিলেন যে ব্রাহ্মণরা এই সমস্ত কিছু করছেন নিজেদের ভগবানরূপে স্থাপন করার জন্য। তাই নিজেকে তিনি সেই বৈদিক ধারার মধ্যেই রাখলেন আর ব্রাহ্মণদের কথামত যত দেবদেবীর রচনা করেছেন তিনি অন্য সকল পুরাণে, সেই সকল দেবদেবীর মাথা করে নিজেকেই অর্থাৎ কৃষ্ণকেই স্থাপন করে দিলেন। তিনি জানতেন, উপনিষদকে প্রত্যাখ্যান করবেনই ব্রাহ্মণরা, কারণ এই মহাজ্ঞানের সামনে তাঁদের আজগুবি কাহানী স্থাপিত থাকতে পারবেনা। তাই উপনিষদের কথাকেই তিনি গ্রহণ করে নিলেন, আর তা নিজের মুখে স্থাপিত করে, ব্রাহ্মণদের থেকে ভগবান হবার অধিকার ছিনিয়ে নেবার কর্ম করে গেলেন, যা আজ তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারো পুত্রী।

আজ দেখো তো, ব্রাহ্মণদের কনো কদর নেই, কেবলই গীতাবাচকের কদর অবশিষ্ট, কেবলই কৃষ্ণভক্তই অবশিষ্ট সম্পূর্ণ বৈদিকধারাতে। যা দেখছো, তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সেই প্রতিশোধ গ্রহণের কর্মসূচির ফল মাত্র। ... যাইহোক, ব্রাহ্মণরা সেই সময়ে স্থিত হয়ে এই গীতার বিস্তার ধারণাও করতে পারেন নি, কারণ উপনিষদ তো তাঁরা পাঠ করেন নি, কারণ তা তাঁদের ধারণারও অতীত বস্তু, আর গীতাও তাই তাঁরা পাঠ করেও বোঝেন নি, যা আজও বোঝেন না । ... হ্যাঁ পুত্রী, সত্যই রসিকতা করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণদের নিয়ে।

কিন্তু সেই রসিকতা না বুঝেই ব্রাহ্মণরা বেদব্যাসের রচিত সমস্ত পুরাণ সকলের কাছে পাঠ করিয়ে করিয়ে, স্থাপন করতে থাকেন যে বৈদিক ধর্মই সনাতন ধর্ম, আর এও স্থাপন করতে থাকেন যে বৈদিক ধর্মের একটি সামান্য অংশমাত্র হলো বৌদ্ধ ধর্ম, দশবতারের একটি অবতারমাত্র। ... মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকলেন, আর যেই ধর্মমানের সঞ্চার করেছিলেন ২৮ বুদ্ধ, তার মান বিনষ্ট হতে থাকলো। কিছুমানুষকে কেবলই জলে পরে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছিলেন মহম্মদ ও ঈশা, কিন্তু বুদ্ধধারার বিকাশ না হলে যে ধর্মচেতনার বিকাশ হবেনা!

শূন্যতত্ত্বের বিকাশ না হলে যে ভ্রম ও সত্যের বিকাশ অসম্ভব! ... শূন্যতত্ত্বকে যদি অনুধাবন না করানো যায়, তবে তো অসত্য অনিত্য এই জগতের দুঃখ বেদনা সকল মানুষকে এবং সমস্ত মনুষ্যযোনিকে গ্রাস করে নেবে! ... ব্রাহ্মণরা তো কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন যে স্বর্গলাভ, বৈকুণ্ঠলাভ, কৈলাসলাভ, সমস্ত কিছু মৃত্যুর পরে! তাই সকলেই ভাবছেন ব্রাহ্মণকে দান করলেই সেই

সব লাভ হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু আদপে তো কিচ্ছুই হচ্ছেনা! কেবলই একটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হচ্ছে, অন্য একটি ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহণ হচ্ছে! ... একটি দেহের নাশ হচ্ছে, অন্য একটি দেহের নির্মাণ হচ্ছে! ... এমন হতে থাকলে যে জনবসতি এমন ভয়ানক অবস্থায় চলে যাবে যে এই মানবযোনির নাশ আবশ্যক হয়ে যাবে প্রকৃতির জন্য!

এমনই স্থির করেন আমাদের সকলের মাতা, যিনি শূন্য আর তাই কালও, আর তাই আসেন শঙ্কর, যাকে বুদ্ধ না বলা হলেও, তিনিই হলেন ৩১ নম্বর বুদ্ধ আর তিনিই ধর্মকে পরবর্তী ১ হাজার বৎসর শাসন করেছেন"।

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু পিতা, মাতা যে স্বয়ং শূন্য! তিনি যে স্বয়ং নিষ্ক্রিয়! তাহলে তিনি কি করছেন? কি করে করছেন?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক বলেছ পুত্রী। চন্দ্রকে দেখ। সে তো সদা একই ভাবে স্থিত, না সে নরে, না সে চরে। যেমন যেমন ধরিত্রী প্রদক্ষিণ করতে করতে তার উপর ছায়া ফেলে, সে তেমনই দেখায় ধরিত্রীর কাছে, আর তা দেখতে দেখতে, যখন ধরিত্রী নিজের ছায়াতে চন্দ্রকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে ভাবে আমাবস্যা, আবার পুরোপুরি ছায়া সরিয়ে নিয়ে দেখে পূর্ণিমা। আর সেই দেখে ধরিত্রীর জলস্তরের কি নাচানাচি দেখেছ? ... অর্থাৎ কি পুত্রী? মাতা নিজের স্থানে স্থিরই থাকেন। আমরা যেমন যেমন আমাদের ছায়া তাঁর উপর স্থাপন করি, তেমন তেমন আমরা তাঁকে পূর্ণিমার মত উর্জ্জাসম্পন্ন মহাদেবী দেখি, আবার আমাবস্যার ন্যায় পূর্ণ শূন্যও দেখি।

অর্থাৎ কথা এই যে তিনি কিছুই করেন না, আবার এও সত্য যে সমস্ত কিছু তিনিই করেন, ঠিক যেমন চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে কিছুই করেনা, আবার বলতে গেলে চন্দ্রই পৃথিবীপৃষ্ঠের সমস্ত কিছু করেন, কারণ চন্দ্রকে লক্ষ্য করেই তো পৃথিবীর সমস্ত নাচনকোদন। তাই না? তেমনই আমাদের মাতাকে দেখেই আমাদের যত নাচনকোঁদন। তাই মাতা কিছুই করেন না, আবার মাতাই সমস্ত কিছু করেন। ... তিনি তো সেই শূন্য ব্রহ্ম। তাই তিনি নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আমরা সক্রিয় তাই তাঁকেও সক্রিয় মেনে নিই, আর তাঁর সক্রিয়তাকে অনুসরণ করেই আমরা গতিমান।

(হেসে) তাই যেমন চন্দ্র স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হয়েও এই ধরিত্রীর কাল নির্ধারণ করেন, তেমনই আমাদের জননী স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হয়েও আমাদের কালনিরীক্ষণ করেন, আর সেই কালনিরীক্ষণের ধারাপাতেই শঙ্কর এলেন। যখন এলেন, তখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পুরাণ ধরে ধরে, ব্রাহ্মণরা সমস্ত সমাজকে গ্রাস করে নিয়ে বসে রয়েছেন। সমস্ত বৌদ্ধবিজ্ঞানকে তস্করি করে বেদের পাতায় তা ধরেছেন, আর তাকে ঘিরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণদের ইচ্ছামত ব্রাহ্মণের আরাধনা করার মত পুরাণ রচনা করে দিয়েছেন। আর তাই দিয়ে ব্রাহ্মণরা একটি শিশু জন্ম নিলে, তাঁর ঠিকুজিকুষ্ঠির নাম করে গল্পফেঁদে ধনসম্পদ, মাংস এমনকি স্ত্রীও লুণ্ঠন করেন দানের নামে। একই প্রথা উপনয়নে, বিবাহে, বিবাহউপরান্তে সাধে, এমনকি মৃত্যুতেও, অর্থাৎ শ্রাদ্ধের নাম করে।

সমস্ত ভাবেই লুণ্ঠন চলতে থাকে, আর তা বিক্রাল আকার ধারণ করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ যথার্থ, তাই কামাতুর ব্রাহ্মণ বিবাহের পর বিবাহ করেন এবং কন্যার বয়সী স্ত্রীর ধর্ষণ করেন সাজানো মিথ্যাচারী বৈদিক ধর্মকে শিখণ্ডী করে রেখে। আবার যদি কনো স্ত্রীর স্বামী ধনবান হন, তবে তাঁর স্ত্রীকে স্বামীর জ্বলন্তচিতায় তুলে দিয়ে, জীবিত ঝলসে দিয়ে, সেই ধনবান স্বামীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিতেন। কনো সুন্দরী কন্যা দেখলেই, তাকে বৃদ্ধের সাথে বিবাহ দিয়ে দিতেন, যাতে সেই সুন্দরী স্বল্পবয়েসে বিধবা হয়ে যায়, আর একবার বিধবা হয়ে গেলে, সেই কন্যা হয়ে যায় ব্রাহ্মণদের বিবাহ না করা, কেবলই কামাতুরতার উপভোগের পাত্রী।

যেই জ্যোতিষের সূচনা বৌদ্ধরা করেছিলেন, মনের বিকার ও বুদ্ধির ভ্রমকাতরতাকে ব্যাখ্যা দিতে, বেদে সেই কথাকেই তস্করি করে রাখলেন, কিন্তু এমন ভাবে রাখলেন যেন সেই মনবিকার অর্থাৎ নক্ষত্ররা, এবং বুদ্ধিভ্রম অর্থাৎ গ্রহরা হলেন দেবতা এবং তাঁদের তুষ্ট করতে হবে, আর এই তুষ্টিকরনের নামে, জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে অসংখ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান রেখে সম্পত্তি উপার্জনের ফিকির তো ছিলই ব্রাহ্মণদের। তবে পুত্রী, মৃত্যুতেই থেমে থাকতো না। মৃত ব্যক্তির অশরীরীও নাকি আহার করে! পাচন শক্তি নাকি তারও থাকে। ... না এমনি তো থাকেনা, মানে বুদ্ধদের থাকেনা, ব্রাহ্মণরা বিশেষ শক্তিশালী না, তাই তাঁরা একটি সূক্ষ্মশরীর দান করে দেয় সেই মৃতকে, আর তাকে আহার দিতে হয়, তাই মৃতের সন্তানকে সম্পদ দান করতে থাকতেই হয় ব্রাহ্মণকে, আর ব্রাহ্মণ শোষণ করতেই থাকেন।

এছাড়া তো মৃত্যুর পরে নরকে গিয়ে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের লেখা গরুড়পুরাণ ধরে ধরে, কুৎসিত অত্যাচার সহ্য করতে হবে, সেই ভয় দেখিয়ে, ব্রাহ্মণদের দান করলে, সমস্ত পাপ কেটে গিয়ে স্বর্গে যাত্রা হবে, এমন প্রলোভন দেখিয়ে, যার যা কিছু পছন্দ ছিল, তা তো হনন করেই নিতো ব্রাহ্মণের দল । তা বুঝতে পারছো আশা করি পুত্রী, কি অসম্ভব রকমের শোষণ ব্রাহ্মণরা করতে শুরু করেন। আবার সেই শোষণে যাতে কনোরকম বাঁধা শাসক না দেন, তার জন্য মনু সমহিতার রচনা করিয়েছিলেন ব্রাহ্মণরা। সেই সমহিতার মাধ্যমে, অশোকের নির্মিত যতপ্রকার হস্তশিল্পীদের শ্রেণী নির্মাণ করে, তাঁদের সম্মান প্রদান করেছিলেন অশোক, তাঁদেরকে শূদ্র বলে চিহ্নিত করে, রাজাকে দিয়ে তাঁদের নির্মিত শিল্পকে ছিনিয়ে নেওয়াতেন, আর তাও সম্ভোগ করতেন নিজেরা।

পুত্রী, পুরাকাল দেখতে পাওয়া একটি দিব্যসামর্থ্য বলেই চিহ্নিত। কিন্তু পুত্রী, যখন দিব্যসামর্থ্যের বলে এই পুরাকালকে মানসচক্ষে দেখতে হয়, তখন আর এই পুরাকাল দেখতে পাবার সামর্থ্যকে বরদান নয়, অভিশাপ মনে হয়। হ্যাঁ পুত্রী, যখন সবে সবে আমার এই সামর্থ্য এসেছিল, তখনই এই সমস্ত কিছু দেখতে থেকেছিলাম, মহাউৎসাহ নিয়েই দেখতে থেকেছিলাম, কিন্তু যখন এই অকথ্য অত্যাচার, অসম্ভব নিপীড়ন, ভয়ানক কামাতুরতা, এবং নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রগুলি দেখেছি, তখন আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আমি প্রায়শই অন্ন নষ্ট করে উঠে যেতাম, মুখে খাবার উঠতো না; প্রায়শই নিদ্রার মাঝে সেই পুরাকালের দৃশ্যকে স্বপ্নে দেখে আঁতকে উঠতাম, স্বপ্নের ঘোরে নিজেকে সেই কালেরই এক নিপীড়িত স্ত্রী মনে হতো, আর ঘরের একটি কোনাতে সিটিয়ে বসে রাত্রি কাটাতাম।

তাই পুত্রী, এটি সত্যি নয় যে অতীত আর ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া বরদান। হৃদয়হীনদের কাছে তা হতে পারে বরদান, কিন্তু হৃদয়ছাড়া যে প্রেম হয়না! ... তাই যেই হৃদয়ে প্রেম হয়, সেই হৃদয়ের জন্য অতীত বা ভবিষ্যৎ দেখতে পাড়ার সামর্থ্য এক শ্রেষ্ঠ অভিশাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ... সবই তো কল্পনার ফের। ... হয়তো সেই মীমাংসাতে তখনই উপস্থিত হতে পারতাম, যখন এই ত্রিকাল দর্শন করছিলাম, তাহলে হয়তো এমন ভাবে দিনের পর দিন অন্নের অপমান করতাম না, দিনের পর দিন এমন ভয়ে শিউরে উঠে, নিজেকে নির্যাতিতা বিধবা নারী মনে করে ঠকঠক করে কেঁপে রাত কাটাতাম না। ...

হ্যাঁ পুত্রী, তখন বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম কেন গৌতম বুদ্ধ এমন আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন দুঃখে। তাঁকেও যে আমারই মত সেই নির্যাতিতা পশু, স্ত্রী, দরিদ্রের অনুভবকে নিজের মধ্যেই অনুভব করতে হয়েছে। আমাদের ঈশ্বরকটিদের তো এই ভাবেই অনুভব আসে! ... তাই তিনি কেন দুঃখে কাতর হবেন না! ... নিজের আতঙ্ককে দিয়ে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম পরবর্তী কালে।

যাইহোক, বৌদ্ধরা বুদ্ধের অনুগত ছাত্রছাত্রী। তাঁরা বুদ্ধের আদেশ মেনেই প্রেমের পক্ষে, ষড়যন্ত্র ও লড়াইএর বিপক্ষে। তাই হয়তো তাঁরা পাহাড়ে এবং বনজঙ্গলে আত্মগোপন করে গেলেন, আবার কেউ কেউ বা অনেকেই জম্বুদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে চলে গেলেন, আর অবশিষ্টরা এই বৈদিকদের অত্যাচারের শিকার হয়েই থেকে গেলেন।

কিন্তু এমন চললে সত্যের কি হবে? যেই সত্যে যাত্রার জন্য হাজারো যোনি পেরিয়ে অবশেষে মনুষ্যযোনির অবতারণা সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যেস্থিত হয়ে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব, সত্যে লীন হওয়া সম্ভব, সেই যাত্রার কি হবে? ... তাই এলেন ৩১ নম্বর বুদ্ধ, যার নাম শঙ্কর। যেই বৈদিক ধর্ম নিজের সপ্তম অত্যাচারীরূপে স্থিত, তাঁর মধ্যে স্থিত হয়ে, এবার এই বুদ্ধ পুনরায় বোধিসত্ত্ব স্থাপন করলেন। উপনিষদে ব্রহ্মকে, শূন্যকে, প্রকৃতিকে ব্যখ্যা করতে গিয়ে, ব্রাহ্মণদের দাপটের জন্য আত্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল, এবার সেই আত্ম শব্দগুলিকে সংশোধন করে দিয়ে শঙ্কর বললেন ব্রহ্ম। সম্যক উপনিষদের আত্মশব্দকে উঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যতে নিজের দাসরূপে স্থাপিত করার জন্য, আর এবার সম্যক আত্ম শব্দকে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে শঙ্কর এক বিপ্লব রচনা করে দিলেন।

শুধু বিপ্লব নয়, মহাবিপ্লব শুরু করলেন শঙ্কর। যেই বেদ দ্বৈততাকে আশ্রয় করেই চলমান ছিল এতকাল, এবং কনো ভাবে সত্যকে সহ্য করতে পারতো না তারা, সেই বৈদিকের সাথেই এবার অদ্বৈততত্ত্বকে যুক্ত করে দিলেন শঙ্কর। আর তা জুড়তেই, এই অসত্য এবং মিথ্যাচারী বৈদিকের মধ্যেও সত্যকে স্থাপন করে দিলেন। পুত্রী, তুমি বলবে, এ কেমন কর্মকাণ্ড? অপরাধীকে অমৃত দান, কিভাবে সঠিক কর্ম হতে পারে?

পুত্রী, গৌতম বুদ্ধ একটি কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে যেই সন্তান দুর্বল, মায়ের সব থেকে অধিক স্নেহ সেই সন্তানের প্রতিই জন্মায়। ... পুত্রী, ব্রাহ্মণরা নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু যাদের উপর অত্যাচার করে চলেছেন তাঁরা, যারা এই অসম্ভব অত্যাচার মুখবুঝে সহ্য করে চলেছেন এমন মনে করে যে যারা অত্যাচার করছেন তাঁরা সত্যজ্ঞাতা, তাঁদের এই নিষ্কপট বিশ্বাসের কি কনো মূল্য নেই?

তাঁদের এই নিষ্কপট বিশ্বাস ব্রাহ্মণদের কাছে শোষণের অস্ত্র হতে পারে, কিন্তু সত্যের কাছে, আমাদের জননী মাতা সর্বাম্বার কাছে! তাঁর কাছে যে এই বিশ্বাস তাঁর উপর বিশ্বাস। নিজের সন্তানের, নিজের মায়ের প্রতি নিষ্কপট বিশ্বাসের অমর্যাদা কি করে হতে দিতে পারেন তিনি! ... আর এই অসম্ভব প্রেমের কথাই তো বুদ্ধধর্ম বলে পুত্রী।

বুদ্ধধর্ম প্রকৃতির এই অসম্ভব প্রেমকেই অনুসরণ করতে বলে আর বলে প্রকৃতির থেকে প্রেম করতে শেখ, আর তেমনই প্রেম করো, কেন প্রতিশোধের চিন্তা করো! কেন প্রতিহিংসার চিন্তা করো! প্রেম করো। প্রতিহিংসা যার প্রতি, তিনি ক্ষমতা বলে সুরক্ষিত হয়ে যান, আর যিনি সেই হিংসার কবলে থেকে নিপীড়িত ছিলেন, তিনিই আমার তোমার প্রতিহিংসার কবলে পরে পুনরায় নিপীড়িত হবেন। তাঁর উপর করুণা হয়না তোমার? তাই কেন প্রতিহিংসা করছো? তোমার প্রতিহিংসার ফলে নিপীড়িত তো তাঁরাই হবেন, যার ইতিমধ্যেই নিপীড়িত। তাঁদের উপর করুণা করে অন্তত প্রতিহিংসা বন্ধ করে, প্রেম করো।

পুত্রী, এই মূল মন্ত্র বুদ্ধকথার, আর আজিবকও অশোককে এই কথাই বলেছিলেন, তাঁকে প্রতিহিংসার পথ থেকে অপসারিত করে সত্যের পথে, সনাতনের পথে চালিত করার জন্য। ... আর তাই শঙ্কর সেই নিপীড়িতদের কাছে তুলে দিলেন বুদ্ধধর্মের সার কথা, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ। ... (হেসে) কি বুঝলে পুত্রী? ব্রাহ্মণরা চাণক্যের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করে বৌদ্ধের মধ্যে অসত্যকে প্রবেশ করিয়ে ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিল, আর ৩১ নম্বর বুদ্ধ, অর্থাৎ শঙ্কর সে বৈদিক ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধারার মধ্যেই সত্যকে প্রবেশ করালেন সত্যের বিকাশ ঘটানোর জন্য।

কি অদ্ভুত অসামাঞ্জস্যপূর্ণ সমীকরণ দেখো পুত্রী। অহংকারের অসুরত্বের দৌরাত্ম এমনই যে সত্যকামীকে অসত্যের পথে ভ্রমিত করে দিয়ে শোষণের পাত্র করে দেওয়া। কিন্তু ঈশ্বরীয় প্রেম এমনই যে সেই অসুরত্বের মধ্যেও অমৃত প্রদান করে, তাকে সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হবার উপযোগী করে তোলে। ... এটিই দিব্য পুত্রী, এটিই ঈশ্বরীয়। এটিই মনোরম, আর এটিই আমাদের সকল ঈশ্বরকটিদের আমাদের একমাত্র জননীর প্রতি বারেবারে আকর্ষিত করে। তাঁর এমন অদ্ভুত বিচারের চিন্তন করলেও, নিজেদের অক্ষমতার কথা স্মরণ এসে, তাঁর প্রতি প্রেমে নয়ন প্রামশ্রু পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তুমি বলবে এর ফল কি হলো? তাই তো? পুত্রী, এর ফল বহন করলেন পরের দুই বুদ্ধ, ৩২ নম্বর ও ৩৩ নম্বর বুদ্ধ, অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং গদাধর রামকৃষ্ণ। ... কি করলেন তাঁরা? তাঁরা এই অদ্বৈত সূত্র নামক সুতাকে দুইদুইবার মোক্ষম টান দিলেন, আর ব্রাহ্মণরা ধরাশায়ী হয়ে গেলেন। ... কি করে? মহাপ্রভু টান দিলেন সেই সুতা ধরে, যেই সুতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণদের নাশ করার জন্য বেঁধে রেখেছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম ধরে। ... এই কৃষ্ণ নাম ধরে টান দিতেই, সামনে চলে এলো ভগবৎ গীতা, আর যাই তা সামনে এলো, অমনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত কথা ফিকে পরে গেল। কেন?

কারণ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে নিজেকেই কৃষ্ণ করে ভগবানের শ্রেষ্ঠ করে স্থাপন করে রেখে ব্রাহ্মণদের বিনাশকে নিশ্চিত করে গেছিলেন। মহাপ্রভু শুধুই প্রেমপ্রদর্শনে সেই সুতাতে একটু টান দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকুল বিপর্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর তারা এমনই ভাবে

বিপর্যস্ত হয়ে উঠলেন যে এতদিন যা করার সাহস এঁরা জম্বুদ্বীপে দেখাতে পারেনি, এবার তাই করলেন। ব্রাহ্মণরা মহাপ্রভুকে গুম করে হত্যা করলেন।

এমন কি প্রয়োজন করে গেল যে জম্বুদ্বীপের ব্রাহ্মণদের স্বয়ং বুদ্ধের হত্যা করতে হলো? বুদ্ধ লীলা অতিমনোরম পুত্রী। জনহিত কামনা করা যে স্বয়ং কতবড় এক ষড়যন্ত্র, তা ব্রাহ্মণদের মোটা মস্তিষ্কে আজও প্রবেশ করেনি। প্রেম যে কতটা শক্তিশালী, তা ব্রাহ্মণরা কনোদিন বোঝেনও নি, আর বুঝবেনও না, কারণ তাঁরা যে প্রেম নয়, শোষণে বিশ্বাসী, অহংকারের তোষামোদি করতেই উন্মত্ত তাঁরা, পায়ের উপর পা তুলে, সহস্র সহস্র বৎসর তাঁরা কুষ্ঠিবিচার করে, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে, আর বিবাহ দিয়ে, যজ্ঞ করিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করে, সকলকে ভ্রমে আচ্ছন্ন করে, শোষণ করাই যাদের ধর্ম, তারা প্রেমের শক্তি জানবেই বা কি করে, বুঝবেই বা কি করে?

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন ব্রাহ্মণদের কথানুসারে বুদ্ধের সমস্ত কথাকে রূপকথার আখরে আবদ্ধ করে পুরাণ রচনা করে ব্রাহ্মণদের সহস্র বৎসরের পায়ের উপর পা তুলে খাওয়ার পন্থা স্থাপন করছিলেন, তখন তাঁকে বুদ্ধতত্ত্বও অনুশীলন করতে হয়েছে, আর তা তাঁর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেই দেয়। আর সেই প্রেমের প্রকাশ না করতে পাড়ার আক্রোশে, তিনি উপনিষদের কথাকে গীতায় স্থাপন করে, নিজেকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভগবান শ্রেষ্ঠ করে স্থাপন করে যান এবং সেই উপনিষদ কথাকে ভগবানের কথা বলে প্রতিষ্ঠা করে যান।

এর ফল কি হলো? এর ফল এই হলো যে, উপনিষদ যা বলে যে যেকেউ ঈশ্বরলাভ করতে পারেন, যেকেউ সত্য লাভ করতে পারেন, যেকেউ সত্যলাভের অধিকারী, যেকেউ ভ্রম থেকে মুক্ত হলেই সত্যলাভ করতে পারেন, আর তা করার জন্য কনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, তাই উঠে এলো কৃষ্ণের বাণীরূপে, অর্থাৎ ভগবানশ্রেষ্ঠের বাণীরূপে। আর সেই রান্নাঘরের আসবাবের পিছনে লুকিয়ে থাকা হামলদিস্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণকেই টেনে বার করে আনলেন মহাপ্রভু। যাই তিনি তা বার করে আনলেন, তাই সম্মুখে এসে গেল ভগবৎ গীতা, অর্থাৎ ভগবানের নিজের মুখে বলা কথা এবং যা উপনিষদ বা বুদ্ধের কথাও। আর যাই তা বেরিয়ে এলো সামনে, অমনি ব্রাহ্মণদের উপর অবিশ্বাস সামনে এসে গেল সকলের।

আর তা এমনই তীব্র ভাবে সামনে এসে গেল যে, ব্রাহ্মণরা বাধ্য হলেন যে তাঁদের মতেই শ্রেষ্ঠ পাপ, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের অবতার বা বুদ্ধের হত্যা করতে এগিয়ে এলেন তাঁরা। ... আমি হেসে হেসে কথাগুলো বলছি বলে তুমি একটু তাজ্জব হচ্ছ পুত্রী, তাই না? একজন অবতারের হত্যা করা হলো, অথচ আমি হেসে হেসে কথাগুলো বলছি, এমনই ভাবছো না! ... পুত্রী, দেহ ধারণ যে এক কল্পঅণ্ড নির্মাণ আর এক কল্পব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ, একটি বুদবুদের মতন তা; এই ফুলে আকাশ ছুঁচ্ছে, আর এই ফেটে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। কিন্তু যখন একটি বুদবুদ ফেটে গিয়ে একটি বুদবুদের লহরকেই ফাটিয়ে দেয়, তখন তা কি আনন্দের বিষয় নয়?

হ্যাঁ পুত্রী, মহাপ্রভু আমাদের গর্ব। তিনি জানতেন যা তিনি করছেন, তার পরিণতি তাঁর হত্যা। কিন্তু তিনি অবলীলায় সেই কৃষ্ণসুতাকে টানলেন, আর ব্রাহ্মণদের সর্বনাশ করে দিলেন। সত্যের পুনরায় জয় হলো পুত্রী, মানব সমাজ সত্যের পথে যাত্রায় পুনরায় উজ্জীবিত হলো। আর এবার সময় এসে গেছিল, সেই সুতা ধরে টান দেবার, যেই সুতাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে ব্রাহ্মণরা মার্কণ্ড

মহাপুরাণের নাশ করে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে দিয়ে মার্কণ্ড পুরাণ রচনা করিয়েছিলেন, অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব, বোধিসত্ত্বতত্ত্ব, বা আমাদের জননীর তত্ত্ব।

আর সেই তত্ত্বকে টেনে আনলেন যিনি, তিনি হলেন গদাধর রামকৃষ্ণ ঠাকুর। তিনি শক্তিনামক সুতা, যা ব্রাহ্মণদের দ্বিতীয় দুর্বলতা, তাকে টেনে বার করলেন, আর আবারও শঙ্করের কথা, উপনিষদের কথাকে একত্রিত করে বললেন যাহা শক্তি, তাই ব্রহ্ম; নিষ্ক্রিয় হলেই ব্রহ্ম, সক্রিয় হলেই শক্তি। ... তাঁর ছিল ইঙ্গিত, আর তাঁর শিষ্য সেই ইঙ্গিতকে ধরে ধরে, পুনরায় এই বুদ্ধযুগের অবসানের কালে, এই বুদ্ধযুগের স্থাপক, শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে সামনে আনলেন, আর সমস্ত দুনিয়াকে পুনরায় বুদ্ধপ্রেমের অমৃতধারায় স্নান করিয়ে দিলেন।

এই ছিল বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম পুত্রী, যেই সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিলেন ব্রাহ্মণরাই, আর গদাধরের শিষ্যের হাত ধরে, বেদান্ত স্থাপিত হয়ে, ব্রাহ্মণরা কেবলই বাউন হয়ে রয়েগেলেন, যাদের সমাজে স্থান রইলো শূদ্রেরও অধম হয়ে। শূদ্রেরও অধম কেন? শূদ্র তো পরিশ্রমের পারিশ্রমিক পায়, কিন্তু বাউন যে কেবলই পঙ্গুর ন্যায় ভিক্ষা পায় এখন, কনো কর্ম করতে তাঁরা পারেন না, তাই তাঁদেরকে সময়ে সময়ে ডেকে এনে, ভিক্ষা দেওয়া হয়।

বুঝতে পারলে তবে পুত্রী, বুদ্ধধারা কি ভাবে কাজ করে, আর কিভাবে ১০ হাজার বছর ধরে ধর্মের ধ্বজাকে তাঁরা রক্ষা করে এসেছেন? ... পূর্বের বুদ্ধদের ধারা দেখতে পাবেনা, কারণ তাঁদের কীর্তির বিস্তারীত কথা উপলব্ধ নেই। কিন্তু যা উপলব্ধ আছে, তাতেও ৬টি বুদ্ধের কথা আছে, এবং দুটি প্রধান বুদ্ধ এবং তাঁদের এক সহস্র বৎসরের রাজত্বের বিবরণও আছে। ... দেখো পুত্রী, গৌতম বুদ্ধ কি করলেন? অদ্বৈতবাদের প্রসার করলেন, এবং নির্বাণকে সর্বৈব করে দিলেন, যতক্ষণ না নির্বাণলাভ হচ্ছে, ততক্ষণ সকলকে সুরক্ষা প্রদানের বচন দিলেন। এই বচনের মান কে রাখলেন? তাঁর দুই অনুগামী, মহম্মদ এবং ঈশা। ইনারা দুইজনেই এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে এই সুরক্ষাকবচই প্রদান করলেন।

কিন্তু এই সময়কালের মধ্যে কি কি হলো ? ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্ষমতা লাভের নেশায় ব্যকুল হয়ে, ষড়যন্ত্র করলেন, এবং ক্ষমতা লাভ করে শোষণ করতে শুরু করলেন। সেই ষড়যন্ত্রের মধ্য থেকেই, যিনি নিপীড়িতদের আশ্রয় দিলেন তিনি হলেন ৩১ নম্বর বুদ্ধ অর্থাৎ শঙ্কর, আর তিনি পুনরায় বুদ্ধধারার স্থাপন করলেন কিন্তু এবার ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্মের মধ্যেই তা স্থাপন করলেন, যা করার প্রয়াস করেও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি পিপলাদ উপনিষদের মাধ্যমে।

আর একবার সেই বুদ্ধযুগের সূচনা শঙ্কর করে দিতেই, এলেন মহাপ্রভু আর তিনি ব্রাহ্মণদের একটি দুর্বলতাকে ধরে টান মারলেন, আর এলেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর, আর তিনি অন্য এক সুতা ধরে টান মারলেন, আর ব্রাহ্মণদের ফাঁস গেলে খুলে, আর ফাঁস খুলতেই, তাঁরা কি হলেন? তাঁরা শূদ্রেরও অধম হয়ে গেলেন। ... এবার জেনে ফেলেছ পুত্রী, সনাতন ধর্ম কি, ১১ হাজার বরষ ব্যাপী ৩৩ টি বুদ্ধ কিভাবে সনাতন ধর্মকে স্থাপিত রেখেছেন, সেই ব্যাপারে?”

দেবী দিব্যশ্রী বললেন, "আর নিজের ব্যাপারে বললেন না তো আপনি? আপনি তো ৩৪ নম্বর বুদ্ধ, আপনিও তো এক বুদ্ধযুগেরই সূচনা করলেন। সেই যুগের কথা বলবেন না আমাকে?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "আমি আমার অতীতের যা কিছু দেখেছি, সমস্ত তোমাকে বললাম। আমারটি তো তুমিই প্রত্যক্ষ করেছ। তাই তুমিই বলো, তুমি কি প্রত্যক্ষ করলে, তা শুনে আমি আপ্লুত হই একটু"।

দেবী দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "আপনি দেহছাড়ার কথা বলেন প্রায়শই, কিন্তু আপনার বাললীলারও এখনো অবসান হয়নি। এখনো আপনি আমার সাথে বাললীলা করে যাচ্ছেন । বেশ তাহলে বলি আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি তা। ... আমি এই প্রত্যক্ষ করেছি যে, ব্রাহ্মণদের পুনজাগরন হচ্ছে। যেই বৈশ্যদের নিয়ে গৌতম বুদ্ধ বিপ্লব করেছিলেন, সেই বৈশ্যদের ধরে ব্রাহ্মণরা আবার জাগ্রত হবার প্রয়াস করছে। তবে পার্থক্য এই যে, সেই বৈশ্যদের ব্রাহ্মণরাই পরবর্তীতে বৈশ্য ও শূদ্রতে ভেঙে দিয়েছিলেন, আর এখন এই ব্রাহ্মণরা সেই ভেঙে দেওয়া বৈশ্যদের নিয়েই পুনর্গঠন করছে নিজেদের শক্তিকে। আর এবার সেই শক্তি জেগে ওঠার আগেই, আপনি সত্যের বুলি স্থাপন করে দিলেন কৃতান্তের মাধ্যমে।

সম্মুখে অনেক ঘটনা পরে আছে, যা আপনার মুখ থেকেই আমি শুনেছি আর জেনেছি। এখন যেমন আপনি অতীতের কথা বললেন, তেমন আপনি ভবিষ্যতের কথাও আমাকে বলেছেন, আর সেখানের একটি কথা যেমন মানবজাতির সংখ্যা কম হওয়া, যাতে যেকেউ মানবজন্ম পেতে না পারে, তেমন জম্বুদ্বীপ ভাঙা এবং বঙ্গগঠনের কথাও বলেছেন আমাকে। এই সমস্ত কিছুকে মেলালে, আমার বোধ হচ্ছে যে, এই নববঙ্গই হবে এই একাদশতম বুদ্ধযুগের পীঠস্থান, যা আগামী বুদ্ধযুগ, মানে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশতম বুদ্ধযুগেরও ক্ষেত্র হতে পারে।

অর্থাৎ ১১ হাজার সাল ধরে যেই মহাবোধিকালের রচনা হয়ে, জগতকে এবং মানবজাতিকে নির্বাণের পথ দেখিয়েছে বোধিসত্ত্ব, আবারও তেমন এক মহাবোধিকালের সূচনা হবার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। প্রথমে মানবের সংখ্যা কমবে, সমসাময়িক ভাবে জম্বুদ্বীপের ভাঙন হবে এবং একাধিক নবদেশের সাথে সাথে নববঙ্গেরও গঠন হবে। আর এই নববঙ্গই হবে নববোধিযুগের মহাতীর্থ, যাকে কেন্দ্র করে আবার জগত সত্যের পথে হাঁটবে। তবে এবারের বোধিযুগে আর কনো বুদ্ধ কর্তা হবেন না, সকলেই কর্তাভাব ত্যাগ করে কৃতান্তিক হবেন, আর কর্তা হবেন আমাদের সকলের মাতা, স্বয়ং ব্রহ্ম, অর্থাৎ মাতা সর্বাম্বা। আর তাই এই যুগকে আর বোধিযুগ বলাও সঠিক হবেনা, একে বলা উচিত মাতৃযুগ।

অর্থাৎ আমার অনুমান যে আপনি কৃতান্ত ধর্মের অবতারণা করে, সমস্ত ভ্রমের বিভ্রান্তিকর তত্ত্বকে ফেলে দিয়ে, কেবলই সারটুকু রেখে দিলেন, এবং ভ্রম থেকে সত্যে যাবার কর্তৃত্ব অর্পণ করে দিলেন কনো নশ্বরকে নয়, যতই সেই নশ্বর বুদ্ধ হোক বা কৃতান্তিক হোক। আপনি সেই কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন স্বয়ং ঈশ্বরকে, স্বয়ং শূন্যকে, স্বয়ং ব্রহ্মকে, যাতে এই মহাযুগ অক্ষয় হয়। কিন্তু তা কি অক্ষয় হবে পিতা?"

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "আমাদের জননীই অক্ষয় নন। ... যেই মুহূর্তে নির্বাণ লাভ, সেই মুহূর্তেই তিনি মাতা থেকে প্রেয়সী হয়ে স্বয়ং ব্রহ্ম হয়ে যান। তাহলে কিই বা অক্ষয় হতে পারে পুত্রী? হ্যাঁ দীর্ঘমেয়াদি হবে তা, হয়তো পূর্বের মহাবোধিযুগের থেকেও অধিক বড় হবে, হয়তো ১১ হাজার সালের বোধিযুগের পরে, এটি হবে ২০ হাজার বছরের স্বর্ণযুগ, কিন্তু যার শুরু আছে, তার ক্ষয় তো আবশ্যক পুত্রী। ...

আবারও ক্ষয় হবে, আবারও প্রতিহিংসা আসবে, আবারও নতুন করে আমাদের জননীর প্রেম স্থাপন হবে, আবারও নতুন করে বুদ্ধ আসবেন, আবারও নতুন করে ধর্মস্থাপনা হবে। ... কিন্তু হ্যাঁ, একটি আশ্বাসবাণী তোমাকে আমি প্রদান করতে পারি। আর তাই এই যে, যতক্ষণ একটি ভ্রমিত কণাও ভ্রমিত অবস্থায় অবস্থান করবে, ততক্ষণ মাতা আবার আবার করে আসবেন, কখনো বুদ্ধ হয়ে আসবেন, তো কখনো কৃতান্তিক হয়ে আসবেন, বা কখনো আরো অন্য অন্য নামে আসবেন, কিন্তু সেই একটি সন্তানকে উদ্ধার করার জন্য হলেও তিনি আসবেন, তাই সেই সন্তান স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণ হলেও, যিনি সমস্ত প্রতিহিংসার শুরু করেছিলেন"।

দেবী দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "এই অপার প্রেম যদি একবার অনুভব করে নিতেন তাঁরা, আর হয়তো ক্ষমতার লালসা করতেন না, শোষণের চিন্তা করতেন না। প্রেম করতে না পারলেও, সেই প্রেমকে অন্তত অনুভবের চেষ্টা করতে চাইতেন স্বর্গনরক ত্যাগ করে । যেদিন তেমনটি হবে মনুষ্যকুলে, সেদিনই মনুষ্যযোনি নিজের যথার্থতার উচ্চতায় উড্ডীয়মান হবে"।

~সমাপ্তি~

ওঁ সনাতনী ত্রিগুণস্থ্যু, তস্মৈ অখিল সন্তোষকরু।

প্রধাশিনাবিশ্বঃ ত্বং ইবভবো, আশুহাতু ভাতিসৌম্যো।।

অব্যক্তব্রহ্মম ব্যক্তভবো, ব্রহ্মময়ী ত্বঃ পূর্ণখণ্ডে।

বহুদাবন্দাতি ত্বং পাদপদ্মে, নমস্তে দেবী সর্বস্বে।।